যুদ্ধ ■ সেলিনা হোসেন

যুদ্ধ

সেলিনা হোসেন

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
২১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

ISBN 984 410 092 5

JUDHA (A Novel) By Selina Hossain. Published By Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar Dhaka 1100 Cover Designed By Dhruba Esh

উৎসর্গ

এই উপন্যাস লেখার প্রযোজনে
ধানুয়া–কামালপুরে তথ্য সংগ্রহকালে
স্থানীয জনসাধারণের মুখে যাঁদেব নাম
বাববার উচ্চাবিত হযেছে—

যুদ্ধাহত মেজর আবু তাহের ও
শহীদ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ

এবং ১১ নম্বব সেক্টরের
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে

युद्ध

১

বিয়ে ভেঙে গেলো তারামনের।

এই মুহূর্তে ও ফিরে যাচ্ছে পুরনো ভিটেয়। ওখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মা ওর ফেরার অপেক্ষা করছে। ওর সঙ্গে বাবা। তিনিও খুশি নন। তিনি জানেন, যে মেয়ের তালাক হয় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সুখের কাজ নয়।

কিন্তু তারামন খুব খুশি। মাঝ-মাঠে দাঁড়িয়ে ও খোলা প্রকৃতি দেখে। পশ্চিমে এগুলে নদী। ব্রহ্মপুত্র। ওরা পশ্চিমে যাবে না। যাবে দক্ষিণে। ওই দিকেই ওর গাঁ, ছয় মাস আগে ওখান থেকে ও শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলো। এর মাঝে ওকে একদিনের জন্যও বাবার বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়নি। ওকে পেছনে ফেলে ওর বাবা বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছে। তারামনের মনে হয় বাবা রেগে আছে। তাই ওর সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছে না। ও গায়ে মাখে না। নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার আনন্দে একটি শাড়ি ও দু'টি ব্লাউজের ছোট্ট পুঁটলিটা উপরে ছোঁড়ে আর দু'হাতে ধরে। এভাবেই খেলতে খেলতে ও এগোয়, যেন গাছ থেকে জাম্বুরা পেড়ে বেণুর সঙ্গে ঐ ছুঁড়ে দেওয়া আর ধরে ফেলার খেলার আনন্দ ও ফিরে পেয়েছে। একদিন খেলতে খেলতে ও আর বেণু সবুজ রঙধনু দেখেছিলো। আজও অনেক দূরের গাছের সারি দিয়ে তৈরি সবুজ রেখাটি ওর দারুণ লাগে। ও নিজের আনন্দের ভাগীদার করতে চায় ওর বাবাকে। চেঁচিয়ে বলে, আব্বা দেখেন সবুজ রঙধনু।

কি? ভুরু কুঁচকে যায় আবদুস সোবহানের।

ঐ যে দেখেন—

ওগুলাতো গাছ।

রঙধনুর মতো লাগে না?

ধুৎ, হাঁট।

আবদুস সোবহানের বিরক্তিতে দমে যায় না তারামন।

কারণ তারামনের খুশির সীমা নেই। ওর ধারণা ও একটা খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে যাবার দু'দিন পরই শাশুড়ি ওকে সকালের বাসি চুলা থেকে ছাই তোলার দায়িত্ব দিয়েছিলো। কাজটি ওর ভালো লাগতো, বেণুর সঙ্গে পুতুল খেলার মতো। আগের দিন

সন্ধ্যাবেলার গনগনে কয়লা সারা রাতে চমৎকার ছাই হয়ে যায়। ভোরবেলা তারামন ছাইগুলো মালসায় ভরে পুকুরঘাটে নিয়ে রাখতো। তারপর সেই ছাই দিয়ে একগাদা হাঁড়িকুড়ি, থালা-গেলাস ঘঁষামাজা। মজার খেলাই তো! ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস, পুকুরের ঠাণ্ডা পানি আর সুন্দর ছাই। তারামন কাজটি বেশ উপভোগ করতো। শুধু রাতে মেছের আলির সঙ্গে ঘুমুতে গেলেই ওর মনে হতো সংসারের মুখে ছাই ভরে দিতে। তখন ছাইয়ের অর্থটা পুতুল খেলার আমোদ থেকে ছিটকে পড়ে জঘন্য কদর্য হয়ে যেতো। তারামন এইসব ভাবনার মাঝে আঁচল খুলে মুঠোভরা ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

তারামন বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছে। গতকাল মেয়েকে দেখতে বেয়াই বাড়িতে এসেছিলো আবদুস সোবহান। বড়ই আকস্মিক আসা। মেয়ের মা মেয়েকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলো। তাই আসা, নইলে আবদুস সোবহানের নিজের কোনো গরজ ছিলো না। এসেই তোপের মুখে। জানতে পারে মেয়ের তিন তালাক হয়ে গেছে। ওই বাড়িতে এক গ্লাস পানিও খায়নি আবদুস সোবহান। তারামনের মা যে বেয়াই বাড়ির জন্য চিতই পিঠা রসে ভিজিয়ে পাঠিয়েছিলো সে পুঁটলিটাও খোলেনি। তারামন তো ফেরার জন্য তৈরিই ছিলো। বাবাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে কাপড়ের পুঁটলিটা বগল দাবা করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, চলেন আব্বাজান।

তারপর থেকে দুজনে রাস্তায়। বিয়ের আগেই আবদুস সোবহান জানতো যে মেছের আলির মৃগী রোগ আছে। তবু মেয়েটিকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। কারণ মেছের আলির পরিবার সচ্ছল। দিনমজুর আবদুস সোবহানের মতো কষ্টের নয়। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে একটি মুখ কমাতে চেয়েছিলো ও। এখন নিজের কপালে নিজেই করাঘাত করে। এই তালাকপ্রাপ্ত মেয়েটিকে আবার কবে বিয়ে দিতে পারবে? দুশ্চিন্তায় আবদুস সোবহান ঠিকমতো হাঁটতেও পারে না। কিন্তু মেয়ের পায়ের চপল গতি দেখে ভাবে, মেয়েটি কি ভাবছে বাপের বাড়িই ওর আসল জায়গা? ওর কি কোনো দুঃখ নেই? বিয়ে ভেঙে গেলে মেয়েরাতো দুঃখ পায়। ও দুঃখ পাচ্ছে না কেন? আবদুস সোবহান রেগে উঠতে চায়। পারে না। সাহস হয় না। দিনমজুরের জীবন ওকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। এই মেয়েটি আবার ঘাড়ে চাপলো এই ভাবনায় ওর নদীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মন চায়।

অসীম বিস্তারী জলের দৃশ্য কিংবা একটুখানি জল-ছোঁয়া বাতাস যদি আবদুস সোবহান অনুভব করে তাহলে কি ও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ জীবনের জ্বালা জুড়াবে? ভাবতেই ভয় পায় আবদুস সোবহান। না ও মরতে পারবে না। মৃত্যু ও সহ্য করতে পারে না।

এইসব ভাবনার মাঝে তারামন ওর কাছে এসে দাঁড়ালে আবদুস সোবহান মেয়ের জন্য প্রবল মমতা অনুভব করে। আসলে মেয়েটি ওর চেয়ে সাহসী। ও তো ভয় পাচ্ছে না। ও মেয়ের মাথায় হাত রেখে নরম স্বরে ডাকে, মা তারামন।

কি বলেন আব্বাজান?

তুই আঁচলে ছাই বেঁধে রেখেছিলি কেন মা?

ছাই আমার পুতুল খেলা।

পুতুল খেলা?

আমার এক পোটলা পুতুল আছে আব্বা। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে পোটলাটা মাচার ওপরে উঠিয়ে রেখে এসেছি। গিয়েই বের করবো।

ছাই যদি পুতুল খেলাই হবে তাহলে উড়িয়ে দিলি কেন?

সংসারের মুখে ছাই দিলাম আব্বা। এখন থেকে আমি স্বাধীন।

স্বাধীন? আবদুস সোবহান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আব্বা আপনি যান, আমি আসছি।

তারামন কাপড়ের পুঁটলি বুকে চেপে ধানক্ষেতে নেমে যায়। ফড়িং ধরবে। টুকটুকে লাল ফড়িং। কিন্তু একটাও ধরতে পারে না। একটা উড়ে গেলে আর একটার পেছনে ছোটে। আবদুস সোবহানের একরকম কষ্ট হয়, যেন কষ্ট হাড়ের গায়ে শ্যাওলার মতো জমে আছে। এটা কোনো বানানো দুঃখ নয়—দুঃখ হাড়ের ভেতর থেকে গজিয়ে ওঠা। সেজন্য আবদুস সোবহান নিজেকে শোনালো, মেয়েটির দোষ কি। ওর বয়স তো মাত্র চৌদ্দ। শুকনো, ময়লা গায়ের রঙ, চোয়াল উঁচু হয়ে থাকে। তবে বড় শক্ত মেয়ে। আবদুস সোবহানের মনে হয় মেয়েটির ওর ঘরে জন্মানোই ঠিক হয়নি। এই বয়সে ও স্বাধীন হওয়া বোঝে। আবদুস সোবহান পঞ্চাশ বছর বয়সেও এতো কিছু কোনো দিন ভাবতে পারলো না। খেয়ে না-খেয়ে সরলভাবে চলে গেলো বেঁচে থাকা। ও ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে। ব্রহ্মপুত্রের কলধ্বনি শুনতে পায়। নদীটি বেশি দূরে নয়, কিন্তু ওতো নদীর দিকে যাবে না। ওর পথ উল্টো দিকে। ও মনপ্রাণ ভরে বিড়ি ফোঁকে।

ফড়িংয়ের উড়ে যাওয়ার মৃদু শব্দ আছে। ভোঁ করে ওঠে, তারামন থমকে যায়। শব্দটি যেন কেমন? ও কান পেতে শোনে। ধানক্ষেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে উড়ে যাওয়া ফড়িংগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বামী মেছের আলির কাছ থেকে ও মুক্তি পেয়েছে। গতপরশু মেছের আলি সারা সকাল এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে চেঁচামেচি করেছে। নিজের কোনো অপরাধের কথা তারামন জানে না। তবে সেই তালাক শব্দগুলো ছাই তুলতে তুলতে দু'কান ভরে শুনেছে তারামন। কি আনন্দ! ওর মনে হয়েছে দারুণ একটা কাঠঠোকরা পাখি তার অসাধারণ সুন্দর ঠোঁট দিয়ে ওর হৃৎপিণ্ডে ঠুকঠুক শব্দ করছে। আসলে ওটা শব্দ না, গান। মুহূর্তে ও ফড়িং ধরতে না পারার দুঃখ ভুলে যায়। চারদিকে তাকায়। নিজের মুঠো ভরে কিছু একটা ধরার তাড়নায় ও দৌড় দেয়। বাবাকে পাশ কাটিয়ে ও ছুটে যায়। বাবা ওকে পেছন থেকে ডাকে। ও সে ডাক শুনেও শোনে না। মনে হয় এক ছুটে বেণুর কাছে গিয়ে বলে, বেণু তুই ঠিকই বলেছিলি। এ বিয়ে টিকবে না। মৃগী রোগীর সঙ্গে ঘর কি? অমন ঘরের মুখে ছাই।

দৌড়াতে দৌড়াতে ওর মনে পড়ে মেছের আলি ওকে তিন তালাক দেওয়ার পর শাশুড়ি ওকে ঢেঁকিঘরে শুতে বলেছিলো। দু'দিন ও ঢেঁকিঘরে ঘুমিয়েছে। খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে। ভালোই ছিলো। নিঃসাড় ঘুমুতে পেরেছে। একঘুমে রাত কাবার। আনন্দ যে এমন এটা বুঝতেই ছয়টা মাস পেরিয়ে গেছে। এই ছয় মাসে রাতের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা মনে হলে ওর শরীর কেঁপে ওঠে। এখন আনন্দের সীমা নেই। মনে হয় খুশি ছাই চাপা আগুন। তখনই বুঝে গিয়েছিলো যে বাড়ি থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ও দখিনা বাতাস পাবে, সে বাতাসে খুশির আগুন দাউদাউ জ্বলে উঠবে। ও দ্বিতীয়বারের মতো থমকে দাঁড়ায়। কান পেতে নদীর কলধ্বনি শোনে, যেন আগুনের শব্দ, উঠে আসছে জলের গভীর থেকে। বাতাসে উড়ছে তারামনের লাল-সবুজ আঁচল, মাথাভরা চুল। শাড়ি উঠে গেছে হাঁটুর কাছে। এই হরিণী-গতিসম্পন্ন মেয়েটির পা জোড়া আবদুস সোবহানের চোখে লেগে থাকে। অপূর্ব দেখাচ্ছে।

গতির সৌন্দর্য বুঝি এমন। আবদুস সোবহানের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। বোঝে গরিবের সৌন্দর্য দেখা শোভা পায় না। মেয়েকে যেনতেন বিয়ে দেওয়াটাই সত্যি।

বাবাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে তারামন গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে। বিয়ের আগে গাছতলায় এমন করে বসে বেণুর সঙ্গে পুতুল খেলা হতো ওর। মা কখনো কখনো ধিঙ্গি মেয়ে বলে মারতে আসতো। তারামন কোনো দিন ভেবে দেখেনি যে ধিঙ্গি মেয়ের পুতুল খেলা থাকতে পারে কি পারে না। ও বরং হাসতে হাসতে বেণুকে জিজ্ঞেস করতো, ধিঙ্গি মেয়ে হতে হলে কতো বয়স লাগে রে?

বোধহয় দশ।

আমার এখন বারো। তাহলে তো কবেই ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে গেছি।

বলেই ও কেমন চুপ করে যেতো। ভাবতো, ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে গেলেও আমার পুতুল খেলার ইচ্ছে কেন ফুরোয় না। বেণু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে চুপিচুপি বলতো, চল বাড়ি যাই।

না।

কেন?

মা তো আমাকে ধিঙ্গি মেয়ে বলে বকেছে। ধিঙ্গি মেয়ে নিজেরাই ঠিক করবে ওরা কি করবে না করবে। চল পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি।

দুজনে আধা বেলা পুকুরে ডুবোডুবি করে এক কোঁচড় শালুক নিয়ে বাড়ি ফিরতো। মার সামনে শালুকগুলো ঢেলে দিয়ে বলতো, নেন ভ্যাটের খই ভাজেন।

জলে ভেজা ফ্যাকাসে মুখ, তবু বিবর্ণ নয়। মা অনুভব করে মেয়েটির চোখে জলের বদলে অন্যকিছু, সেটা জ্বলজ্বল করে। সেটা জলে ভিজে চুপসে যায় না, কোনো কিছুতেই ঐ জ্বলজ্বলে আভা বুঝি নিভে যাবে না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তারামনের মা কুলসুম ভড়কে যায়। তার ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে। তারামন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি দেখেন?

কুলসুম মেয়ের প্রশ্নের জবাব দেয় না। বলে, কতো বেলা হয়ে গেলো খিদে পায়নি? খেতে আয়?

কি রেঁধেছেন মাগো?

কলার মোচা ভাজি।

রোজ রোজ কলার মোচা ভাজি, আমি খাবো না।

আজ কলার মোচায় চিংড়ি মাছ দিয়েছি। তোর আব্বা খেয়ে বলেছে, খুব মজা হয়েছে।

সত্যি।

তারামন লাফ দিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। মা চেঁচিয়ে ওঠে, ছাড়, ছাড়, আমার কাপড়ও যে ভিজিয়ে দিলি। আমার কি আর কাপড় আছে?

তারামন মাকে ছেড়ে দৌড়ে ঘরে যায়। ভিজে কাপড় ছাড়ে। এখন ও ভেবে পায় না এই গাছতলায় বসে এতো কিছু মনে পড়ছে কেন ওর? ওর কি বাড়ি ফিরতে ভয় করছে? ও কি ভাবছে যে তালাক হয়ে গেলে মায়েরা মেয়েদের আগের মতো আদর করে না? নাকি অন্যরকম ভাবে? ভাবে বোঝা। উঠতে বসতে বলবে, ঝামেলা একটা। শ্বশুরবাড়ির ভাত খেতে পারে না।

তারামন জোরে জোরে বলে, মা যা ভাবে ভাবুক। আমি তো স্বাধীন হয়েছি।

এইসব ভাবনার মাঝে ছোট্ট একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে মেরে ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আবদুস সোবহান ততোক্ষণে মেয়ের কাছে এগিয়ে আসে। ওর পাশে বসে কপালের ঘাম মোছে।

আমরা কতখানি পথ হাঁটলাম আব্বা?

এক কোশ।

আর কতোদূর?

আরো দুই কোশ। পাকা রাস্তায় উঠলে আমরা মোষের গাড়ি পাবো।

মোষের গাড়ি?

তারামনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গাড়োয়ান কি চমৎকার ভাওয়াইয়া গান গায়। সে গানের সুরে ওর ঘুম পায়। গাড়িতে বিছানো বিচালির ওপর ও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এবারের বাড়ি ফেরাটা অন্য রকম। ওর কি ঘুম আসবে? নাকি ও দু'চোখের পাতা এক না করে তাকিয়ে থাকবে। দেখবে। কি? ফিক করে হেসে ফেলে তারামন।

হাসিস কেন মা?

চুপ করে থাকে তারামন। ভাবে, বাবাটা কি যে বোকা। কেউ কি মেয়েকে এমন করে জিজ্ঞেস করে? এই বয়সের মেয়েদের হাসির কতো কারণ থাকতে পারে। বাবাকে কি সব কথা বলা যায়?

মা তোর খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ, আব্বা।

তারামন প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকায়। আবদুস সোবহান পুঁটলি খুলে পিঠে বের করে। পিঠেগুলো তারামনের শাশুড়িকে দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি। এখন বাবা-মেয়ে পেটপুরে পিঠে খায়। তাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। দুজনেরই ভীষণ খিদে পেয়েছে। মেয়ের খুশিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আবদুস সোবহান জিজ্ঞেস করে, ওরা তোকে ঠিকমতো খেতে দিতো মা?

দিতো। ওরা রোজ রোজ মাছ খেতো আব্বা। মাছ না থাকলে গোস্ত। না হলে ডিম। ডাল, তরিতরকারিতো থাকতোই।

ওরা আমার চেয়ে বড়লোক মা।

খিলখিলিয়ে হাসে তারামন।

হাসিস যে?

বড়লোকের ভাত বেশিদিন খেতে হয়নি আব্বা। বেঁচে গেছি।

আবদুস সোবহান একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আবার তো অভাব।

থাকুক অভাব। অভাবের যন্ত্রণা সইতে পারি আব্বা।

তোর কিসের দুঃখ ছিলো?

সে আপনি বুঝবেন না আব্বা।

ঠিকই বলেছিস, বুঝবো না। বুঝলে কি আর মৃগী রোগির কাছে তোর বিয়ে দেই।

এখনতো বুঝলেন মেয়ের জ্বালা জুড়াতে চাইলেই জুড়ানো যায় না। মেয়ে আবার বাপের ঘাড়ে চাপে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে তারামন। কি উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত হাসি। আবদুস সোবহান অবাক হয়ে মেয়েকে দেখে। কবে ও এতো বড় হলো, কবেই বা এতোকিছু শিখলো। হাসতে হাসতে

মাথা নিচু করলে ওর সাদা সিঁথি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওর চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তেল চকচক করছে চুলে। শাড়ির ছেঁড়া পাড় দিয়ে বেণীর ডগা বাঁধা। লাল সুতো ঝুলে আছে সে পাড়ের প্রান্ত থেকে। বেগুনি জমিনে সাদা ফুল, সঙ্গে লালের টান। বেশ দেখাচ্ছে, যেন রঙিন ফিতা। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আবদুস সোবহানের। ও বেশ খুঁটিয়ে দেখা শিখেছে। সেই বেণীর ওপর রঙিন প্রজাপতি এসে বসে। দৃশ্যটি তারামন দেখতে পায় না, দেখে আবদুস সোবহান। ওর মন ভরে যায়। ভাবে, যে মেয়ে স্বাধীন হয় তার চুলে ফুটে থাকে প্রজাপতির সৌন্দর্য। কি সুন্দর। আবদুস সোবহান পা মেলে বসে থাকা তারামনের বুড়ো আঙুল ধরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোর বেণী কে বেঁধে দিয়েছে মা?

আমার ছোট ননদ। আমারই সমান। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিলো। আমার চুল আঁচড়ে দেবার সময় ও কেঁদেছিলো। চুপচুপ করে। বাড়ির কেউ দেখতে পায়নি। শুধু আমি আর ও। আমাকে বলেছে, ওর বিয়ে হলে ও বর নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে।

এটুকু বলেই আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে ও। অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে বলে, জানেন আব্বা আমার শাশুড়ি কি বলেছে? বলেছে, আমার কাছে তোর কোনো অপরাধ নাই মা রে। তুই লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু ওই যে তিন তালাক হয়ে গেছে তাই আর কিছু বলতে পারিনি। তিন তালাক বলা হলে কোনো মেয়ে তো আর শ্বশুরবাড়ি থাকতে পারে না।

তারামন আবার হাসে। হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে বলে, এখন আমার ছুটি, ছুটি।

মেয়েকে দেখা ফুরোয় না আবদুস সোবহানের। বুঝতে পারে এক নতুন তারামনকে নিয়ে ও বাড়ি ফিরছে। এই মেয়েটা এতোকাল ওর ঘরে ছিলো, কিন্তু এমন করে দেখা হয়নি। আবদুস সোবহানের সেই চোখ ছিলো না। এখন এই চারদিক খোলা প্রান্তরে গাছতলায় বসে মেয়েটি একটু একটু করে নিজের খোলস খুলছে। ওর মা যদি দুয়োরানী হয়, তাহলে ও ব্যাঙ-রাজকুমারী। এতোদিন লুকিয়ে রেখেছিলো নিজেকে।

দিনমজুর আবদুস সোবহান এমন একটি মধুর দিন আর কখনো পায়নি। মেয়েটির জন্য এই মুহূর্তে ওর বাবার হৃদয় হাহাকার করে উঠলে ও বুঝতে পারে এটাই শেষ নয়। ওর জন্য মেয়েটির কাছে আরো দিন আছে। সেইসব দিন দিয়ে ও দিনমজুর থাকার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।

তারামন পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আব্বা চলেন।

আবদুস সোবহান ওঠে না। এই ক্ষণিকের আনন্দটুকু রেখে ও উঠতে চায় না। বরং ঘাসের ওপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

যাবেন না?

যেতে মন চায় না মা রে।

তাহলে আর একটু বসি।

তারামন বাবার পাশে বসে পড়ে। পা ছড়িয়ে দিলে আবদুস সোবহান আবার ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ধরে নাড়া দিয়ে বলে, মাগো তোর জন্য আমি কিছু করতে পারিনি।

কেন বিয়ে তো দিয়েছেন।

বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে ও। আবদুস সোবহান বেকুবের মতো নিজেকে বলে, এটা কোনো বিয়ে হলো।

তারামন চোখ বড় করে তাকায়। বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। বাবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করে গভীর স্বরে বলে, এমন বিয়ে হয়েছিলো বলেই না মুক্তির আনন্দ বুঝতে পারছি।

আবদুস সোবহান ওর কথার অর্থ বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে মেয়ের পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে টান দেয়া বেশ মজার খেলা। যেন এখানেও প্রজাপতির সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হয়। আবদুস সোবহান ভেবে দেখলো, মানুষের সব অঙ্গের মধ্যে পা-ই ওর বেশি প্রিয়। গদগদ স্বরে বলে, বলতো মা তোর পা দেখতে আমার এতো ভালোলাগে কেন?

দৌড়াতে পারি যে।

তারামন নির্বিকার উত্তর দিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

নিচু হয়ে পুঁটলিটা তোলার ভঙ্গি দেখেই মনে হয় যে বাবাকে ছেড়ে এখন ও ভীষণ দৌড় দেবে। কতো পেছনে পড়ে থাকবে বাবা! আবদুস সোবহান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই তারামন ছুটতে শুরু করে। ভেসে আসে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে যাওয়ার ধ্বনি।

বাবাকে বেশ পেছনে ফেলে দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে তারামন।

চেঁচিয়ে বলে, ও বাড়িতে আমার আর যেতে হবে না। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি।

কুলসুম বিস্মিত হয়, যেতে হবে না?

না। তালাক হয়ে গেছে। একটা পাগল। মৃগী রোগি। ছয়টা মাস আমার দোজখের আগুনে কেটেছে মাগো। কি যে বাঁচা বেঁচে গেছি। উহ্ মারে।

তারামন খুশি হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুলসুম ওর চুলের মুঠি ধরে ধমাধম পেটাতে থাকে। বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ছিলো লালভানু। দৃশ্যটা ও বেশ উপভোগ করে। তারপর বারান্দা থেকে নেমে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলে, ওকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলেন আম্মা। স্বামীর সংসার থেকে তালাক নিয়ে বাপের ওপর বোঝা হতে এসেছে। যতো দোষ ওই ছুঁড়ির। দোষ না থাকলে কেউ এমন খুশি হয়ে নাচতে পারে। ঢঙ কতো। আমি হলে তো লজ্জায় মরে যেতাম।

তারামন বুঝতে পারে দুটোই পিটুনি। একটা মুখে, অন্যটা হাতে। মা এবং বোন মিলে ওর মুক্তির আনন্দ পুকুরে চুবিয়ে ধরেছে। ওকে জল ঝেড়ে উঠে আসতে হবে। লালভানু ওর নির্লজ্জতার কথা পূণর্বার উচ্চারণ করলে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে তারামনের চোখ। লজ্জা? লজ্জা কিসের? বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়া কি লজ্জা? লালভানু কেমন করে এমন কথা বললো? তাহলে ওরা কি তারামনের কষ্টহীন জীবনকে মুক্তি মনে করে না? ও নিজের শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে চেঁচিয়ে বলে, মাগো আমি মুক্তি পেয়েছি। আপনারা আমাকে দোয়া করেন।

লালভানু মুখ বেঁকিয়ে আবার বলে, ঢং কতো? পোন্দে ত্যানা নাই ওনার আবার স্বাধীনতা।

না খেয়ে থাকলেও আমি স্বাধীনতা চাই। আমার গতর আছে কাম করবো।

ও নিজেকে এক ঝটকায় মায়ের কবল থেকে মুক্ত করে। এতো জোরে করে যে কুলসুমের বুকে ওর কনুইয়ের ধাক্কা লাগে। ব্যথা পায় কুলসুম। দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরলেও ব্যথার তীব্রতা ওর মগজে গেঁথে যায়।

ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। তারামন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একবার বোনের দিকে, একবার মায়ের দিকে তাকায়। এমন সময় আবদুস সোবহান উঠোনে এসে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি না জেনে নিজের খুশি প্রকাশ করেই বলে, আমাদের কপাল ভাঙেনি লালভানুর মা। মেয়েটা বেঁচেছে। আমাদেরও খুশি হওয়া উচিত।

খুশি! মুখ বেঁকে যায় কুলসুমের। বুকের ব্যথা কট করে ওঠে। এতোক্ষণে মনে হয় ব্যথাটা

জোরেই লেগেছে। কিন্তু স্বামীর আচরণে ব্যথার বোধ তীব্র হয়ে ওঠে। আবদুস সোবহান বারান্দায় উঠতে উঠতে বলে, লালভানু মা পানি দে। বড় তেষ্টা।

কুলসুম স্বামীর নির্বিকার আচরণে অবাক হয়। সংসারের এমন একটা দুর্ঘটনায় লোকটা কেমন সহজ হয়ে আছে। এতোটা কাল তো ও আবদুস সোবহানকে বোকাই দেখেছে। শুধু বোকা না—নীরেট বুদ্ধিহীন। কিন্তু নতুন করে বোকা হওয়ার আর কি আছে? আবদুস সোবহান কি বুঝতে পারছে না যে কতো বড়ো সর্বনাশ হয়েছে। কুলসুম বারান্দায় উঠে বসে। বুকে যতোটুকু ব্যথা লেগেছে তারচেয়ে বেশি ভান করে মুখ কুঁচকে রাখে। আবদুস সোবহানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। দেখতে পায় সে চেহারায় বৃষ্টির পরে ভেসে ওঠা রংধনুর ছায়া। ঠিক সাতটি রঙই আছে, সঙ্গে জলের ফোঁটা, যেন শিশির স্নাত। কুলসুম দীর্ঘদিন পর স্বামীর এমন চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়। ইচ্ছে করে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেতে। যেন বলে, সংসারের অনেকখানি তো টানা হলো। এবার নিজের দিকে তাকাই, যেমন শুরুতে কেউ ছিল না তেমন করে। কিন্তু বুকের ভেতর ইচ্ছে গুমরে মরে। কুলসুম এতো সহজে নিজের ক্রোধ দমন করতে চায় না। প্রবল কম্পনে মুখে থুতু ছিটিয়ে বলে, মিনসের ভীমরতি হয়েছে।

আবদুস সোবহান কুলসুমের দিকে তাকায় না। তারামনকে দেখে। মেয়েটি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে বারান্দায় উঠছে। বাড়িতে আসার পর কেউ ওকে হাত ধরে ঘরে ওঠায়নি। আদর করে ডেকে বলেনি, আয় এখানে বস। কেমন ছিলি এই ছয়টি মাস? সুতরাং ওকে তো একা একটি ঘর খুঁজে নিতে হবে। ওর আশ্রয় দরকার। মুক্ত জীবনের স্বাধীনতা ভোগ করতে হলেও ঘর লাগে—শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়াল, ঢেঁকিঘর— আরো কতো কি। তারামনের এখন সব চাই। ঘরের ভেতরে ঢোকার মুখে ও দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, আব্বা আপনি আমাকে হুসেন জোতদারের বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেন। আমি নিজে কামাই করবো।

হি হি করে হেসে ওঠে লালভানু। হাসতে হাসতে বলে, বান্দী হওয়ার শখ।

তারামন কাপড়ের পুঁটলিটা বড় বোনের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে। বলে, বান্দী না বুজান স্বাধীন। কাজ করবো, নিজের ভাত নিজে খাবো। কারো ঘাড়ের বোঝা হবো না। দুই মুঠা ভাতের জন্য স্বামীর হাতে মার খেতে খেতে আপনি বান্দী হয়েছেন।

লালভানু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে, শুনলেন, শুনলেন আব্বা কতো বড়ো কথা।

আবদুস সোবহান বড় পেতলের গ্লাসে পানি খেয়ে শেষ করেছে। লালভানুর কথা তার কানে যায় না। সে নিজেও বিপুল বিস্ময়ে তারামনের পরিবর্তন উপলব্ধি করে। মেয়েটা বয়সের চেয়েও বড় হয়ে গেছে। ওর বুদ্ধি হয়েছে। আনন্দের উপলব্ধিতে আবদুস সোবহানের চোখ চিক্‌চিক্ করে। দু'হাতে চোখ মুছে লালভানুকে বলে, মাগো ওতো ঠিকই বলেছে।

লালভানু একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করে। বিলাপ করে বলে, আমি বাড়ির বড় মেয়ে, অথচ সেদিনের মেয়ে তারামনের পক্ষে চলে গেছে আমার আব্বা। তারামন আমাকে বান্দী বলেছে। আব্বা সেটা স্বীকার করেছে। লালভানুর বিলাপ থামে না। তারামন ঘরে ঢুকেছে। ওদের ছোট ভাই দুটো বাড়িতে নেই। থাকলে এরাও কি কাঁদতো? তারামন উঁকি দিয়ে দেখে কুলসুম স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ও খুশি হয়ে পাটি বিছিয়ে বিছানা করে। এতোটা পথ হেঁটে এসে ওর ভীষণ ঘুম পেয়েছে। ও বালিশে মুখ গোঁজে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা কুলসুম লালভানুর কান্না শুনেও আজ রেগে উঠতে

পারে না। ভাবে, কাঁদুক, যতো খুশি কাঁদুক। স্বামীর হাতে মার খায় আর দু'দিন পরপর বাপের বাড়িতে চলে আসে। এমন মেয়ে বোঝা না তো কি? নিজের পথ নিজে দেখতে পারে না? কুলসুম নিজের অজান্তে লালভানুর ওপর বিরক্ত হয়। এতোদিন পর নিজের এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুলসুম আবদুস সোবহানের হাত চেপে ধরে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, ভাত খাবেন? খিদা লাগেনি?,

আবদুস সোবহান মাথা নাড়ে। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। দীর্ঘ পথ হাঁটলে ও খুব ক্লান্ত হয়ে যায়। নিজের অজান্তে কুলসুমের ধরে রাখা হাতটা কোলের ওপর উঠিয়ে নেয়। খুব কৃতজ্ঞ বোধ করে যে কুলসুম তারামনের শ্বশুরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেনি। ওই বাড়ির কথা বলার ইচ্ছে ওর নেই। একটা মৃগী রোগির সঙ্গে মেয়েটির ছয় মাস থাকতে হয়েছে এই অপরাধ বোধে ও মরমে মরে যায়। একটি সুস্থ মেয়ে কি মৃগী রোগির সঙ্গে থাকতে পারে? না থাকা উচিত? আবদুস সোবহানের মুখের দিকে তাকিয়ে কুলসুম জিজ্ঞেস করে, কি ভাবেন?

তখনো লালভানুর কান্না থামেনি, সেটা পুরো বাড়ি গ্রাস করে রেখেছে। লালভানু কখনো ফোঁপায়, কখনো বিলাপ করে, কখনো শব্দের রেশ নিচু হয়ে যায়। লালভানু বুঝতে পারে না যে তীব্র ধাক্কা খাওয়া মানুষের উপলব্ধি সঞ্জাতবোধ মানুষের পিছু ছাড়েনা। এখন তেমন পরিস্থিতি ওর জীবনে। স্বামীর ঘরে বাঁদী হয়ে থাকার সত্যটি ও কেমন করে মেনে নেবে? বরং মাঝে মাঝে কান্নার তীব্রতা বেগে প্রবাহিত হয়, যেন কোনো জলপ্রপাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এবাড়ির ওপর পতিত হচ্ছে।

এখন তার চেয়েও বড় একটি শক্তি এই পতিত হওয়ার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তার গতি পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। ওকে আর চেনা যাচ্ছে না। এ এক প্রবল ভাঙন। আবদুস সোবহান কান পেতে সে ভাঙনের শব্দ শোনে। কুলসুম আবারও জিজ্ঞেস করে, কি ভাবেন?

আবদুস সোবহান স্ত্রীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, খিদের কথা ভাবি।

কুলসুম প্রবল বেগে মাথা নাড়ে, না খিদার কথা না। অন্য কিছু।

আবদুস সোবহান মৃদু হেসে বলে, তুমি গন্ধ পাও না?

গন্ধ? কৈ না।

কি সুন্দর গন্ধ। ওই যে মানুষে বলে হরিণের নাভীর গন্ধ, ঠিক তেমন। আমার মাথাটা ফর্সা হয়ে যাচ্ছে।

আপনে তো কোনোদিন হরিণ দেখেন নাই। তার নাভীর গন্ধ কেমন করে বুঝবেন?

যা দেখি নাই সে দেখাটা এখন আমার সামনে তারামনের মা।

কুলসুম অবাক হয়ে বলে, খুলে বলেন।

লালভানু যে কান্দে সেই শব্দটা ভালো করে নাকে টানো। দেখো গন্ধ আছে। হরিণের নাভীর গন্ধ।

ধুত কি যে পাগলামি।

কুলসুম হাত ছাড়িয়ে উঠতে চায়। আবদুস সোবহান হাত চেপে ধরে বলে, বসো। ঠিকমতো কান্নাটা শোনো। ও অমন করে কাঁদে কেন?

কাঁদবে না? তারামনের কথায় দুঃখ পেয়েছে যে।

না, তা না। তারামন যে একটা সত্যি কথা বলেছে সে সত্যির গন্ধে ও দিশেহারা হয়েছে।

তুমি এই বাড়ির চারদিকে ভাঙনের শব্দ শুনতে পাও না লালভানুর মা?

কেন পাবো? আমি তো পাগল হয়ে যাইনি।

তাহলে তারামনকে ডাকো। ও ঠিকই শুনতে পাবে।

ও ঘুমিয়েছে।

ঘুম থেকে তুলে আনো।

আবদুস সোবহানের দৃঢ় স্বরে কুলসুম তারামনকে ডাকতে যায়। তারামন ঘুম জড়ানো চোখ দুহাতে ডলতে ডলতে উঠে আসে। দরজার বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরে শ্বাস টেনে বলে, এ কিসের গন্ধ আব্বা? ওহ্ কি ভালো লাগছে।

আমার কাছে এসে বস মা। তুই কি কোনো ভাঙনের শব্দ শুনতে পাস মা?

তারামন নির্বিকার কণ্ঠে বলে, সে তো আমি ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেয়েছি।

তাহলে যা, তুই আবার ঘুমিয়ে পড়।

তারামন চলে গেলে কুলসুম চেঁচিয়ে বলে, এসব কি কথা?

এগুলো শুধু কথা না। তুমি এখন তোমার মেয়েকে থামতে বলো।

আপনে বলেন।

কুলসুম উঠে রান্নাঘরে যায়। আবদুস সোবহান উঠোনের বেল গাছের নিচে বসে ক্রন্দনরত লালভানুর কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবাকে দেখে লালভানুর কান্নার শব্দ কমে আসে, কিন্তু মুখটা বিকৃত করে ঘুরিয়ে নেয়। আবদুস সোবহান ওর মাথায় হাত রেখে বলে, আয় মা, ঘরে আয়। কেঁদে কি হবে?

ঘর? আমার কি ঘর আছে? বাপের বাড়িতে ঘর নাই। স্বামীর বাড়িতেও ঘর নাই।

আবদুস সোবহানের বুক কট করে ওঠে। ভাবে, মেয়েটা চরম দুঃখী। তারামনের মতো শক্ত না। যে শক্ত হতে পারে না, তার দুঃখ বেশি হয়।

আপনি তারামনকে কিছু বলবেন না আব্বা?

না। বলে কি হবে? ওতো ভাঙনের শব্দ শুনতে পায়।

ভাঙন?

তোকেও শব্দটা শুনতে হবে মা। আমি জানি তুইও শুনতে পাবি। চল, ভাত খেয়ে নে।

আমি শুনতে পাবো না আব্বা।

কেন?

আমি পাগল না, বলেই দুপদাপ করে হেঁটে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আম্মা।

কুলসুম সানকিতে ভাত বাড়ছিলো। মেয়ের ডাকে তাকায় না। ছেলে দু'টোও এসে পিঁড়ি নিয়ে বসেছে। ব্যতিব্যস্ত করছে ভাতের জন্য। লালভানু গলার স্বর উঁচু করে বলে, আম্মা তারামন আমাকে এতো বড় কথা বললো—

কুলসুম তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে লালভানুর দিকে তাকায়। লালভানু বুঝে যায় যে মার কাছে ওর আর জায়গা নেই। কুলসুম ওর অভিযোগের জবাব না দিয়ে বলে, ভাত খাবি, আয়।

আমি ভাত খাবো না। আজই চলে যাবো।

কুলসুম আবারো তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ও বাড়িতে গিয়ে শুধু শুধু মার খেয়ে কি হবে? তারচেয়ে কোনো বাড়িতে কাজে লেগে যা।

আমি কাজ করবো? তারামনের স্বামী নাই, তারামন করুক। আমার স্বামী আছে।

স্বামী? কুলসুম আবারো ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে গজগজ করে, পোড়াকপালীর আবার স্বামী।

আবদুস সোবহান লালভানুর হাত ধরে নিজের পাশে বসায়।

বলে, ভাত খা।

বাপের সোহাগে লালভানু আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। আবদুস সোবহানের মনে হয় মেয়েটি পরাজয়ের কান্না কাঁদছে। একটি জন্ম লাগে এই পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে ওঠার জন্য।

দশ বছরের রবি খি-খি করে হেসে বলে, বুবু কান্দে কেন আম্মা? বুবুর কি হয়েছে?

সবচেয়ে ছোট নবি চোখ মোছার ভান করে বলে, বুবু কাঁদলে আমিও কান্দবো।

তারপর দু'ভাই একসঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে। লালভানু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বকা দেয়, বিচ্ছু শয়তান।

আবদুস সোবহান আবার মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলে, রাগিস না মা। ওরা কি বোঝে! ওরা ছোট বলেই তো মানুষের কান্নায় মজা পায়।

ছোট না ছাই। বিচ্ছু।

ভাত খা লালভানু।

কুলসুমের গম্ভীর কণ্ঠ। লালভানু আর কোনো কথা না বলে ভাতের সানকি টেনে নেয়। তখন তারামন রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকে একসঙ্গে ওর দিকে তাকায়। তারামন বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, আব্বা আমি ঠিক করেছি বুবুকে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে দেবো না। আমি আর বুবু কাজ করবো। রোজগার করবো। মানুষের বাসায় কাজ না পেলে আপনের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করবো।

লালভানু মুখ নিচু করে ডাল দিয়ে ভাত মাখায়। ওর মাথার মধ্যে ভাঙনের শব্দের সূচনা হয়। ওর মনে হয় ঘুম থেকে উঠে আসার ফলে তারামনকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। নাকি অন্য কিছু? নাকি তারামনের ভেতরটা অন্যরকম হয়ে গেছে বলে সেটা ওর মুখে ভর করেছে।

তারামন ঘরে ঢুকে বলে, আমার ভাতের সানকি কই আম্মা?

মুখ ধুয়ে নিবি না।

না। মুখ না ধুয়েই ভাত খাবো।

ও ছোট ভাইদুটোর পাশে বসে পড়ে। সবাই মিলে ভাত খায়। নবি আর রবি তারামনের সঙ্গে মাছ ধরার গল্প করে। রবি এক গ্রাস ভাত গিলে বলে, বিকেলে ছিপ দিয়ে একটা মস্ত বড় পুঁটি মাছ ধরে আনবো বুবু। সেই পুঁটিটা আপনাকে দেবো। ভেজে খাবেন।

তারামন হাসতে হাসতে বলে, তাহলে তো আমি রাজা হয়ে যাবো, না আব্বা?

হ্যাঁ। আয় আমরা সবাই সেই ছড়াটা বলি,

রাজা খায় কি ভাজা?

মাছ ভাজা।

কি মাছ?

পুঁটি মাছ।

পুঁটি কোথায়?

পুকুরে।

পুকুর কোথায়?

এতোল বেতোল ছেতল তলায়।

রান্নাঘর জুড়ে হাসির রোল। হাসি থামলে রবি গম্ভীর হয়ে বলে, বুবু কি রাজা না রানী?

তারামনও একই ভঙ্গিতে গম্ভীর হয়ে বলে, রাজাও রানীও। দুটোই।

লালভানুর মৃদু কটাক্ষ, তুই কি একাই একশ?

হ্যাঁ বুবু একাই একশ।

ছোট রান্নাঘর আবার হাসির তোড়ে ভেসে যায়। আবদুস সোবহান আর কুলসুম ভীষণ তৃপ্তিতে অনুভব করে, এতোক্ষণের গুরুভার ধোঁয়ার মতো সরে যায়। তারামন ফিরে আসার পর থেকে যে কষ্ট এবং গ্লানির পাথরটা ওদের বুকের ওপর চেপে বসেছিলো সেটা নেমে গেছে। এখন ভাঙনের শব্দ হাসির মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আবদুস সোবহান বুঝে যায় ভাঙন অমঙ্গলের নয়, মঙ্গলের। নইলে এমন আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হতো না। ও গভীর মনোযোগে ভাত খেতে শুরু করে।

সবার ভাত খাওয়া হয়ে গেলে লালভানু ঘোষণার মতো করে বলে, আব্বা আমি আর ঐ বাড়িতে যাবো না।

সত্যি? ও হো-হো-হো-

তারামন হাততালি দেয়, সঙ্গে রবি ও নবি। ওরা সুর করে বলতে থাকে, বুবু খায় কি ভাজা, মাছ ভাজা—। তারামন ওদের হাত ধরে উঠোনে ছুটে যায়। তিনজনে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে ঘুরতে গায়, রাজা খায় মাছ ভাজা, রানী খায় মাছ ভাজা। আবদুস সোবহানের মনে হয় এমন অলৌকিক দৃশ্য দেখে সে মূর্ছা যাবে। নড়তে পারে না। তার ভাঙা চোয়ালের ওপর দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়ায়। কুলসুম দ্বিতীয়বারের মতো আবদুস সোবহানের হাত চেপে ধরে। জিজ্ঞেস করে, কি ভাবেন?

আবদুস সোবহানের নির্বিকার কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের জোয়ার, বুঝি ব্রহ্মপুত্র ভর করেছে তার গলায়। তেমন কলধ্বনি নিয়ে কলকলিয়ে বলে, তারামন একা মুক্তি পায়নি। আমার বাড়িটাই মুক্তি পেয়েছে। আমরা স্বাধীন।

পরদিন দু'বোন বাবার সঙ্গে কাজে যায়। যে কাজই জুটুক না কেন সেটাই ওরা করবে, এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে দু'বোনে হাত ধরে হাঁটে। গল্প করে। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখে কুলসুম। ওর পাশ কাটিয়ে রবি আর নবি খলুই পিঠে বেঁধে ছুট দেয়। দুপুর পর্যন্ত ওরা ধানক্ষেত, নিচু জমিতে মাছ খুঁজবে। পাবেও। ট্যাংরা, পুঁটি, শোল, গড়ই, টাকি, চিংড়ি— আরও কতো কি! মেয়েরা বাপের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ছেলেদু'টো দৌড়াচ্ছে। অভাবের সংসারে কুলসুম এই মুহূর্তে নিজেকে ভীষণ সুখী মনে করে।

এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে মারা যায় আবদুস সোবহান। তারও কিছুকাল পরে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়।

২
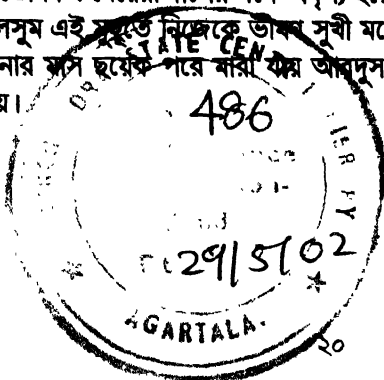
লোকটি হাঁটে। অনবরত হেঁটে যায়। ওর কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি নেই। গ্রাম নেই। শহর নেই। ও কোনো বিশেষ নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায় না। ওর নিজস্ব কোনো মেঠো পথ নেই কিংবা পাকা সড়ক, যে পথে ওকে বারবার যেতে হয়। ওর অবাধ গতি সর্বত্র। ও শুধু যেতে শিখেছে।

এই যাওয়াটা কোনো গৃহকোণে ভালোবাসার মানুষের কাছে যাওয়া নয়। কোনো শিশুকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য নয়।

এই যাওয়াটা নদীতে মাছ ধরার জন্যে যাওয়া নয়। কিংবা কাঠ চেরাইয়ের জন্যও নয়। কুড়ালের প্রতিটি আঘাত পেটা শরীরের শক্ত পেশী মজবুত করে তোলার প্রত্যাশায় নয়।

এই যাওয়া কোথাও বেড়াতে যাওয়ার জন্য নয়। কোনো বিনোদন নয় — যাত্রা কিংবা নৌকা বাইচ। অথবা ঘোড়ার পিঠে উঠে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে কিনা সে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠার জন্য নয়।

এই যাওয়া ফুটবলের মাঠেও যাওয়া নয়। দুরন্ত গতিতে পায়ে পায়ে বল নিয়ে জালের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়ার চরম উত্তেজনা। কিংবা কাবাডি খেলার দম আটকানো সেই অদ্ভুত শব্দটা বুকের ভেতরে ধরে রাখার আমোদের জন্য নয়।

আসলে ও মাত্র একটি জায়গাতেই যেতে শিখেছে। সেটি যুদ্ধক্ষেত্র।

এই জনপদের মাঠঘাট, পথপ্রান্তর, গ্রামগঞ্জ, শহর সর্বত্র ও দেখেছে যে কোনো সময়ে যে কোনো একটি বাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র হয় — মানুষ উন্মুখ প্রতীক্ষায় যোদ্ধার জন্য অপেক্ষা করে। সেই যোদ্ধা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে পারে। বাঘের পিঠে চড়ে আসতে পারে। কুমিরে চড়ে আসতে পারে। কিংবা দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে আসতে পারে। যেভাবেই আসুক না কেন আসাটুকুই ওদের কাছে সত্য। ও শুধু দেখে। দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে ওর চোখ সাগরের মতো গভীর হয়। আকাশের মতো বিশাল হয়। ওর চোখে নদীর প্রবল স্রোত ধ্বনিত হতে থাকে। সবশেষে ওর চোখ সবুজ শ্যামল সুন্দরবন হয়।

ও নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। নদীর নাম কীর্তনখোলা। শত্রুরা শহরের এসডিও-কে জিপের পেছনে বেঁধে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটির জামা ছিঁড়ে গেছে। প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে। পায়ের জুতো খুলে পড়েছে। শরীর ছিন্নভিন্ন। মাংসের কুচি লেগে থাকছে কংক্রিটের রাস্তায়। ওর চোখ ফুটো হয়ে গেছে। থেঁতলানো শরীর থেকে রক্ত নয়, কীর্তনখোলা নদীর জল বেরুচ্ছে। লোকটি বুঝতে পারে এসডিও ওর শরীরের ভেতর কীর্তনখোলাকে পুরেছে। ও রক্ত চেনে না। রক্ত চিনলে ওতো স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে পারতো না।

লোকটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে। আর কীর্তনখোলার কাছে মিনতি করে, নদী আমি আর সইতে পারছি না। তুমি ওকে তোমার ভেতরে টেনে নাও।

তখন শত্রুর জিপ কীর্তনখোলার পাড়ে এসে থামে। ওকে জিপ থেকে খুলে বুটের লাথথি দিয়ে নদীর পাড়ে গড়িয়ে দিতে দিতে বলে, বোল শালা পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

এসডিও ওর চৈতন্যরহিত অবস্থা থেকে শরীরের ভেতরের নদীর জলে তোলপাড় তুলে বলে, জয় বাংলা।

ক্রুদ্ধ লাথথি ওকে আরো খানিকটা ঢালুতে গড়িয়ে দেয়। আবারো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার ওঠে, বোল শালা নারায়ে তকবির.....।

তখন এসডিও-র ভেতরে জল আবার রক্তে রূপান্তরিত হয়। ওর শেষ রক্তবিন্দু স্বদেশের মাটিতে গড়িয়ে পড়ার আগেই বলে, জয় বঙ্গবন্ধু।

শালা গাদ্দার। শুয়োরকা বাচ্চা।

ব্রাশফায়ারে কেঁপে ওঠে শব্দবিহীন প্রান্তর। এসডিও গড়িয়ে পড়ে নদীতে। কীর্তনখোলা ওকে বুকে টেনে নেয়। লোকটি দেখে এসডিও-র লাশ আর দেখা যাচ্ছে না।

ও আবার হাঁটতে শুরু করে। কতোটা এসেছে ও জানে না। এসব হিসেব ও রাখে না। পথের মোড়ে মজনু ওকে দেখে জড়িয়ে ধরে, দেখেছিস?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

এই দৃশ্য দেখে আমি বাড়ি থেকে মাকে কিছু না বলে চলে এসেছি। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবো।

লোকটি মৃদুস্বরে বলে, যা।

মজনু খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে।

তুই কোথায় যাচ্ছিস?

লোকটি ছোট্ট করে বলে, যুদ্ধে।

আমার মা তো আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে। একটা খবর —

ঘাবড়াস না। আমি মাকে তোর কথা জানিয়ে যাবো। বলবো, তুই যুদ্ধে গেছিস।

মজনু চারদিকে তাকিয়ে দেখে লোকটি নেই। ও কখন চলে গেলো টেরই পেলো না।

৩

পরিবারের জোয়ান ছেলে সুভাষ যুদ্ধে যাবার পর থেকে এ বাড়িতে জীবনযাপন অন্যরকম হয়ে গেছে, আগের মতো স্বাভাবিক নেই। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে গলার স্বর নেমে যায় ওদের, শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দেও চমকে ওঠে কেউ কেউ, ছায়া দেখলে আঁতকে ওঠে, খেতে বসলে কখনো গলার কাছে আটকে যায় ভাত। অকারণে কেঁদে ফেলে সরলা, তার কান্না বিনুনি পাকানোর মতো এঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ঘিরে ফেলে বাড়িটা, যেন অকাল সন্ধ্যা নেমে এসেছে ওদের জীবনে। গলায় ঘরঘর শব্দ বেড়ে যায় নিখিলের। কাশের যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারে না ও, নিজের গলার শব্দ নিজের কাছেই ভৌতিক মনে হয় — গভীর রাতে সে শব্দ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠলে ওর মনে হয় বুকের ভেতরে বসে কারা বুঝি গুলি চালাচ্ছে, সে গুলিতে পড়ে গেছে দেবেশ।

ওরা বুঝতে পারে এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ওদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে নেমে এসেছে। ওরা এটাকে ছায়া মনে করে— এতে ওদের দুঃখ নেই, কিন্তু বেঁচে থাকার ভয় আছে-– বাঁচবো তো, এমন আশঙ্কা আছে। পুরো ব্যাপারটা বুঝেও কেউ কিছু বলে না, যেন বুকের ভেতর থেকে কোনো শব্দ বেরিয়ে এলে সেটা মুহূর্তে চারিয়ে যাবে গাঁয়ে এবং তা শুনতে পাবে

পাকিস্তানি সেনারা। ওরা ভাষা না বুঝলে কি হবে, ওরা শব্দ ঠিকই বুঝতে পারবে। তাই পঁয়ষট্টি বছরের নিখিল সকাল-বিকাল ঘরের দাওয়ায় বসে থাকে। এখান থেকে বাজারের রাস্তাটা সোজা দেখা যায়। পথের বাঁক কিংবা গাছের আড়াল নেই। তার স্ত্রী, উনষাট বছরের সরলা, যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ, সংসারের কাজে তার ক্লান্তি নেই। কখনো আনমনা হয়ে সুভাষের কথা ভাবে। ওর বাবা, সরলার বড় ছেলে দেবেশ, এখন থেকে উনিশ বছর আগে ওর বাইশ বছর বয়সে হারিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ওরা জানে না ও বেঁচে আছে, না মরে গেছে। ঐ এক ছেলে ছাড়া সরলার আট মেয়ে। ছয়জনের বিয়ে হয়েছে, ওরা শ্বশুরবাড়িতে। ছোট দুটি কুমারি, একজনের বয়স বার, অন্যজনের ষোল। একজনের নাম লক্ষ্মী, অন্যজন সরস্বতী। এ বছর সরস্বতীর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিলো, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াতে বিষয়টি আর এগোয়নি। পাত্রপক্ষ পরিবারসহ ভারতে চলে গেছে। নিখিল ওদের কোনো খবর জানে না। ও খুব অবাক হয়ে অনুভব করে যে এখন ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা শিখেছে। সারাদিনে কতোজন লোক আসা-যাওয়া করে এবং তারা কারা, তা ও বলে দিতে পারে। রাতে ঘুমুবার সময় সরলাকে বলে, গিন্নী এটা একটা কঠিন বিদ্যা। যে কেউ শিখতে পারে না।

সরলা কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করে, কোনটা?

এই যে রাস্তা পড়তে পারা।

ঘুমোও! সরলা পাশ ফিরে শোয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ও সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে পারে না, এ কষ্ট ওকে ছাড়ে না। কষ্টটা দেবেশের হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে কম নয়। নিখিল বলে, যুদ্ধের সময় এসব কষ্ট মনে রাখতে নেই। স্বামীর এমন কথা শুনলে সরলার রাগ হয়। উপদেশ দিয়ে কি কষ্ট দূর হয়। কিন্তু নিখিলের ওই এক অভ্যেস, আকাশের দিকে তাকিয়ে কিংবা ঘরে থাকলে মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে এমন এক-একটা কথা বলবে। বুঝতে চায় না যে মনে রাখতে নেই বললেই কষ্টটা ফুরিয়ে যায় না, ওটা তুষের আগুনের মতো জ্বলে। সরলার এখন তেমন অবস্থা। একমাত্র পুত্র দেবেশ নেই, তার স্ত্রী সুষমা আছে, তার ছেলে সুভাষ আছে। বাবার মতো তেজী। যুদ্ধের শুরুতেই বললো, এটা যুবক ছেলেদের সময়। এ সময় কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না। আমি চললাম। সরলাকে বলে চলে গেছে ও। ওকে কিছু বলার সাহস ছিলো না। গাঁয়ের ছেলে মোস্তফার সঙ্গে যেদিন চলে গেলো সেদিন দেবেশকে মনে করে কাঁদলো সরলা। মাঝে মাঝে সরলার সঙ্গে রাগারাগি হলে নিখিল ওকে শাসায়, আমিও একদিন দেবেশের মতো হারিয়ে যাবো। তখন মজাটা টের পাবে। সরলা ভাবলো, এই উনিশ বছর ধরে মানুষটা কতোবার ছেলের খোঁজে ঢাকায় গেলো, কিন্তু কোনো খোঁজ পায় না। শুধু যাওয়ার জন্য যাওয়া। সরলার মনে হয় মানুষটা সংসার থেকে পালানোর জন্য ঢাকা যায়। দু-চার-পাঁচ দিন ঘুরেফিরে এসে বলে, দেবেশের মতো হারানো সহজ কথা না। হারাতে সাহস লাগে। আমার অতো সাহস নেই।

আড়াল থেকে শ্বশুরের কথা শুনে সুষমা ভেবে পায় না যে দেবেশের কি সাহস ছিল যে হারাতে সাহস লাগে? আসলে দেবেশকে তো ও ভালো করে বুঝতেই পারেনি। ঠিকমতো দেখেছে কিনা তাও মনে নেই। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হলো, ষোল বছর বয়সে সুভাষ হলো। সুভাষের দেড় বছর বয়সে হারিয়ে গেলো স্বামী। এতো অল্প বয়সে কেমন করে এতোকিছু বুঝে উঠবে? অনেক কিছু বুঝে ওঠার যে বয়স লাগে সে বয়সটাতো ওকে কেউ দেয়নি। এখন ও জানে না ও বিধবা না সধবা। সিঁদুর পরতে ও ভালোবাসে। টকটকে লাল

সিঁদুর সিঁথিতে উজ্জ্বল হয়ে না থাকলে সুষমার মনে হয় ও অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছে — ভুলে যাচ্ছে দেবেশের সঙ্গে বিয়ে এবং সহবাসের কথা ; এমনকি ভুলে যাচ্ছে তীব্র প্রসব বেদনার কথা, অপরিসর আঁতুর ঘরে প্রবল দিনের আলোয় ওর চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো। ও একটা আর্ত-চিৎকার দিয়েছিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেয়েছিলো শিশুর কান্না। ও মা হয়েছিলো। খুব অল্প সময়ের স্মৃতি, কিন্তু ও ভুলতে চায় না। শুধু মনে হয় ওই সিঁদুর ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই উনিশ বছরে কেউ ওকে সিঁদুর পরতে নিষেধ করেনি। ও নিখিল এবং সরলার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ পরিবারের কেউ ভাবতে চায় না যে দেবেশ মরে গেছে। তাই ঢাকা গেলেই নিখিল হাবিবের কাছে যায়, হাবিব দেবেশের বন্ধু। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের সময় দুজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলো, একই ডিপার্টমেন্ট, একই ব্যাচ। গলায় গলায় ভাব ছিলো ওদের। দেবেশের সঙ্গে হাবিব নিখিলের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। এখন ও মস্তলোক, হাইকোর্টের বিচারপতি। নিখিলকে দেখলেই ওর মুখ শুকিয়ে যায়, যত্ন করে। আর খুব নিচুস্বরে বলে, আপনি কতোদিন দেবেশকে খুঁজবেন কাকাবাবু?

যতোদিন আমার মরণ না হয়।

আমার বিশ্বাস পুলিশ দেবেশের লাশ গুম করেছিলো। কাকাবাবু ওকে আর ফিরে পাবেন না।

নিখিল চেঁচামেচি করে, কেন ওর লাশটা তোমরা পুলিশের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারোনি? তাহলে তো ওর নামটা শহীদের তালিকায় উঠতো। আমি লোকের কাছে গর্ব করে বলতে পারতাম যে আমার ছেলে মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। হাবিব তুমি দেখোনা পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে কি না। নইলে যে আমার মনে হয় আমার ছেলে হারিয়ে গেছে?

আমি যতোটা সম্ভব খোঁজ নিয়েছি কাকাবাবু। কোথাও দেবেশের নাম নেই। কিন্তু জানি বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি ও মিছিলে ছিলো। খুব ভোরে আমি আর ও ডিম-পাউরুটি খেয়েছিলাম। ও বলেছিলো, আমার ছেলেটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। ও খুব সুন্দর হয়েছে, একদম ওর মায়ের মতো। ও আরো বলেছিলো, আমি যদি দেখে যেতে না পারি তো কিছু এসে যায় না, আমার ছেলে সুভাষ তো দেখবে ওর বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে।

হাবিবের এসব কথা নিখিল অনেকবার শুনেছে, কিন্তু ও বুঝতে পারে না এটা ওর গর্ব না দুঃখ? কিভাবে বেঁচে থাকলে মানুষের গর্ব আর দুঃখ এক হয়? কেমন করে এসবের মধ্যে নিজেকে এক করে ফেলা যায়। সুষমার কি গভীর বিশ্বাস! একদিন না একদিন দেবেশ ফিরে আসবে। ও কিছুতেই ওদের ভুলে থাকতে পারে না। দেবেশ বেঁচে আছে। নিখিল যা পারেনি, তা সুষমা পেরেছে। ও গর্ব এবং দুঃখ এক করে ফেলেছে, তাই ওর কাছে বেঁচে থাকা সহজ। মাত্র সতেরো বছর বয়সে সবকিছু হারিয়ে গেলে মানুষ বোধহয় এমন করে, খানিকটা অন্যভাবে বেঁচে থাকাকে সাজাতে পারে। তাই ওর কপাল জুড়ে টকটক করে উজ্জ্বল রঙের সিঁদুর।

এখন এই যুদ্ধের সময়ে দেবেশ কাছে থাকলে নিখিলের হয়তো অন্যরকম সাহস হতো, খানিকটুকু বাড়তি সাহস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতো। কারণ নিখিল সুষমার কপালের সিঁদুরে ভয় পায়। ওদিকে তাকাতে পারে না। যেন ওটা সিঁদুর নয়, রক্ত। ওই রক্তে মুখ থুবড়ে পড়ে

আছে দেবেশ। ওই রক্ত গড়িয়ে আসছে এই পরিবারকে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য, কারণ চারদিকে পাকিস্তানি সেনা। ওই সিঁদুর লক্ষ্য করেই ছুটে আসবে বুলেট। ওরা ভালো করেই জানে সিঁদুর কি এবং কাদের কপালে সিঁদুর থাকে। সরলাও তো সিঁদুর দেয়, তাহলে সরলার সিঁদুরের দিকে নিখিলের চোখ পড়ে না কেন? সরলার সিঁদুরের সঙ্গে নিজের জীবনটা জড়ানো বলে? সরলার খালি সিঁথি মানে যে নিখিলের নেই হয়ে যাওয়া। ঘরের দাওয়ায় বসে নিখিল দুই হাতে মুখ ঢাকে। এই নিষ্ঠুর সত্য ওর মন ছোট করে দেয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই নিখিল ধুতি ছেড়ে লুঙি পরছে। ওকে লুঙি পরতে দেখে আঁতকে উঠেছে লক্ষ্মী। বলেছে, বাবা তুমি কি মুসলমান হয়ে গেছো? নিখিল ঠাণ্ডা প্রশান্ত গলায় বলেছে, কাপড়ে কি এসে যায় মা। কাপড় তো আবরণ। লজ্জা নিবারণ হলেই হয়।

দূরে দাঁড়িয়ে স্বামীর কণ্ঠ শুনে সরলার মনে হয়েছে এ কণ্ঠ নিখিলের নয়, নিখিল এমন স্বরে কথা বলে না।

কিন্তু নিখিলের উত্তর শুনে খুশি হতে পারেনি লক্ষ্মী। প্রতিবাদ করে বলেছে, কাপড় যদি আবরণই হবে তাহলে আমাদের পুরুষ মানুষেরা ধুতি আর ওদের পুরুষ মানুষেরা লুঙি পরে কেন? না বাবা কাপড়ও অনেক কিছু।

আরে পাগলি মা, তুই বুঝলি না কেন যে এটা জয়বাংলার সময়। এ সময় কাপড়ের ভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে।

বাবার উত্তর লক্ষ্মীকে ভাবায়। ও জয়বাংলার সময়টা বুঝতে চায়। কেমন এক চমকানি ওকে আলোড়িত করে, জয়বাংলো সময়টা যদি শুধু কাপড়ের ভেদ না ঘুচিয়ে মানুষের ভেদটাও ঘুচিয়ে দিতো! তাহলে মুচিপাড়ার মায়ারানীকে ও প্রাণের বান্ধবী করতে পারতো। মায়ার মতো ভালো মেয়ে হয় না, কিন্তু বন্ধুত্ব করতে পারে না, তেড়ে আসে ওর বাবা-মা। বাবার উত্তর শুনে ও খুশি হয়ে সরস্বতীর কাছে যায়। কিন্তু নিখিলের উত্তরটা শুনে কান্না পায় সরলার। এ কেমন সময় যে কাপড়ের ভেদ ঘুচিয়ে দেয়? ওদের জীবনে তো কখনো এমন সময় আসেনি। কতোবার দাঙ্গা দেখেছে, চোখের সামনে দেশভাগ হয়ে গেলো কিন্তু এ যুদ্ধ অন্যরকম। সরলা বুঝতে পারে এ যুদ্ধ ওদের ভিত ধরে নাড়িয়ে দিচ্ছে। ধসে যাচ্ছে এতোদিন ধরে চলে আসা সংস্কার। নিখিল একে জয়বাংলার সময় বলে আঁকড়ে ধরেছে। তাই নিখিলের কোনো দুঃখ নেই। রাতে ঘুম না এলে সরলাকে চুপিচুপি বলে, দেবেশের মা আমরা যদি যুদ্ধে জিতি তাহলে আমাদের দিন ফিরবে। দেশ স্বাধীন হলে আর দুঃখ কি? ধুতি লুঙিতে কি আসে যায়। যুদ্ধের জন্য সবকিছু মানতে হয়।

দেশ একবার ভাগ হলো, এবার স্বাধীন হবে। কপালে আরো কি দেখার আছে!

তোমার দুঃখ হয়?

সরলা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বুঝি না। বুঝি তোমার পরনে ধুতিই থাকবে, আমার সিঁথিতে সিঁদুর। আমি সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দেবো, দুমুঠো ভাত খেয়ে যেন ঘুমুতে পারি।

তুমি একটুও ভেবো না গো, এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে শান্তি আনবে।

নিখিলের কথায় স্বস্তি হয় না সরলার। এমন কথা শুনতে ওর ভালো লাগে না। মনে হয় এগুলো কোনো মানুষের কথা নয়, কথাগুলো গীতা থেকে কেউ পাঠ করছে। সরলা ছোট কথা শুনতে চায়। সহজ কথাও। বড় কথা শুনলে ওর মেজাজ খারাপ হয়। নিখিলের কথা শুনে মেজাজ খারাপ হলে ও দরজা খুলে বাইরে আসে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশে ঘন কালো

মেঘ। চাঁদ নেই, তারা নেই। সরলা চৌকাঠের ওপর দুপা ছড়িয়ে বসে থাকে। উনিশ বছর আগে বাইশ বছরের দেবেশ বড় কথা বলে ওর কাছে থেকে বিদায় নিয়েছিলো। প্রণাম করার সময় বলেছিলো, আশীর্বাদ করো মা যেন জয়ী হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি। সরলা অবাক হয়ে বলেছিলো, এমন কথা বলছিস কেন?

এবারের যাওয়াটা সবসময়ের যাওয়া নয় মা। এখন আমাদের সামনে ভাষার লড়াই। পাকিস্তান সরকারের পুলিশ, মিলিটারি কিছু করতে পারবে না।

তোদেরকে তো গুলি করে মেরে ফেলবে।

কয়জনকে মারবে? আমরা তো হাজার হাজার। তুমি কিছু ভেবো না। একদিন শুনবে আমাদের বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে মাগো।

সেই যে গেলো আর ফিরলো না দেবেশ। কি হলো ছেলেটির, কোথায় গেলো, কিছুই জানে না সরলা। মাঝে মাঝে ওর সন্দেহ হয়। দেবেশ সবাইকে ফেলে রেখে ইণ্ডিয়া চলে যায়নি তো? কতো লোকই তো ভিটেমাটি বেচেবুচে ইণ্ডিয়া গেলো। এ দেশটা আর ওদের দেশ থাকলো না। নিখিলকে নিজের সন্দেহের কথা বললে খেঁকিয়ে ওঠে নিখিল। বলে, আমার দেবেশ এতো খারাপ না। ওকি স্বার্থপর যে বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাইবোন ফেলে একলা চলে যাবে?

সরলা ঠোঁট ওল্টায়, কে জানে কখন কার কি মতি হয়।

দেখবে আমার দেবেশ একদিন বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে।

কেমন নির্ভাবনায় কথা বলে নিখিল, যেন ইণ্ডিয়া চলে যাওয়ার মতো জঘন্যতম খারাপ কাজ দেবেশ করতে পারে না ; ও তেমন ছেলেই নয় ; ও নিজের ভিটেমাটি চেনে ; ও জানে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। কিন্তু এই মুহূর্তে সরলা ভীষণ অবসন্ন বোধ করে। নিখিল যাই বলুক না কেন ও স্বস্তি পায় না, নিখিলের চোখের ভাষা ও পড়তে পারে না, নিখিলের স্বপ্ন ও দেখতে পায় না। ও বোঝে তুলসীতলায় প্রদীপ, পুজোর ঘর- নিজেরটুকু নিয়ে শান্তিমতো বেঁচে থাকা। যুদ্ধের এই অনিশ্চিত সময় ওর আশাটুকু মুছে দিচ্ছে, ও বুঝতে পারে চারদিক থেকে ওদের দিকে কুরুক্ষেত্র ছুটে আসছে। কোথায় পালাবে ওরা?

একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। সরলার চোখমুখ ছুঁয়ে গেলে ও খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ভাবে, বৃষ্টি হলেই ভালো হয়। এই ভ্যাপসা গরম অসহ্য। পাশের ঘরের দরজা খুলে সুষমা বেরিয়ে আসে। প্রথমে চমকে ওঠে ও। তারপর মৃদুস্বরে ডাকে, মা।

হ্যাঁ, তোরা বেরিয়েছিস কেন?

সুষমার পেছনে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তিনজনে সরলার পাশে এসে বসে। সরলা সুষমার কাঁধে হাত রাখে। কেউ কিছু বলে না। সুষমা নিজের শরীরটা সরলার শরীরের দিকে ঠেলে দেয়, যেন ছুঁয়ে থাকা কাউকে, যে ভরসা এবং ঠাঁই। দেবেশ হারিয়ে যাওয়ার পর ওর নিজের বাপ-মা ভিটেমাটি বেচে ইণ্ডিয়া চলে গেছে। এদেশে সুষমার কাছের আত্মীয় কেউ নেই। সরলা ওকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। সুষমারও কোনো অভিযোগ নেই। ও ধরে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ি ওর নিজের বাড়ি। আগের জন্মে ও এ বাড়ির মেয়ে ছিলো। একথা পাড়া-প্রতিবেশি সবাইকে ও বলে থাকে। সরলা জানে সুষমা এ কথা শুধু বলার জন্য বলে না। ও এটা বিশ্বাস করে। মা বলে যখন সরলাকে ডাকে তখন ওর মনে হয় ও সুষমাকে পেটে ধরেছিলো। আগের জন্মে সুষমা ঠিকই ওর মেয়ে ছিলো। ও সুষমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে

বলে, ঘুমুতে যা মা।

ঘুম আসছে না মা। সুভাষকে স্বপ্ন দেখার পরই ঘুম ভেঙে গেলো। ছেলেটা যে কোথায় কে জানে।

সরস্বতী বলে, আমিও সুভাষকে স্বপ্ন দেখেছি। মনে হলো ও যেন জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, পিসি, পিসি। আমি বললাম, কি হয়েছে সুভাষ। ও মা দেখি কোথাও কেউ নেই।

তোরা ছেলেটাকে নিয়ে বেশি ভাবিস।

ও কি ওর বাবার মতো হারিয়ে যাবে মা?

বালাই ষাট!

সরলা সুষমার মাথা নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে। মুখ ফুটে বলা হয় না, কিন্তু সুষমা অনুভব করে শাশুড়ি ওকে বলতে চাচ্ছে, স্বামী হারিয়েছিস, ছেলেটাকেও কেন হারাবি হতভাগী। সুষমার চোখের জলে সরলার বুক ভিজে যায়। একসময় ও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলে, আমি এক হতভাগিনী মেয়ে মা। আমি বুঝি আমার ছেলেকে ধরে রাখতে পারবো না। আপনি আপনার নাতীকে ধরে রাখবেন মা।

ওর কথা শেষ হতে না হতে সরলা ওর মুখ চেপে ধরে, কাঁদিস না মা। কাঁদলে সুভাষের অমঙ্গল হবে।

ওর কান্না শুনে ঘুম ভেঙে যায় নিখিলের। চাপাস্বরে খেঁকিয়ে বলে, কি হয়েছে তোমাদের?

কেউ কোনো জবাব দেয় না। আরো দুবার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে উঠে আসে নিখিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমাদের? এখানে জটলা পাকিয়েছো কেন?

সরলা আস্তে করে বলে, সুভাষকে স্বপ্ন দেখেছে সুষমা।

ও স্বপ্ন, বলতে বলতে নিখিল উঠোনে নেমে যায়। সুপোরির পাতা দিয়ে ঘেরা পেসাবের জায়গা পর্যন্ত না গিয়ে খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে পেসাব করে নিখিল। ওই পর্যন্ত যেতে ওর ভয় করে। ফিরে এসে বলতে থাকে, মা তো ছেলেকে স্বপ্ন দেখবেই এ আর নতুন কি!

সরস্বতী চাপাস্বরে বলে, সময়টা নতুন বাবা। এ সময়ে স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নটাও নতুন হয়। তুমি, মা তোমরা কি আগে যুদ্ধ দেখেছো, নাকি তোমাদের বাড়ির কেউ যুদ্ধ করতে গিয়েছিলো?

ঠিক বলেছিস। আমি তোদের কাছে একটু বসি?

বসো বাবা।

সরস্বতীর কণ্ঠ যেন উঠোনে উড়ে যায়, এতোক্ষণের দমবন্ধ করা চাপা স্বরটা আর নেই। ওরা সবাই জড়াজড়ি করে বসতে পেরে বেশ স্বস্তি পাচ্ছে। এই অন্ধকার রাত, এই অনিশ্চিত সময়, প্রিয়জন হারানোর দুঃখ, প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা ইত্যাদি থাকলেও ওরা আনন্দ পাচ্ছে, ওদের ভালো লাগছে। লক্ষ্মী গুনগুনিয়ে কীর্তন গাইছে। ওর গলা খুব মিষ্টি। ওই গান শুনে সরস্বতী খানিকটা উদ্বেল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু না হলে ওর বিয়ে হয়ে যেতো। ছেলেটি ওকে খুব পছন্দ করেছিলো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই ও বাড়ির সবাই ভারতে চলে গেছে। খবর পেয়েছে শরণার্থী ক্যাম্পে আছে। সরস্বতীর প্রচণ্ড অভিমান হয়, কি হতো বিয়ে হলে? জয়বাংলার সময়টাকে দুজনে ভাগাভাগি করে নিতে পারতো। ইণ্ডিয়া যেতে হলে দুজনেই যেতো। কেন হেমন্ত ওকে একলা রেখে চলে গেলো? যুদ্ধ শেষ হলে হেমন্ত কি ফিরে এসে

ওকে বিয়ে করবে? দু'জনের কি ঘরগেরস্থি হবে? হেমন্ত যদি আর ফিরে না আসে? যদি ও ইণ্ডিয়ায় থেকে যায়। ওখানে যদি ওর কাউকে ভালো লাগে? তীব্র দহন বুকের ভেতর, সরস্বতী মুহূর্তের জন্য মুষড়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণে ভিন্ন চিন্তায় ও আবার খানিকটা চাঙা হয়। মনে হয় ভালোই হয়েছে বিয়ে না হয়ে। দেবেশের মতো হেমন্ত যদি হারিয়ে যেতো তাহলে তো ওকে সুষমার মতো সারাটা জীবন না বিধবা না সধবা অবস্থায় কাটাতে হতো। ভগবান ওর মঙ্গলই করেছে। সরস্বতী স্বস্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর সঙ্গে কীর্তন গাইতে শুরু করে। সবার বুকের ভেতর থেকে চাপা ভাবটা কেটে যায়, কেউ আর চাপাকণ্ঠে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

তখন বাড়ির দরজায় টুকটুক শব্দ হয়। প্রথমে কেউ কথা বলে না, কান পেতে নিঃসাড় হয়ে থাকে। কে এলো? এতো রাতে?

সুষমা ফিসফিসিয়ে বলে, যে ছেলে যুদ্ধে যায় সে যুদ্ধ শেষ না করে ফেরে না।

তাহলে কেউ হয়তো আশ্রয়ের জন্য এসেছে।

হতে পারে।

তুমি যাও না দরজাটা খোলো।

আর একটু দেখি।

আবার শব্দ, সঙ্গে মৃদু ডাক, কাকাবাবু?

তোমরা ঘরে যাও।

নিখিল ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। মৃদু স্বরে বলে, কে?

কাকাবাবু আমি কামাল। খুলুন।

তুই মোস্তফার ভাই কামাল তো?

হ্যাঁ। জরুরি কথা আছে।

নিখিল দরজা খুলে দেয়। ঘরের দরজার সামনে বাকিরা উৎকণ্ঠিত। কোনো খারাপ খবর নিয়ে এতো রাতে কেউ এলো না তো? প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাত চেপে ধরছে। সুষমা বেড়ার গায়ে শরীরের ভার ছেড়ে দেয়, ওর আশঙ্কা বেশি। ওর ছেলে যুদ্ধ করছে। তখন নিখিল আর কামাল বারান্দায় উঠে আসে। ওদের দেখে সরলা বলে, হারিকেন জ্বালাবো?

না। কামাল বাইশ বছরের যুবক হলেও কণ্ঠ কিশোরের মতো। ও না বললে সেটা সরলাকে স্পর্শ করে না। ও আবার জিজ্ঞেস করে, হারিকেনটা জ্বালি?

খেঁকিয়ে উঠে নিখিল, না। চুপ করে বসো। কামাল এসেছে।

ওহ্ কামাল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কাকীমা সুভাষ খবর পাঠিয়েছে। বলেছে, আমি যেন আপনাদের সীমান্ত পার করে দেই। শরণার্থী ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা ও করে রেখেছে।

গর্জে ওঠে নিখিল, কি বললি ইণ্ডিয়া যাবো আমি? কেন যাবো? আমি কি যুদ্ধ করতে পারবো? আমার কি সেই বয়স আছে?

যুদ্ধ করতে নয় কাকাবাবু, যাবেন আশ্রয়ের জন্য।

আশ্রয়? এদেশে হাজার হাজার লোকের আশ্রয় থাকলে আমারও আছে। আমার যেতে হবে কেন? গেলে যুদ্ধ করতে যাবো, নইলে না। নিজের জমি ফেলে পরের জমিতে যাবো রিফিউজি হতে?

সরস্বতী বাবার পিঠে হাত রেখে বলে, রিফিউজি নয় বাবা, শরণার্থী। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা আবার ফিরে আসবো।

ঐ হলো, সবই এক। আমাকে তোরা বোঝাতে আসিস না। আমি কিছুতেই ইণ্ডিয়া যাবো না। মরতে হলে নিজের ভিটেয় মরবো।

খবর পাচ্ছি দিন দিন অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে। যেকোনো সময় এ গাঁয়ে মিলিটারি আসতে পারে কাকাবাবু।

আসুক। এলে দেখা যাবে তখন কি করবো। এখানে বসে বাঁচার কোনো পথ থাকলে সেটা বলে দে। ভিটে ছাড়তে বলিস না।

নিখিলের এমন শক্ত কথায় কামাল আর কথা বলে না। সুষমা নাক ঝেড়ে বলে, বাবার সঙ্গে আমিও এখানে থাকবো। আমার সুভাষ যদি বুকে গুলি খেয়ে আমার কাছে ফিরে আসে তাহলে কে দেখবে ওকে? যুদ্ধতো দেশের ভেতরেই হবে নাকি রে কামাল?

সরলা মৃদু ধমক দেয় সুষমাকে, কেন যে মা তুমি বারবার অলুক্ষণে কথা বলো।

মা, আপনার ছেলে যদি ফিরে আসে? কোথায় খুঁজে পাবে আপনাকে?

ও রে, আমার দেবেশ রে! বলে সরলা সুর উঁচু করতে গেলে নিখিলের থাবা পড়ে ওর মুখে। একটি হেঁচকি তুলে ও থেমে যায়। নিখিলের মনে হয় এই উনিশ বছরে দেবেশ ওদের জীবনে যতোটুকু ছিলো তার চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে সুভাষ যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকে। যে কোনো ঘটনায় কিংবা ঘটনার অনুভবে দেবেশ সামনে এসে দাঁড়ায়। দু'চারটা হেঁচকি উঠিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে সরলা বলে, আমিও যাবো না।

তখন চৌদ্দ বছরের লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করে, সুভাষ কেমন আছে কামালদা?

ভালো আছে। ওর ট্রেনিং শেষ হয়েছে। পাক আর্মির মোকাবেলা করার জন্য এখন থেকে ও প্রায়ই দেশের ভেতর ঢুকবে।

আমিও তো তাই বলি। যুদ্ধ তো দেশের মাটিতে হবে। ওটা তো আর ইণ্ডিয়ায় হবে না। আমরা গেলে ছেলেগুলোকে দেখবে কে?

আবার নিস্তব্ধতা। কেউ কথা বলছে না। ঘরের পেছনে শুকনো পাতা মচমচিয়ে চলে যাচ্ছে বেজি। ওটা কাছেধারে কোথাও থাকে। দিনের বেলাতেও দেখা যায়। এ বাড়ির কাউকে ও ভয় পায় না।

নিখিল গলা ঝেড়ে বলে, তুই চারটে গুড়-মুড়ি খাবি কামাল?

না। আমি যাচ্ছি। রাতেই আমাকে গাঁ ছাড়তে হবে। আপনারা সাবধানে থাকবেন।

কামাল উঠোন পেরিয়ে এলে সবাই ওর পিছু পিছু সদর দরজা পর্যন্ত আসে।

লক্ষ্মী বলে, আবার আসবেন। সুভাষের খবর দিয়ে যাবেন।

আচ্ছা। কামালের কিশোর কণ্ঠ অন্ধকারে ধ্বনিত হয়। ও বাঁশঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে নিখিল। ওরা ফিরে আসে। এবার আর বারান্দায় বসা হয় না। যে যার ঘরে চলে যায়। সরলা উস্‌খুস্‌ করে বলে, একটা কি ভুল হয়ে গেলো?

ভুল! নিখিল বিস্মিত হয়, কি ভুল করেছি?

মেয়ে দুটোকে পাঠিয়ে দিলে হতো না।

ওই জোয়ান ছেলের সঙ্গে? রাতের অন্ধকারে?

কামাল তো সুভাষের বন্ধু। সুভাষ বয়সে লক্ষ্মী সরস্বতীর বড়।

কামালকে নিয়ে তো ভয় নেই। ভয় পথঘাটের। না, না এসব কথা তুমি আর বলবে না। যদি কিছু হয় সবার একসঙ্গেই হবে।

যদি আর্মি তোমার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে মেয়ে দু'টোকে নিয়ে যায় তুমি কি করবে?

এই মাঝরাতে তুমি আমাকে জ্বালিয়ো না দেবেশের মা।

সরলা কথা বলে না। শোনা যায় তার দীর্ঘশ্বাস। নিখিলের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। বাকি রাতটুকু ও ছটফট করে। শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে নিখিলের প্রথম মনে হয় ওর বাবার কথা। বাড়ির পেছনের ফল বাগানের মধ্যে ওর বাবার মঠ আছে। ও নিজে বাবার চিতাভস্ম রাখার ব্যবস্থা করেছে। ও বিছানা ছেড়ে সোজা মঠের কাছে এসে দাঁড়ায়। মাত্র আলো ফুটেছে। মায়াময় আলো। সেই আলোয় ও মঠ দেখে। চীনামাটির কাঁচ বসানো মঠটা রোজ পরিষ্কার করা হয়। কোথাও ময়লা নেই। বাবার মৃত্যুর দশ বছর তো হয়েই গেলো। মা গেছে তারও আগে। মঠের সামনে দাঁড়িয়ে নিখিলের বুক ভার হয়ে থাকে। মনে মনে বলে, আমি তোমার তেমন ছেলে নই বাবা যে ভিটেমাটি ছেড়ে পালাবো। তুমি দুঃখ পেয়ো না। ইণ্ডিয়া কেন যাবো? ইণ্ডিয়া কি আমার দেশ? তুমিও তো এমন কথাই বলতে। দেশভাগের সময় তুমি যাওনি। উল্টো জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ঝগড়া করেছো। যারা গেছে তাদের গালাগাল করেছো। এখন জয়বাংলার সময়, দেশটা স্বাধীন হবে গো বাবা! বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে আটক আছে শুনেছি। শুনেছি দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য নিজে ধরা দিয়েছেন। এখন আমাদের জোয়ান ছেলেগুলো যুদ্ধ করছে। কেউ ঘরে থাকতে চায় না বাবা। তুমিই বলো, আমাদের দুঃখ কি! ছেলেগুলো যুদ্ধ করলে মেয়েগুলোও করবে। আর্মি যদি ওদের নিয়ে যায় তাহলেও বুঝতে হবে ওরাও দেশের জন্য মরেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মরা আর নির্যাতনে মরা দুটোই সমান। আমি জানি তুমি বেঁচে থাকলে তুমিও এই কথা বলতে। সরলা মিছেমিছি আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

বাবার সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসে নিখিল। গাছ থেকে একটা কাঁঠাল পাড়তে ভোলে না। ওটা গাছেই পেকে গেছে। বেশ গন্ধ আসছে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠোনে ঢুকতেই সুষমার সঙ্গে দেখা হয়। হঠাৎ করে সুষমার মুখোমুখি হয়ে চমকে ওঠে নিখিল। হাত কাঁপে, তবু কাঁঠালটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, বৌমা নাও। গাছেই পেকেছিলো।

নিখিলের কাঁপাকণ্ঠ এবং ভীত চেহারা দেখে অবাক হয় সুষমা। কিন্তু শ্বশুরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। কাঁঠাল নিয়ে চলে যায়। নিখিল কুয়োতলায় এসে বসে। সুষমার কপালের এবং সিঁথির বাসী সিঁদুর নিখিলের চোখের সামনে সাদা হয়ে ওঠে। কামাল বলে গেছে সাবধানে থাকবেন। কপালের সিঁদুর নিয়ে কি সাবধানে থাকা যাবে? আর কিছুক্ষণ পর সুষমা স্নান করবে, আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াবে, ডগডগে লাল রঙের সিঁদুর দিয়ে উজ্জ্বল করবে নিজের এয়োতি অবস্থা। আর্মি এলে কোথায় লুকোবে ও সুষমাকে? তবে কি ও সাবধান থাকার জন্য সুষমার সিঁথি শূন্য করে তুলবে? এ যে গুলি চালনার মতো ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। নিখিল কুয়োতলা থেকে উঠতে পারে না। বালতিভরা জল নিয়ে সামনে বসে থাকে। দেখে বালতির জলে ওর ছায়া পড়েছে। ও হাত বাড়িয়ে জল নাড়াচাড়া করে। রান্নাঘরে বসে কাঁঠাল ভাঙে সুষমা। বড় বড় কোষগুলো থেকে চমৎকার ঘ্রাণ আসছে। বাবার কি হলো? ওর হাত থেমে যায়। বাবাকে বিচলিত মনে হলো কেন? কাল রাতে কামাল এসেছিলো দেখে বাবা কি ভয় পেলো? বাবা তো ভয় পায় না। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সোজা তাকালে কুয়োতলা দেখা যায়। নিখিল উবু হয়ে আছে, তার পিঠ রান্নাঘরের দিকে। দেবেশের পিঠটা

অমন ছিলো, অমন চওড়া। ঘাড়টা বেশ লম্বা দারুণ লাগতো দেখতে। দেবেশের কোনো কিছু ও ভোলেনি। ঢাকা থেকে যখন ফিরতো কেমন করে যে দিন কেটে যেতো বুঝতেই পারতো না। বলতো, সুষ্মি ফিরে এসে যেন দেখি তোমার চোখে আমার অপেক্ষার যন্ত্রণা। যে মানুষের যন্ত্রণা নেই তাকে আমার ভালো লাগে না। কেবল সুখে থাকে বোকারা। জানো বোকাদের অনুভবে ঘাটতি থাকে।

তখন এতো কথা বোঝার বয়স ছিলো না ওর। একটি মেয়ে তার কৈশোরে কতোটুকু বা বড়ো হয়। শুধু দেবেশ সুষ্মি ডাকলে মনে হতো ও স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবেশ। ওর কণ্ঠে পাখির ডাক থাকে, ফুলের সুবাস থাকে, নক্ষত্রের আলো থাকে এবং নদীর কলধ্বনি বয়ে যায়। কি প্রচণ্ড তীব্র ভালোবাসা ছিলো ওর। দেবেশ কখনো ওকে সুষমা বলে ডাকেনি। বলতো, আর দুটো বছর অপেক্ষা করো সুষ্মি। পাস করে একটা চাকরি নেবো। তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো ঢাকায়। সেখানে তুমি আর আমি খড়কুটো দিয়ে একটা বাসা বানাবো।

সুষমা হাসতে হাসতে বলেছিলো, না, খড়কুটো দিয়ে বাসা না। বাবুই পাখির মতো বাসা। ওই রকম সুন্দর বাসা কি আর হয়।

উহুঁ, ওই বাসা ঝড় উঠলে পড়ে যাবে। যে বাসা পড়ে যায় আমি তেমন বাসা চাই না।

এখন সুষমার বুকের ভেতরটা কট করে ওঠে। বাসাই তো বানানো হলো না, তার আবার পড়ে যাওয়া আর টিকে থাকা। কতোইবা বয়স ছিলো ওদের। নিখিল শখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেকে বিয়ে দিয়েছিলো। বছর ঘুরতেই বাবা হলো দেবেশ। লজ্জায় কাউকে ছেলের খবর দেয়নি, শুধু হাবিব জানতো। হাবিব এখনো ওদের খোঁজ নেয়। সুভাষ ঢাকা পড়তে গেলে নিজেই সুভাষের লোকাল গার্জিয়ান হয়েছে। সুষমার ভাবনা ঘুরেফিরে আবার বাসায় এসে থেমে যায় — কেমন ঘরহীন জীবন কেটে গেলো ওর। আর কবে আসবে দেবেশ? কবে ওর দেবেশের অপেক্ষার যন্ত্রণা ফুরোবে? অপেক্ষা করতে করতে যে আমার চোখে ছানিপড়ার বয়স ঘনিয়ে আসছে। তখন কি তুমি আর চোখের ভাষা পড়তে পারবে? দেখতে পাবে কি, কী গভীর যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে ওই চোখের গভীরে? তুমি বলেছিলে বোকাদের অনুভবে ঘাটতি থাকে, কেবল সুখে থাকে বোকারা, কিন্তু তোমার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমি বোকা হয়ে যাচ্ছি দেবেশ — আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। তখন ও দেখতে পায় সরলা গিয়ে নিখিলের পাশে বসেছে। সুষমা দ্রুত হাতে কাঁঠাল খুলতে থাকে। কারণ সরলা কুয়োতলা থেকে নিখিলকে উঠিয়ে আনবে এবং কাঁঠাল আর মুড়ি দিতে বলবে। একটু পর স্বরস্বতী এসে ওর সামনে বসে।

কি রে মুখটা অমন শুকিয়ে আছে কেন?

বাবা, ইণ্ডিয়া যেতে চাইলো না। আমার খুব মন খারাপ হয়েছে।

নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ভালো লাগে না।

তুমিতো দাদার অপেক্ষায় আছ বৌদি। সেজন্য তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে।

তো ইণ্ডিয়া গিয়ে তোরই বা কি হবে?

হেমন্তর সঙ্গে দেখা হতে পারতো। হয়তো আমার বিয়েটাও হয়ে যেতো বৌদি।

অ। সুষমা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

কিন্তু, এই জয়বাংলার সময়ে বিয়ে করতে আমার ভয়ও লাগে। যদি—

যদি কি রে, বিয়ে হলে তো ভালোই হতো।

না, বৌদি না। যদি হেমন্ত দাদার মতো হারিয়ে যায়? অসম্ভব, আমি তোমার মতো একা জীবন কাটাতে পারবো না। এতো অপেক্ষা আমার সইবে না।

আমার অবস্থা তোর হলে কি করতি?

আর কারো হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। ঘর বাঁধতাম, সংসার করতাম।

যদি হেমন্ত ফিরে আসতো?

যদি আসতো তাহলে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতো। তুমি কি ভেবেছো ও আমার জন্য অপেক্ষা করতো? মোটেই না। ছেলেরা অপেক্ষা না করলে মেয়েরা করবে কেন বৌদি?

জানিনা। এতোক্ষণে সুষমার চোখ জলে ভরে ওঠে। ও নিজেও জানে না এ কিসের জল। সরস্বতী লজ্জিত হয়ে বলে, আমাকে ক্ষমা করো বৌদি। আসলে তোমাকে কাঁদাতে চাইনি।

আমি তোর কথায় কাঁদিনি রে। তুইতো জানিস আমি যখন এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসি তখন তোর জন্ম হয়নি। তুই আর লক্ষ্মী আমার সুভাষের ছোট। তোদের আমি সুভাষের মতো করে দেখি। যা, কাঁঠাল নিয়ে বাবাকে খেতে দে।

সরলা ততোক্ষণে নিখিলের মাথা ধুইয়ে দিয়েছে। নিখিল বলেছে, জলটা একটু বেশি করে ঢালো দেবেশের মা। দু'বালতি জল ঢালা হয়েছে নিখিলের মাথায়। হাতের কাছে গামছা না থাকায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা মুছিয়ে দেয় সরলা। তারপর চোখে চোখ রেখে বলে, তোমার কি হয়েছে? ঘুম থেকে উঠেই বাগানে গেলে। কাউকে কি দেখেছো? কাল রাতে কামালকে এ বাড়িতে আসতে কেউ দেখে ফেলেনি তো?

না। নিখিল অবসন্ন কণ্ঠে বলে।

তাহলে এমন কি হলো যে তুমি গায়ে জোর পাচ্ছো না?

দেবেশের মা আমি নিজের ভেতর শত্রু দেখতে পাচ্ছি।

কি বলছো? খোলাসা করে বলো না ছাই। সরলা ঝঙ্কার দিয়ে কথা বলে। ওর রাগ হচ্ছে। বুড়োটা জীবনভর এভাবেই জ্বালালো ওকে।

এখন আমি কিছু বলতে পারবো না। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। নাড়িভুঁড়ি মোচড়াচ্ছে।

সরলার রাগ দ্বিগুণ হয়। এভাবে উৎকণ্ঠা জিইয়ে রাখলে কতোক্ষণ সহ্য হয়। ও দাঁত কিড়মিড় করে। জোরে বালতি রাখে, সে শব্দে চমকে উঠে নিখিল। তবু সরলাকে কিছু না বলে উঠোন পেরিয়ে চলে যায়। আসলে সরলাকে কিভাবে কথাটা বলা যায় এ প্রস্তুতির জন্য নিখিলের নিজের কিছু সময় দরকার। কাঁঠাল খেতে বসে হৈ চৈ করে নিখিল, সবাইকে ডাকে, একসঙ্গে বসে খেতে বলে। সরলা আর সুষমা পরে খাবে বললে, রাগ করে। ওদেরকে খেতে বাধ্য করে এবং দুঃখ প্রকাশ করে যে অন্য মেয়েগুলো এ সময় বাড়িতে নেই। কে যে কেমন আছে এ খবরও রাখা হয়নি। লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বলে, বাবা তোমার সব নাতি নাতনী এ বাড়িতে জড়ো হলে আমরাই একটা মুক্তিবাহিনী গড়তে পারবো। তোমার কি মনে আছে যে তোমার নাতি- নাতনীর সংখ্যা কতো?

খুব আছে। কেন থাকবে না? ছেলে এবং ছয় মেয়ে মিলিয়ে আমার নাতি-নাতনীর

সংখ্যা তেতাল্লিশ জন। আমি একজন জমিদার ঠাকুরদাদা। সবচেয়ে ছোটটির বয়স কতো রে?

দেড় মাস। পার্বতীর ছেলে। সরলা বলে। সুষমা তোমার মনে আছে তোমার বিয়ের পর আমরা কাঁঠাল খাওয়ার উৎসব করেছিলাম।

সুষমা লজ্জায় বিব্রত হয়ে বলে, আছে মা।

তখন বাড়িতে সব মেয়েরা ওদের ছেলেপুলেসহ এসেছিলো। সরস্বতী অর লক্ষ্মী হয়নি।

লক্ষ্মী প্রশ্ন করে, কাঁঠাল খাওয়ার জন্য আবার ধুম করতে হয় নাকি?

নিখিল জোরে জোরে মাথা নাড়ে, হয় হয়। তোরা তো জানিস না, তখন আমাদের জমজমাট সংসার। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলের বিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে দুর্গার মতো পুত্রবধূ। জ্যৈষ্ঠি মাসে প্রথম কাঁঠাল পাড়লাম গাছ থেকে। বৌমা কাঁঠাল ভাঙবে। কেন জানিস?

কেন বাবা?

কাঁঠালে যতোগুলো কোঁয়া থাকবে অতোগুলো নাতি-নাতনী আসবে আমার সংসারে। বলতে বলতে হা-হা করে হাসে নিখিল।

সে কাঁঠালটায় কতোগুলো কোঁয়া ছিলো বাবা?

অনেক, ছোট ছোট অনেক। গুনে শেষ করা যায় না। কাঁঠালটাও ছিলো এতো বড়ো। তোরা এখন সে কাঁঠালের কথা ভাবতেও পারবি না। আমার দুর্গার মতো বৌমা কাঁঠাল ভাঙলো।

একে একে সবাই আমাকে কাঁঠাল খাওয়ালো। সেদিন আমাকে অনেকগুলো কাঁঠালের কোঁয়া খেতে হয়েছিলো বাবা। শেষে আমার মনে হলো আমি আর শ্বাস করতে পারছি না। আপনার ছেলে —।

আর কথা বলতে পারলো না সুষমা। কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলো। ওর পিছে পিছে গেলো লক্ষ্মী আর সরস্বতী। বসে রইলো নিখিল আর সরলা। নিখিল সরলাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ছেলে বলে ও কি দেবেশের কথা কিছু বলতে চেয়েছিলো নাকি?

হয়তো চেয়েছিলো।

সেদিন দেবেশ কি কিছু বলেছিলো?

হ্যাঁ। দেবেশ ওর হাত ধরে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। লীলাকে বলেছিলো, তোমরা কি ওকে মেরে ফেলবে বড়দি।

আহা রে, সুষমাকে দেবেশ খুব ভালোবাসতো।

এতো ভালোবাসা নিয়ে ও কেমন করে হারিয়ে গেলো গো?

মানুষের জীবনে এমন এক একটি বড় ঘটনা থাকে যার জন্য মানুষ নিজের কথা বেমালুম ভুলে যায়। আমাদের দেবেশ তেমন বড় ঘটনায় ঢুকতে পেরেছিলো।

আহা রে, আমার সোনার ছেলে। সরলা কাঁঠালের ভুতির ওপর আঙুলের মাথা বুলোয়। নিখিল নির্নিমেষ সরলার সিঁথির দিকে তাকিয়ে থাকে। সরলার স্নান হয়ে গেছে, ও নতুন সিঁদুর পরেছে সিঁথিতে।

কি গো হাঁ-করে দেখছো কি?

একটি কথা ভাবছি দেবেশের মা।

বলো।

কালরাতে কামাল আসার পর থেকেই মনটা খুব খারাপ।

কেন? সুভাষের কথা মনে হচ্ছে?

না। কামাল বলেছে অবস্থা খারাপ। সাবধানে থাকতে।

অবস্থা তো যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে খারাপ হয়েছে। এখন আর নতুন করে খারাপ হবে কি?

নিখিল চুপ করে থাকে। নিজের ওপর রাগ হয়। শারীরিক কারণে যুদ্ধ করতে না পারলে কি হবে, ওতো মানসিক যুদ্ধটা করতে পারে। যুদ্ধটা ভয়ের বিরুদ্ধে এবং বেঁচে থাকার পক্ষে, তাহলে এতো দ্বিধা কেন?

কি হলো কিছু বলছো না যে?

ভাবছি, বৌমাকে বলবো ওর আর সিঁদুর পরার দরকার নেই।

কি বললে? অসম্ভব, আমরা ওকে একথা বলতে পারবো না। যে কথা আমরা ওকে উনিশ বছর বলিনি সেকথা এখন কেন বলবো? মরতে হয় মরবো।

মরতে হয় মরবো বলাটা সহজ দেবেশের মা, কিন্তু কাজটা কঠিন। দেখবে সামনে যমদূত এসে দাঁড়ালে সবাই লুকোতে চাইবো। বলতে পারবো না আমাকে তুলে নাও।

সরলা চুপ করে থাকে। তারপর করুণ কণ্ঠে বলে, বৌমার সিঁথি খালি দেখলে মনে হবে দেবেশে মরে গেছে। এখন তো ভাবতে পারি দেবেশ হারিয়ে গেছে। একদিন না একদিন আসবে।

নিখিল দেখতে পায় কাঁঠালের ভুতির লোভে উঠোনে কাক জড়ো হয়েছে। একে দুয়ে অনেকগুলো কাক এসেছে। ও গুনতে থাকে, পঁয়ত্রিশটা কাক। ও মনে মনে বলে, আমার উঠোনে কাকদের মেলা।

দেবেশের মা দেখো কাকগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কি যে ছাইপাশ বলো না, ভালো লাগে না।

সরলা উঠে চলে যায়। নিখিল কাঁঠালের ভুতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাকদের দিকে ছুঁড়ে মারে। কা-কা শব্দে মুখর হয়ে উঠে বাড়ি। নিখিল কাকদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। ওর ভীষণ ফূর্তি হয়। ও কখনো কাক এবং কাঁঠালের ভুতির খেলা দেখেনি এবং খেলেওনি। তাহলে এটা কি যুদ্ধের সময়ের খেলা? দারুণতো। ও কখনো উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে ভুতির টুকরো, সেটা শূন্য থেকে লুফে নেয় কোনো কাক। ও কখনো কাকদের মাঝে সরাসরি ছুঁড়ে দেয় ভুতির টুকরো। কাকগুলো কাড়াকাড়ি করে, একজন অন্যজনের ঠোঁট থেকে কেড়ে নিয়ে উড়ে গেলে আরো কতোগুলো একসঙ্গে ওটার পেছনে ধাওয়া করে। নিখিল হা-হা করে হেসে হাততালি দেয়। ওরা তিনজন এসে বাবার পাশে বসে বাবার ফূর্তি দেখে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাবার কখনো এতো আনন্দ হয়নি। আজ বাবা একদম ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। লক্ষ্মী বলে, বাবা আমিও তোমার সঙ্গে খেলবো?

আয়। দেখ কাকগুলো কেমন করে উঠোনের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে।

গাঁয়ের সব কাক কি এসেছে বাবা?

হতে পারে।

বাবা কাঁঠালের গন্ধ কতোদূর যায়?

অনেকদূর, সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পার। বলেই নিখিল হা-হা করে হাসতে থাকে।

বাবা কাঁঠালের গন্ধ কি মিলিটারির নাকে পৌঁছে যাবে?

কি বললি? চমকে তাকায় নিখিল। এবং লক্ষ্মীর দিকে তাকাতে গিয়ে ওর দৃষ্টি সুষমার সিঁথিতে স্থির হয়ে যায়। সুষমার সিঁথির দিকে তাকিয়ে বলে, আসবে। আসবে না কেন? এ দেশের আনাচেকানাচে সবখানে যাবে ওরা।

তখন আমরা কি করবো বাবা?

আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

কি ভাবে?

আমরা ভেবে বের করবো কিভাবে।

সরস্বতীর কণ্ঠ যেন বেজে ওঠে, বাবা ওরাতো দখলদার। ওরা কিভাবে গ্রামে গ্রামে পৌঁছুবে?

ওরা ভুল পথে খুঁজে মরবে, ওদের ভুল পা ফেনা-কাদায় দেবে যাবে, ওদের দৃষ্টি তুমুল বৃষ্টিতে আটকে যাবে এবং ওরা আমাদের উঠোনে উঠোনে আসবে মা।

বাবা, বাবাগো, লক্ষ্মী আর সরস্বতী নিখিলের দু'পাশ ঘেঁষে বসে। সুষমা পিঠের কাছে। ওরা সবাই মিলে দেখতে পায় ভুতি নিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাকরা। উঠোনে আর একটুকরোও ভুতি নেই। লক্ষ্মী বলে, বাবা কাকদের মুখে ভুতি দেখে মিলিটারিরা কি আমাদের বাড়িতে কাঁঠাল খেতে আসবে?

নিখিল লক্ষ্মীর দিকে তাকায় না, ওর প্রশ্নের উত্তরও দেয় না। দেখতে পায় সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে ও যেন এক আদিম নারী। ওর স্বামী ভিন্ন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে। সরলা এসে ওদের কাছে বসলে নিখিল একটা গল্প বলতে থাকে : অনেক, অনেক কাল আগে, যখন মানুষ পাহাড়ের গুহায় থাকতো, শিকার করে জীবনযাপন করতো সে সময়ের কথা। ছেলেটি ছিলো বৌদ্ধ, নিজের গোত্রকে খুব ভালোবাসতো, গোত্রের অবমাননা সইতে পারতো না।

পাহাড়, সমতল, বন, নদী, ঝর্ণা মিলিয়ে ওরা নিজেদের জন্য চমৎকার আবাস গড়ে তুলেছিলো। ওদের মেয়েরা ক্ষেতে ফসল ফলাতো, শস্য এনে খাবার বানাতো। ঝর্ণা থেকে সংগ্রহ করতো মিষ্টি পানি। ছেলেরা বনে বনে শিকার করতো, নদী থেকে ধরে আনতো মাছ। ভারী সুন্দর দিন ছিলো। রাতের বেলা গুহার সামনে আগুন জ্বালিয়ে ওরা নাচতো, গাইতো। ঘুমিয়ে গেলে ছেলেটি স্বপ্ন দেখতো যে চিত্রল হরিণের পেছনে দৌড়াচ্ছে ও। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এসেছে মায়াবনে। সেখানে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রূপবতী এক নারী। ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির ভালোবাসা হয়। গভীর ভালোবাসা। এক সময় ওরা আগুনে হরিণ-পোড়ানো উৎসব করে। গোত্রের লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে রাতভর নাচলো। সেকি নাচ, ওদের সঙ্গে নাচলো নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো। তারপর থেকে ওরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করলো। মেয়েটি গুহার গায়ে নিজেদের ছবি আঁকলো। আরো আঁকলো ফসল তোলার চিত্র, হরিণ শিকারের চিত্র। বন, ঝর্ণা, আকাশ, নদীও ওর চিত্র থেকে বাদ পড়লো না। সবশেষে আঁকতে শুরু করলো একজন যোদ্ধা মানুষের ছবি, দেয়ালজোড়া বিশাল ছবি। যে ওর গুহা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়। রাতের বেলা ওদের গুহা থেকে ভেসে আসে গান, দুজনের কণ্ঠ থেকে ঝর্ণার মতো ভালোবাসার গান ঝরে

পড়ে। অন্য গুহার মানুষের চোখে সে গান ঘুম নামিয়ে আনে, ওদের সারাদিনের ক্লান্তি ঝরিয়ে দেয়। ওরা ভেবে পায় না এর চেয়ে বেশি সুখ মানুষের জীবনে থাকে কিনা। নিজের *গুহার ছবি আঁকা শেষ হলে ও অন্যদের গুহার ছবি এঁকে দেবে কথা দিলো, কিন্তু কবে* পারবে ও জানে না, ওর যে যোদ্ধা মানুষটিকে আঁকা ফুরোয় না। কেমন করে আঁকলে মানুষটিকে সবচেয়ে বড় বীর হিসেবে আঁকা যাবে সেটা নিয়েই ওর রাতদিনের ভাবনা। একদিন ছেলেটি নদী থেকে একটি বিরাট মাছ ধরে নিয়ে এলো। এতো বড় মাছ ওদের গোত্রের কেউ কখনো ধরেনি। আজ ওদের উৎসব। আগুনে ঝলসানো মাছ খাবে সবাই। কি আনন্দ চারদিকে। ছেলেটি মাছটি কেটেছে মাত্র, রক্তে ভেসে গেছে সবুজ ঘাস, তখন খবর এলো আর একদল যাযাবর মানুষ ওদের সীমানা আক্রমণ করেছে, ওরা স্বর্গের মতো এই ভূমি দখল করে নিতে চায়। গোত্রের মানুষেরা ছুটলো যুদ্ধ করতে। ছেলেটি ওর তীর-ধনুক নিয়ে এলো – গায়ে জড়িয়ে নিলো বাঘের চামড়া। মেয়েটি দু'হাতে আগলে দাঁড়ালো, কবে ফিরবে?

যেদিন যুদ্ধ শেষ হবে।

মেয়েটি কাঁদতে শুরু করলো। ছেলেটি ওকে মাছের রক্তের কাছে নিয়ে এসে নিজের তর্জনী রক্তে ডুবিয়ে রাঙিয়ে দিলো ওর সিঁথি। বললো, আমি আছি এটা তার চিহ্ন। আমার কথা মনে রেখে তুমি তোমার সিঁথি রাঙিয়ে রেখো। রক্ত দিতে হবে এমন কথা নেই, তুমি যা কিছুর রঙ দিও, লাল টকটকে উজ্জ্বল রঙ।

কেমন করে তোমার খবর পাবো?

তুমি তোমার ছবি শেষ করো সুকন্যা, দেখবে ওটাই তোমার ভালোবাসা, বেঁচে থাকা। আর যদি কোনো নতুন বিপদ হয়, যদি মনে করো সিঁথিতে রঙ থাকলে শত্রু তোমাকে মেরে ফেলবে তাহলে মুছে ফেলো সিঁথির রঙ।

মেয়েটি কেঁদে বলে, না, তাহলে তোমাকে হারাবো।

সিঁথির রঙ নিজের হাতে মুছে ফেললেই কাউকে হারানো হয় না সুকন্যা। হারানোর দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়। বেঁচে থাকা কৌশল সুকন্যা। তোমাকে, আমাকে, সবাইকে যুদ্ধের সময়ে কৌশলে বেঁচে থাকতে হবে। আমি জানি যখন শত্রু আমার হাতে নিধন হতে থাকবে তখন শত্রুর চর তোমাকে খুঁজতে আসবে। তুমিই জানবে যে তুমি নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে। আমি তোমাকে হারাতে চাই না। মনে রেখো আমরা আবার আমাদের গুহায় একসঙ্গে গান গাইবো।

ছুটে চলে যায় ছেলেটি। ওর যুদ্ধ শেষ হয় না। শত্রুদের ও তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে নদীর ওপার, বনের ওপার। দিন যায়, মাস যায়। শত্রুর চর আসে ওদের সমতলে। ওকে কেউ খুঁজে পায় না। দেখতে পায় সব নারীর মধ্যে একজন নারী আছে যে ক্লান্ত, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনিতে ম্রিয়মান – চোখের নিচে কালি, গালভাঙা, হাতের আঙুলে কড়া পড়ে গেছে। ওরা বোঝে যে এখানে এমন কোনো নারী নেই যে ছবি আঁকতে পারে। ওরা ফিরে যায়। মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করে, ছেলেটি ফিরে না আসা পর্যন্ত ও আর সিঁথিতে রঙ দেবে না। আর এমন দিন যদি আসে যে অন্য সবাই ফিরলো, শুধু ফিরলো না ছেলেটি সেদিন ও আবার সিঁথিতে রঙ দেবে — ওই রঙটাতো ছেলেটির ভালোবাসা।

কতো বছর গড়ালো মেয়েটি জানে না। ও সময়ের হিসেব রাখে না। শুধু শুনতে পায়

শত্রুদের নদীর ওপারে, বনের ওপারে তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। ততোদিন মেয়েটির যোদ্ধা ছেলের ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। ও একবারও নিজের দিকে তাকায়নি– গালের কালি মোছেনি, হাতের কড়া ওঠায়নি, চোখের নিচের কালো দাগ আরো গাঢ় করেছে। কিন্তু ওর স্বপ্ন ফুরোয়না। ও নতুন ছবি আঁকতে শুরু করে। ভাবে, ছেলেটি ফিরে আসার আগেই ছবিটি শেষ করতে হবে। ও যেন এসে দেখে যে যুদ্ধের সময়ে ও শুধু বেঁচেই থাকেনি, নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখেছে। ঘুমুবার আগে গুহার মুখে যে বড় পাথরটি দেয় সেই পাথরের গায়ে ও আঁকতে শুরু করে নিজের ছবি। ওর কোলে শিশু। অন্য শিশুটি হরিণ শাবকের সঙ্গে খেলা করছে মহুয়া গাছের নিচে। আর দূর থেকে পাহাড়ী পথে আসছে যোদ্ধা মানুষটি, পিঠে তীর-ধনুক। যেদিন ছবিটি শেষ হলো সেদিন ফিরলো ছেলেটি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো ছবিটির দিকে। বললো, সুকন্যা ঝর্ণার জলে নেয়ে এসো। মেয়েটি স্নান করলো, ধুয়ে ফেললো ওর বেঁচে থাকার কৌশল, সিঁথিতে উজ্জ্বল লাল রঙ দিয়ে যখন ছেলেটির সামনে দাঁড়ালো ছেলেটি বললো, এখন থেকে আমাদের নতুন জীবনের শুরু। তোমার ওই ছবির মতো। মেয়েটি লাজুক হেসে ছেলেটির বুকে মাথা রাখলো।

নিখিলের বলা শেষ হলে লক্ষ্মী-সরস্বতী উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, খুব সুন্দর গল্প বাবা। আর তুমি কি চমৎকার করে বললে। মনে হলো আমরা যেন সেই গুহার জীবনে ফিরে গেছি। ইস, তেমন জীবনে যদি আমরা যেতে পারতাম।

সুষমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, এটা এখন আমাদের তেমন জীবনই সরস্বতী।

ওরা দু'বোন চমকে সুষমার দিকে তাকায়। সরলা বুঝেছে যে কেন নিখিল এই গল্পটি বলেছে। তাই ও অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। নিখিল মুখ নিচু করে আছে। ও সুষমার দিকে তাকাতে পারছে না। সুষমা গলা উঁচু করে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, বাবা শাঁখা ভেঙে ফেলার গল্প নেই?

আছে মা, যুদ্ধের সময়ের জন্য সব গল্প থাকে।

আমি পারবো না, পারবো না, বলতে বলতে সুষমা উঠে চলে যায়। শোনা যায় ওর ফোঁপানির শব্দ আসছে। নিখিল সরলাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি সিঁথি মুছতে পারবে দেবেশের মা?

সরলা অনড় কণ্ঠে বলে, পারবো।

লক্ষ্মী সরস্বতী মায়ের কথায় চমকে ওঠে। দেখতে পায় নিখিলের ঠোঁটে মৃদু হাসি। লক্ষ্মী বোকার মতো প্রশ্ন করে, বৌদি না পারলে মা কেন পারবে বাবা?

তোদের মা আমাকে হারাতে চায় না। সুষমার সামনে তো দেবেশ নেই। আছে দেবেশের ফিরে আসার আশা। তাই ও পারবে না। আশাটুকু চলে গেলে মানুষের আর কি থাকে?

বাবার কথা শুনে সরস্বতীর খুব মন খারাপ হয়। তীব্রভাবে হেমন্তের কথা মনে পড়ে। হেমন্ত তো ওর বন্ধুদের বলেছিলো, সরস্বতীকেই ওর চাই। সরস্বতীকে না পেলে বাঁচবো না। তাহলে এখন কেমন করে ওকে ভুলে বসে আছে। কেন ও ভাবলো না এই যুদ্ধের সময়ে সরস্বতীর একা থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় আর্মি ওকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে.– – ধর্ষণে ছিবড়ে করে ফেলবে ওকে। তাহলে হেমন্ত কি শুধুই মুখের কথা বলেছে? কোনো টান নেই — নিজের অজান্তেই ওর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সরলা ওর পিঠে হাত রেখে বলে, মন খারাপ কেন মা?

এমনি। আমাদের যে কি হবে।

নিখিল নিশ্চিত কণ্ঠে বলে, আমরা বাঁচার কৌশল বের করবো মা।

কৌশলটা কি বাবা?

জানিনা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো। যাই বাজারটা ঘুরে আসি।

সাবধানে যেও বাবা।

মেয়ের কথায় হাসি পায় নিখিলের। আজকাল সবাই সাবধান কথাটা বেশ ব্যবহার করছে। অথচ কেউ জানে না সাবধান মানে কি, কীভাবে সাবধান থাকতে হয়। যুদ্ধের সময়ে সাবধান থাকা সহজ কথা নয়। এসব ভাবতে ভাবতে নিখিল বাড়ি থেকে বেরুলো। লুঙ্গি খানিকটা কোমরে গুঁজে হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নিলো, গায়ে ফুলহাতার বুকখোলা শার্ট। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। মেঠো পথে ও খালি পায়ে হাঁটতেই ভালোবাসে, কিন্তু আজ ওর মনে হলো পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, যদি বড় একটা ক্ষত হয়, সে ক্ষত যদি না সারে, তাহলে মিলিটারি এলে ও কেমন করে পালাবে? বাড়িতে জোয়ান ছেলে নেই যে ওকে কাঁধে তুলে নেবে। একেই কি বলে সাবধান থাকা? আশ্চর্য, কতো সহজভাবে সাবধান থাকার কথা মনের ভেতর ডুবে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে সেটা ফুঁস করে মাথা তুলে ফেলে। অন্যকে বলে দিতে হয় না যে সাবধান থাকা কি? নিখিল বড় বাঁশঝাড় পেরিয়ে খোলা মাঠের উঁচু রাস্তাটায় উঠে এসে আবদুর রহমানের দেখা পায়, সেও বাজারে যাবার জন্য বেরিয়েছে। দূর থেকে ওকে দেখে একগাল হেসে এগিয়ে আসে।

কেমন আছেন নিখিল বাবু?

নিখিল গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। আবদুর রহমানকে এড়াতে চায়, কারণ আবদুর রহমান মোস্তফা ও কামালের বাবা। ও জানে মুক্তিযোদ্ধা ছেলের বাবারা যুদ্ধের সময় ভয়াবহ, ওদের সঙ্গে প্রকাশ্য দিবালোকে মিশতে নেই। কেউ কথা বলতে দেখলে সন্দেহ করবে।

আপনার কি শরীর খারাপ নিখিল বাবু?

হ্যাঁ, কদিন ধরে জ্বর যাচ্ছে। কিছু ভালোলাগে না। কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না।

তাহলে আপনার শরীর খারাপ না, মন খারাপ।

নিখিল ম্লান হেসে বলে, যুদ্ধের সময়ে কার মন ভালো থাকে বলুন।

আমার মন ভালো আছে।

আছে? তাহলে আপনি ভাগ্যবান।

আমার ছেলেরা যুদ্ধ করছে। আমার মন ভালো থাকবে না তো কার মন ভালো থাকবে?

আহ্ আস্তে বলুন।

এখানে আমি আর আপনি ছাড়া কেউ নেই।

কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে। এখানেতো দেয়াল নেই, আমি বলি বাতাসেরও কান আছে।

আমার তো এসব মানতে ইচ্ছে করে না নিখিল বাবু।

আমাদের সাবধান থাকবে হবে। আমাদের একসঙ্গে হাঁটা উচিত নয়। আপনি আগে আগে চলে যান। আমি পরে আসছি।

আবদুর রহমান নিখিলের কথার সমর্থনে মাথা নাড়লো। ও বুঝলো, নিখিল ঠিকই বলেছে। আসলে লোকটা পোড়-খাওয়া তো, সেজন্য বেশি সাবধানী, তাছাড়া বাড়িতে বয়স্ক মেয়ে

আছে। আবদুর রহমানের তো বয়স্ক মেয়ে নেই। জোয়ান ছেলে দুটো যুদ্ধে, বাড়িতে ওরা বুড়োবুড়ি দু'জন। মেয়ে চারটে শ্বশুরবাড়ি। ও কাউকে ভয় পায় না। আবদুর রহমান লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেকখানি চলে যায়। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিখিল রাস্তার ধারে বসে আছে। আবদুর রহমান ভাবলো নিখিল এতো সাবধানী হয়েছে যে ওর ছায়াটুকুও দেখতে চায় না। ধু-ধু ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ও জোর পায়ে হাঁটতে থাকে। ভাবে, সর্বনাশের মধ্যে আছে ওদের বুড়োবুড়ির জীবন আর ভিটেটুকু। যায় যদি যাক। ভিটে পুড়িয়ে দিলে ভিটে হবে, কিন্তু যুদ্ধে হেরে গেলে—। না, আবদুর রহমান বেশি ভাবতে চায় না। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার মানে ও বোঝে, সেজন্য ওর কাছে ভিটে তুচ্ছ। এমনকি তুচ্ছ ষাট বছরের ওপরের নিজেদের দুটো জীবনও।

নিখিল রাস্তার পাশে বসে পড়েছে, কারণ ওর ডান পায়ের স্পঞ্জের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। প্রথমে ও ছেঁড়া স্পঞ্জের ফিতাটা লম্বা ঘাস দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করলো। হলোনা, ওটা হবার নয়, ও কি স্পঞ্জ জোড়া ফেলে দেবে? কেন ফেলবে? মুচির কাছে নিয়ে জোড়া দিলে এখনো অনেকদিন পরা যাবে। শুকনো ঘাস দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া বেঁধে হাতে দোলাতে দোলাতে নিখিল বাজারের দিকে যায়। আজ হাটবার নয়, তবু রাস্তায় বেশ লোক চলাচল আছে। অনেকেই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কেন আজ এতো লোক বাজারে যাচ্ছে? কি ওদের প্রয়োজন? নিখিল সবার থেকে আলাদা থাকতে চায়। অকারণে জড়ো হওয়ার তো দরকার নেই। জড়ো তখনি হবে যদি সবাই মিলে কিছু একটা বাধা দিতে চায়। সেটা মিলিটারির কনভয় হতে পারে, কিংবা যুদ্ধ! নিখিলের মনে হয় ওর মগজের ভেতর হাজার হাজার মৌমাছি বিজবিজ করছে। ওদের ভাঁড়ারে কোনো মধু নেই, ওরা অকারণে জড়ো হয়েছে। নিখিলের অস্বস্তি হতে থাকে।

পাশ থেকে কেরামত বলে, দাদু স্যাণ্ডেল জোড়া অমন ঝুলিয়েছেন কেন? ওটা আর কয়দিন পরতে পারবেন? ফেলে দেন।

ফেলে দেবো কেন? থাকনা।

কেরামত গাঁয়ের গণু মোল্লার ছেলে, বাবা মসজিদের ইমাম।

সুভাষ ইণ্ডিয়ায় কি করছে দাদু?

কে জানে কি করছে, হারামজাদার খোঁজ রাখি না।

আপনি যাবেন না ইণ্ডিয়ায়?

না। আমার গায়ে শক্তি নেই, হাঁটতে পারবো না।

আপনি বললে আমি আপনাকে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। আপনার ভিটে-বাগান আমি পাহারা দেবো।

তুমি? তুমি আমার জন্য এসব করবে কেন কেরামত?

পাকিস্তানে হিন্দুদের বিপদ বেশি। আর মিলিটারি হিন্দু খুঁজে খুঁজে মারছে। ওরা যে কাফের।

মারবেই তো। এটা তো মুসলমানের দেশ।

আপনার ভয় করছে না দাদু?

ভয়তো করেই। ভয় করে আর কি করবো। ভগবান সহায়।

তাহলে আপনি যাবেন না?

না, না, যাওয়ার কথা আমাকে বলো না। এটা আমার চৌদ্দ পুরুষের ভিটে।

অ, আচ্ছা।

কেরামত হনহনিয়ে হেঁটে চলে যায়। নিখিল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওর কণ্ঠ স্বাভাবিক মনে হয়নি নিখিলের, এখন ওর চলে যাওয়া স্বাভাবিক মনে হয় না। এমন কি প্রখর রোদে ওর যে ছায়াটি পড়েছে সেটিও কেমন যেন, নিখিলের চোখে তা মানুষের ছায়া মনে হয় না। ও পথের ধারে বসে পড়ে। ওর শরীর কাঁপছে। ও বুঝে যায় বাজার পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ওর আর নেই। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম গাঁয়ের একটি ছেলে ওর সঙ্গে ভিন্ন কণ্ঠে কথা বললো। রাস্তার পাশের কাউফল গাছের নিচে গিয়ে বসে ও। বুকে-পিঠে ঘাম বয়ে যাচ্ছে, একটুখানি ছায়া দরকার। কতোক্ষণ বসেছিলো ও জানে না। হয়তো ওর ঝিমুনি এসেছিলো, হয়তো প্রবল ভয়ে ওর ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিলো। হয়তো দুশ্চিন্তার কারণে ও এক ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো বলে ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলো। ফলে পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের একটি ফাঁক তৈরি হয় ওর করোটিতে। ও দেখতে পায় পাখির মতো উড়ে আসছে মানুষ — ওদের পা মাটি স্পর্শ করছে না। এবং এ গাঁয়ের মানুষগুলো দৌড়ানো ভুলে গিয়ে উড়তে শিখেছে। ও ভালো করে চোখ খুলে তাকায়, এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। কেমন করে সম্ভব হলো? এতোক্ষণ ধরে যতোলোক ওর আশেপাশে দিয়ে হেঁটে বাজারে গিয়েছিলো তারাতো ফিরছেই, যারা বাজারের দোকানদার এবং এতোক্ষণ ধরে বাজারে ছিলো তারাও ফিরে আসছে। মানুষের এই ফিরে আসা নিখিল প্রবলভাবে উপভোগ করে। এমন একটি অলৌকিক দৃশ্য ওকে আনন্দ দেয়। ও দেখতে পায় সবার আগে কেরামত। ও হাত নেড়ে বলছে, দাদু পালান, মিলিটারি আসছে।

নিখিল কেরামতের কথা বুঝতে পারে না। কেরামতকে ও বিশ্বাসও করে না। ও ছেলেটিকে বুঝে গেছে। ওর ভেতরে প্যাঁচ এবং কুমতলব। এখন ও পালাচ্ছে। সুযোগ পেলে ও মিলিটারির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। এবং ওদের কাছ থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করবে। ও ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখতে পায় রাস্তার গর্তে পা পড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো কেরামত এবং ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়লো আরো কয়েকজন। ছোটখাটো জটলা তৈরি হয়ে গেলো ; কিন্তু মুহূর্ত সময় মাত্র। কেউ কেরামতকে টেনে তুললো না, যে যার মতো পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলো। যারা উল্টে পড়েছিলো তারা নিজেরা উঠলো। কেউ আর ছুটতে পারছে না, খোঁড়াচ্ছে। কেরামতের বোধহয় আঙুল কেটে গেছে। ও রাস্তার পাশে বসে আঙুলটা চেপে ধরে কোনো একটি পাতা চিবিয়ে রস লাগাচ্ছে। ওর উঠতে সময় লাগছে। ততোক্ষণে রাস্তা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। নিখিল দেখতে পায় কাঁচা রাস্তাটা ধূলায় ভরে গেছে, চারদিক কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন সাদা কুয়াশা ছড়িয়ে গেছে গ্রামটার চারদিক — এই গ্রামটাকে ও শৈশব থেকে দেখে আসছে, কিন্তু এমন সুন্দর হয়ে উঠতে কখনো দেখেনি। ওর মনে হয় চারপাশে এক অলৌকিক নিসর্গ। ওর যতোদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে থাকে, কিন্তু মিলিটারির কোনো চিহ্ন নেই।

৪

লোকটি এখন মেহেরপুরে।

ভবেরপাড়া হয়ে বৈদ্যনাথতলার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ও দ্রুত হাঁটছে। ও জানে একটুপরে ওখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে। ও সেই ঘটনার সাক্ষী হবে। ও খুব দ্রুত হেঁটে এসে বাংলাদেশের এই সীমান্ত চৌকির সামনে এসে দাঁড়ায়। ছোট্ট একটি দালান। সিমেন্টের মেঝে, ইটের দেয়াল, উপরে টিনের ছাদ। সামনের ফ্ল্যাগ স্ট্যাণ্ডে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। লোকটি প্রথমে উপরে তাকিয়ে মুহূর্ত মাত্র পতাকাটা দেখে। পরে চোখ বোঁজে। ওর মনে হয় কারা যেন গাইছে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে। ঘাস এখনো ভেজা। মাটিতে সোঁদা গন্ধ, যেন ধুলোর কণা নিয়ে কেউ পাউডারের মতো পাফ বুলিয়ে দিয়েছে মাটির শরীরে। গাছের সবুজের স্নিগ্ধতা তুলনাহীন। প্রতিটি পাতা বুঝি সদ্য হয়ে ওঠা কিশোরীর ঘুম-ভাঙা ধোয়া মুখ। কৌমার্যের সরল চাউনিতে অপলক তাকিয়ে থাকা। লোকটির মনে হয় প্রকৃতির ওই সবকিছুর ভেতর থেকেই গান ভেসে আসছে। প্রকৃতি স্বাগত জানাচ্ছে অবিনশ্বর সময়ের একটি অবিনশ্বর ঘটনাকে। ও নিজেও আমার সোনার বাংলা, গুণগুণ করতে করতে বলে, আহ্, কি মায়াবতী সময়। সারা জীবনের জন্য ঢুকে যাচ্ছে হৃদয়ের ভেতরে। ভরে দিচ্ছে প্রতিটি শূন্য কন্দর।

তখন সীমান্তের ওপার থেকে কয়েকটি এ্যাম্বাসেডর গাড়ি এগিয়ে আসতে থাকে। লোকটি একপাশে সরে দাঁড়ায়। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মাত্র সাতদিন আগে প্রবাসী সরকার গঠন করেছে। আজ তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং শপথ গ্রহণ। বিশ্বের মানুষের সামনে আবির্ভূত হবে স্বাধীনতাকামী একটি জাতির অস্তিত্ব। অস্থির আবেগে লোকটি কেঁপে ওঠে। বৈদ্যনাথতলার বিশাল আমবাগানে মানুষের ভিড়—সব বয়সী মানুষ। জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে মাতিয়ে তুলেছে আমবাগান। লোকটি লক্ষ করে আমবাগানের চারপাশে অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় কমাণ্ডোর সদস্যরা। যদি পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করে তাহলে তারা রক্ষাব্যূহ তৈরি করবে। লোকটি ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ওরা ওর দিকে একবার তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। লোকটি মৃদু হেসে হাত তোলে। ওরা নির্বিকার। পলকহীন তাকিয়ে আছে। এখন ওদের ডিউটি। সৌজন্য বিনিময়ের সময় নয়। লোকটি খুশি হয়ে মাথা নাড়ে। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

ভারতীয় সীমান্তের একশো গজের মধ্যে একটি চৌকি পেতে মঞ্চ করা হয়েছে। উপরে কয়েকটি টুল এবং চেয়ার পাতা। মঞ্চের সামনে বাঁশের মাথায় উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। লোকটি দেখতে পাচ্ছে একজন বিদেশি সাংবাদিক এক পা এক পা করে সীমান্ত এলাকা থেকে মঞ্চের দূরত্ব মাপছে। মেপে বললো, এ মঞ্চ সীমান্ত এলাকা থেকে একশ গজও হবেনা। সবার মুখে স্বস্তির হাসি। কারণ পাকিস্তান জঙ্গী বিমান চেষ্টা করলেও ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম না করে এখানে বোমা ফেলতে পারবে না।

তড়িঘড়ি অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। সবাই ব্যস্ত। এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা নিরাপদ নয়। লোকটি প্রত্যেকর গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে যায়। শুনতে পায় ওদের কথা।

ফিসফিস ধ্বনি। মেহেরপুরের এসডিও তৌফিকের কাছে এসে দাঁড়ায় ও। তৌফিকের কারো দিকে চোখ তুলে তাকানোর সময় নেই। ওর ঘাড়ে ঘামের স্রোত, কপালে ঘামের বিন্দু। পুরো হাত জামার উল্টো দিকে কখনো কপালের ঘাম মুছে নেয়া। পকেট থেকে রুমাল বের করাও বুঝি সময়ের অপচয়। উদ্বিগ্ন ও চারদিকে তাকায়। একসময় ঝিনাইদহের পুলিশ অফিসার মাহবুবকে কাছে পেয়ে বলে, কি করি বলতো?

মাহবুবের শান্ত কণ্ঠের জিজ্ঞাসা, কি হয়েছে?

প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর গার্ড অব অনার দিতে হবে। কিন্তু ওসমান ভাই এখনো এলেন না। কি হলো বুঝতে পারছি না। তাঁর কনটিনজেন্ট নিয়েই গার্ড অব অনার দেয়ার কথা ছিলো। এদিকে নেতাদেরকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা উচিত হবে না। গার্ড অব অনার না দিলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তাইতো। ভীষণ দুশ্চিন্তার কথা। মাহবুবও উদ্বিগ্ন হয়।

পরক্ষণে তৌফিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, মাহবুব তুই না হয় গার্ড অব অনার দেয়ার ব্যবস্থা কর। আমি জানি তুই পুলিশে এসব ট্রেনিং নিয়েছিস।

আমি? বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয় মাহবুব।

তুই পারবি আমি জানি। প্রতি সপ্তাহে তুই পুলিশের গার্ড পরিদর্শন করিস।

পারার কথা নয় তৌফিক। আমি নিশ্চয় পারবো। এতো বড় গৌরবের অংশীদার আমি হচ্ছি ভাবতেই আমার বুক কাঁপছে।

ডোন্ট বি নারভাস। যা রেডি হয়ে নে।

লোকটি মাহবুবের পিছু পিছু যায়। দেখে মাহবুব উপস্থিত পুলিশ-আনসার-ইপিআর-এর সদস্যদের ডেকে ফল ইন করায়। অ্যাটেনশন, স্ট্যাণ্ড এ্যাট ইজ করায়। সবাইকে ফল ইন করিয়ে অভিবাদন দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে ও। ওর শেষ কাজটি পতাকা নামানো। বাঁশের মাথার ওপর থেকে উড়ন্ত পতাকাটি নামায়। হঠাৎ মাহবুবের মনে হয় কেউ যেন ওর সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু ও সেই অনুভব গায়ে মাখে না। নিজেকেই বলে, আমি কি একা? আমি তো এখন হাজার মানুষ। পরক্ষণে ও অনুভব করে কেউ একজন ওর হাত হয়ে পতাকাটা মাটি থেকে দু-তিন ফুট উঁচুতে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রাখে। মাহবুব মুহূর্তে নিজের হাতের দিকে তাকায়। ঠিকই তো আছে। লোকটি মাহবুবের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। মাহবুবের মনে হয় কেউ যেন বলছে, মাহবুব আমি আছি তোর সঙ্গে। মাহবুব আবার নিজেকে বলে, থাকবিই তো। এখানে যারা আছে আমরা কেউ একা নই, হাজার।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পায় নেতারা আসছেন। তাঁরা সেই চৌকি পাতা মঞ্চে উঠলেন। মাইকে মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। ওর মনে হয় কণ্ঠস্বর তো নয়, এ হচ্ছে শব্দের অপূর্ব শিহরণ। বুঝতে পারে ওর বুকের ওপর বর্ম আঁটা হয়ে গেছে — সামনে ঢাল, হাতে সড়কিটা তুলে নিলেই হয়ে যায়। চারদিকে রণদামামা বাজছে। মাইকে বলা হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানের জেলে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ। একে একে ঘোষিত হচ্ছে অন্যদের নাম। লোকটি মঞ্চের এই অসাধারণ দৃশ্যের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। মঞ্চে এলো মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানী। সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেলো সবাই। তখন গর্জে ওঠে মাহবুবের কণ্ঠ,

অ্যাটেনশান। ওর পেছনে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা আনসার, পুলিশ, ইপিআর–এর সদস্যদের নিয়ে তৈরি হওয়া জওয়ানদের কমাণ্ড দিলো। পরবর্তী নির্দেশ সোল্ডার আর্মস। তারপর ও যখন প্রাণপণ শক্তিতে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে কমাণ্ড দিলো, প্রেজেন্ট আর্মস, তখন ওর মনে হলো ওর কণ্ঠ একটা নয়, আর একটি কণ্ঠ ওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর পেশীর ভার কিছুটা লাঘব করে দিলো। ও তেমন কোনো কষ্ট অনুভব করলো না। বুঝতে পারলো ওর পেছনের প্রতিটি রাইফেল প্রত্যেকের বুকের ছয় ইঞ্চি দূরত্বে — নলগুলো আকাশের দিকে উঠে আছে। সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে ওরা ঋজু এবং অনড়। মাহবুবের ডান হাত স্যালুট দেবার জন্য উঠে গেলো মাথার ডান পাশে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম এসে দাঁড়ালেন পতাকার সামনে। আস্তে আস্তে পতাকা উঠে যাচ্ছে উপরে। তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্থির দৃষ্টি — স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বপ্ন তাঁর দুচোখের দৃষ্টিতে। লোকটির মনে হলো ওর নিজের মাথার ওপরে প্রোথিত বাঁশে উড়ছে পতাকা। ওই পতাকা নিয়ে হেঁটে যাবে প্রতিটি ঘরে — প্রতিটি মানুষের কাছে। ও নিজের ভেতর ভীষণ চঞ্চলতা অনুভব করে।

গান গাইছে শিল্পীরা — আমার সোনার বাংলা। ওদের সঙ্গে গান গাইছে হাজারো মানুষ। পতাকা স্থির হয়ে গেলো বাঁশের মাথায়। একই সঙ্গে শেষ হলো জাতীয় সঙ্গীত। সঙ্গে সঙ্গে জয় বাংলা স্লোগান অযুত মানুষের কণ্ঠে। লোকটি হেঁটে যায় সেই মানুষের ভেতর দিয়ে। চারদিকে করতালি। কি অদ্ভুত শব্দ। শব্দ নয় যেন জলপ্রপাতের ধ্বনি। সেই ধ্বনির ভেতর দিয়ে আবার মাহবুবের কমাণ্ড, সোল্ডার আর্মস। রাইফেলগুলো নেমে যায় জওয়ানদের কাঁধের ওপর। মাহবুব হাত নামিয়ে দু'পা এগিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে স্যালুট দিয়ে বলে, গার্ড রেডি ফর ইন্সপেকশন স্যার।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ওর বাম পাশে এসে দাঁড়ায়। কি স্থির , অচঞ্চল, সৌম্য দেখাচ্ছে তাঁকে। কাঁধে রাইফেল নিয়ে জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে। যেন স্বাধীন দেশের স্বাধীন সৈনিক। গার্ড পরিদর্শন করেন তিনি। পেছনে প্রধান সেনাপতি। ধীর পায়ে এগোতে থাকেন। পরিদর্শন শেষে এগিয়ে যান মঞ্চের দিকে। মঞ্চে উঠে নিজের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালে মাহবুব সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট দিয়ে বলে, গার্ড রেডি ফর মার্চ পাস্ট স্যার।

তিনি সম্মতি প্রদান করেন।

কমাণ্ড দেয় মাহবুব, রাইট টার্ন, কুইক মার্চ।

গার্ড দল মার্চ করে মঞ্চের ডান দিকে চলে যায়। আবার মাহবুবের কণ্ঠে কমাণ্ড, ডিসমিস।

যে যার মতো বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে জনতার কাতারে মিশে যায়। লোকটির মনে হয় এমনই হওয়া উচিত। এমন সবাই মিলে মুক্তিযোদ্ধা। সবাই মিলে যুদ্ধ। সিভিল এবং মিলিটারি।

ততোক্ষণে কোরআন তেলওয়াত শুরু হয়েছে। তারপর বাইবেল, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ হয়। মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এর পরপরই তিনি পাঠ করলেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্মুহূ করতালিতে শব্দের দীর্ঘ লয়ে মর্মর ওঠে আমগাছের পাতায়। অযুত মানুষ নিজেদের বুকে কান পেতে শোনে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি। আর বুকে টানে সুবাতাস। বাহুর পেশী ফুলিয়ে নিজেকেই বলে, পারবো। লড়তে পারবো। জয় হবেই। জয় বাংলা।

তখন শুরু হয় ভাষণ। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ইংরেজিতে ভাষণ দিচ্ছেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠ। ক্রুদ্ধ উচ্চারণ। পৃথিবীর মানুষকে বলে দিতে চান স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অবিচল প্রত্যয়ের কথা। শেষে পর্যায়ে এসে বাংলায় বলেন, "এই যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি হানাদারদের হটাবোই। আমরা না পারলে আমাদের ছেলেরা হটাবে। তারা না পারলে তাদের ছেলেরা হটাবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবেই।"

এরপর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন। বক্তৃতা শেষে ঘোষণা দিলেন,' আজ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হবে এ বৈদ্যনাথতলা এবং এর নতুন নাম হবে মুজিবনগর।'

বক্তৃতা শেষে গান শুরু হয়। শিল্পীরা মনপ্রাণ ঢেলে গাইছে। লোকটি গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে। মুখোমুখি হয় মাহবুবের। মাহবুব ওকে দেখে চমকে ওঠে, তুই?

লোকটি মৃদু হাসে। বলে, চৌদ্দ তারিখে পাকিস্তান আর্মি যখন ঝিনাইদহ, ভেড়ামারা, গোয়ালন্দ আক্রমণ করে তোদের রক্ষাব্যূহ ভেঙে দিলো—

মাহবুব হতাশ কণ্ঠে বলে, তখন আমাদের পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না।

লোকটি মৃদু হেসে বলে, এখন?

এখন অস্ত্র-গোলাবারুদ চাই। যুদ্ধ করবো।

প্রধানমন্ত্রী তো বললেন সব ব্যবস্থা করবেন।

মাহবুব লোকটির হাত চেপে ধরে। পরক্ষণে দেখে ও নেই। ও নিজেই নিজের দু'হাত ধরে আছে। চৌকিতে খাবার দেয়া হয়েছে। কে একজন এসে ওর হাত ধরে বলে, মাহবুব ভাই খেতে আসেন।

মাহবুব নিজের অজান্তে চারদিকে তাকায়। কাকে যেন খোঁজে।

বিকেল হয়েছে। আমবাগান শূন্য। যেখানে চৌকিটা পাতা হয়েছিলো সেটা আর নেই। পতাকা ওড়ানোর জন্য পোঁতা বাঁশটাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শুধু চিহ্ন হিসেবে গর্তটি আছে। লোকটি হাত-পা ছড়িয়ে সেই চিহ্নের কাছে বসে। ওকে তো এই চিহ্ন নিয়ে যেতে হবে ঘরে ঘরে।

সন্ধ্যার আগেই গরু নিয়ে ঘরে ফেরার পথে একটি বালক ওর সামনে থমকে দাঁড়ায়। লোকটি হেসে বলে, কি রে কিছু বলবি?

আপনি কে?

মুক্তিযোদ্ধা।

ছেলেটি গরু ছেড়ে দিয়ে ওর মুখোমুখি বসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আমিও যুদ্ধ করবো।

তুইতো ছোট। পারবিনা।

আমার চৌদ্দ বছর বয়স হয়েছে। আমাকে আপনার সঙ্গে নেবেন?

হ্যাঁ, নেবো। আয়।

চলেন।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর বালকটি দেখলো ও গরু নিয়ে ঘরেই ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে লোকটি নেই।

তখন বালকটির মনে হয়, শুধু মাকে বলেই বাড়ি থেকে পালাবো আমি। যুদ্ধ করতে যদি

না পারি তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য তো করতে পারবো। ওদের ভাতের থালা এগিয়ে দেবো। বন্দুকের নল সাফ করে দেবো। কাউকে কোনো খবর পৌঁছাতে হলে সেটা করবো। ওরা আমাকে যা বলবে আমি সবকিছু করতে পারবো। শুধু মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে থাকতে চাই।

৫

যুদ্ধের খবরে বিচলিত বোধ করে কুলসুম। শব্দটা ওর কাছে নতুন। একটি নতুন শব্দ হুট করে গ্রহণ করা সহজ নয় — এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগ না থাকলে সেটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কুলসুম আকাশ-পাতাল হাতড়ে যুদ্ধের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। তার ওপরে সে শব্দে যদি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ওঠার কারণ থাকে তাহলেতো কথাই নেই। অথচ উঠোনে নবি আর রবি যখন দু'টো লাঠি নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ বলে চিৎকার করে তখন কুলসুম বোকার মতো ওদের দেখে। যেন ছেলেদু'টো সেই মিলিটারি হয়ে যায়, যাদের কথা গ্রামবাসীর মুখে মুখে। বলছে ঢাকার রাস্তায় মিলিটারি ট্যাঙ্ক নামিয়েছে। ট্যাঙ্ক গ্রামের কেউ দেখেনি। জানেও না সেটা কেমন। শুধু বোঝে ট্যাঙ্ক দিয়ে সবকিছু গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। পঁচিশের রাতে ঢাকা শহর গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিলিটারি — মেরে ফেলেছে সব মানুষকে।

কুলসুম কখনো ঢাকা যায়নি। ও নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়ালে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের ছোট্ট গ্রাম শংকর মাধবপুরের দিগন্তরেখা দেখতে পায়। ও আবদুস সোবহানের সঙ্গে দু'বার কুড়িগ্রাম গিয়েছিলো। কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে দক্ষিণে ওর গ্রামটি সড়ক-পথে, নদী-পথে এক লম্বা পাড়ি, পথ যেন ফুরোয় না। এই পথ পেরিয়ে কি মিলিটারি এখানে আসতে পারবে? বোধহয় না, কুলসুম নিজের মনে যুক্তি খোঁজে। খানিকটা ভরসাও পায়। আবারও আবদুস সোবহানের মুখ ভেসে ওঠে। যদি এই গাঁয়ে মিলিটারি আসে তাহলে কি গুঁড়িয়ে দেবে আবদুস সোবহানের এই ভিটেটি? মেরে ফেলবে গাঁয়ের সব মানুষকে? যুদ্ধ যদি এমনই হয় তাহলে এই যুদ্ধ করে লাভ কি? ভিটে ছাড়া, মানুষ ছাড়াতো খাঁ-খাঁ করবে চারদিক। এমন কি কোনো দেশ হয়? কেউ কেউ যে বলছে মিলিটারি যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়? তাহলে ওর লালভানু আর তারামনের কি হবে? ভাবতেই কুলসুম কুঁকড়ে যায়। ওর নির্ঘুম রাত দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

দিন গড়ায়। যুদ্ধের পরিস্থিতি জোরদার হয়ে ওঠার খবর আসে। শোনা যায় মিলিটারি এগিয়ে আসছে। যে কোনোদিন রৌমারী, রাজীবপুর, কোদালকাটিতে চলে আসতে পারে। গ্রামবাসী শঙ্কিত। অনেকে বাড়িঘর ছাড়ছে। ভারতের মেঘালয়ে শরণার্থী শিবির হয়েছে। সেখানে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাবে কুলসুম? একটুখানি ভিটে ফেলে রেখে গেলে যদি দখল হয়ে যায়? ওর এই আশঙ্কার কথা শুনে বেণুর মা বলে, জান না বাঁচলে ভিটে দিয়ে কি হবে? কিন্তু আবদুস সোবহানের কথা মনে পড়লে ভিটেটুকু ভীষণ প্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষটার শেষ

সম্বল। ঘরের পেছনে কবর আছে। নিরুপায় কুলসুম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ভাবে, ছেলেমেয়েদের অন্যদের সঙ্গে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আগলে রাখবে ভিটে। কিন্তু তারামনের সাফ জবাব, আপনাকে রেখে আমরা যাবো না। মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরবো।

লালভানু শুকনো মুখে বিড়বিড় করে বলে, আমাদের দু'বোনকে যদি মিলিটারি ধরে নিয়ে যায়?

পারবে না।

কেন?

তারামন অবজ্ঞার স্বরে বলে, মিলিটারি এতো বড় ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এ পাড়ে আসতেই পারবে না।

ঠিক বলেছিস মা।

কুলসুম ওর বিশ্বাসের একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। যেন ও এমন মানুষ খুঁজে পেতে চায় যে ওকে বলবে, ভয় নেই। যুদ্ধে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি আছি তোমার জন্যে। তারামনও দু'হাতে মাকে বেড় দিয়ে ধরে।

লালভানু রেগে দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে, ও যেন একটা ফেরেশতা। যা বললো তাই আপনি বিশ্বাস করলেন আম্মা?

তারামন খিলখিলিয়ে হেসে বলে,আমিতো একটা কথার কথা বললাম। সত্যি হলেও হতে পারে। নাও পারে। কে জানে।

তোর কথার কথাটা যেন সত্যি হয় মা। তাহলেতো আমরা বেঁচে যাই।

আমার তো মনে হয় যুদ্ধ আসুক আমাদের গাঁয়ে। আমরা কি যুদ্ধ দেখবো না?

লালভানু মুখ ঝামটা দেয়, ছুঁড়ির কেবল লাফানি।

তারামন মাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে। কুলসুম দ্বিধান্বিত কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ করে, কে জানে আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

তারামন আবারো হাসিতে ভেঙে পড়ে বলে, আমাদের ভাগ্যে ঘোড়ার ডিম। বড় বড় ডিম। আয় রবি ডিম নিয়ে হাটে যাই। ডিম বেচে বন্দুক কিনবো। যুদ্ধ করবো।

যুদ্ধ,যুদ্ধ।

ছোট দু'ভাই লাফাতে লাফাতে তারামনের হাত ধরে উঠোনে নেমে যায়। তিনজনে হাত ধরাধরি করে ঘোরে আর সুর করে বলতে থাকে, ঘোড়ার ডিম বেঁচে বন্দুক কিনবো, যুদ্ধ করবো।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে লালভানু আর কুলসুম তো অবাক। মেয়েটা এই একরকম তো ওই আর একরকম। মাঝে মাঝে কথা শুনলে মনে হয় আদ্যিকালের বুড়ি। বয়সে শিখেছে অনেক কিছু — সে সব কথাই গলগল করে বলে যায়। কখনো বালিকা, যেন খেলা ছাড়া কিছু জানে না। খেলার বাইরে আরো কিছু শিখতে হবে এমন বোধই হয়নি। মা ও বড় বোনের সামনে মেয়েটি তার অপার রহস্য নিয়ে কলকল করছে, যেন বিশাল ব্রহ্মপুত্র। বোঝা যায় না তার রহস্য — কি কৌশলে পাড় ভাঙে, কি কৌশলে ছোটে — কোথায় তার তল, কোথায় তার সীমা — কুলসুম আর লালভানুর সাধ্য কি তাকে বোঝার। দুজনে বুঝি শুধু শিশুদের খেলা দেখতেই মগ্ন। ভুলে যায় যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা।

কিন্তু সে বড় সাময়িক ভোলা। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত কুলসুমকে ভিটে ছাড়তে হয়। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ে আসতে না পেরে পাকিস্তান মিলিটারি নদীর পশ্চিম পাড়ের চিলমারিতে ঘাঁটি করেছে। দুই কোম্পানি নিয়মিত সৈন্য আর দুই কোম্পানি মিলিশিয়া সেখানে অবস্থান করছে। মুক্তিযোদ্ধারা রৌমারী—রাজীবপুর মুক্ত এলাকায় ট্রেনিং ক্যাম্প করে। নদীর চরের বিভিন্ন গ্রামের বাড়িঘর ছেড়ে চলে এসেছে যারা তাদেরও থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামবাসী প্রবল উৎসাহে যুদ্ধ করার মনোবল নিয়ে নিজেদের তেরি করছে। নদীর পাড় বরাবর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিফেন্স লাইন গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন খবর আসে। নানারকম খবর, কখনো পল্লবিত হয়ে। জোয়ান ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চলে যাচ্ছে। সবার চোখেমুখে স্বপ্ন। যুদ্ধ করবে, দেশ স্বাধীন হবে। অনেকেই কুলসুমকে গ্রাম ছেড়ে যেতে উপদেশ দিয়েছে। গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু গুটিকয়েক বুড়োবুড়ি ভিটে দেখার জন্য রয়ে গেছে। এদেরই একজনকে ভিটে দেখার কথা বলে সাতসকালে বাড়ি ছেড়েছে কুলসুম, যেন বেলাবেলি পৌঁছে যেতে পারে রাজীবপুর ঘাটে। পরিবারটি গ্রামের সীমানায় এসে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামে। লালভানু প্রশ্ন করে, আম্মা আমরা কোথায় যাবো?

তারামনের ঝটপট জবাব, আমরা সোজা আজিজ মাস্টারের বাড়িতে যাবো। ঐ বাড়িটাইতো এখন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প।

কুলসুমও নিশ্চিত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, মাস্টারের বাড়িতেই যাবো। মাস্টারই আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

লালভানুর গলা শুকিয়ে যায়, ওখানে তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। যদি আমরা মরে যাই আম্মা? যদি —

থাক, আর যদি যদি করতে হবে না। মরলে মরবো। একদিন তো মরতেই হবে। আব্বা মরে যায়নি।

তারামন ঝাঁঝালো কণ্ঠে লালভানুকে আক্রমণ করে।

আব্বাতো গুলি খেয়ে মরেনি। আব্বাতো যুদ্ধ দেখেনি।

আমি জানি আব্বা যুদ্ধ করে মরতে পারলে খুশি হতেন। আজ আব্বা থাকলে আমি আব্বাকে বলতাম, আব্বা চলেন আমরা যুদ্ধ করি। বলতে বলতে তারামনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন ও ইচ্ছে করলেই ব্রহ্মপুত্র নদীটা হেঁটেই পার হতে পারবে। ওর পায়ের স্পর্শে পানিই পথ হয়ে যাবে। কিন্তু লালভানু কিছু দেখতে পায় না। তারামনকে অবজ্ঞা করে বলে, মেয়েমানুষ আবার যুদ্ধ করবে কি? ছুঁড়ির যতো আজগুবি চিন্তা। মাথাটা খেয়ে বসে আছে।

তারামন ওর কথায় কান দেয় না। লালভানু এমনই। খুব সাধারণ, না বুঝেই বলে। বোঝার চেষ্টাও নেই। তারামন নিজের ভেতরে একটা কিছু বুনতে বুনতে মাকে তাগাদা দেয়, আম্মা চলেন।

পরিবারটি আবার ওঠে। সবার মুড়ি আর পানি খাওয়া শেষ হয়েছে। আরো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। কাপড়ের বড় পোটলাটা এতোক্ষণ কুলসুমের কাছে ছিলো। এবার তারামন ওটা নিজের মাথায় উঠিয়ে নেয়। ওরা দেখতে পায় সামনে-পেছনে এমন পরিবার আরো আছে। সবাই সুবিধে মতো জায়গায় চলে যাচ্ছে। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

কোদালকাঠি, নয়তো মদনের চর, নয়তো সাজাই।

কেউ জানে না ওখানে গিয়ে তারা বাঁচতে পারবে কিনা। শুধু বুঝতে পারে যাওয়াটা সত্যি। যেতে যেতে কোথাও গিয়ে থামতে হবে। আশ্রয় নিতে হবে। আর যারা লড়বে বলে চলে গেছে সেটা অনেক গৌরবের যাওয়া। গাঁয়ের সবাই এটুকু সত্যিটুকু বুঝে নিয়ে নিজেদের গন্তব্য ঠিক করে নিতে পেরেছে। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কুলসুমের পরিবার আবার যেন দ্রুত পা চালাতে পারছে। রবি নবিরও কোনো ক্লান্তি নেই। কখনো ছুটে পথের পাশে ফড়িং ধরতে যায়। তারামন একটা বুনোফুল ছিঁড়ে লালভানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, খোঁপায় পরেন বুবু।

ছুঁড়ির রঙের শেষ নাই। আমি ভয়ে মরি। কোথায় যাচ্ছি, কি হবে —

তারামন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, আপনাকে না বলেছি কি হবে ভাববেন না। ফুলটা খোঁপায় পরলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখাবে বুবু। নেন পরেন।

আম্মা ওরে রঙ–তামাশা করতে মানা করেন।

ওতো ঠিকই করেছে। যুদ্ধের সময় রঙ–তামাশা করতে পারলে মন ভালো থাকে। মরণের ভয় কমে যায়। তুই ফুলটা খোঁপায় পর লালভানু। আর একটা ছিঁড়ে তারামনের খোঁপায় পরিয়ে দে।

লালভানু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। সেদিনের ঘটনার পর থেকে কুলসুম প্রতিটি কথায় তারামনকে সমর্থন দেয়,যেন ও একটা পীর, যা বলে তাই ঠিক। মা ওর কথায় পাত্তাই দেয় না। ওর ভীষণ রাগ হয়। তারামনের হাত থেকে ফুলটা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে। তারামন মৃদু হেসে জোর পায়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে যায়। দেখতে পায় পেছন থেকে আসা অচেনা একদল মানুষ ওদের সঙ্গে হাঁটছে কিংবা সামনে এগিয়ে যাওয়া কেউ দাঁড়িয়ে পড়লে পেছনের লোকেরা এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গ ধরে। এভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে। এভাবে এগুতে এগুতে বেশ একটা বড় দল গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই বয়স্ক মানুষ, নারী, শিশু–কিশোর। বয়স্করা উৎকণ্ঠিত, ভীত। তারচেয়ে কম বয়সী কেউ কেউ সাহসী — অন্যদের যুদ্ধের গল্প বলে সাহস জোগাচ্ছে। যদিও সে নিজে কখনো যুদ্ধ দেখেনি। এদের সবার কাছে যুদ্ধ একটা রূপকথা। দাদীর মুখে শোনা — অনেকেই এই রূপকথা বানাতে পারে, ইচ্ছেমাফিক হাতিঘোড়ার সংখ্যা–রাজাউজির, তীরধনুক, পঙ্খীরাজ, আরো কত কি। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনায় যুদ্ধ এক একরকম হয়ে ওঠে। অনেকটা পথ হেঁটে বিশ্রামের জন্য থামলে তারামন মাথা গুণতে শুরু করে। গোণা শেষে চেঁচিয়ে বলে, সব মিলে আমরা দুই কুড়ি নয় জন।

একজন বৃদ্ধ ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, তাতে হলো কি? তুই এতো খুশি কেন?

এতো মানুষ একসঙ্গে হয়েছি তাইতো আমি খুশি। যুদ্ধ শুরু না হলে আপনার সঙ্গে কি আমার দেখা হতো দাদা? আমি এমন দাদা কোথায় পেতাম? আমার তো দাদা নাই। বাপও নাই।

বৃদ্ধ তারামনকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

কার মেয়েরে তুই? তোর বাপের নাম কি?

আবদুস সোবহান।

কি করতো?

দিনমজুরি। ওই যে আমার মা। ভিটে ছেড়ে আসতে চায়নি। কিন্তু না এসে করবে কি?

যুদ্ধ যে।

কুলসুম মাথায় ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে বসে। সে কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলো যে এতো লোকের সঙ্গে এই যাত্রায় তাকে পথ হাঁটতে হবে? সে তো কমই বাড়ির বের হয়েছে। পথঘাট চেনে না। আবদুস সোবহান ছাড়া কোনোদিন কিছু বোঝে নি। এখন বেশ তো যাচ্ছে, নিজে নিজেই পথ খুঁজে নিতে পারছে। তারামন মায়ের মাথার ঘোমটাটা ফেলে দিয়ে বলে, ঘোমটা দিতে হবে না আম্মা। চলেন মুড়ি খাবেন।

একজন সবাইকে মুড়ি দিচ্ছে। সঙ্গে পাটালি গুড়। কে এনেছে তার ঠিক নেই। সবাই মিলেমিশে খাচ্ছে। আর এক বেলা খেতে পারবে কিনা সে ভাবনাও কারো নেই। এখন এই মুহূর্তের খাওয়াটাই সত্য। কেউ কেউ এলুমিনিয়ামের কলসি নিয়ে আশেপাশের নিচু জমি থেকে টলটলে পানি নিয়ে আসছে। আঁজলা ভরে খাচ্ছে সবাই। তারামন ছুটোছুটি করে সবাইকে মুড়ি-গুড় দিচ্ছে। আঁচলে করে মুড়ি এনে বুড়োর কোঁচড়ে ঢেলে দেয়, দাদু খান। বৃদ্ধের চোখ চকচক করে ওঠে, তুই আমার আর জনমের কেউ ছিলি রে। নইলে এমন টান লাগে কেন?

ছিলামইতো, সেটা কি আর মিথ্যা। সামনে যদি আর একটা জন্ম থাকে তাহলে সে জনমেও আপনার নাতনী হবো। ছাড়বো না।

বৃদ্ধের চোখ ছলছল করে, তোর মতন নাতনী পেলে আমার জীবন ধন্য হবে।

সত্যি? কি মজা। দাদা আপনাকে আমি মুড়ি খাইয়ে দেই।

তারামন একমুঠি মুড়ি বৃদ্ধের মুখে পুরে দেয়। খানিকটা খাওয়াবার পর ও বাচ্চার কান্না শুনে উঠে দৌড় দেয়। কোলে তুলে নেয়। দোলাতে দোলাতে বলে, সোনা আমার, চাঁদ আমার কাঁদে না।

নবি ছুটে আসে, বুবু ও কি বল খেলতে পারবে? আমার কোলে দেন?

শুধু বল খেলা? ওতো যুদ্ধও করতে পারবে। আমি মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের বলবো, আপনারা ওকে একটা বন্দুক দেন। তাহলেই ওর কান্না থামবে। সোনা, ঠিক বলিনি?

ও কি আপনার কথা বুঝতে পারে?

পারে।

যাহ্, মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা হবে কেন, দেখেছিস না কান্না থেমে গেছে।

তারামন শিশুটিকে উপরে তুলে নাচায়, দোলায়। তারপর ওকে ওর মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে সবার মাঝে বসে মুড়ি খায়। লালভানু ঠাণ্ডা গলায় বলে, এটা কি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হলো? খেলাটি কি নতুন শিখলি?

নতুনইতো। এমন করে খেলার সময় তো আগে পাইনি বুবু। আপনি বলেন এর আগে আমরা কি এতো মানুষ একসঙ্গে কোথাও যাবার জন্য পথে নেমেছিলাম? সবই তো অন্যরকম।

এ দলের ভেতরে যারা বুঝতে পারার মানুষ তারা সবাই একসঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি মুখ নিচু করে মুড়ি চিবুচ্ছে, কিন্তু ওর ভেতরে ওলোটপালট ভাবনা। অনবরত ভেঙে ভেঙে নতুন ভাবনার চর জাগছে। মেয়েটি কি ব্রহ্মপুত্র হয়ে গেছে? বিশাল, গভীর? সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। একে অপরের দিকে তাকায়। লালভানুর মনে হয় এতোদিন ধরে

দেখে আসা এই ছোট বোনটি বড় দ্রুত নিজেকে বদলাতে পেরেছে। ও পারেনি। পারছেনা। উল্টো ওর কাছ থেকে একটা না একটা নতুন কিছু শিখছে। সেই নতুন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ওর বড় সময় লাগে নিজেকে গুছিয়ে তুলতে। তারামন কিভাবে এতোকিছু বুঝতে পারে? স্কুলে তো যায়নি। আল্লাহ কি ওকে আলাদা করে দেখার জন্য ওর ভেতরে আর একটি চোখ দিয়েছে? কোথায় সেই চোখটি? এর মধ্যে বাচ্চাদের কেউ কেউ পানি খেতে চায়। সব কলসি শূন্য। পানি আনা দরকার। তারামন দ্রুত শূন্য কলসি উঠিয়ে নেয়।

চলেন বুবু পানি নিয়ে আসি। দুধের শিশুরা পানি চায়।

তুই যা। লালভানুর রাগ হয়। ও বুঝতে পারে হিংসায় ওর বুকের ভেতরটা পুড়ছে। ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারামন মিনতির স্বরে বলে, চলেন না বুবু।

লালভানু ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বললাম না তুই যা। তুই তো একটা নেতা হয়েছিস। জয় বাংলার নেতা। এখন থেকে তোকে আমরা বঙ্গবন্ধু ডাকবো।

ওপাশ থেকে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে, বড় খাঁটি কথা বলেছিস রে। ওতো এখন আমাদের নেতাই। অচেনা মানুষের এক হয়ে যাওয়া দলটির মনে হয় আকাশ থেকে ঢোল কলমি ফুল ঝরছে। গাঢ় বেগুনি রঙে ভরে উঠেছে প্রান্তর। ফুলের ভেতরে ডুবে যায় তারামন।

ও তখন কলসি নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। জয় বাংলার নেতা? কথাটা তারামনকে চমকিত করে। ভাবতেই ও শিহরিত হয়। নেতা হওয়ার ধারণা নিয়ে ও জলাভূমির কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় এতোক্ষণ ধরে পানি নেয়ার ফলে পানি ঘোলা হয়ে গেছে। বাচ্চারা খেলে পেটের অসুখ হবে। এ-সময় কারো অসুখ হওয়া চলবে না। ও কলসি নিয়ে হাঁটতে থাকে। পরিষ্কার পানি খোঁজে। একসময় টলটলে পানির ধারে এসে দাঁড়ায়। ও পানির মধ্যে নিজের মুখটা দেখার চেষ্টা করে। ও বুঝতে পারে যে লালভানু ওকে সহ্য করতে পারছে না। ওর পেছনে লেগে আছে। কিন্তু নিজের অজান্তে একটা সত্য কথা বলে ফেলেছে। সময়টাতো জয়বাংলার সময়। এই শব্দটা নিয়েই তো মানুষ এক হয়েছে। সবাই মিলে জয়বাংলার সময় নামে এক কঠিন সময় তৈরি করেছে নিজেদের জন্যে। এতোসব অচেনা মানুষের নেতা হওয়া কি সহজ কথা? তারামন পানিতে কলসি ডোবায়। ঢেউ ওঠে জলে। জলের ভেতরে হারিয়ে যায় ওর নিজের ছবি। তারামন জলভরা কলসিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভাবে, আমি তো একা নই। আমরা সবাই। কেন আমার একার চেহারা জল ধরে রাখবে? কিন্তু দাদা যে বললো, আমাকে বঙ্গবন্ধু ডাকবে। হ্যাঁ, আমি নেতা হবো। তারামন চেঁচিয়ে নিজেকে বলে। পানি তুই সবখানে চলে যা, সবাইকে বলে দে তারামন নেতা হতে চায়। ফড়িং তুই সবখানে উড়ে যা, সবাইকে বলে দে তারামন নেতা হতে চায়। বাতাস, আমি নেতা হবো। তুই আমাকে উড়িয়ে সবখানে নিয়ে যা। সব গাঁয়ে। সব মানুষের ঘরে ঘরে। তারামনের মনে হয় উত্তেজনায় ওর ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। ও একছুটে সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু ভরা কলসি নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় উল্টে পড়ে গেলে মাটিতে গড়িয়ে যায় পানি। পায়ে ব্যথা পেয়েছে ও। কনুই কেটে গেছে। তাতে কি, দ্রুত উঠে বসে। ও আবার জলের ধারে বসে কলসি ভরায়। ও এখন শান্ত। নিজেকে ধমক দিয়েছে। অমন হুট করে দৌড় দেওয়া ঠিক হয়নি। ও এবার ধীরে সুস্থে জলের ধারে বসে কলসি ভরায়। একগাদা কলমি ফুল ছিঁড়ে কোঁচড় ভর্তি করে। তারপর জলভরা কলসি সবার সামনে রেখে বলে, আয় কে কে পানি খাবি? সব ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরে। যারা পানি খেতে চায়নি, তারাও। ওদের পানি

খাওয়া হলে ও সবাইকে ফুল দেয়। প্রথমে লালভানুকে, কারণ লালভানু ওর শত্রুপক্ষ। তারপর একে একে অন্যদের। তারপর কুলসুমকে। এবং শেষ ফুলটি বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ ওকে কাছে বসিয়ে বলে, বুঝেছি কেন আমাকে ফুল দিয়েছিস।

আমি বুঝিনি। বলেন তো কেন দিয়েছি?

অন্য আর একদিন বলবো।

কোনদিন?

যেদিন যুদ্ধ থেমে যাবে সেদিন।

আপনার সঙ্গে যদি আমার আর দেখা না হয় দাদা?

বৃদ্ধ চুপ করে থাকে। এখন তো এক অনিশ্চিত সময় বুকে নিয়ে সবার বেঁচে থাকা। দেখা তো নাও হতে পারে। আর কিছুক্ষণ পর কে কোনদিকে চলে যাবে কেউ জানে না। কে বেঁচে থাকবে সেটাও একটা প্রশ্ন। যুদ্ধ নিজের মুঠিতে নিয়ে নিয়েছে ওদের ভবিষ্যত।

দাদা? তারামনের কোমল কণ্ঠ বৃদ্ধের কর্ণকুহর শ্রুতিমধুর করে তোলে। বৃদ্ধ ওর দিকে ফুলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমার ফুলটা আমি তোকেই দিলাম রে মেয়ে। আমি তোকে দোয়া করি। যদি আর কোনোদিন দেখা না হয় শুধু মনে করবি একজন মানুষ তোকে বঙ্গবন্ধু ডেকেছে।

তারামন বৃদ্ধের পা ধরে সালাম করে। ওপাশ থেকে লালভানু খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসির শব্দ সবার কানে লাগে। সেটা শ্রুতিমধুর নয়।

ছুঁড়ির যতো ঢঙ।

আমি তো আপনাকেও ফুল দিয়েছি বুবু। দেখেন না এতোগুলো ফুল এই জায়গাটাকে কতো সুন্দর করে দিয়েছে।

কুলসুম আনন্দে মাথা নাড়ে। এতোক্ষণ ম্রিয়মাণ হয়ে থাকা ভাবটা তার ভেতর থেকে চলে যায়। বলে, ঠিকই বলেছিস মাগো।

হ্যাঁ, ও যা বলবে তাতো সবই ঠিক হবে।

লালভানুর আবার ব্যঙ্গোক্তি। কেউ ওর কথা গায়ে মাখে না। কুলসুম ওর বয়সী মহিলাদের বলে, আসেন আমরা ফুলটা খোঁপায় পরি।

সবার মাথা থেকে ঘোমটা পড়ে যায়। সবার মাথার মধ্যে মুকুটের মতো ফুল শোভা পায়। গাঢ় উজ্জ্বল বেগুনি রঙের দ্যুতি খোলা আকাশের নিচে বসে থাকা মানুষের ভেতরটা শুধু রঙিন করে না, যেন রঙ বাতাসে, মেঘে — রঙধনু হয়ে ফুটে উঠেছে দিগন্তরেখায়। তারামন হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে, কি সুন্দর, কি সুন্দর।

বৃদ্ধ সবাইকে তাড়া দেয়, এবার আমাদের যেতে হবে। ওঠো সবাই।

আবার যাত্রা। বিভিন্নমুখী গন্তব্য। দলছুট হয়ে যায় অনেকে। পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কেউ কেউ চোখ মোছে। মহিলারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।

আবার কি দেখা হবে?

আমরা কতোজন মানুষ কতোক্ষণ ধরে একসঙ্গে ছিলাম।

আমরা বড় ভালো সময় কাটিয়েছি

তোকে দোয়া করি তারামন।

তুই বেঁচে থাক মা।

তারামনের বুকের ভেতর দুঃখের শব্দ হয়। কেউ যেন ভেতরে বসে বলছে, হ্যাঁ বেঁচে তো থাকবোই। মানুষের বাসায় কাজ করে।

একই সঙ্গে এই উপলব্ধি কুলসুমেরও হয়, আবার মেয়েটিকে কারো বাসায় কাজে লাগাতে হবে। নইলে খাবে কি?

একই সঙ্গে এই উপলব্ধি লালভানুরও হয়, আবারও তো ওকে কারো বাসায় কাজে ঢুকতে হবে। কিন্তু এবার ও তারামনকে ব্যঙ্গ করে না। এখন ও আর তারামন সমান সমান অবস্থায় এসেছে। তারামন কাজের মেয়ে, ও নিজেও কাজের মেয়ে। তবু বুকটা খচ্‌ করে ওঠে। কোথায় যেন তারামন খানিকটা আলাদা। ওর ভেতরে অন্যকিছু আছে — বুঝতে পারে, বলতে পারে। যেটা লালভানু পারে না। অথচ দুজনের কেউইতো স্কুলে যায়নি। কেমন করে ও আলাদা হলো? কি আছে ওর ভেতরে? আমিও তা পেতে চাই। ভাবনা লালভানুর বুকের ভেতর খামচে ধরে। সেটা জ্বালা, হিংসা, আক্রোশ হয়ে ওকে বিষণ্ন করে দেয়। ওর চোখে পানি আসে।

মানুষগুলো আবার দলছুট হয়েছে। কেউ এগিয়ে গেছে, কেউ পিছিয়ে পড়েছে, কুলসুম রবি আর নবির হাত ধরে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। লালভানু আরো পেছনে। তারামন একাই অনেক সামনে। ও আবার উল্টো হেঁটে এসে লালভানুর হাত ধরে।

বুবু? কি হয়েছে?

লালভানু আঁচলে চোখ মুছলে তারামন অবাক হয়। আবার বলে, কি হয়েছে?

আমার স্বামীর কথা মনে হয়েছে।

তারামন ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় বলে, স্বামী?

কতোদিন দেখি নাই তারে।

কানতে হবে না বুবু। রাজীবপুর ঘাট থেকে তো আপনার স্বামীর বাড়ি কাছে। যাবেন।

তুই যাবি আমার সাথে?

তারামন চুপ করে থাকে। মুহূর্তে ওর লালভানুর ওপর রাগ হয়। কিন্তু প্রকাশ করে না। কারণ লালভানুর কান্নার বেগ বেড়েছে। ও প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয়। তারামন নিঃশব্দে লালভানুর হাত ছেড়ে দেয়। দেখতে পায় কুলসুম ওদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ও দৌড়ে গিয়ে মায়ের হাত ধরে বলে, আম্মা চলেন। আমরাতো এইদিকে যাবো, না?

কুলসুম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিকে চলে যেতে থাকে বিভিন্ন পরিবার। কুলসুম যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজিজ মাস্টারের বাড়িতে পৌঁছে তখন ওরা পথশ্রমে ক্লান্ত। মাস্টারের বউ ওদের বসার জন্য বারান্দায় মাদুর পেতে দেয়। আজিজ মাস্টার তারামনের দিক তাকিয়ে বলে, কোন গ্রাম থেকে এসেছো গো?

শঙ্কর মাধবপুর।

ভালো। বিশ্রাম নাও। ভাত খাও।

বাড়ি ভর্তি লোক। বিভিন্ন দিক থেকে এসে এ-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। গমগম করছে বাড়ি। তারামনের মনে হয় হাজার হাজার মৌমাছি গুঞ্জন করছে। এরা সবাই বুঝি মধু সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। বড় একটা মৌচাক বানাবে। তাহলে কি এই বাড়িটির ওপর মধুর মতো পবিত্র জিনিস তৈরি হবে। সেই মধুটা কি? কেমন? আজিজ মাস্টার কি এর উত্তর ওকে বলে দিতে পারবে? ওর দৃষ্টি মাস্টারের পিছু পিছু ঘোরে। উঠোনে সারি করে বসা লোকদের ভাত

বেড়ে দিচ্ছে মাস্টার। অনেকে খাচ্ছে। বাকিরা অপেক্ষা করছে। আরেক হাঁড়ি ভাত নামলে ওরা বসবে। উঠোনের এক কোণায় বড় হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে। সঙ্গে বুটের ডাল। অমৃতের স্বাদ নিয়ে খাচ্ছে মানুষ। তারামনের আবার মনে হয় প্রতিটি মানুষের বুকভরা মধু। দূর-দূরান্ত গাঁ থেকে বয়ে নিয়ে এসেছে। তারামন ছটফট করে ওঠে। কুলসুম ওর হাত চেপে ধরে, বস।

আজিজ মাস্টারের বউ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, তুই আমার সঙ্গে আয়।

রান্নাঘর থেকে জগভর্তি পানি আর একটা গ্লাস দিয়ে বলে, তোর মাকে পানি খেতে দে।

পানি না মধু?

মধু? আজিজ মাস্টারের বউ ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

তারপর হেসে বলে, তুই বড় সেয়ানা মেয়ে রে। এখন সবার কাছে পানিই মধু।

তারামন পানি নিয়ে মায়ের কাছে আসতে আসতে ভাবে, এ মধু সে মধু নয়। এ মধুর অন্য রকম মানে আছে। সেটার অর্থ ওর কাছে ঝাপসা। কিছু একটা প্রথম আলোর মতো ফুটে উঠতে চায়, কিন্তু আবার আড়াল হয়। তারামন প্রাণপণ চেষ্টায় সে আড়ালটুকু সরাতে চায়, পারে না। মনে হয় আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে — নদীটা পার হতে পারলে কিংবা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেলে ওর সামনে থেকে সব আবরণ সরে যাবে। ও দেখতে পাবে। কি? তারামন আপন মনে হেসে একগ্লাস পানি মায়ের দিকে এগিয়ে দেয়। পানি খেয়ে তারামন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। লালভানুও পানি খায়। তারামন দেখে রবি-নবি ভাতের হাঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে একমনে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভাত দেখে। তারামন পানি নিয়ে ওদের কাছে যায়।

রবি নবি করুণ চোখে তাকায়, বুবু শুধু পানি?

এক গ্লাস খা। দেখবি খিদে কমে গেছে।

ওরা দু'জনে প্রবলভাবে মাথা নাড়ে, না, পানি খাবো না।

ভাত তো হয়নি। হলে তো দেবে।

ওদের মতো আমার কলাপাতায় ভাত খেতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে।

আমারও।

আর কলাপাতা কি আছে?

চল আমরা খুঁজে দেখি।

তারামন দু'ভাইয়ের হাত ধরে এগোয়। রান্নাঘরের পেছনে কলা গাছের ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পাতা কাটতে কাটতে গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে গেছে। অনেক ওপরে কচি পাতাগুলো ঠিকমতো সবুজ হয়ে ওঠেনি। ওগুলো ওদের নাগালের বাইরে। তারামন ঘাড় কাত করে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রবি ওর হাত ধরে টান দেয়, কি দেখেন বুবু?

আয় একটা বাজী ধরি।

বাজী?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা যুদ্ধে জেতার আগেই ওই ওপরের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ হবে।

মোটেই না।

যদি সত্যি হয়?

তাহলে সবচেয়ে বড় একটা পুঁটি মাছ ধরবো।

দু'ভাই হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।

ঠিক আছে, পুঁটি মাছই সই।

কিন্তু যদি না জিতি?

তারামন ওদের কথার জবাব দেয় না। নিজে নিজেই বলে, যুদ্ধে জেতার আগেই ওই কচি পাতাগুলো গাঢ় সবুজ হবে। নেমে আসবে আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে। আমরা ছিঁড়ে নিয়ে ভাত খেতে পারবো।

রবি–নবি রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কেবল নিজে নিজে কথা বলেন। এখন পাতা নেই তো কি সে ভাত খাবো? খিদেয় আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে। ওহ্, মাগো।

শোন, আমাদের জন্য ভাত থাকলে পাতাও থাকবে। চল খুঁজে দেখি।

কিন্তু খুঁজতে হয় না তারামনের। উঠোনে এগিয়ে যেতেই দেখে আগের দলের খাওয়া শেষ। পরের দলের জন্য পাতা বিছানো হচ্ছে। আগেই কেটে রাখা হয়েছিলো। রবি–নবি দৌড়ে গিয়ে খেতে বসে। তারামন ওদের পাতা নিজের ওড়নায় মুছে দিতে দিতে বলে, দেখলি তো আমরা যুদ্ধে জিতেছি।

দু'ভাই অবাক হয়ে বুবুকে দেখে। আসলে যুদ্ধে জেতা কি ওরা তো তা জানে না। বুবুটা কেমন করে যেন অনেক কিছু বুঝতে পারে। ওর ভীষণ বুদ্ধি। এর মধ্যে ওদের কলাপাতায় ভাত আর বুটের ডাল দেয়া হয়। দু'ভাই খেতে শুরু করে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দুজনের চোখ। দুজনে একই সঙ্গে মুখভরা ভাত নিয়ে চকচকে চোখে তারামনের দিকে তাকায়। তারামনের মনে হয় কি সুন্দর দৃশ্য। যুদ্ধে জেতার আনন্দই এমন। ওর নিজেরও ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু সেকথা কাউকে বলতে পারে না। উল্টো রবি–নবিকে বলে, আমরা যুদ্ধে জিতে যাবো রে।

এতো তাড়াতাড়ি কি কচি পাতাগুলো সবুজ হবে?

সেগুলো তো সবুজ হয়েছে।

কই?

এই যে।

তারামন দু'ভায়ের থুতনি ধরে নাড়িয়ে দেয়। রবি এক লোকমা ভাত এগিয়ে দিয়ে বলে, খান।

তারামন এক মুহূর্ত দেরি না করে টুপ করে খেয়ে ফেলে। ওহ্ কি আনন্দ। খিদেয় পেটের ভেতরে নাড়িভূড়ির তোলপাড় হচ্ছে। তখন বারান্দা থেকে আজিজ মাস্টারের বউ ওকে ডাকে, ভাত খাবি আয় তারামন।

কি সুন্দর ডাক। ভাত খেতে ডাকছে। ছুটে যাবে কি? উঠতে গিয়েও উঠতে পারে না। রবি–নবির খাওয়া শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। ওদের খাওয়া হলে এঁটো পাতা উঠিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। তখন বাড়িতে সোরগোল ওঠে, মুহিব হাবিলদার এসেছে, মুহিব হাবিলদার।

তারামন চমকে পেছন ফিরে তাকায়। পিঠে রাইফেল নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। আজিজ মাস্টার ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে, আসেন। বসেন।

তারামন রান্নাঘরে ঢোকে। মাস্টারের বউ ওকে সানকি ভরা ভাত আর ডাল এগিয়ে দেয়।

তারামন ভাত মাখতে মাখতে বলে, মুহিব হাবিলদার কে চাচী?

মুক্তিযোদ্ধা। অনেক বড় মানুষ।

পিঠে ওইটা কি?

রাইফেল।

আচ্ছা চাচী মুক্তিযোদ্ধা হলে অনেক বড় মানুষ হয় কেন?

ভাত খা। এতো কথা বলতে হয় না।

ও ভাত খাওয়ায় মনোযোগী হয়। খুব ইচ্ছে করে লোকটির কাছে গিয়ে যুদ্ধের গল্প শুনতে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সোজাসুজি তাকালে মুহিব হাবিলদারকে দেখা যায়। মধ্যবয়সী, হাসিখুশি মানুষ। দু'হাত নেড়ে কথা বলছে। ছোটরা তাকে ঘিরে ধরেছে। রাইফেলটা ছুঁয়ে দেখছে। মুহিব ওদের প্রত্যেকের মাথায় রাইফেলটা ছোঁয়ায়। ওরা শান্ত হয়ে মাথা নিচু করে থাকে। এই দৃশ্য দেখে তারামনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দৃশ্যের অন্তরালে দৃশ্য থাকে। ওর মনে হয় যুদ্ধের মতো একটি বড় দৃশ্যও ও দেখতে পাচ্ছে। সেই দৃশ্যের বিশাল ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের টু-এম, এফ কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার মুহিব আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে মিলে ব্রহ্মপুত্র নদীর পুব পাড় বরাবর ডিফেন্স লাইন গড়ে তুলেছে। এখন পর্যন্ত ভারতের মেঘালয় সীমান্ত সংলগ্ন রাজীবপুর-রৌমারি এলাকা মুক্তাঞ্চল। পাকবাহিনী মাঝে মাঝে এসব এলাকায় হানা দিয়েছে কিন্তু দখল করতে পারেনি। মুক্ত এলাকায় মুক্তযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছে। দলে দলে নতুন ছেলেরা ট্রেনিং নেবার জন্যে আসছে। শরণার্থীদের জন্যে আশ্রয় শিবিরও আছে। যারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যেতে পারছে না, কিংবা যেতে চায় না তারা এখানে থেকে যাচ্ছে। এখানে মানুষ নতুন করে ঘরবাড়ির খেলা শুরু করেছে। কতো মানুষ একসঙ্গে শ্বাস নেয়, একই স্বপ্ন নিয়ে ঘুমুতে যায়। প্রতিদিন যুদ্ধের গল্প বলে, কারো মুখে অন্য কথা নেই। তারামনের মনে হয় কুলসুমও স্বপ্ন দেখে। ও নিজেও। যুদ্ধে জিততে পারলে তারা আবার ফিরে যাবে চরের ভিটেমাটিতে। মা আর ভাইদের হাত ধরে আবার শংকর মাধবপুর — বেণুর সঙ্গে পুকুরে সাঁতার কাটা। কতোদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। গত মাসে ওরা কোদালকাঠিতে মামার বাড়িতে গেছে। পারলে ভারতেও যেতে পারে। ঠিক নেই।

এমন অসাধারণ দৃশ্য একের পর এক ভেসে ওঠে তারামনের দিব্যদৃষ্টির সামনে। আসলে ওর মনে হয় যে দৃশ্য ও দেখতে পাচ্ছে না সেটি একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ। দৃশ্যের অন্তরাল থেকে ফুটে ওঠা দৃশ্য ওর কাছে বাস্তব হয়ে উঠে। ও গভীর মনোযোগে চারদিকে তাকায় । পুরো বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখে। কতো জায়গায় যে দৃষ্টি আটকে যায়। বারান্দায় বসে তখনো কথা বলছে মুহিব হাবিলদার। কথা বলছে রাইফেল সামনে নিয়ে গোল হয়ে বসে থাকা ছেলেমেয়েরা। উঠোনে তখনো বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িঘর ছেড়ে বিভিন্ন গাঁ থেকে চলে আসা লোকেরা। বাড়িটি যেন একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শরণার্থী ক্যাম্প। জ্বলন্ত উনুন — আগুন নিভছে না। এক পাতিল ভাত নামানো হলে অন্য আর একটি পাতিল চুলোয় উঠছে। ডাল নামছে। ডাল থেকে ক্ষুধা উদ্রেককারী ঘ্রাণ আসছে। সে ঘ্রাণ মিশে যাচ্ছে বাতাসে। তারামনের মনে হয় অসংখ্য দৃশ্য এই বাড়ির আনাচে-কানাচে ফুটে আছে, প্রয়োজন শুধু দেখতে শেখা। এই যেমন আজিজ মাস্টারের মুখোমুখি বসে থাকা মুহিব হাবিলদার একটি দৃশ্য। সে একটি

প্লাটুনের কমাণ্ডার। সদা-সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পাহারায় নিয়োজিত। ঘুরে বেড়ায় পুরো এলাকায়। ভাত খাওয়া শেষ করার পরও তারামন বুঝতে পারে না এইসব দৃশ্যের আড়ালে যুদ্ধের ইতিহাস শুরু হয়ে গেছে। ও সানকি চেটেপুটে ভাত খাওয়া শেষ করে। মনে হয় আরো এক সানকি ভাত পেলে ও সেটাও খেয়ে সাবাড় করতে পারতো। হাত ধুয়ে, সানকি ধুয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েদের আড়ালে। অপার কৌতূহল, মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি কি ওর মাথায় একবার রাইফেলটা ছোঁয়াবে? ব্যাকুলতা ওকে অস্থির করে। কিন্তু নিজের বাসনার কথা কাউকে বলা হয় না। দু'কান ভরে বাজে মুহিব হাবিলদারের কণ্ঠ, আমাদের এই এলাকা স্বাধীন। এখানে পাকিস্তানি মিলিটারি ঢুকতে পারেনি। আমরা ওদের ঢুকতে দেবো না। এই শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ওরা ঢুকতে পারবে না।

কেঁপে ওঠে তারামন। এ কেমন অদ্ভুত কথা! ও কোনোদিন এমন কথা শোনেনি। ও নিজের ভেতর আবার ব্যাকুলতা অনুভব করে। ওর হাত নিসপিস করে উঠলে ও দু'হাতে নিজের চুলের গোছা ধরে খোঁপা বাধতে থাকে। তখন আজিজ মাস্টারের বউ ওকে দ্বিতীয়বার ডাকে। এ জায়গা ছেড়ে ওর যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যেতে হয়। ও ভুলে যায় না যে ওর মা এ বাড়িতে ওদের নিয়ে আশ্রয়ের জন্যে এসেছে। ওদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। খানিকটা বিমর্ষ হয়ে ও রান্নাঘরে আসে। দেখে আজিজ মাস্টারের বউ কাঁচের বাসন, বাটি, গ্লাস বের করে ভাত, ডাল, পানি সাজিয়েছে। তারামন কাছে এসে খুশি হয়। বুঝতে পারে কার জন্য এই আয়োজন।

চাচী?

আয়। এগুলো কাচারিঘরের চৌকির ওপর নিয়ে যা। হাবিলদার সাহেবকে খেতে দে। কতোদূর থেকে এসেছে বেচারা। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

আমি? আমি নিয়ে যাবো?

তো কি হয়েছে? এখন তো এখানে আর কেউ নেই।

আমার ভয় করছে।

ভয়? কিসের জন্য?

তিনি যে মুক্তিযোদ্ধা।

তাতে কি হয়েছে। দেখবি খুব ভালোমানুষ।

আমি পারবো না। বুবুকে ডাকি।

না, পারবে না। নিয়ে যা বলছি।

তারামন ধমক খেয়ে ভাতের গামলা নিয়ে দ্রুতপায়ে কাচারিঘরে যায়। চৌকির ওপর রেখে দৌড়ে রান্নাঘরে আসে। মাস্টারের বউ মৃদু হেসে বলে, এখনো ভয় লাগছে?

ও জোরে মাথা নাড়ে, না।

নে ডালের বাটি নিয়ে যা। দৌড়াতে হবে না। আস্তে যাবি।

তারামন মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, একজন মুক্তিযোদ্ধা কি সবার মতো শুধু ডাল আর ভাত খাবে?

না, তারজন্য ডিম ভেজেছি। ডাল রেখে আয়। দিচ্ছি।

তারামন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। যে যুদ্ধ করবে তারজন্য অবশ্যই একটুখানি বেশি কিছু রাখতে হবে। নইলে সে যুদ্ধ করতে পারবে কেন? যুদ্ধ করা কি সহজ কাজ?

কাচারিঘরে ডাল রেখে ছুটে এসে ডিম, লবন, কাঁচামরিচ ইত্যাদি নিয়ে যায়। সবশেষে পানি। সবকিছু রাখা হলে চৌকির দিকে তাকিয়ে দেখে নেয় পরিপাটি করে গোছানো হয়েছে কিনা। তারপর খুশি মনে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ায়।

আজিজ মাস্টার ভুরু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি রে ভাত দেয়া হয়েছে?

ও মাথা কাত করে। হ্যাঁ বলবে এমন সাহসটুকুও হয় না।

মুহিব হাবিলদার ওর মাথায় রাইফেল ছুঁইয়ে বলে, ভারী চটপটে মেয়ে।

মাথায় রাইফেলের স্পর্শে তারামনের চোখের সামনে পুরো গ্রাম দুলে ওঠে, যেন ভীষণ ঝোড়ো বাতাস ছুঁয়ে গেলো গ্রামটা। ব্রহ্মপুত্র নদী সাগর হয়ে যায়, যে সাগর ও কখনো দেখেনি। সেইসঙ্গে মৃত বাবার মুখ ভেসে উঠলে ও নিজের বিন্দু অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়। বুঝে যায় ও আর কোনো একটি মানুষ নয়। ওর ভেতরে অনেক, অনেক মানুষের বয়স যোগ হয়েছে। সেটা যে কতো সংখ্যা দিয়ে তার হিসেব করা যাবে না। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কি রে অমন করে তাকিয়ে আছিস যে? আয় আমার সঙ্গে ভাত খাবি।

আমার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে। এইটা আমাকে দেন?

হা-হা করে হেসে ওঠে মুহিব হাবিলদার। বলে, দেখেন মাস্টার সাহেব মেয়ের সাহস কতো। রাইফেলটা চায়।

আমি একটু ভালো করে ধরে দেখি।

ও রাইফেলটার জন্য হাত বাড়ায়।

এটা ধরা কি এতো সহজ কাজ। আয়, আগে খেয়ে নেই।

মুহিব ওর ঘাড়ে হাত রেখে কাচারিঘরে যায়। সঙ্গে আজিজ মাস্টার। পেছনে একদল ছেলেমেয়ে। দু'জনে চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে। ছেলেমেয়েরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারামন দুজনের বাসনে ভাত উঠিয়ে দেয়। ডাল, ডিম দেয়। ওরা খেতে শুরু করলে ও রাইফেলটা ধরার জন্য হাত বাড়ায়। মুহিব হাবিলদার বাম হাতে রাইফেলটা চেপে ধরে বলে, এখন না পরে।

পরে? কখন? জিজ্ঞেস করতে পারে না তারামন। ক্ষণে ক্ষণে ভেতরে কি যে ওর হয়ে যায়। নিজেকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। যেসব ছেলেমেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা উৎসুক হয়ে ওদের দেখছে। তারামন ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি এক লহমায় দেখে নিয়ে একলাফে দরজা পেরিয়ে উঠোনে চলে যায়। উঠোনে লালভানু দাঁড়িয়েছিলো।

তারামন ওকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বুবু মুক্তিযোদ্ধা আমাকে বলেছে এখন না পরে।

পরে? কি পরে?

লালভানু বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকায়। তারামন ওর বিরক্তি গায়ে মাখে না। উচ্ছ্বাস নিয়েই বলে, পরে আমি ওই রাইফেলটা ধরতে পারবো।

রাইফেল ধরে তোর কি হবে? তাছাড়া ওনার খাওয়া হলে তো চলেই যাবেন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে।

তাইতো? তাহলে পরে মানে কখন?

তারামন বিষণ্ন কণ্ঠে বলে।

লালভানু জোর দিয়ে বলে, কখনোইনা।

নিষ্প্রভ হয়ে যায় তারামন। নিজের অজান্তেই দু'হাত শিথিল হয়ে গেলে ছুটে যায় লালভানুর বন্ধন। ওর বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে খুশি হয় লালভানু। তারামন কাচারিঘরে ফিরে যায়.। দু'জনের খাওয়া শেষ। দুজনেই বাসনে হাত ধুয়ে নিচ্ছে। তারামন কারো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে বাসনকোসন গুছিয়ে নেয়। ঘর থেকে বেরুবার সময় শুনতে পায় মুহিব হাবিলদার বলছে, কথাটা মনে থাকে যেন মাস্টার সাহেব। রান্নার জন্য আমার একটি মেয়ে দরকার। আপনি ঠিক করে রাখবেন। সামনের মঙ্গলবার আবার আসবো। সেদিন মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

মুহিব হাবিলদারের কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে তারামন রান্নাঘরে আসে। বড় এক গামলা পানিতে বাসনকোসন ডোবাতে ডোবাতে ভাবে, আমি তো রাঁধতে পারি। তাহলে আমি.... আর বেশি কিছু ভাবতে পারে না ও। ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সে মুখ ক্ষণিকে জ্বলে ওঠে, ক্ষণিকে নেভে। তারামনের ভেতরে এক নতুন খেলা শুরু হয়। ও কি কি রাঁধতে পারে সে হিসেব করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আঙুলে গুণতে থাকে — আমি পোলাও, কোর্মা, কালিয়া, কোপ্তা রাঁধতে পারি না। মাত্র অল্প কয়টা রান্না। আসলে এসব তো আমি কখনো খাইনি। যে বাসায় কাজ করতাম ওই বাসায় পোলাও, কোর্মা রান্না হয়েছে। কিন্তু আমাকে খেতে দেয়নি। আচ্ছা যুদ্ধের সময় কি কেউ পোলাও-কোর্মা খায়? খাওয়া উচিত নয়। যুদ্ধ তো ভয়াবহ – কতো মৃত্যু, মানুষের হাত-পা উড়ে যাওয়া। যুদ্ধ মানুষের নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়ে দেয়। আসলে আমি অনেক বেশি রাঁধতে পারি — ভাত, ডাল- -অনেক রকম ভাজি, ভর্তা, মাছ-মাংসের তরকারি আরো কতো কি । আমার আব্বা আমার হাতের রান্না খেয়ে খুশি হতেন। বলতেন, তারামন টাকি মাছের ভর্তা খুব মজা করে বানাতে পারে। মুক্তিযোদ্ধাদের আমি ডালের চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট, টাকি মাছের ভর্তা খাওয়াবো। ইলিশ মাছ ভাজলে চারদিকে গন্ধ ছুটবে। আর আলু দিয়ে মুরগির ঝোল রাঁধলে সবাই বলবে তারামনটা ভীষণ কাজের মেয়ে। ওরা পোলাও-কোর্মা কালিয়া-কোপ্তার কথা ভুলে যাবে। বলবে, তারামন কলাপাতায় মুড়ে গুঁড়ো মাছের রান্নাটা আবার রাঁধিস তো। ওহ্ কলাপাতায় মুড়ে পাঁচ রকমের গুড়ো মাছ আমার হাতে অন্যরকম হয়ে যায়। কেউ ভুলতে পারেনা সে স্বাদ। এসব নিয়ে তারামন নিজের ভেতর ডোবে আর ভাসে। আনন্দ-উচ্ছাসে হাততালি দিয়ে বলে, কি মজা! আজিজ মাস্টারের বউ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়, কি রে কি হয়েছে?

কাল থেকে আমি রাঁধবো চাচী। আপনি শুধু আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

উঁহু তা হবে না। আমি না রাঁধলে তোর চাচা খেতে পারে না।

তারামন নিষ্প্রভ হয়ে চুপ হয়ে যায়। তারপর আবার উৎফুল্ল হয়ে বলে, এমন তো হতে পারে যে মনে করা হবে আপনি কিছুদিনের জন্য বাবার বাড়ি গেছেন।

আজিজ মাস্টারের বউ ভুরু কুঁচকে তাকালে ও ঢোক গিলে বলে, না, মানে। বলছিলাম চাচা কয়দিন আমার রান্না খেয়েই দেখুক না।

তোর বুঝি রান্নার খুব শখ।

হ্যাঁ, খুব শখ । মনে হয় রাতদিন রাঁধি।

আজিজ মাস্টারের বৌ স্নেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়, পাগল মেয়ে।

ততোক্ষণে কুলসুম রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মাস্টারের বউ কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপা আপনি ওকে কোনো বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিন। লালভানু স্বামীর বাড়ি চলে

যাবে। আমি আপনার বাড়িতে কাজ করে ছেলেদু'টো নিয়ে থাকতে পারি।

দেখি মন্টুর বাপের সঙ্গে কথা বলে। যুদ্ধের সময় সব মানুষেরই দিশেহারা অবস্থা। কে যে কি করবে।

তারামন আস্থা হারায় না। ও জানে কোথাও না কোথাও কাজ পাবে। কিন্তু ও রান্নার কাজ চায়। সেটা একজন মানুষের কাছেই যে যুদ্ধ করতে জানে। অস্ত্র চালাতে পারে। রান্নাঘর থেকে বেরুনোর সময় শুনতে পায় ওর মা বলছে, আমার মেয়েটা খাটতে পারে আপা। শিখিয়ে দিলে সব কাজ পারবে। ও হয়েছে আমার বড় মেয়েটার একদম উল্টো। তখন তারামনের ইচ্ছে করে একটা লাল ফড়িংয়ের পেছনে ছুটে অনেকদূর চলে যেতে।

পরদিন সকালে লালভানু রবি-নবিকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি রওনা হয়ে যায়। ওরা কিছুদিন ওর সঙ্গে থাকবে। কুলসুমই সঙ্গে দিয়েছে। লালভানু মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে। আর দেখা হবে কিনা এই আশংকায় ও ম্রিয়মান। তারামনের হাত ধরলে ও শক্ত কণ্ঠে বলে, আমরা বেঁচেই থাকবো। আমাদের আবার দেখা হবে বুবু।

লালভানু ধাক্কা খায়। বোনটি ওর ছোট, কিন্তু ওকে বোঝা কঠিন। ওর আচরণ এবং কথা কখনোই লালভানুর কাছে পৌঁছেনি। তবু ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে বিদায় নেয় লালভানু।

পরের মঙ্গলবার মুহিব হাবিলদার আসে। সঙ্গে আরো দুজন মুক্তিযোদ্ধা, দুলাল আর সেতাব। এসেই বলে, আজ আর আপনার এখানে বসবো না আজিজ ভাই। তাড়া আছে, যেতে হবে। আমাদের ওদিকটা মুক্তাঞ্চল বলে পাকিস্তান আর্মি ওদের তৎপরতা বাড়িয়েছে। প্রায়ই ছোটখাটো আক্রমণ করে।

আজিজ মাস্টার শুকনো মুখে বলে, আমরা পারবো তো ওদের ঠেকাতে?

দুলাল বুকে আঙুল ঠুকে জবাব দেয়, যতোক্ষণ এই শরীরে প্রাণ আছে, ততোক্ষণ এই মাটিতে পা রাখতে পারবে না ওরা।

আড়াল থেকে ওদের কথা শোনে বাড়ির মেয়েরা। সে কথা শুনে চকচক করে ওঠে তারামনের দৃষ্টি। ও মায়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে। দুলালের কথা শেষ হতেই মুহিব হাবিলদার তাড়া দেয়, আমার জন্যে মেয়ে পেয়েছেন আজিজ ভাই?

হ্যাঁ।

বাহ, তাহলেতো সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কই ডাকুন ওকে।

আজিজ মাস্টার গলা উঁচিয়ে হাঁক দেয়, তারামন, মা তারামন, এদিকে আয়।

তারামন কুলসুমকে জড়িয়ে ধরে।

ভেসে আসে আজিজ মাস্টারের গলা, আমার বউ বলেছে রাঁধার হাত ভালো। খুব কাজের মেয়ে।

আজিজ মাস্টারের কথা শুনে কুলসুম বিপন্ন বোধ করে। বাঁচার জন্য আশ্রয় নিতে এসে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠাতে হবে মেয়েকে? কাঁদো কাঁদো স্বরে আজিজ মাস্টারের বউকে বলে, আমার মেয়েকে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যেতে দেবো না আপা।

কি বললেন আম্মা? আমি যাবো।

তারামন মাকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

যাবি?

যাবোইতো।

যদি ওখানে যুদ্ধ হয়?

যুদ্ধ করবো।

বলতে বলতে ও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মুহিব হাবিলদার ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওহ্ সেই চটপটে মেয়েটি। তারামন মুহিবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে, আমি আপনার সাথে যাবো। যা বলবেন তাই রান্না করতে পারবো।

তখন কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে কুলসুম। আজিজ মাস্টার সান্ত্বনার স্বরে বলে, কাঁদেন কেন, আপনার মেয়ে ওর কাছে ভালোই থাকবে।

আমার বাপহারা মেয়ে। ওকে —

মুহিব তারামনকে কাছে নিয়ে বলে, আজ থেকে আমি ওর ধর্মবাবা। ও আমার ধর্মমেয়ে। আপনার কোনো চিন্তা নেই। বেঁচে থাকলে আপনার মেয়েকে আবার আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাবো।

তারামন আনন্দে, দিশেহারা, বাবা আমার বাবা।

ওরা তখন ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অজস্র কৌতূহল তারামনের মনে। কেন আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি বাবা?

বাবা ওকে বুঝিয়ে দেয় কেন যুদ্ধ করছে।

বাবা আমাকে রাইফেল চালানো শেখাবেন? আমিও মিলিটারি মারবো।

তুই? সাহস হয়?

দুলালের প্রশ্নের জবাবে লাফিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, খুব সাহস হয়। আপনারা পারলে আমি পারবো না কেন? বাবা —

ও মুহিবের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত প্রসারিত করে ওর চলা থামিয়ে দেয়। মুহিব একা নয়, দুলাল ও সেতাব ওর দৃষ্টি দেখে চমকে ওঠে।

বাবা —।

তারামনের কণ্ঠে আবেদন। মুহিব বুঝতে পারে ও কি চায়। শুধু একটু ছুঁয়ে দেখতে। শুধু ছুঁয়ে দেখা নয়, মুহিব রাইফেলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নে।

তারামন প্রথমে বুকের সঙ্গে জড়িয় ধরে। তারপর রাইফেলটা দু'হাতে উঁচু করে ধরে চিৎকার করে ওঠে, জয় বাংলা।

শব্দ যেন ওর বুকের ভেতর আটকে ছিলো, অস্ত্রটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো সমস্ত দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে। ওর কণ্ঠের তীব্রতা তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে হতবাক করে দেয়। ওরা ভাবে, মেয়েটির কণ্ঠে ব্রহ্মপুত্রের গর্জন। ও দু'কূল ভাসিয়ে দিতে পারবে।

ওরা যে বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তা বুঝতে পেরে তারামন লাজুক হেসে বলে, জয় বাংলা বলেইতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাই না বাবা?

মুহিব হাবিলদার মাথা নেড়ে সায় দেয়।

দুলাল গলা চড়িয়ে বলে, ওটা এখন আর শুধু স্লোগান না। ওটা এখন আমাদের রণধ্বনি।

ঠিক। সেতাব সায় দেয়। তারামনের সঙ্গে রাইফেলটা উঁচু করে ধরে বলে, আয় আমরা সবাই মিলে জয় বাংলা বলি।

জয়—বাংলা—। কেঁপে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়। প্রবল যোশ তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে আবেগতাড়িত করে। ওরা জানে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে চিলমারি বন্দর। ওখানে পাকিস্তান আর্মি শক্ত ঘাঁটি করেছে। পূর্ব পাড়ে শুধু কোদালকাঠি চর ওদের দখলে। ওখান থেকে ওদের তাড়াতে হবে।

কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নদীর পাড় ধরে ওরা হেঁটে গেলে তারামনের কাঁধে রাইফেলটা পতাকার মতো দৃশ্যমান হয়। তিনজনের কেউই সেই রাইফেলের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

৬

রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো পুড়ছে — পুরো কনভয় নয়, কতোগুলো জিপ এগুচ্ছে। পেট্রোল লাগানো পাটের মশালগুলোতে আগুন দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে এ বাড়ির চাল থেকে ঐ বাড়ির চালে। ওরা পোড়ানো-পোড়ানো খেলা খেলছে – খেলাটা একদম নতুন, এ দেশে এসে শিখেছে – ওদের উত্তেজনার শেষ নেই। নতুন খেলার কোনো নিয়মকানুন থাকে না – তা মানতেও হয় না। ইচ্ছেমাফিক যা খুশি তা করা যায়। মানুষের চোখে মুখের হিংস্রতার সঙ্গে উল্লাস মিশলে চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তা এ দেশের মানুষ কখনো দেখেনি। দেখার অবকাশ ওদের নেই – ওরা প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। কিন্তু মেনাজের পরিবার বেশি দূর যেতে পারলো না। আকাশে মেঘ দেখে ওরা থমকে গেলো।

মেঘবৃষ্টি বাদলের আবহাওয়ার মানুষ ওরা, মেঘ দেখার তো কিছু নেই। হর-হামেশা মেঘেজলে থিতুবিতু হয়ে থাকে। তাছাড়া মেঘের কালো আকার – ঝুলে থাকার ভঙ্গি – ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে বড় হয় এদেশের মানুষ। সেদিন মেনাজের পরিবার মেঘের দিকে প্রচণ্ড ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে থাকার ফলে ভুলে গিয়েছিলো সৈনিকের নষ্টামির কথা। আসলে মেনাজের পরিবার জানতো না যে নষ্টামি ওদের কাছে উল্লাস, নৈতিকতা নয়। ওরা আরো ভুলে গিয়েছিলো যে দখলদার বাহিনীর কাছে ধর্মের নামে ধর্মের মূল্যবোধ বাতিল হয়ে যায় – – যুদ্ধকালীন সময় সৈনিকের জন্য ধর্মের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা জায়েজ করে দেয়।

মেনাজ পরিবারের বাড়ি যখন পুড়ছিলো তখন ওরা আকাশে মেঘ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। একবার দাউদাউ জ্বলে ওঠা ঘরের চালের দিকে তাকায়, আর একবার মেঘের দিকে। বাপদাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটে ওরা কোনোদিন পুড়তে দেখেনি – কোনোদিন ভুলক্রমে ওদের ঘরের চালে আগুন লাগেনি – ওদের দোষ কি ! এমন করে পুড়তে দেখলে কার না বুকের ভেতরে টান পড়ে ! ওদেরও টান পড়েছিলো। মেনাজ আর ওর বউ সকিনা মেঘের দিকে হাত তুলে বলেছিলো, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে। আহা রে, এমন করে ছড়া গেয়ে ওরা তো ওদের শৈশব-কৈশোর পার করে এসেছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাও সুর করে ছড়াটা বলতে থাকে। মেনাজের এবং তার বউয়ের আগুন দেখে যদি শৈশব-কৈশোরের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে ওদের বাপদাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটে-রক্ষার জন্য মেঘের কাছে মিনতি করবে না কেন?

সেদিন ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে – ঘরের অর্ধেকটা বেঁচে যায়। কিন্তু ওরা তখন বুঝতে পারেনি যে আগুনের মতো মেঘও ওদের জীবনে এক ভয়াবহ সর্বনাশ। ওরা কেন যুদ্ধের সময় মেঘ দেখে পালানোর কথা ভুলে যাবে? যুদ্ধ তো নিয়ম মানে না–যুদ্ধ সমান্তরাল নয়, যুদ্ধের কোনো আইন–কানুন নেই। তাই কতিপয় সৈনিক ওদের পরিবার থেকে হালকা–পাতলা গড়নের বড় মেয়ে বেণুকে বাজ পাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নেয়। বেণু চেঁচাতে চেঁচাতে সৈনিকদের জিপে ওঠে। সৈনিকদের সে কি অদ্ভুত হাসি, মেনাজ পরিবার সে হাসি দেখে জগৎ–সংসার ভুলে যায়। বুঝলো এমন হাসি হয় তো এক জীবনে একবারই দেখা যায়।

বেণুকে নিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সকিনা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে। মাটি এবং বৃষ্টি মিশে ওর শরীর মাখামাখি হয়ে যায়। মেনাজ বৌকে টেনে তুলতে পারে না।

অসহায় ছেলেমেয়েরা মায়ের তড়পানি দেখে। ওরা তো শেখেনি কেমন করে এ অবস্থায় মার পাশে দাঁড়াতে হয়। ওদের জীবনে এমন ঘটনা তো কখনো ঘটেনি। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স ছয় বছর। ও বাবার হাত ধরে টেনে বলে, ও বাবা মায়ে নাচে ক্যান?

অন্যটি ধমক দেয়, চুপ কর শয়তান, মায়ে নাচবো ক্যান? মায়ের প্যাডের মধ্যে মরণ–কামড়ের ব্যথা।

মরণ–কামড় কি ছোড বাই?

রেণু কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে। মাকে কাঁদতে দেখে ওরও ভীষণ কান্না পাচ্ছে, তাই ও কাঁদছে। অবশ্য বোনকে ধরে নিয়ে গেছে এটাও ওর খারাপ লাগছে। শুধু বুঝতে পারছে যে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। এটা কেমন যাওয়া? ধরে নিয়ে যাবে কেন? কি জন্যইবা ধরে নিয়ে গেলো? মেনাজ পরিবারের ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছয়, এখন পাঁচজন বৃষ্টিতে ভিজে হি–হি কাঁপতে থাকে। এর মধ্যেও ওদের বৈষয়িক বুদ্ধি থমকে থাকে না। ওরা সমবেতভাবে নিজেদের ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকেও ওরা বুঝতে পারে যে ঘরের অর্ধেকটা রক্ষা পেয়েছে। আগুন নিভে ছাই। ওরা মাকে ডাকে, মা ওডো, দ্যাহ আগুন নাই। মাগো আমাগো ঘরের অদ্দেক খান আছে।

মেনাজ সকিনার পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলো, ওদের কথায় চমকে উঠে তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বৃষ্টি এবং মাটির মিশেলে তৈরি হওয়া কাদায় পিছলে পড়ে যায়। একদম মুখ থুবড়ে। ওর মুখে কাদা ভরে গেলে ও থুতু ফেলার চেষ্টা করে। পারে না, এঁটেল মাটিতে ঠোঁট জড়িয়ে আছে। ও খানিকক্ষণ কাদার ওপর জুবুথুবু হয়ে বসে থাকে। আশপাশে জমে থাকা পানিতে হাত ভিজিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে থাকে। ছেলেমেয়েরা ওর কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে হি–হি করে হাসে।

রেণু বাবার পাশে বসে সহানুভূতির সঙ্গে বলে, বাবা তুমহি পইড়ে গেলা ক্যান? মার মতো তুমহার প্যাডেও কি মরণ কামড়ের ব্যথা?

মেনাজ মেয়ের প্রশ্নের জবাব দেয় না। নিজের মুখ থেকে কাদা মুছে ফেলতে ব্যস্ত।

রেণু তখন ঘুরে বাদলের দিকে তাকিয়ে বলে, ও ছোট ভাই তুমি তো কইলা না মরণ–কামড়ের ব্যথা কি?

চুপ কর ছেড়ি, তুই বুজবি না।

রেণু আবার গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। ঘরের চালে আগুন নিভে গেছে এ আনন্দের

কথা ও মুহূর্তে ভুলে যায়। মেনাজ ততোক্ষণে মুখ পরিষ্কার করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে ওর ভীষণ আনন্দ হয়। ওরই তো দায়িত্ব ছিলো বাজপাখির মতো ঘরের চালের দিকে দৃষ্টি রাখা – কতোটুকু গেলো, কতোটুকু থাকলো তার হিসেবে কষা। ও সকিনার হাত ধরে টানে, সকিনা ওডো? দ্যাহো!

সকিনা উঠে বসে, কিন্তু তাকায় না। বৃষ্টি হলে আগুন তো নিভেই যাবে, বৃষ্টি আর আগুন তো একসঙ্গে চলতে পারে না। এতে এতো আনন্দিত হবার কি আছে? কিছুক্ষণ আগে ওরা সবাই মিলে ভীষণভাবে বৃষ্টি চেয়েছিলো, বর্ষাকাল, আকাশে ঘন কালো মেঘ ছিলো, ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো, আপনা-আপনি বৃষ্টি হয়ে গেছে। ওরা না চাইলেও সেই মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারতো। বাংলাদেশের বর্ষাকালের আকাশ এমনই। তাছাড়া এ বছর বৃষ্টি বেশি হচ্ছে। এ গাঁয়ের-ও গাঁয়ের লোক বন্যার কথা বলাবলি করছে। মেঘের পোয়াবারো-আকাশজুড়ে হরহামেশা দাপায়। খবর এসেছে মেনাজের বড় বোনের ঘরে পানি উঠেছে। ওরা চৌকির ওপর বাস করছে। ওদের এলাকা উঁচু বলে এখনো বানের পানি আসেনি। ওরা তো ভালোই ছিলো। আকস্মিকভাবে সকিনা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে, হায়রে বৃষ্টি।

মেনাজ আবার ওর হাত ধরে টেনে বলে, ওডো সকিনা, দ্যাহো হামাকেরে আদ্দেক ঘর।

সকিনা কাঁদতে কাঁদতে বলে, আর মোগ মাইয়াডাও তো আদ্দেক খান হইয়ে গেলো। পুরা মাইয়া কি আর কনু দিন ফেরত পামবো?

মেনাজ পরিবারের ক্ষুদেরা মায়ের কথা বোঝে না। ঘরের আগুন নিভে গেছে এই আনন্দে ওরা হৈ-চৈ করছে। ওদের আনন্দ-উল্লাস ধ্বনির ভেতর বিলাপের ধ্বনি ছড়াতে থাকে সকিনা।

ও আমার বেণু রে, তুই কনে গেলি?

মেনাজ ওকে ধমক দেয়, বেণু নাই তো কি অইছে? গরডা তো বাঁইচা গেছে। হামরা গরে ফেরতে পারমু। হামকরে আরো পোলাপান আছে।

সকিনা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এবং বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। চারদিকে যুদ্ধ বলে লোকটার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? কেমন করে বলতে পারছে এমন কথা? বেণু ওদের প্রথম সন্তান, কতো আদরের। মেয়ে হয়েছিলো বলে ওরা দু'জনের কেউই মন খারাপ করেনি। খুশি হয়ে বলেছিলো, হামি যেদিন মাইয়া কোলে নিমু সেদিন একডা উৎসব করুম।

মেনাজের মা আপত্তি করেছিলো, তুই কি পাগল হয়েছ?

পাগল তো হয়েছি মা। খুশির পাগল। আমি চাইল আর গুড় আইনে দিমু। তুমি সিন্নি রাঁধবা।

সাত দিনের দিন মেয়েকে কোলে নেয়ার উৎসব করেছিলো মেনাজ। ওর মা বড় এক হাঁড়ি সিন্নি রেঁধেছিলো। পাড়াপড়শি, আত্মীয়-স্বজন এসেছিলো। মেনাজ মেয়েকে কোলে নিয়ে বসেছিলো। আর সবাই এসে নতুন বাবাকে সিন্নি খাইয়ে দিয়েছিলো। কেউ কেউ গান করছিলো। একজন একটা ভাঙা কলসি দিয়ে বলেছিলো, এইডার মধ্যে টাকা জমাও মিয়া। মাইয়ার বিয়ায় যৌতুক দেয়া লাগবে না?

মেনাজ কলসি উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলো, হামার মাইয়ার বিয়ায় যৌতুক লাগবে না। মাইয়ারে ব্যারিস্টার বানামু।

হাসির রোল উঠেছিলো আসরে। গর্বে-আনন্দে সকিনার মনে হচ্ছিলো ওর বুঝি মাটিতে

পা পড়বে না। তারপরের সন্তানটি ছিলো ছেলে। তারপর একে একে চারজন হলো। না, মেনাজ কাউকে নিয়ে আর এমন আনন্দ করেনি। বেণুর বয়স এখন সতেরো, বেশি দিন আগের কথা নয়। পুরো ছবিটির কোনো কিছু ভোলেনি সকিনা। তাহলে আজ কেন মেনাজ এমন করছে? যুদ্ধ কি ওকে ওর জীবনের সব আনন্দ-উৎসবের ঘটনা ভুলিয়ে দিয়েছে? মেনাজ কি অতীত ভুলে যাচ্ছে? বর্তমান কি ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে?

সকিনা মেনাজের হাত ধরে বলে, আদ্দেক গর পাইলে গর ঠিক করণ যায়। আগুনে পুড়লে গরের কোনো দোষ অয় না। আদ্দেক মাইয়া পাইলে মাইয়া পুরা অয় না। অগুনে পুড়লে মাইয়ার দোষ অয়। মাইয়াডা তো দোযখের আগুনে পুড়তাছে।

সকিনার বিলাপ ফুরোয় না। মেনাজ বিরক্ত হয়ে বলে, ক্যাবল বক্তিমা। উনি য্যান বঙ্গবন্ধু হয়েছেন। বক্তিমা করবার লাগছে। চুপ না করলে হামার যেইদিগে দুইচোখ যায় হেইদিগে যাবো গিয়া।

তুমি বেণুরে আইনে দাও। আমি যেইদিগে দুইচোখ যায় হেইদিগে যাই গিয়া।

উঁ, মিলিটারিরা য্যান হামার শালা। হামার কতা শুনবার লাইগে বইয়ে আছে। কোনোদিকে গেছে আমি কি জানি? দেখলা না জিপে কইরে নিলো?

সকিনা কিছু বলার আগেই ক্ষুদেরা হি-হি করে হাসে। এতো আগুন-বৃষ্টির মধ্যে ওদের হাসি পায় কেন? হাসি পেলে ওরা কিইবা করতে পারে, হাসতেই হয় ওদের। ওরা বুঝে হাসে, না বুঝেও হাসে। এটা ওদের বয়সের দোষ। এক এক রকম বয়স থাকে, যে বয়সের মানুষ পরিস্থিতি বুঝতে পারে না। বুঝতে না পেরে বেকুবের মতো আচরণ করে। ছোটরা বেকুব নয়, কিন্তু অবুঝ। অবুঝ শিশুদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় অসহায় বাবা-মাকে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার মেনাজ পরিবারের ছোটদের শুধু হাসি পায় না, ওদের দুঃখও আছে। সবচেয়ে ছোট জাকু আক্ষেপ করতে থাকে, আহারে আমিও যদি বেণুবু'র মতো জিপে চড়তে পারতাম! হামি তো কনু দিন জিপে চড়ি নাই বাবাগো। বাবা হামারে জিপে চড়াও না?

কি কহালি হারামজাদা।

সকিনা ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারতে মারতে ওকে কাদায় ফেলে দেয়। মেনাজ দু'হাতে ছেলেকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় সকিনাকে। ছোটরা বুঝতে পারে না যে মা এতো রেগে গেলো কেন? মিলিটারিরা তো হাসতে হাসতে বেণুকে কোলে তুলে আদর করে নিয়ে গেছে। আহা রে, বেণু'বু কি চিল্লানি না চিল্লাইলো। এতো চিল্লাইলো ক্যান? কে ওদের এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? জাকু ছটফটিয়ে বাবার কোল থেকে নেমে গেলে রেণু চিৎকার করে বলে, এইহানে আমরা বইয়ে আছি ক্যান হে? বুবু কি ফিরা আইবো? ও মা কতা কও না ক্যান? ও বাবা?

আকাশে-বাতাসে হাহাকার করে ফেরে রেণুর জিজ্ঞসা। কে ওদের উত্তর দেবে? মেনাজ আর সকিনার মনে হয় ওদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে জিপগুলো। থেঁতলে দিচ্ছে হাড়-মাংস-হৃদপিণ্ড-ফুসফুস - আর কি? না জিপগুলো চলে যায়নি। ওরা আবার ফিরে আসে - আবার যায়। থেঁতলে দিতেই থাকে। মেনাজ চিৎকার করে ওঠে, আর কি বাকি থাকলো, আর কি? আর কি?

সবাই চমকে ওর দিকে তাকায়, বাবা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

তখন আকাশে মেঘের গর্জন ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি কমে এসেছিলো, হয়তো আবার

প্রবল বর্ষণ শুরু হতে পারে। তখন রেণু বাবার হাত ধরে টেনে বলে, বাবা বুবু না আসে আসুক, চলো আমরা ঘরে যাই।

না। সকিনা রেণুকে আঁকড়ে ধরে বলে, ওরা আবার যদি আসে। ও আমার বেণু রে-।

সকিনার বিলাপ শুরু হয়। ছোটখাটো ক্ষীণকায় বারো বছরের রেণু বিস্ফারিত চোখে মাকে দেখে। মেনাজ পরিবারের সবাই রেণুর দিকে তাকায়। ওর লিকলিকে হাতে দু'গাছা কাচের চুড়ি, বেণীতে লাল ফিতে – পরনের পুরনো ফ্রকটি ছুঁড়েনি। তবে রঙ উঠে বিবর্ণ হয়ে গেছে। মেনাজ ভাবলো আর কয়দিন পর ওর জন্য শাড়ি কিনতে হবে। বেণুকে কবে প্রথম শাড়ি কিনে দিয়েছিলো মনে নেই, তবে মেয়েটার হলুদ রঙ খুব প্রিয় ছিলো। বলতো, শাড়ি কিনবা ঠিক বউ কথা কও পাখির লাকান। টকটকা হলদা।

ওর কানে তখন সকিনার বিলাপ প্রতিধ্বনিত হয়, ওরা যদি আবার আসে? কেন আসবে? কার জন্য? রেণু কি পাকিস্তান আর্মির খিদে মেটানোর উপযোগী হয়েছে? শিউরে ওঠে মেনাজের শরীর, এসব কি ভাবছে ও? ও মাথা নিচু করে ফেলে, যেন দেখতে পায় পায়ের নিচে জমে থাকা কাদাজলে বেণুর ক্ষতবিক্ষত মুখ কর্দমাক্ত, থেঁতলানো। ওটা বুঝি যে কোনো সময়ে রেণুর মুখও হয়ে যেতে পারে। ওর তখন মনে পড়ে এখন যুদ্ধের সময়। ছেলেরা মরণপণ লড়াই করছে। গগন গাজীর ছেলে মাখন মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। ও কোথায় লড়াই করছে ওরা জানে না। যুদ্ধের সময় কোনো কিছু ঠিক থাকে না, যা খুশি হতে পারে। তবে ওর ধারণা ছেলেটি বেণুকে পছন্দ করতো। ওর প্রতি বেণুরও টান ছিলো। কিন্তু মেনাজ নিশ্চিত নয় যে মাখন আর বেণুর সম্পর্কটা কতোটুকু গড়িয়েছিলো।

ওর বুক মোচড়াতে থাকে। ওদের ভালোবাসা ঠিকমতো ফুটে ওঠার আগেই দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়েছে।

যুদ্ধে জিতে মাখন হয়তো একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু বেণুকে কোথায় খুঁজে পাবে? ততোদিন বেণু কি বেঁচে থাকবে?

এমন অবাস্তব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মেনাজ সোজা হয়ে বসে। নিজেকে শক্ত করে।

ও তখন সবাইকে বলে, উডো,.চলো।

কোনহানে বাবা? ঘরে?

না।

কোন্‌দিকে যাবো হামরা?

পুব দিগে।

সকিনা অবাক হয়ে বলে, পুব দিগে ক্যান? ঐদিগে কে আছে?

কেউ নাই। কিন্তু কাউরে না কাউরে পাবো। একডা ঠাঁই কি মিলবে না?

সকিনা আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়ে, হ, মিলতেও পারে।

সবাই মিলে পুব দিকে হাঁটতে থাকে। সবার পেছনে মেনাজ। কেউ জানতেও পারে না যে কি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেনাজ। কিন্তু কথাটা ও উচ্চারণ করতে পারে না, এমন কি সকিনাকেও বলা হয় না। ও দেখেছে পুব দিকে জিপগুলো চলে গেছে। এমনও তো হতে পারে যে ওরা পথের ধারে বেণুকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে? ক্ষীণকায় বেণু ওদের যথেষ্ট খোরাক নয়? যে খোরাকে পেট ভরে না সে খোরাক ওরা বেশিক্ষণ রাখবে কেন? মেনাজের বুক ক্ষীণ আশায় দুলে ওঠে। পরক্ষণে নিজেকে শাসন করে। নিজের বোকামির জন্য নিজের ওপর রাগ

হয়। নিজেকে বলে, হায়রে বেকুব বাপ। তবুও পুব দিকে যাওয়াটা ও থামাতে পারে না।
তখন লোকটির সঙ্গে দেখা হয় ওদের। সকিনা ওকে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে।
আকাশে মেঘ নেই। তবু সকিনার কণ্ঠে কড়-কড়াৎ শব্দ। প্রবল বজ্রপাত।
হামার বেণু? বেণু কৈ? লোকটি সকিনার হাত ধরে বলে, আপনার বেণু আছে।
আছে? কোনে?
লোকটি মাথা নেড়ে বলে, কোথাও না কোথাও আছে।
আপনে দ্যাহেন নাই?
দেখেছি।
তাইলে কন না ক্যান?
মেনাজের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ।
চলেন আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি।
কোনে?
আবারও মেনাজের ব্যগ্র কণ্ঠ।
কোদালকাঠি।
সকিনাও ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, হামার দূর সম্পর্কের ভাই আছে ওখানে।
আমি জানি।
বলতে বলতে লোকটি সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ওরা কেমন জানি বোকা হয়ে যায়। বুঝতে পারে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ওরা ছুটে যাচ্ছে এক অনির্দিষ্ট পথে।
সে পথের ধারে কোথাও বেণু নেই।

৭

ঘরের দাওয়ায় বসে আকাশে দুটো শকুন উড়ে আসতে দেখে মকবুল — ও বুড়ো হয়েছে, একটা চোখ ছানি পড়ে নষ্ট হয়েছে, তবু শকুন দেখতে ভুল হয় না ওর। তখন বিকেলবেলা। ওর বাড়ির চারপাশে নারকেল- সুপারি- আম- জাম- জামরুল- মেহগনির ঘন বাগান — বাদশা মিয়ার বাগান। ও পাহারাদার মাত্র। বাগানের মাঝখানে দুটো মাত্র ঘর। বুড়ো মকবুল তার বউ ছহিতনকে নিয়ে থাকে। ওর বাড়ির আঙিনায় সরাসরি রোদ পড়ে না। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসে বলে কখনো কখনো সে আলোর ছায়া গোলাকার, কখনো তা তেরচা, যেন স্কুলে পড়া কোনো ছেলের স্লেটের ওপর দাগিয়ে রাখা এলোমেলো আকার — যে হয়তো ছবি আঁকতে চায় কিন্তু কোনোকিছুর ঠিকমতো আকার দিতে পারে না। আপাতত শকুনের চিন্তায় বুড়ো মকবুল বিষণ্ন হয়ে ওঠে। এখন যুদ্ধের সময়, তাই ওর বুক কাঁপে।
আগের দিন হলে ও ধরে নিতো মরে পচে যাওয়া গরু কিংবা মোষ দেখে উড়ে এসেছে

শকুন, কিন্তু এখন আর আগের দিন নেই। পুকুরের পানি থির হয়ে থাকে না, বাতাস খেলে যায় না সুপুরি নারকেল গাছের মাথায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে পথঘাট, বনবাদাড়, ভিটেমটি, ডোবা-পুকুর — অন্যরকম ছবি দেখছে মকবুল। বড় সড়কে ছুটে যায় ভারি মিলিটারির গাড়ি, গুমগুম করে রাস্তা। সেই শব্দে কেঁপে যায় পুকুরের জল, ভিটেমাটি — গাছের মাথা থেকে উড়ে যায় পাখি। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ হলে শত্রুপক্ষ আকাশে আগুনের গোলা ছুটিয়ে দেয় — আলো পড়ে পুকুরের জলে, ঘরের চালে, ধানক্ষেতে। এমন ছবিতো মকবুল আগে দেখেনি। এমন ছবি মকবুলের পূর্বপুরুষও দেখেনি। তাই মকবুলের আগের দিনের ধ্যানধারণাগুলো গোলমাল হয়ে যায়। ও বুঝতে শিখেছে যে, যুদ্ধের সময়ে সবকিছু ঠিক থাকে না।

যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের ফলে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মকবুল এখন তাই নিয়মের মতো করে দেখে না। আগে দেখে, বুঝে নেয় — তারপর নিয়ম বলে ভাবে। বুড়ো শকুন দেখে বুড়িকে ডাকে, ও রজবের মা, রজবের মা, দেই যা।

বুড়ি বুড়োর মতো নয় — অনেক বেশি ক্ষিপ্র, দ্রুত চিন্তা করতে পারে এবং কী করতে হবে তাও বুঝে নেয়। ছোটখাটো শুকনো শরীর — দ্রুতপায়ে হাঁটলে মনে হয় হাঁটে না, উড়ে যাচ্ছে। শনের মতো সাদা চুলগুলো চকচক করে — এখনো মাথাভরা চুল ওর। মকবুলের ডাক ওর কানে স্বাভাবিক শোনায় না, তাই তাড়াতাড়ি কাছে আসে। বলে, কী অইছে? মকবুল আঙুল তুলে আকাশ দেখিয়ে বলে, শকুন।

ছহিতনের ভাঁজপড়া কপালে আরো ভাঁজ জমে ওঠে। নিজেও বলে, শকুন? যুদ্ধের সময়তো শুকুন বেশি উড়ে আকাশে। জানেন না?

মকবুল খেঁকিয়ে বলে, আমরা কি যুদ্ধ দেখছিনি?

দ্যাহেন নাইতো কী অইছে? এইডাতো বুজেন যে, যুদ্ধে মানুষ মরে?

মকবুল চুপ করে থাকে। এমন কথা ওর বুক পাথর করে দেয়, ও নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। বুড়ি ওর হাত ধরে বলে, ঐখানে মরা গরু নাই, আছে মানুষ। ঠিক মুক্তিযোদ্ধা।

ছহিতনের নিষ্প্রভ দৃষ্টি আগুনের গোলার মতো লাল হয়। বুড়ো সেই দৃষ্টি দেখে ভাবে, যুদ্ধের সময় মানুষের দৃষ্টিও আগের মতো থাকে না। মাথা নেড়ে বলে, অইতে পারে।

কিছুক্ষণ আগে এক পশলা গোলাগুলি হয়েছে। ওদের বাড়ি বড়ো রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে। তবু ওরা দুজনে ঘরের ভেতরে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলো। যতোক্ষণ গোলাগুলি চলেছে মাথা তোলেনি, কান থেকে হাত সরায়নি।

ছহিতন মকবুলের হাত ধরে টানে, চলেন, দেই আই।

বুড়ো বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলে, তুই থাক, আঁই যাই।

গাছগাছালির ফাঁকে সরু পায়েহাঁটা রাস্তা — খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেরুলে ডানে পাকা সড়ক, রামগতির দিকে চলে গেছে। সোজাসুজি ধানক্ষেত — তারও খানিকটা দূরে মেঠোপথ, অন্য গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। ফাঁকা জায়গায় এসে বুড়ো চারদিকে তাকায়, কোনদিকে যাবে? ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি বেশিদুর এগোয় না। সে চেষ্টাও ও করে না। সবদিকে যাবে বলে ঠিক করে নিয়ে প্রথমে পাকা সড়কের দিকে যায়। রাস্তা শূন্য। পায়ে হেঁটেও কেউ কোথাও যাচ্ছে না। ও খানিকটা গিয়েই বুঝতে পারে যে, মুক্তিযোদ্ধারা মেঠোপথে নেমে গেছে। ও ছানিপড়া চোখ নিয়ে এগুতে থাকে। তখনো দিনের আলো ফুরোয়নি। বর্ষায় মেঠোপথ কাদা

হয়ে আছে। শ্যাওলাও জমেছে। সাবধানে পা না ফেললে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। মকবুল বুড়ো পিছু ফেরার লোক নয়। ও পা টিপে টিপে এগুতে থাকে। মেঠোপথে ইঁদুরের গর্ত, পা পড়ে যায়। দুবার পড়ে গিয়ে আবার উড়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে মুক্তিযোদ্ধারা এ পথে হেঁটে গেছে — থেঁতলে গেছে পথের ঘাস। হয়তো ওরা কোনো আশ্রয়ের ঠিকানায় গেছে।

হাবিবকে অনেকটা পথ কাঁধে করে বয়ে এনেছে ওরা। হাবিবের বুকে গুলি লেগেছে। অবিরাম রক্ত ঝরছে। একেকবার একেকজন কাঁধ দিয়েছে হাবিবের জন্যে। ভিজে গেছে ওদের জামা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে কদম আর তরফ। ওদের সামনে এই প্রথম একজন সহযোদ্ধা আহত হয়েছে। ওদেরকে কেউ কাঁদতে নিষেধ করেনি। সবাই চায় ওরা একবার দুবার কেঁদে শক্ত হয়ে যাক। ভবিষ্যতে আর এমন করে ভেঙে পড়বে না। কতো মৃত্যু দেখতে হবে।

মকবুল খানিকটা এগুতেই টের পায় মেঠোপথের ওপর লম্বালম্বি শুয়ে আছে একজন। ওর পা যেন ওঠে না — ও দৌড়ে কাছে যেতে চায় — পা ওঠে না — ও কষ্টে বসে পড়তে চায় — হাঁটু ভাঙতে পারে না। এ কেমন স্থবির অবস্থা? মকবুল নিজেকে ঝাঁকুনি দেয়। তারপর ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে গোটাকয়েক কদমে পৌঁছে যায় লাশের কাছে। সহযোদ্ধাদের কাঁধের ওপর মরে গেছে হাবিব। ওরা ওকে এখানে নামিয়ে রেখে গেছে। ওর বুকের ওপরে ইটের টুকরো দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে দুটুকরো কাগজ। বুড়ো হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে। বুকের বাম দিক ফুটো হয়ে আছে, চারপাশে জমাটবাঁধা রক্ত। সাদা হয়ে গেছে মুখ, শক্ত সমর্থ চেহারা কিন্তু মলিন নয়, যেন ঘুমিয়ে আছে, জেগে উঠে রাইফেল নিয়ে ছুটে যাবে শত্রুর পিছনে। বুড়ো ওর মুখে হাত বুলোয়, বুকের ওপরে নিজের গাল বুলিয়ে বলে, আহারে, সোনা মাইনকা আঁর। এতোক্ষণে বুড়োর চোখ ভিজে ওঠে। ও দুহাতে চোখের জল মুছে ফেলে। এতোক্ষণে ওর দৃষ্টি খানিকটা স্বচ্ছ হয়েছে। ডান চোখে ছানি পড়েছে কিন্তু বাম চোখ পরিষ্কার, কোরানশরীফ পড়তে পারে। ও দেখতে পায় একটি কাগজে লেখা আছে হাবিব সিদ্দীকী, BLF No. 15151, বুড়ো বুঝতে পারে না। জামার বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। অন্য কাগজটি একটি অনুরোধপত্র। লেখা আছে, আমাদের সহযোদ্ধা হাবিব শহীদ হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য তাঁর অবদানের কথা আমরা যদি বেঁচে থাকি তবে একদিন স্মরণ করবো। অনুগ্রহ করে ওর লাশটি দাফন করবেন। আমরা ওর লাশ দাফন করার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, প্লাটুন নং ৯।

মকবুল চিঠিটা জামার পকেটে রেখে কতোক্ষণ বসে বসে কাঁদে। তারপর ভাবতে থাকে কিভাবে একে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবে? কিভাবে সুপুরির বাগানের ছায়ায় ওকে কবর দেবে? ও তখন উঠে দাঁড়ায়। ভাবে, বুড়িকে নিয়ে এলে দুজনে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যেতে পারবে। বাড়ি ফেরার পথে মকবুলের নিজের ছেলেদুটোর কথা মনে হয় — রজব আর তরফ, পিঠেপিঠি ভাই। ওরা দুজনে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে কাজ করে — একজন কাঠমিস্ত্রী, অন্যজন রাজমিস্ত্রীর যোগানদার। দুজনেই যুদ্ধে চলে গেছে। ওরা কোথায় আছে কোনো খবর নেই।

ছহিতন বুড়োর ফেরার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। কী হলো বুড়োর? মিলিটারির হাতে ধরা পড়েনি তো? ওরা ওর গলায় রশি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায়নি তো ক্যাম্পে। যেমন নিয়ে গিয়েছিলো চেয়ারম্যানকে? বুড়ি অস্থির হয়ে ওঠে। উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সুপুরির বন পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। ঠিক সে সময়ে মকবুল ধানক্ষেতের

আল পেরিয়ে খোলা জায়গাতে এসে উঠেছে। বুড়িকে দেখে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। বুড়ির কাঁধে ভর করে নিজেকে সামলে নেয় এবং এক ধরনের ভারমুক্তির তীব্রতায় নিচু কণ্ঠে গলা নামিয়ে বলে, আমাগো হোলা। বুড়োর কথা শুনে বুড়ির মনে হয় বুঝি ওদের রজব বা তরফ। তারপর ও মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয় — এই শেষ বিকেলে কিংবা সন্ধ্যার শুরুতেই ও নিজের ছেলের জন্যে শোক করতে চায় না। তবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, কী কইলেন? আঁই বুঝি ন।

মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ অইছে। এই দ্যাখ চিডি। লিখছে ইগারে মাডি দিতে।

বুড়ির শূন্য হয়ে যাওয়া বুকের ভিতরে স্বস্তি ফিরে আসতে আসতে থমকে যায়। বুড়োতো ঠিকই বলেছে, আমাগো হোলা। রজব তরফ নয়, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাতো। ওরা তো আমাদেরই ছেলে। বুড়ি নিজের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ও কেন শুধু নিজের ছেলেদুটোর কথা ভাবলো? বুড়োতো ভাবেনি।

মকবুল চিন্তিত কণ্ঠে বলে, আঁই এই লাশ ক্যামনে আইননুম রজবের মা?

বুড়ি এক মুহূর্ত চিন্তা করে। সব ক্ষুদ্রতা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে। কখনো আর এমন চিন্তা মনে স্থান দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। তারপর ক্ষিপ্র গতিতে ঢুকে যায় সুপুরি বাগানে। দুটো বড়ো পাতা সংগ্রহ করে উঠোনে নিয়ে আসে। পাশাপাশি রেখে বটি দিয়ে ফুটো করে দু'টো পাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে জোড়া লাগায়। তারপর মকবুলকে এক প্রান্ত ধরতে বলে অন্য প্রান্ত নিজে ধরে বলে, লন, এইডার উপরে রাখি টানি আইননুম।

মকবুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কতো দ্রুত বুড়ি এমন একটি সমাধানে পৌঁছে গেলো। ক্ষুদ্রাকায় এই মানুষটিকে এখন সুপুরি গাছের সমান মনে হচ্ছে, বুড়োর মনে হচ্ছে ও অনেককিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ওর বাম চোখের ছানিটা কি ভালো হয়ে যাচ্ছে? ও বুড়ির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় দেয় না ছহিতন। বলে, লন, দেরি করিয়েন না। টাইম নাই।

টাইম নাই? শব্দদুটো মকবুলের করোটিতে ঘন্টাধ্বনির মতো ঢং ঢং করে। দু'জনে সুপুরির ডোঙাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকা সড়ক ধরে যায় না — ধানক্ষেতের আল ধরে একরকম দৌড়ুতে থাকে, ওদের ভয় যে কোনো মুহূর্তে শেয়াল আসতে পারে।

সুপুরির ডোঙার ওপরে দু'জনে ধরাধরি করে লাশ ওঠায়। ওদের ভিটের চারপাশে কতো খালি জায়গা পড়ে আছে, আর একজন মুক্তিযোদ্ধার মাটি হবে না ওরা দু'জন মানুষ বেঁচে থাকতে? বুড়ো পাতার অংশ ধরে টানতে থাকে, বুড়ি পেছনের দিকটা সামলায়, যেন উল্টে পড়ে যায় না ওদের মৃত ছেলেটি। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা — টানতে কষ্ট হয়। তবু দুজনে বিচলিত হয় না, ধৈর্য হারায় না। খানিকটা পথ এলে উঁচু নিচুতে ধাক্কা খেয়ে লাশ ধান ক্ষেতের আল থেকে নিচে কাদার মধ্যে পড়ে যায়। বুড়ি কেঁদে ওঠে, আহারে আঁর সোনা হোলা।

মকবুল ধমক দেয়, কাঁদিছ না। কেউ হুইনতে হারে।

দু'জনে কাদামাখা লাশ টেনে-হিচড়ে ডোঙার ওপর ওঠায়। হাঁপাতে থাকে ওরা — পা ভেঙে আসে, যেন আজ রাতে ওরে শক্তির সবটুকু খরচ হয়ে যাবে। ওরা দম নেওয়ার জন্য বসে। বেশিক্ষণ বসতে পারে না, ভয় পাছে কোনো রাজাকার দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে যাবে লাশ। ওরা আবার সুপুরি পাতার ডোঙাটা টানতে থাকে। বাকি পথটুকু ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যায় ওরা। খোলা জায়গাটা মসৃণ। টানতে কষ্ট নেই। ছেলেবেলায় বন্ধুদের নিয়ে এটা

দুজনেরই একটা মজার খেলা ছিল। একজন আর একজনকে সুপুরি পাতার ডোঙায় বসিয়ে দিয়ে যেমন খেলতো। একটানে পৌঁছে যেতো উঠোনের এমাথা থেকে ও মাথায়। তেমনি মুহূর্ত ওদের দু'জনকে জাপটে ধরলে ওদের পায়ের ক্ষিপ্রতা বেড়ে যায়। ওরা একটানে নিজেদের বাড়ির উঠোনে পৌঁছে গেলে দুজনে বেশ নিরাপদ বোধ করে।

মকবুল বলে, বরই হাতা ছিঁড়ি আন রজবের মা। হানি গরম করন লাইগব। গোসল করাইয়ুম।

রাইতের বেলা গাছের হাতা ছিঁড়িউম? কন কি? রাইতের বেলা গাছের হরান হিরি আইয়ে না?

মুরব্বিরা যতো কতা কইছে যুদ্ধের সময় ব্যাক বদলাই গেছে। অহন ব্যাক কাজ করন যায়। অহন রাইতদিন হমান। মকবুলের কণ্ঠ।

ছহিতন বরই পাতা ছিঁড়ে আনার জন্য অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মকবুল ঘর থেকে লম্বা একটা তক্তা বের করে। কেউ হয়তো খাট বানাতে দিয়েছিল। যুদ্ধে যাওয়ার আগে রজব বেশকিছু কাঠ বাড়িতে রেখে গেছে। বলে গেছে, ফিরে এসে খাট বানিয়ে দেবে। বরই পাতা নিয়ে বুড়ি ফিরে এলে দুজনে মিলে লাশ তক্তার ওপর ওঠায়।

বরই পাতা দিয়ে গরম পানি করে ছহিতন। মকবুল কাদামাখা জামাকাপড় খুলে ফেলে। পরক্ষণে ওর মন খারাপ হয়, গোসল তো হবে, কিন্তু কাফনের কাপড় কৈ? আহারে, ঘরে একটুখানি আতর, লোবানও নেই। মকবুল ওকে সামনে রেখে নিশ্চল বসে থাকে। এতো বছরের জীবনটা কেবল অর্থহীন মনে হয়। গতকালও চাল কিনেছে। চাল না কিনে যদি খানিকটা অতর-লোবান কিনতো? কেন এমন ভুল হয়, এমন কষ্টকর ভুল! হাঁড়িতে বরই পাতা সেদ্ধ পানি নিয়ে আসে ছহিতন। বালতি ভরে পুকুর থেকে পানি আনে। মকবুল গরম পানি ঠাণ্ডা করে। গোসল করাতে করাতে ও ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, রজবের মা, কাফনের কাপড় তো নাই? ওরে কি ল্যাংটা কবরে নামাইউম।

বুড়ি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, কী কন, ক্যান ল্যাংটা নামামু?

রাগে গজগজ করত করতে ছহিতন কাদামাখা জামা-প্যান্ট নিয়ে পুকুরঘাটে যায়। অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো পরিষ্কার করে। অন্ধকারে দেখা যায় না — সেজন্য বারবার পানিতে ডোবায়, ওঠায় — একবার নিংড়ে ফেলে, আবার ধোয়, যেন কোথাও এক ফোঁটা কাদা না থাকে। ফিরে এসে বুড়োকে বলে, লন এগুলা পরাই দ্যান।

মকবুল খুশি হয়ে সার্ট-প্যান্টের কাফন পরিয়ে দেয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে।

কতো রাত ওরা জানে না। চাঁদের আলো সম্বল করে ওরা দু'জনে এখন গোর খুঁড়ছে। গোর খুঁড়তে খুঁড়তে বুড়োর বুকের খাঁচা হাঁপরের মতো ওঠানামা করছিলো। বুড়োর অবস্থা দেখে বুড়ি ওকে হাত ধরে টেনে গাছতলায় বসিয়ে দিয়ে বলে, আমনে বইয়েন। আঁই অহন দেহি।

বুড়ো আশ্চর্য হয়ে দেখে বুড়ির শরীরে অদ্ভুত শক্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। সে অনায়াসে কোদাল চালিয়ে মাটির বড়ো বড়ো চাঁই উঠিয়ে ফেলছে। বুড়ো ভাবতে চায়, শরীরের আকার ছোট হলে কি মানুষ এমন ক্ষিপ্র হয়? নাকি ছহিতনই আলাদা? অন্য আরো একশো জনের মতো নয়? শেষে ও সিদ্ধান্তে আসে ছহিতনই অন্যরকম। যেমন সাহস তেমন বুদ্ধি। আহা- পড়ালেখা শেখালে ও হয়তো জজ-ব্যারিস্টার হতে পারতো, নয় তো থানার দারোগা। কবর

খোঁড়া শেষ হতে হতে দুপুর রাত গড়িয়ে যায়। দু'জনে তক্তা টেনে টেনে লাশ কবরের কাছে নিয়ে আসে। তখন মাথার ওপর কর্কশ কণ্ঠে পেঁচা ডাকে। বুড়ি হুসহুস শব্দ করে তাড়ায়।

লাশ কবরে নামানোর আগে বুড়ো বুড়িকে বলে, জানাজায় খাড়া রজবের মা।

বুড়ি অবাক হয়, কী কন? মাইয়ালোকতো জানাজা হড়ে না।

বুড়ো খেঁকিয়ে বলে, শহীদের জানাজা অইবো না এইডা অয়নি? যুদ্ধের সময় মাইয়ালোক, বেডালোক নাই। যুদ্ধের সময় তো যুদ্ধই ধর্ম। আয়, খাড়া।

বুড়ি কৃতজ্ঞতায় বুড়োর হাত জড়িয়ে ধরে। ওতো যুদ্ধের সময় সব কাজের অংশী হতে চায় — চায় না কেউ ওকে অকারণে বাধা দিয়ে কোনো কাজ থেকে বাদ দিয়ে রাখুক। সেদিন ও সব সংস্কার ভেঙে জানাজায় দাঁড়ায়। যুদ্ধ এটা সম্ভব করে।

জানাজা পড়া শেষ হতে না হতেই ওরা টের পায়, পেছনে পায়ের শব্দ। ওরা চমকে ওঠে। বুড়ো বুড়িকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু একটু পরই ওরা বুঝতে পারে যে এটা মিলিটারির পায়ের শব্দ না, ওরা এলে মাটি কেঁপে যেতো — ওদের বুটের শব্দ কঠিন। এটা রাজাকারের পায়ের শব্দ নয় — ওদের নিমকহারামি মাটি সহ্য করে না — মাটি ওদের উপড়ে ফেলতে চায়, ওদের পায়ের শব্দ মাটিতে আছড়ে পড়ার মতো, যাতে প্রতি মুহূর্তে পা ডেবে যায়। এটা ওদের পায়ের শব্দ, যাদের শব্দ মাটি বুকে টেনে নেয়, গভীর মমতায় নিজেরে ভেতর শুষে রাখে — নিঃশব্দে, হালকা হয়ে যায়, শত্রু বুঝতেই পারে না যে ওরা কাছে না দূরে, ওরা আছে কি নেই। ওরা পাঁচজন কাছে এসে দাঁড়ায়। রজব বলে, মা, আমরা আইছি।

তোমরা আইছো সোনামনি। ছহিতন ছিটকে ওঠে। ওদের ভয় কেটে যায়। হাবিবের লাশের কাছে দাঁড়িয় রজব আত্মতৃপ্তির স্বরে বলে, আঁই কইছিলাম না, আর কেউ না কইল্লেও আঁর বাপ-মায়ে টের হাইলে অকগা ব্যবস্থা অইবো।

বাকি তিনজন ছেলে ওদের পা ধরে সালাম করে।

সাহাব বলে, আমরা একটি শত্রুঘাঁটি মুক্ত করেছি চাচা। ওরা পিছু হটে যাওয়ার সময় গুলি করতে করতে ফিরছিলো। গুলি হাবিবের বুকে লাগে। রজব আর তরফ বলছিলো কাছেই ওদের বাড়ি, কিন্তু তখন আমাদের অপেক্ষা করার সময় ছিলো না। তাই হাবিবের লাশ রেখে যেতে হয়েছিলো আমাদের। আমরা জানতাম না যে ওর লাশের খোঁজে আবার আসতে পারবো। আমাদের কী সৌভাগ্য যে আপনাদের মতো বাবা-মা পেয়েছি।

বুড়ি প্রতিবাদ করে, সৌভাগ্য কও ক্যান বাবা? যুদ্ধের সময় সৌভাগ্য নাই। ব্যাকই যুদ্ধ।

ঠিকই বলেছেন মা। আপনারা বারান্দায় গিয়ে বসুন। লাশ আমরা কবরে নামাবো।

আইচ্ছা।

দুজনে পিছু হটে দাঁড়িয়ে থাকে। রজব আর তমিজ লাশ নামাবার উদ্যোগ করতেই সাহাব চেঁচিয়ে বলে, থামো, রজব, থামো।

কী হয়েছে? সবাই চমকে ওর দিকে তকায়।

আমরা ওকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করবো। সবাই লাইন করে দাঁড়াও।

ওরা সবাই লাইন করে দাঁড়ালে বুড়োও এসে ওরে সঙ্গে দাঁড়ায়। বুড়ি অসহায়ভাবে পিছনে দাঁড়িয় থাকে। ওর কান্না পায়। ও কেন সামরিক কায়দায় স্যালুট করতে পারবে না?

ও সামরিক লোক নয় বলে? বন্দুক ধরলেই যুদ্ধ হয়? সহযোগিতা করলে সামরিক লোক হওয়া যায় না? অভিমানে বুড়ির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এমন সময় সাহাব ওকে ডাকে, চাচী, আপনিও আসেন। আপনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ওহ্, কী আনন্দ! বুড়ি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বুড়ি দ্রুতপায়ে ওদের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। সাহাব সামনে গিয়ে চাপা কিন্তু দৃঢ় স্বরে জয় বাংলা বলে স্যালুট করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও, মকবুল এবং ছহিতনও ওদের দেখাদেখি ডান হাত ওঠায় এবং ডান পা তুলে মাটিতে আঘাত করে। কাজটি করতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে দু'জনে। যুদ্ধ ওদের নতুন মানুষ করে দেয়।

লাশ দাফন হয়ে যায়। ছেলেরা ওদের বলে, আবার যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন করতে হয় তখন এমন করে স্যালুট দেবেন। যদি আর কেউ না থাকে, আপনারা দু'জনেই দেবেন।

আমরা দুইজন?

হ্যাঁ দু'জনেই। এভাবেই আমরা শহীদদের সম্মান জানাবো। জানবেন, আপনারাও মুক্তিযোদ্ধা।

এরা এসব কী বলছে? ওদের এতোকিছু করার আছে? মকবুল এবং ছহিতন বিশ্বাস করতে পারে না। সবাই বারান্দায় গিয়ে বসলেও ছহিতনের কাজ ফুরোয় না। ও সুপুরির ডোঙা দিয়ে ঢেকে দেয় কবর, যেন এখানে একজন মুক্তিযোদ্ধা ঘুমিয়ে আছে কোনো রাজাকার বা খানসেনা জানতে না পারে।

গোলচাঁদ উঠেছে আকাশে। ছেলেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে — কেউ বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে চিৎপাত শুয়ে আছে। রজব আর তরফ বাবাকে যুদ্ধের গল্প বলছে। ওদের বাবা কোনোদিন যুদ্ধ দেখেনি। দাঙ্গা দেখেছে, মারামারি দেখেছে — কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মকবুল শুধু কান দিয়ে নয়, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ওদের কথা শুনছে। ছহিতন ফিরে এলে ছেলেরা বললো, মা, খিচুড়ি রাঁধেন।

ছহিতনের ক্ষিপ্রতা অপরিসীম। দ্রুত চাল-ডাল ধুয়ে নিয়ে আসে। এক চুলোয় খিচুড়ি বসায়। ছোট তোলা-চুলোয় ডিম সেদ্ধ করে। অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যায় খিচুড়ি আর ডিমের তরকারি। কে যেন গুনগুনিয়ে গান করছে, আমার সোনার বাংলা...

ছহিতন কান খাড়া করে গান শোনে। ও ভুলে যায় যে একটু আগে ওরা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে কবর দিয়ে এসেছে। ছেলেদের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে মকবুলেরও মনে হয় যুদ্ধ মানুষকে কতো বদলে দেয়। এই মুহূর্তে এ বাড়িতে প্রতিটি মানুষের শোকে স্তব্ধ হয়ে থাকার কথা ছিল, কিন্তু তা হচ্ছে না। এবং এই না হওয়াটাকেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে মকবুলের। চমকে ওঠে ভিতরে ভিতরে। ভাবে, যুদ্ধতো ওকেও অনেক বদলে দিয়েছে। ও নিজেওতো আর আগের মানুষ নেই। বাতেন বলে, অনেকদিন পর আজ বেশ ভালো লাগছে। হাবিবের কবর হয়েছে, আমাদের জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। একটু পর নতুন উদ্দীপনায় আমরা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবো।

মকবুল দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে, তোমরা যে মউতেরে জয় করলা, তাইলে এইটাই কি

যুদ্ধের জিত?

ছেলেরা মকবুলকে ঘিরে বসে। বলে, চাচা আপনি ঠিক বলেছেন আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি। যুদ্ধ আমাদের বুকের ভেতরটা উল্টেপাল্টে দেয়। আমরা নতুন করে অনেক কিছু শিখি।

ছহিতন গামলা-ভরা খিচুড়ি নিয়ে আসে। খেতে খেতে গল্প হয়। রাত ফুরিয়ে আসতে থাকে। ওদের যাবার সময় হলো। ছহিতন গামছায় করে এক পোটলা মুড়ি বেঁধে দেয় ওদের জন্য। যাবার সময়ে সাহাব বলে, আমরা আবার আসতে পারি। কিংবা অন্য কেউ আসতে পারে। আপনারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। আসি। জয় বাংলা।

মকবুল বলে, জয় বাংলা। ছহিতনও বলে।

ওরা মেঠো পথে নেমে যায়। দুজনে ঘাসের ওপর উবু হয়ে বসে থাকে। যতোক্ষণ ওদের দেখা যায় তাকিয়ে থাকে। ওরা ঘর বারান্দা উঠোন আলোকিত করে রেখে চলে গেছে। এতো আলো ওদের জীবনে দেখা হয়নি।

ছহিতন মকবুলের দিকে তাকায়, ওরা কইলো আবার আইবো। কোনদিন আইবো?

মকবুল মাথা নাড়ে, যুদ্ধের কোনো সময় যায় না। কে জানে কবে আইবো।

আমাগো জাগি থাকন লাইগবো।

মকবুল সায় দেয়, হ্ ঠিক। আমরা পালা করি গুমাইউম। তুই কতোক্ষণ, আঁই কতোক্ষণ।

ছহিতনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাড়ি ফেরার পথে ওরে মনে হয়, যুদ্ধতো এভাবেই করতে হয়। ওদের কাছে যুদ্ধের মানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করে থাকা।

তখন লোকটি এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। মকবুলকে এক শিসি আতর আর এক প্যাকেট লোবান দিয়ে বলে, চাচা রাখেন।

মকবুল খুশিতে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে, তুমি পোলাডা খুব ভালা। ক্যামনে যে জাইনলা আঁই এইডা চাই।

ছহিতন ওকে পিঁড়ি এগিয়ে দেয়, বসো বাবা। এতোদিন আসো নাই ক্যান? খিচুড়ি খাইবা?

খাবো চাচী। আগে এক গ্লাস পানি দেন।

আহারে সোনা, মেলা দূর থাকি আসছ বুঝি?

হ্যাঁ, অনেকদূর।

ছহিতন ঘরে যায়। সানকিতে করে খিচুড়ি আর ডিম নিয়ে আসে। লোকটি খাওয়া শেষ করলে রাত ফুরিয়ে যায়। বলে, আপনারা একটুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন।

মকবুল, না, না বাবা। কেউ যদি আসে।

আমি জেগে থাকবো। আপনারা ঘুম থেকে উঠলে তবে যাবো।

এইডা কেবুম অয় যে আমরা ঘুমাইডম আর তুমি জাগি থাইকবা?

আমিতো আপনাদের ঘুম পাড়াবো বলেই এসেছি। আবার মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। আপনাদের সামনে অনেক অনেক কাজ। সারারাত খাটুনি গেছে একটু ঘুমুতেই হবে। যান। দেরি করবেন না। আমার আবার যেতে হবে।

বুড়ো বুড়ির দিকে তাকায়। বুড়ি বলে, আপনে যান।

তুমি যাইবা না?

হ্যাঁ যাবে।

লোকটির আদেশ। বুড়িও ঘরে ঢোকে।

বিছানায় শুতে না শুতে দু'জনের ভীষণ ঘুম পায়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবে, এটাই হয়তো দুজনের একসঙ্গে শেষ ঘুম। লোকটি আবার কবে আসবে কে জানে? দুজনের একসঙ্গে ঘুমুনো হয়তো হবে না। একজনকে না একজনকে জেগে থাকতেই হবে। ওরা বেঁচে থাকতে মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ শেয়াল-কুকুরে খুবলে খাবে না।

ওদের ঘুম পাড়িয়ে লোকটি পথে নামে।

৮

নিখিল দেখতে পায় সাদা কুয়াশার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একটি মানুষ, তার পরনে সাদা লুঙি, গায়ে পাঞ্জাবি, সাদা চুল-দাড়ি, কিন্তু লোকটি উড়ে নয়, দৌড়েও নয়, লোকটি হেঁটে আসছে। নিখিল বুঝলো খানিকটুকু দৌড়োনোর পর ও আর দৌড়াতে পারছে না। কিংবা খানিকটুকু দৌড়ানোর পর ও মনে করছে দৌড়াবো কেন? মিলিটারিকে ঠেকিয়ে দেইনা কেন? আমার দেশে তোমরা কারা? তোমরা দখলদার। তোমরা আমাকে হটাতে পারো না। হটাতে চাইলেই আমরা হটে যাবো না। নিখিল স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে এই শেষ মানুষটির সঙ্গে ওকে পালাতে হবে। এতোক্ষণে সচেতন হয় এবং বাঁচার জন্য ওর প্রাণ আকুলিবিকুলি করে। ততোক্ষণে শেষ মানুষটি ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। আশ্চর্য ইনিই তো আবদুর রহমান। ধমকের সুরে বলে, আপনি এখনো বাড়ি যাননি নিখিল বাবু?

কি হয়েছে? কোন পর্যন্ত মিলিটারি এসেছে? বাজারে?

না, বাজারে নয়। শোনা গেছে স্টেশনে এসেছে। তাতেই গুজব ছড়িয়েছে। আসলে কেউ দেখেনি। সবাই বলছে একজন আর একজনের কাছে শুনেছে।

ও রটেছে। তবে কি জানেন যা রটে তার কিছু না কিছু ঘটে। আসেনি তো আসবে। ওরা হয়তো কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে গেছে। তাই না?

হবে হয়তো। আবদুর রহমানের বুকের হাঁফ তখনো কাটেনি। ভয়ে, আতঙ্কে সেটা আরো জমাট হয়ে আছে। সহজে কাটবে বলে মনে হয় না। তবু দুজনে যতোটা সম্ভব দ্রুত পায়ে বাড়ি ফেরে।

তখন ভরদুপুর। নিখিল হাঁফাতে হাঁফাতে উঠোনে ঢোকে। সরলা স্নান সেরে গামছা দিয়ে ভিজে চুল ঝাড়ছে। নিখিলকে ঢুকতে দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে।

কি হয়েছে?

নিখিল সরলার ভেজা চুল এবং সাদা সিঁথি দেখে থমকে যায়। সরলা যখন আবার বলে, কি হয়েছে? তখন নিখিল খেঁকানো কণ্ঠে বলে, তোমার সিঁথি সাদা কেন?

মাত্র তো চান করলাম। এখন সিঁদুর দেবো।

অ। নিখিল হাঁফ ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সরলা তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

নিখিল চোখ গোল করে বলে, আমাদের স্টেশন পর্যন্ত মিলিটারি এসেছে বলে গুজব রটেছে।

মিলিটারি! আর্তচিৎকার ছড়িয়ে যায় সরলার কণ্ঠে। ছুটে আসে ওরা তিনজন, কি হয়েছে মা?

সর্বনাশ।

আহ্ দেবেশের মা সর্বনাশ এখনো হয়নি।

কি হয়েছে বাবা?

মিলিটারি—

মিলিটারি? ওরা তিনজনে দৌড়ে ঘরে ওঠে।

কে দেখেছে মিলিটারি?

কেউ না, সবাই শুনেছে।

মিলিটারি এলে আমরা টের পাবো। ওরা গুলি করতে করতে আসবে।

আগুন দিতে দিতে আসবে।

মানুষ মারতে মারতে আসবে।

আমরা কি করবো গো?

গুলির মুখে তো কিছু করতে পারবো না।

তাহলে?

যদি বাড়িতে আসে, যদি ধরে নিয়ে যায়, সেজন্যে কিছু উপায় বের করতে হবে। যাই, স্নান করে আসি। মাথাটা কেমন জ্বালা করছে।

আজ আর গায়ে তেল মাখার জন্য অপেক্ষা করে না নিখিল। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে মাথায় জল ঢালতে থাকে। সরলা গামছা, লুঙ্গি নিয়ে আসে। নিখিল জল ঢালছে তো ঢালছেই। ওর গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, থলথলে শরীর। ঘি ভাত খেয়ে ভুঁড়িটা ইচ্ছেমতো বড় হয়েছে। সরলা নিখিলের শরীরে জল গড়াতে দেখে। খুব সুন্দর লাগছে মানুষটাকে। এতো বছর বয়সেও রঙ মজে যায়নি। জল ধুলোবালি ধুয়ে নিয়ে গেলে সে রঙ আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সরলার গায়ের রঙ এতো উজ্জ্বল নয়, ও শ্যামলা। বয়সের কারণে শ্যামলা রঙের চকচকে আভা নষ্ট হয়ে কালো হয়ে গেছে। এখন সরলাকে কালোই বলা যায়। তার ওপর রাতদিন রান্নাবান্নার কাজ করতে করতে নখগুলো নষ্ট হয়েছে। হাতের পিঠে রগগুলো জেগে উঠছে, কব্জীর হাড়টাও উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকে। সরলার চেহারায় লাবণ্যও নেই। একদম ভেঙে গেছে। সরলার এসব ভাবনার মাঝে ও খেয়াল করেনি যে নিখিল গামছার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

কি হলো, কি ভাবছো? গামছা দাও।

নিখিল গা মুছতে মুছতে বলে, ভয় কি দেবেশের মা, অনেক দিন তো বাঁচলাম। এখন মরণ যদি দোরগোড়ায় এসেই থাকে কি আর করা। আমার কোনো দুঃখ নেই।

আমারও নেই। কিন্তু মেয়েগুলো?

ওদের জীবন পড়ে আছে। আমি তা ভেবেছি। একটা বুদ্ধি ঠিক করলাম। চান করার পর

মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছে। এখন আমি কিছু ভাবতে পারছি।

কি মনে এসেছে?

ভাত দাও। আগে ভাত খেয়ে নেই।

আজ ওরা সবাই মিলে রান্নাঘরের দরজা আটকে ভাত খেলো। নিখিলের মনে হলো সরলা আজ দারুণ রেঁধেছে। ওর শরীরে দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এসেছে। কারো সাধ্য নেই ওর মেয়েদের ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার। ও বুঝতে পারছে মেয়েরা খেতে পারছে না। ও চেঁচামেচি করে, কিরে তোরা খাচ্ছিস না কেন? পেট ভরে খা।

খিদে নেই বাবা।

খিদে নেই? বলিস কি? কি সুন্দর রেঁধেছে তোর মা! গন্ধেই তো খাবার ইচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। নে, আরো ভাত নে।

সুষমার মনে হয় নিখিল ওদেরকে ভাত খেতে বলছে না। ভাত খেতে বলার পেছনে নিখিলের একটি উদ্দেশ্য আছে। যেন সুষমাকে বলছে, তোমার যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে মুছে ফেলো সিঁথির সিঁদুর, কপালের ফোঁটা। শত্রুকে বুঝতে দিওনা তোমার চিহ্ন। শত্রুকে চিনতে দিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি, কিন্তু শত্রুকে কৌশলে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের জয়। যে কাজটি করবে তার জন্যে মনে কোনো দ্বিধা রেখো না, কোনো সংস্কার প্রশ্রয় দিয়ো না, কোনো আশঙ্কাও যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। মনে রেখো সবকিছুর উপরে জীবন অনেক বড়। মানুষের দ্বিধা কেটে যায়, সংস্কারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, আশঙ্কা বিতাড়িত হয় কিন্তু জীবন একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। ভেবে দেখো কি করবে?

সুষমা কোঁত করে একগ্রাস ভাত গিলতে গেলে বিষম খায়। সরলা ওকে জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়। ও কাশতেই থাকে, ওর কাশি থামতে চায় না। সরলা হাতের তালুতে জল নিয়ে ওর মাথা চাপড়ে দেয়। বলে, বুঝেছি ছেলেটা তোকে মনে করছে।

হ্যাঁ, তাই হবে। দুঃখে–আনন্দে ছেলেমেয়েরা মা, মা, করেই ডাকে।

নিখিলের কণ্ঠে সুষমার কাশি থেমে আসে। নিখিলের কথায় সুষমার ভাবনা ভিন্ন প্রেক্ষিত পায়। ওর মনে হয়, তাইতো ওর এতো আশঙ্কা কেন? ওর ছেলে যুদ্ধ করছে। ও একজন মুক্তিযোদ্ধার মা। এ বাড়িতে ওর গৌরব সবচেয়ে বেশি। ও আবার একটা ধাক্কা খায়, মিলিটারির কাছে ওর অপরাধ সবচেয়ে বেশি এবং এই অপরাধের শাস্তি – মৃত্যু। সুষমার কাশি আবার বেড়ে ওঠে। ও কাশতে কাশতে বাসন নিয়ে উঠে যায়। এক লোকমা ভাত ও বাড়ির বেড়ালটাকে দিয়ে দেবে।

মেয়েটা ঠিকমতো খেতে পারলো না।

এতো উৎকণ্ঠা নিয়ে খাওয়া যায় না বাবা।

সরস্বতী নিজের বাসন নিয়ে সুষমার পিছু পিছু চলে যায়। দুজনে কুয়োতলায় বসে কিছুক্ষণ কাঁদে। দুজনেরই মনে একরকম দুঃখ। অদৃশ্য কারো প্রতি ওদের রাগ। ওরা দু'জনে বাসনের বাকি ভাতটুকু বেড়ালটাকে দেয়। ওটা চেটেপুটে খেয়ে ফেলে। দুজনেই ভাবে, আহা বেচারার খুব খিদে পেয়েছে। দুজনেই অবাক হয়ে অনুভব করে ওদের ভেতরটা বেড়ালের মতো মিউ মিউ করছে। তখন লক্ষ্মী এঁটো বাসনকোসন নিয়ে কুয়োতলায় আসে। তিনজনে মিলে সেগুলো ধুয়ে ফেলে। একটা কাজ পেয়ে ওরা নিজেদের ভাবনা থেকে মুক্তি পায়।

কিছুক্ষণের জন্যে তিনজনে বেড়ালের গল্পে মেতে ওঠে। ছেলেবেলায় কালো বেড়াল দেখে ভূতের ভয় পাওয়া থেকে শুরু করে বেড়ালের বাচ্চা হতে দেখা ইত্যাদি কোনো কিছু বাদ থাকে না।

ধোয়াপালার কাজ হয়ে গেলে নিখিল ওদের নিয়ে বাগানে আসে। ওর পরিকল্পনার কথা বলে, এখনই একটা বড় গর্ত করার কাজ শুরু করবো আমরা। গাঁয়ে মিলিটারি আসার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে নিয়ে সুষমা ঐ গর্তে ঢুকে যাবে। পুরোন বড় ঝাঁকাটায় শুকনো পাতা বোঝাই করে রাখা হবে। ওরা গর্তে নেমে গেলে ঝাঁকাটা গর্তের মুখে দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হবে। শুকনো ডালপালা, বাঁশ, আবর্জনা পড়ে থাকবে গর্তের পাশে। ওরা বুঝতেই পারবে না যে এখানে কেউ লুকিয়ে আছে। ঠিক আছে?

বাবা আমি ঐ গর্তে ঢুকতে পারবো না। লক্ষ্মী কেঁদে ফেলে।

এতো ভয় নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? তারচেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

সরস্বতীর গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। সুষমা দাঁতের ফাঁকে আঁচল কামড়ে ধরে রাখে। ও কিছু বলে না। সরলা লক্ষ্মীকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কাঁদিস কেন হারামজাদী?

মাগো, ওটা কবরের মতো গর্ত।

চুপ কর। সরলার ঝাঁঝালো কণ্ঠ।

আহ্ বকছো কেন? আয় মা আমরা কাজ করি। মনে রাখিস এটা যুদ্ধের সময়। এ সময় বাঁচার কৌশল শিখতে হয়।

নিখিলের নরম কথায় ওরা তিনজনে শান্ত হয়। নিখিল কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে। ওরা ঝুড়ি ভরে মাটি নিয়ে উঠোনের এক কোণে ফেলতে থাকে। কাল থেকে ঐ মাটির উপর ছাই ফেলা হবে এবং সরলা সেখানে লাউয়ের চারা লাগাবে। দু'দিনের মধ্যে সুন্দর একটি গর্ত বানিয়ে ফেলে ওরা। প্রথমে নিখিল ওই গর্তে ঢুকে পরীক্ষা করে। বলে, বেশতো মাটির নিচের ঠাণ্ডা ঘরের মতো লাগছে। নেমে আয় লক্ষ্মী।

না বাবা আমি না। দিদি নামুক।

সরস্বতী নামে না। দাঁড়িয়ে থাকে। সরলা রেগে বলে, ঠিক আছে আমি নামছি।

নিখিল সরলাকে হাত ধরে নামায়। চেঁচিয়ে বলে, ভারী সুন্দর গর্ত হয়েছে রে লক্ষ্মী। তোরা এখানে বসেই বেঁচে যাবি।

আমরা শেয়াল হতে পারবো না। ওটা শেয়ালের গর্ত।

সরস্বতী নিচুকণ্ঠে কথা বলে। নিখিল এবং সরলা শুনতে পায়। ভেতর থেকে নিখিল ওদের বলে, শুকনো পাতার খাঁচাটা গর্তের ওপর দিয়ে দে, দেখি কেমন লাগে।

তিনজনে খাঁচাটা টেনে গর্তের মুখে দিলে একগাদা ধুলোবালিতে ওদের গা ভরে যায়। সরলা দু'হাতে চোখ কচলায়। নিখিল অনবরত থুতু ফেলতে থাকে, মুখ ভরে গেছে ধুলোয়। চোখ কচলে সরলা বলে, মাগো কি অন্ধকার।

গর্তে তো অন্ধকারই হবে। আলো পাবে কোথায়?

মেয়েরা ভয় পাবে।

পাবে না। যে ভয়ে ওরা এই গর্তে ঢুকবে সে ভয়ে ওদের সামনে থেকে অন্ধকার মুছে যাবে। অন্ধকারই আলো হবে ওদের সামনে।

ধুত, গীতার মতো কথা বলছো। মনে হচ্ছে যেন পুরোহিতের মন্ত্রপড়া। মাঝে মাঝে

তোমার মাথায় বায়ু চড়ে।

থামো। সুযোগ পেলেই কেবল বকবক।

মা, তোমরা কি গর্তে বসে ঝগড়া করছো?

সরস্বতী উপর থেকে ডাকে।

না তো ঝগড়া করবো কেন?

উঠে আসবে না?

আর একটু থাকি।

শোনা যায় ওরা তিনজনে উপরে বসে হাসছে। ভেতরে দু'জনের চোখে অন্ধকার সরে গেলে ওরা নিশ্চিত ভার অনুভব করে। ভাবে, এখানে বেঁচে থাকার কোনো ভয় নেই, যুদ্ধের সময় এসব জায়গাকে বাসযোগ্য করে তোলে যায়। দুজনে দুজনের হাত ধরে। নিখিল ফিসফিসিয়ে বলে, দেবেশের মা যুদ্ধের সময়ে আমি যদি হারিয়ে যাই তাহলে তুমিও সুষমার মতো আমাকে বাঁচিয়ে রেখো।

বালাই ষাট, কি সব অলুক্ষণে কথা।

নিখিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমরা কি মেয়েটার প্রতি অবিচার করেছি?

অবিচার? কার কথা বলছো?

সুষমা। আহারে, মেয়েটা বিশ বছরের আগেই বিধবা হয়ে গেলো।

বিধবা? আমার দেবেশ কি মরে গেছে? ওতো হারিয়ে গেছে।

নিখিল চুপ করে থাকে। তাইতো, ওরা তো কখনো মনে করে না যে দেবেশ মরে গেছে। তাহলে এই গর্ত ওকে কেন মৃত্যুর কথা মনে করাচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে সুষমা মিছেই অপেক্ষা করছে? নিখিলের প্রচণ্ড অনুতাপ হয়। আসলে গর্ত তো জীবিত মানুষের জন্য নয়। গর্তে ঢুকলে মানুষের মৃত্যুর কথাই মনে আসে। ওর দোষ কি, ও মনে মনে ভগবানের কাছে ক্ষমা চায়। সরলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, দেবেশের মা চলো উঠি। ও সরলার গাল নিজের গালে চেপে ধরে, মুছে দেয় চোখ। বলে, যুদ্ধের সময়টা আমাদের দুঃখ – বেদনা বাড়িয়ে তোলে। দেবেশের মা, আমরা কি ভুলে গেছি কতো বছর আগে এ বাড়িতে আমাদের জীবনের শুরু হয়েছিলো?

আমার মনে নেই। বছরের হিসেব আমি রাখতে পারি না। আমার বয়সইবা কতো হলো তাওতো আমি জানি না।

মা, কি হলো তোমাদের?

লক্ষ্মীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে আসে।

কিছু হয়নি মা। আমরা বুঝে দেখছি তোমরা এখানে কতোক্ষণ থাকতে পারবে।

লক্ষ্মীর কান্না জড়ানো কণ্ঠ, আমি কিছুতেই ওখানে নামবো না। তোমরা উঠে এসো।

গর্ত থেকে ওরা কোনো কথা বলে না। সুষমা বলে, তোদের দু'বোনকেই থাকতে হবে। আমাকে হবে না।

কেন? দু'বোন বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়।

আমার ছেলে যুদ্ধ করছে। আমার বয়স হয়েছে না। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি।

তুমি এখনো অপূর্ব সুন্দরী বৌদি, দু'বোনের চোখেমুখে মুগ্ধতা ঝরে পড়ে। সরস্বতী ফিসফিসিয়ে বলে, তোমার এতো রূপ ভগবানেরও সহ্য হয়নি। তোমার আর বয়স কি?

আমার চেয়েও কম বয়সে তুমি মা হয়েছিলে।

সরস্বতী চুপ কর। সুষমার কণ্ঠ কেঁপে যায়।

লক্ষ্মী খিলখিলিয়ে হেসে বলে, মিলিটারি এলে তোমাকেও পালাতে হবে। রক্ষা নেই বৌদি।

সুষমা আর দাঁড়ায় না। ঘরে চলে আসে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর লজ্জা করছিলো, ভীষণ কান্নাও পাচ্ছিলো। উনিশ বছর ধরে এই হারিয়ে যাওয়া মানুষটি ওকে কাঁদালো, অভিমানী করলো। সুখের স্মৃতিতে ওর শরীরে কাঁপন জাগিয়ে দিলো। ও ঘরে এসে খাটের নিচ থেকে ওর পুরনো বাক্সটা টেনে বের করে। এ টিনের বাক্সটায় দেবেশের কাপড়-চোপড়, বই খাতা ইত্যাদি রাখা আছে, সঙ্গে আছে কতোগুলো চিঠি, চারটি কবিতা, দেবেশের নিজের লেখা। কখনো চিঠি না লিখে ও কবিতা পাঠিয়ে দিতো। পুরনো কাপড়ের সোঁদা গন্ধে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সুষমা। কতোক্ষণ যে কাপড়গুলো বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে ও জানে না। সে কাপড় চোখের জলে ভিজে গেলে চিঠির পোঁটলাটা বের করে। চিঠিগুলো কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে ও। কাগজ লালচে হয়ে গেছে – কালি ফ্যাকাসে, তবু মুক্তোর দানার মতো হাতের লেখা স্পষ্ট হয়ে থাকে কাগজের ওপর। প্রথম কাগজের ভাঁজ খুললে ওর প্রিয় কবিতাটি পেয়ে যায়। বিড়বিড় করে পড়ে সুষমা : 'হীরণ পয়েন্টে সে বালক তাকে বললো/ তুমি এক অপূর্ব হরিণী/ তোমার ডাগর চোখে সূর্যের ছায়া/ বালিকার খিলখিল হাসিতে/ মেতে ওঠে সাগরের জল/ বলে মায়ার হরিণ তুমি/ আমার ডাগর চোখে তোমার ছায়া।' কতোবার এ কবিতা পড়েছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। দেবেশকে ও বলতো, তুমি কেমন কবিতা লেখো আমি যে কিছুই বুঝতে পারি না? দেবেশ হাসতে হাসতে বলতো, একদিন বুঝতে পারবে, যখন তুমি বড় হবে। জানো আমার বন্ধুরা বলে, আমি ভালো কবিতা লিখি। তুমি দেখো একদিন আমি অনেক বড় কবি হবো। চিঠিগুলো আবার ভাঁজ করে বেঁধে রাখতে থাকে সুষমা। বড় কবি হওয়ার জন্য কি দেবেশ বনবাসে গেলো? এখন সুভাষও নেই। সুভাষ ফিরে এলে ছেলের হাতে বাবার কবিতাগুলো দেবে। ও পারবে পত্রিকায় ছাপাতে, তারপর একটা বই হবে দেবেশের, কবি দেবেশ সরকার। সুষমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ও বাক্সটা বন্ধ করে আবার খাটের নিচে ঠেলে দেয়। সরস্বতী এসে ওর পেছনে দাঁড়ায়, বৌদি? আবার তুমি দাদার বাক্সটা খুলেছো? তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।

আমি কাঁদছি না সরস্বতী। তোমার দাদার কবিতাগুলো দিয়ে একটা বই করা যাবে কিনা সেটা ভাবলাম।

তুমি কি পাগল হয়েছো? দাদার কবিতা কে পড়বে? একটা পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

কেন গাঁয়ের গোপাল হালদার বুঝি কবিগান গায় না।

ধুৎ, ওসব দিয়ে কি হবে।

কেন হবে না সরস্বতী, লোকে তোমার দাদার কথা মনে করবে।

চলো, মা তোমাকে ডাকছে।

সরস্বতীর আচরণে দুঃখ পায় সুষমা। দুঃখ পেলে ও আর কথা বলতে পারে না। সরস্বতী কি ভাবলো দেবেশকে নিয়ে ও আদিখ্যেতা করলো? ভাবলো কি কবিতার কথা সুষমার মুখে শোভা পায় না?

কি হলো ওঠো মা ডাকছে?

কেন?

সুষমার কেন শুনে থমকে যায় সরস্বতী, বুঝতে পারে সুষমা আহত হয়েছে। অনুনয়ের স্বরে বলে, ওঠো বৌদি। গর্তটা দেখার জন্য মা ডাকছে।

আমি গর্ত দেখতে পারবো না বলে সুষমা খাটে শুয়ে বালিশে মুখ গোঁজে, ওর দীঘল কালো চুল ছড়িয়ে থাকে। সরস্বতী দেখে ওর চুলের কালচে আভা চিকচিক করছে। ঈর্ষায় ওর বুক পুড়ে যায়। এখনতো ফুটে ওঠার কথা ওর, কিন্তু সুষমার দিকে তাকালে নিজেকে ম্লান মনে হয়। ও সুষমাকে আর না ডেকে চুপচাপ পা ফেলে বেরিয়ে যায়। ও যে বিরক্ত হয়েছে এটা স্পষ্টত প্রকাশ করে সুষমা। হোক না শ্বশুরবাড়ি, তাতে কি, রাগতো ওরও আছে। কষ্ট আছে, অপমান বোধ আছে। প্রকাশ করবে না কেন? সরস্বতী কেন কথা বলবে দেবেশের কবিতার বিরুদ্ধে? আজ দেবেশ বেঁচে থাকলে কি বলতো? ওহ্ দেবেশ বেঁচে থাকলে ও কবিতা নিয়ে গর্ব করতে পারতো। ও না বুঝলে কি হবে, দেবেশ তো সুন্দর লিখেছে। সুষমা দেবেশের কথা ভেবে আকুল হয়ে কাঁদলো। ওর কান্নার শব্দ শুনলো সবাই, কিন্তু কেউ ওকে বিরক্ত করলো না। উল্টো সরস্বতী বকা খেলো মায়ের কাছে। নিখিল চুপচাপ বসে রইলো বারান্দায়।

বিকেলে লক্ষ্মী বললো, বাবা গণেশরা ইণ্ডিয়া চলে গেছে কাল রাতে।

আমাকে তো কিছু বলেনি। ওর বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কাউকে কিছু বলেনি বাবা। বাড়িটা নাকি কেরামত মোল্লা দেখাশুনা করবে।

কেরামত মোল্লা?

তাইতো শুনলাম।

মেয়ের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে নিখিল পুরো খবর নেবার জন্য পেরিয়ে পড়ে। সরলা পিছু ডাকে। ও দাঁড়ায় না। আসছি, বলে ছুটতে থাকে। এতোদিন ধরে একসঙ্গে বাস করছে অথচ এমন নীরবে চলে গেলো গণপতি? ওকে একটু বললে কি হতো? ও কি গণপতির শত্রু? আশ্চর্য, মানুষ এমন হয় কি করে? এতো স্বার্থপর? নিখিলের আবেগ বাধা মানে না। হাজার বুড়বুড়ি ওঠে ওর মনের ভেতর। শেষে ও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে যুদ্ধের সময়টাই এমন। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যুদ্ধের সময় বাতাসের কান গজায়, গাছেরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়, মাটি কথা বলে এবং মানুষেরা একে অপরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়। গণপতির উঠোনে কেরামত মোল্লা আরো কয়েকজনকে নিয়ে তাসের আড্ডা বসিয়েছে। জুয়োও খেলতে পারে, কে জানে। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। ভেতরে ঢোকার সাহস হয় না ওর। বুকটা খাঁ-খাঁ করে ওঠে। হাতের তালুতে চোখ মোছে। ফেরার পথে আবদুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয় ওর।

আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম নিখিল বাবু। শুনলাম আপনি এদিকে এসেছেন।

গণপতি চলে গেছে।

শুনেছি। দেশ স্বাধীন হলে আবার ফিরবে। গণপতি আপনার মতো শক্ত না। ভয়েই বেচারার অসুখ হয়ে গিয়েছে। আমাশা, কতোকিছু করলো ভালো হয় না।

আমাশা নিয়ে কি শরণার্থী ক্যাম্পে থাকতে পারবে?

মনের শান্তি তো হবে। ভালোই হয়েছে গিয়েছে। ওর মনের শান্তি দরকার। চলেন, কোথাও একটু বসি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে ধানক্ষেতের আলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আবদুর রহমান গলা ঝেড়ে বলে, সত্যি

সত্যি আমাদের স্টেশনে মিলিটারি এসেছে। ওরা ক্যাম্প করেছে। গতকাল মোস্তফা চিঠি পাঠিয়েছে। সুভাষও চিঠি দিয়েছে। এই আপনার চিঠি।

আবদুর রহমান পায়জামার ফিতার ভেতরে পেঁচিয়ে রাখা এক টুকরো কাগজ বের করে নিখিলকে দেয়। নিখিল ওটা বিড়ির কাগজের মধ্যে পেঁচিয়ে রেখে কোমরে গুঁজে ফেলে। বাড়িতে গিয়ে পড়বে। আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলে, মোস্তফা লিখেছে আপনাকে যেন কলেমা তৈয়ব আর সুরা ফাতেহা শিখিয়ে রাখি। মিলিটারি জিজ্ঞেস করলে যেন বলতে পারেন।

নিখিল বুঝতে পারে আবদুর রহমান কি বলতে চায়। কতো নির্বিকার তার কণ্ঠ, উত্তেজনা বা অস্থিরতা নেই তার চেহারায়। সহজভাবে বললো, মিলিটারি এসেছে, যেন মিলিটারি নয় কুটুম এসেছে। কতো সহজভাবে নিখিলকে আত্মরক্ষার কৌশলের কথা বললো। নিজের কথা নয়, মোস্তফার নামে বললো যেন একজন মুক্তিযোদ্ধার নামে বললে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। নিখিলের বুকে গেঁথে থাকবে এবং নিখিল তা বিশ্বস্তভাবে পালন করবে। আবদুর রহমানের সামনে নিখিল শক্ত থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু মনে হয় পারছে না, ধসে আসছে ভিত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে আবদুর রহমান। গাঢ় কণ্ঠে আপনজন-কে বলার মতো করে বলে, আপনাকে কলেমা আর সুরা ফাতেহা শিখতে হবে নিখিলবাবু। যুদ্ধের সময়ে এ সবকিছুই বেঁচে থাকা।

নিখিলের নিজের ওপর রাগ হয়। যে কথাগুলো ও সারাক্ষণ ভাবছে, বিশেষ মুহূর্তে তা কেন অন্যের কাছ থেকে শুনতে হলো? আবদুর রহমান হাত চেপে ধরে বলে, মিলিটারি স্টেশন পর্যন্ত এসেছে, যে কোনো সময়ে বাজারে আসবে, তারপর হয়তো গাঁয়ে ঢুকবে। স্কুলের মাঠে সবাইকে ডেকে পাঠাতে পারে।

ঘটনাগুলো সব আপনি দেখতে পাচ্ছেন মনে হয়?

এমনই তো হয় শুনেছি। সেজন্যে সাজিয়ে নিয়েছি।

আবদুর রহমান ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে কথা বলে যায়। নিখিল ভাবে ও কি করে এতো সহজ? অথচ উত্তেজনা, অস্থিরতা প্রতি পদে পদে ওকেও তো ঘায়েল করে। যে মৃত্যুভয় নিখিলের, সে ভয়তো আবদুর রহমানেরও, তবে কেন শুধু ওর ভেতরে তোলপাড়?

জানেন মোস্তফা লিখেছে ওর আর সুভাষের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। ওরা দুই নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করবে। দুদিন আগে মুক্তিযুদ্ধের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ওসমানী ওদের ক্যাম্প ভিজিট করেছে।

চিঠিটা কি আপনি মুখস্ত করেছেন?

ঠিক তাই। মুখস্ত করে ছিঁড়ে ফেলেছি। আপনি কি করে বুঝলেন?

আপনি যে গড়গড় করে বলতে পারছেন সেজন্যে।

সুভাষের মাকে বলবেন, সেও যেন চিঠিটা মুখস্ত করে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।

ওরাতো বাংলা পড়তে পারে না।

ওরা না পারলে কি হবে ওদের বাঙালি বন্ধুরা তো পারে। আমাদের পদে পদে বিপদ। চলেন যাই।

দুজনে কথা বলতে বলতে ফিরে আসে। এমনভাবে কথা বলে যেন খুব জরুরি আলাপ করছে। নিখিল আবদুর রহমানের আচরণে অনুপ্রাণিত হয়। লোকটি অদ্ভুত রকমের শান্ত।

মানুষ যুদ্ধের সময়ে এতো ঠাণ্ডা থাকে কি করে!

নিখিল ধরে নেয় যে এই লোকটির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, যা অন্য সব ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। বিদায়ের সময় আবদুর রহমান নিখিলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, জয় বাংলা। নিখিলও অনুচ্চ স্বরে বলে, জয় বাংলা। যে যার পথে নেমে যায়। নিখিল ভাবলো, আবদুর রহমান প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, রাজনীতি করে না, কিন্তু জয় বাংলা সময়কে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় নিজের করে নিয়েছে। জেনেছে এটাই আসল সময়, সবার এক হতে হবে।

বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে সবাইকে নিয়ে বসে ও। সুভাষের চিঠি পড়া হবে। সুষমা চিঠিটা পেয়ে দিশেহারা, কি করবে বুঝতে পারে না, ওর হাত কাঁপে। লক্ষ্মী চিঠিটা টেনে নিতে নিতে বলে, দাও আমি পড়ি বৌদি।

খুব আস্তে আস্তে পড়বি।

বাইরে তো কেউ নেই বাবা।

দেয়ালেরও কান আছে। সাবধান।

কেউ কোথাও নেই, তবু সবার কণ্ঠে ফিসফিস ধ্বনি। ঘরে ভেসে বেড়ায় লক্ষ্মীর অনুচ্চ কণ্ঠস্বর : মা, আমার ট্রেনিং শেষ হয়েছে। হাতিয়ার খোলা এবং জোড়া লাগানো শেখার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিলো ট্রেনিং। এখন আমি অনেকগুলো অস্ত্র চালাতে পারি। ভারতীয় ক্যাপ্টেন দত্ত আমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন। আমরা আমাদের ক্যাম্পের নাম রেখেছি'মুজিব ক্যাম্প'। আমরা পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে আছি এক প্লাটুনে। মেজর অম্বর আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার। তিনি বলেছেন, আগামীকাল অপারেশনে যেতে হবে। প্লাটুনের ছেলেরা সবাই বেশ অস্থির। কারো কারো মন খারাপ হচ্ছে এই ভেবে যে, যদি ফিরে না আসতে পারে। যদি আর কোনো-দিন বাবা, মা, ভাইবোনের সঙ্গে দেখা না হয়। আমি অপারেশনে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমাদের সঙ্গে থাকবে চারটি স্টেনগান, পাঁচটি রাইফেল আর ছয়টি গ্রেনেড। আমাদের দলের নেতা হবেন মাখন ভাই। ভাবতে পারো মা গেরিলা যোদ্ধা হয়ে দেশের মাটিতে ঢুকবো! মেজর অম্বর বলেন, আমরা শুধু সাহায্য করবো। নিজের দেশের জন্য তোমাদেরকেই লড়তে হবে। ঠিকই তো বলেন। এটা আমাদের কাজ। আমার কথা যখন তোমার খুব মনে পড়বে তখন তুমি গুনগুন করে 'আমার সোনার বাংলা ...' গাইবে। দাদু, দীদাকে আমার প্রণাম দিও। সরস্বতী, লক্ষ্মীর কথা খুব মনে হয়। তোমরা সাবধানে থেকো। ইতি তোমার স্নেহের সুভাষ।'

চোখ মুছতে মুছতে চিঠিটা শেষ করে লক্ষ্মী। ঘরের সবকটি মানুষ নির্বাক বসে থাকে, নীরবে চোখ মোছে। কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে সুভাষ সবাইকে কাঁদিয়ে দিলো। কিন্তু কেউ শব্দ করে কাঁদতে পারে না। এ এক গভীর নিঃশব্দ বেদনা।

অনেকক্ষণ পর নিখিল বলে, বৌমা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

ছিঁড়ে ফেলতে হবে? আঁতকে ওঠে সুষমা। আপনি কি বলছেন বাবা? এ আমি পারবো না।

পারতে হবে মা।

না, বাবা, আমি কিছুতেই পারবো না। মিলিটারি এসে যদি আমাকে মেরে ফেলে তাও পারবো না। যদি সুভাষ আর ফিরে না আসে, যদি সুভাষ হারিয়ে যায়, তখন ওই চিঠিগুলোই হবে আমার সম্বল। ওগুলো না থাকলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো?

সুষমা মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কান্নার শব্দ আটকে রাখে। সরলা ওকে কাছে টেনে বলে, চিঠিটা তুমি রেখেই দাও বৌমা। দেবেশের টিনের বাক্সটায় রাখো। মরণ যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তো এমনিই হবে। চিঠি আর কি করবে।

সরলার কথায় নিখিলের মনে হয় আসলেই চিঠিটা ছিড়ে ফেলার কোনো মানে হয় না। যা হয় হোক।

থাক মা, চিঠিটা তোমার কাছেই থাক। আমার বোঝার ভুল হয়েছে।

ওদের মনে হয় সবার বুকে স্বস্তি ফিরে এসেছে। যে যার কাজে যায়। সুষমা ঘরে ফিরে বারবার চিঠিটা পড়ে। লক্ষ্মীকে ডেকে বলে, আমাকে আমার সোনার বাংলো ... গানটা শিখিয়ে দে লক্ষ্মী।

আমি তো ঠিক মতো জানি না বৌদি। সুর ভুল হবে।

সুর দিয়ে কি করবো রে? গাইতে পারলেই হয়।

সেটাই করো না কেন? নিজের মতো করে গাও। তুমি তোমার মতো করে, আমি আমার মতো করে।

ঠিক বলেছিস। দরকার নেই আমার সুরের। আমি আমার মতো করে গাইবো।

সুষমা খুশি হয়ে বাগানে চলে যায়। আম-জাম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে গানটা গায়। গুন গুন করে, কিছুতেই ওর গলা চড়ে না।

পরদিন সকালে নিখিল ওদের ডেকে বললো, আমাদের কলেমা তৈয়ব আর সুরা ফাতেহা শিখতে হবে?

ওরা বজ্রাহত হয়ে বসে থাকে। নাকি বোমা ফাটলো কোথাও? সরলা দুর্বল কণ্ঠে বলে, কি বলছো তুমি?

নিখিল আবদুর রহমানের মতো শান্ত কণ্ঠে বলে, স্টেশনে মিলিটারি এসেছে, এরপর বাজারে আসবে, তারপর গাঁয়ে ঢুকবে, স্কুলের মাঠে জড়ো করবে সবাইকে। এটুকু বলে বাকিটুকু ও নিজের মতো করে বলে, ওরা প্রথমেই আমাদের জিজ্ঞেস করবে আমরা হিন্দু না মুসলমান। যদি বলি হিন্দু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। আর যদি বলি মুসলমান তাহলে কলেমা জিজ্ঞেস করবে। না পারলে গুলি করবে। তোমরা এখন বলো আমাদের কি করা উচিত?

এতোকিছুর আগে তো আমাদের সিঁদুর মুছতে হবে, শাঁখা ভাঙতে হবে। সরলা দুর্বল কণ্ঠে, ভীত চোখে বলে।

নিখিলের দৃষ্টি ওর পরিবারের সদস্যদের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে আসে। সব মুখ শুকনো, আতঙ্কিত এবং বিশ্বাস আহত হলে মানুষের চেহারার রঙের কি নাম হতে পারে সেটা নিখিল জানে না — শুধু সবার ত্বকের ওপর অদ্ভুত রঙ প্রত্যক্ষ করে। ও জানে এই একই রঙ ওর মুখের ওপরও লেপ্টে আছে। ওকেও হয় তো আর মানুষের মতো দেখাচ্ছে না।

সুষমা শান্ত স্বরে মুখ নিচু করে বলে, বাবা আপনি আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলুন তাও আমি সিঁদুর মুছতে পারবো না।

আমি পারবো। এই দেখো, সরলা দু'হাতে সিঁদুর মুছতে থাকে।

আমার স্বামী, আমার মেয়েদের আমাকে বাঁচাতে হবে। আমাদের জন্য তোমার কি কোনো মায়া নেই বৌমা।

মা? বিস্ময়ে, আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে সুষমা। একি করলেন?

ঠিকই করেছি। তোমাকেও করতে হবে। তুমি মুছতে না পারো তো কি হয়েছে? আমি মুছে দেবো। দেবেশ তো আমারও ছেলে।

নিখিল বুঝতে পারে সুষমার আপত্তির কারণে সরলা সাহসী হয়ে উঠেছে। একটু আগে ও যেভাবে ভীত, দুর্বল কণ্ঠে কথা বলছিলো সে কণ্ঠস্বরও নেই। পরিস্থিতি এখন নিখিলের হাতে নেই, সেটা সরলার হাতে। সুষমা নিঃশব্দে উঠে যায়। লক্ষ্মী বলে, বাবা শুনেছি ঐ কলেমা মুখস্ত করলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো।

এটা তো যুদ্ধের সময় মা। এখন করলে কিছু হবে না। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাদের ধর্ম আমাদেরই থাকবে।

সরলা ঠাণ্ডা গলায় বলে, তুমি রহমান মাস্টারকে বলো কলেমা আর সুরা বাংলায় আমাদের লিখে দিতে। আমরা শিখে রাখবো।

সরস্বতী আর লক্ষ্মী একসঙ্গেই ভাবলো, বাবা-মা কি পাগল হয়ে গেলো? ওরা দু'বোন উঠোনে নেমে বাগানের গর্ত থেকে উঠিয়ে আনা নতুন মাটিতে ছাই ছড়িয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছ লাগানোর উপযোগী করতে থাকে। কাজ পেয়ে দু'বোন মেতে উঠে। একে অন্যকে ফিসফিসিয়ে বলে, কাল সকালে দুলালদের বাড়ি থেকে গোবর এনে মাটির ওপর বিছিয়ে দেবো। কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটা নতুন মাটি। আমরা বাগানে একটা গর্ত খুঁড়েছি।

এটার ওপর কয়েকটা জাংলা বিছিয়ে দিলেই হয়। বাগান থেকে দুটো শুকনো ডাল টেনে নিয়ে আসি।

দাঁড়া, মা মিষ্টি কুমড়োর বিচি এনেছে ওটা আগে লাগিয়ে নেই।

কুমড়োর বিচি লাগানো শেষ হতে না হতে ওরা দেখলো নিখিল ফতুয়া গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাথায় বেশ খানিকটা সরষের তেল দিয়ে চুল আঁচড়েছে। বেশ দেখাচ্ছে নিখিলকে। সদর দরজা পর্যন্ত সরলা নিখিলের পিছু পিছু গেলো। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিস্মিত হলো যে সরলা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের দিকে ফিরছে না। এতোক্ষণ তো নিখিলকে দেখতে পাওয়ার কথা না, তবু কেন সরলা দাঁড়িয়ে আছে। দু'বোন কৌতূহল নিয়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ওঠে সরলা। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছতে পারে না, মেয়েদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

মা, তুমি কাঁদছো?

সরলা দু'মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। জোরে শব্দ করতে পারে না, পাছে কেউ শুনে ফেলে। লক্ষ্মীও মায়ের সঙ্গে কাঁদলো। কিন্তু সরস্বতীর কান্না পায় না। মা যে নিজেকে লুকোতে পারেনি। এই বেদনায় ও নির্বাক হয়ে থাকে।

দুপুরে নিখিল ফিরলো হাঁফাতে হাঁফাতে, পোড়-খাওয়া বিধ্বস্ত মানুষ হয়ে। প্রথমেই কুয়োতলায় গিয়ে মাথা ধুতে শুরু করলো। সরলা, সুষমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলো, কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। নিখিল যতোক্ষণ চাইলো ততোক্ষণ মাথায় পানি ঢেলে দিলো। ধাতস্থ হয়ে বললো, বাজারে মিলিটারি এসেছিলো। দোকানপাট লুট করেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে।

এখন কোথায়? গাঁয়ের দিকে কি আসছে?

না, ক্যাম্পে ফিরে গেছে।

রহমান মাস্টার তোমাকে কাগজ দেয়নি?

দিয়েছে।

সরলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিখিল উঠোন পেরিয়ে বারান্দার দিকে হাঁটতে শুরু করলে অন্যরা পিছু নিলো. একটি ক্ষুদ্র দলের বড় মিছিল যেন। বারান্দায় বসে ও ফতুয়ার পকেট থেকে কলেমা ও সুরা লেখা কাগজগুলো বের করলো। রহমান মাস্টার বাংলায় বড় বড় করে লিখে দিয়েছে। কিভাবে পড়তে হবে সেটা শিখিয়ে দিচ্ছিলো, সে সময়ে খবর আসে যে বাজা-রে মিলিটারি এসেছে।

আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করে উঠেছিলো দেবেশের মা।

হবেই। ঐ কুকুরগুলো গাঁয়ে এলে তো আমাদের মেরে ফেলবে।

মেয়েরা সরলার গা-ঘেঁষে বসে। ওরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে চায়। যে মেয়েটির ছেলে মুক্তিযোদ্ধা তার ভয় বেশি, সে বিপন্ন নারী। সরলার মনে হয় ও একজন মুক্তিযোদ্ধার ঠাকুরমা, ওর ভয় খানিকটা কম। মিলিটারি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধার মাকেই খুঁজবে। লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে সুষমার মুখের দিকে তাকায়, ওরা সম্পর্কে একজন মুক্তিযোদ্ধার পিসি, যদিও সুভাষ বয়সে ওদের বড়, কিন্তু মিলিটারি এলে ওরা মুক্তিযোদ্ধার মাকেই খুঁজবে। ওদেরকে হয়তো কিছুই বলবে না। সুষমাকেই ধরে নিয়ে যাবে কিংবা এই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে ওকে গুলি করবে। তারপর কি কিছু করবে? না, আর কিছু করবে কেন। ওরাতো মুক্তিযোদ্ধার মাকে হাতের কাছে পেয়েই যাবে। অন্যদের ওদের দরকার কি? লক্ষ্মী-সরস্বতী বেশ একটা স্বস্তি পায়। তখন নিখিল ঘরঘর শব্দ করে গলা কাঁপিয়ে বলে, ঠিকই বলেছো, সবাইকেই মারবে। লোকে বলাবলি করে ওরা নাকি পাখি শিকারের মতো মানুষকে গুলি করে। কোনো বাছবিচার নেই। তারপর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

হ্যাঁ, ঠিকই তো বলে গাঁয়ের লোক। যুদ্ধের সময়ে কি এতোকিছু দেখার সময় আছে। যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর করে দেয়, না বাবা?

সুষমা সমর্থনের আশায় নিখিলের দিকে তাকায়। নিখিল মাথা নাড়ে। সুষমার মনে হয়, হলেতো সবারই ক্ষতি হওয়া উচিত। সবাই তো স্বাধীনতার কথা ভাবে।

তখন নিখিল ফতুয়ার পকেট থেকে টুপিটা বের করে ওদের দেখায়। বলে, রহমান মাষ্টার আমাকে বলেছে রাস্তায় বেরুলে বা বাজারে গেলে টুপিটা মাথায় রাখতে। আরো বলেছে জুমার দিনে যেন তার সঙ্গে মসজিদে যাই। আরো বলেছে, আমাকে আযান দেয়া শেখাবে যেন আমি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে গিয়ে আযান দিতে পারি।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে সরস্বতী। নিখিল মৃদু হাসে। সে হাসি দেখে সরলার মনে হয় নিখিলের চেহারা বিপদে বেঁচে যাওয়া মানুষের ছবি হয়ে গেছে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলে, এভাবে তুমি তো বেঁচে যাবে। আমাদের কি হবে?

আমি বেঁচে গেলে তোমরাও বেঁচে যাবে। তোমরা কলেমা মুখস্ত করে রাখবে। তাছাড়া মেয়েরা তো মসজিদে যায় না। তোমাদের আমার মতো এতো ঝক্কি পোহাতে হবে না।

বলতে বলতে নিখিল টুপিটা মাথায় দেয়। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুষমার মনে হয়, বাবাকে কেমন কুৎসিত দেখাচ্ছে, একটা জন্তুর মতো লাগছে। সরলার ভেতরটা কেঁপে ওঠে, যেন ঘেন্না লাগছে। এই মানুষটার সঙ্গে ও কেমন করে এতোকাল ঘর করলো। এই কি ওর স্বামী? এই লোককে কি ও এতোকাল চিনেছে? এই লোকের জন্য ওর সিঁদুরের কৌটা

কোনোদিন খালি হয়নি। হায় ভগবান, বলে সরলা বারান্দা থেকে উঠে ঘরে যায়। লক্ষ্মী হঠাৎ করে হাসতে হাসতে বলে, বাবা গাজনের মেলায় যেমন সঙ দেখা যায় তেমন সঙের মতো দেখাচ্ছে তোমাকে। বাবা সঙেরা তো মানুষ হাসায়, তুমি কি এখন থেকে মানুষ হাসাবে?

নিখিল হাঁ করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, হ্যাঁ রে মা, এখন থেকে মানুষই হাসাবো। যুদ্ধের সময়ে মানুষের মুখে যে হাসি থাকে না।

নিখিল মাথা থেকে টুপিটা খুলে যত্ন করে ভাঁজ করে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। সুষমাকে বলে, কাল থেকে মসজিদে যাবো। আবদুর রহমানের সঙ্গে নামাজে দাঁড়াবো।

বাবা আপনার খিদে পায় নি? দুপুর তো গড়িয়ে যাচ্ছে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে মাগো। কি রান্না হয়েছে আজ?

আজ তো মাছ নেই, নিরামিষ। বেগুন ভেজেছি। আলুপটলের দোলমা করেছি। মুগের ডাল। সুক্তো।

বাহ্, অনেক। পেটভরে খেয়ে যদি কড়া একটা ঘুম দিয়ে উঠতে পারি তাহলে বুঝবো একটা দিন কাটলো।

বাবা এখন আমরা শুধু একটা দিনের হিসেব করি, না?

ঠিকই বলেছো। এখন আমাদের সামনে সপ্তা নেই, মাস নেই, বছর নেই। কেবল আধাবেলা, এক বেলা, একদিন। তারপর হা-হা করে হেসে বলে, যুদ্ধ যে কতোকিছু খায় তার হিসেব আছে।

নিখিলের হাসি এ পরিবারের সবার স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। লক্ষ্মী সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরে বলে, দিদি চল, তুই, আমি আর বৌদি মিলে আমাদের বাগানে চড়ইভাতি করি।

ওমা এখন এসব কি?

এখনিতো করবো দিদি: যদি আর করতে না পারি। তুই না করিস না দিদি রে, আমার খুব ইচ্ছে হয়েছে।

সরস্বতী ওর ছোট বোনটির আদুরে কণ্ঠ শুনে আহ্লাদে আটখান হয়ে যায়। সেই সুভাষ চলে যাবার পর তো ওরা এমন আদুরে কণ্ঠে কথা বলেনি। ও লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে বলে, ঠিক আছে তোর কথাই সই, আজ আমরা চড়াইভাতি করবো।

সারাটা দুপুর দু'বোনে খড়কুটো কুড়োলো, মাটি দিয়ে চুলো বানালো, কলাপাতা কাটলো, ডাল-চাল ধুয়ে নিলো, মসলা বাটলো, চাক-চাক করে বেগুন কাটলো, তারপর আগুন জ্বালা-লো। ধোঁয়ায় ভরে গেলো বাগানের গাছের পাতাগুলো। কিছু কিছু শুকনো পাতা ঝটপট পুড়ে শেষ হয়ে গেলো। কিছু আধা-ভেজা গাছের ডাল পুড়তে না পেরে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠতে লাগলো। লক্ষ্মীর আনন্দ ধরে না, চড়ইভাতিতে ও ভীষণ মজা পাচ্ছে। আগুনে ফুঁ দিতে দিতে ওর চোখ লাল হয়ে উঠেছে, তারপরও উৎসাহ ক্লান্তিহীন। সুষমা হাসতে হাসতে বললো, এভাবে উনুন জ্বললে রান্না শেষ হতে হতে রাত ফুরিয়ে যাবে। খাবি কখন লক্ষ্মী?

দেখো বৌদি ফোড়ন কেটো না। রান্না না হলে খাবো না। কাকদের দিয়ে দেবো, কিন্তু মজা তো পাচ্ছি।

হ্যাঁ, আমারও খুব মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সুভাষকে ডেকে এনে বলি, দেখ কেমন চড়ইভাতি হচ্ছে। ও আমাকে বলতো, আমাকে একটা গোটা ডিম দিও মা। জানিস ছোটবেলায় ওর যা নেশা ছিলো গোটা ডিম খাওয়ার। দিনে দু'টো তিনটে ডিম ও একা খেতো।

সুষমা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মী ভেবে পায় না যে এমন সামান্য কথায় এতো হাসছে কেন সুষমা। সরস্বতী ফিসফিস করে বলে, বলতো লক্ষ্মী বৌদি হাসছে না কাঁদছে?

হাসছে। তোমার পাকামো আমার ভালো লাগে না দিদি।

ইস ঢং।

সরস্বতী ওর গালে ঠোনা মারে। তখন দু'বোনে শুনতে পায় মাথার ওপর কুটুম পাখি ডাকছে। ঘু-ঘু-ঘু শব্দে একটা ঘুঘুও বিকেলটা মাতিয়ে তুলেছে। সুষমার মনে হয় পাখিগুলোর হলো কি? এমন প্রাণ খুলে গেছে কেন ওগুলোর। ও আপন মনে বাগানের এমাথা-ওমাথা ঘুরে বেড়ায়। শুকনো ডাল কুড়িয়ে আনে লক্ষ্মীর জন্যে। লক্ষ্মী আজ রাঁধুনী। বাগানের ধারে দু'একটা ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। ওরা চড়ুইভাতির লোভে এগিয়ে এসেছে। সরস্বতী ওদের হাত ইশারায় ডাক দিলে একছুটে চলে আসে। উনুনের ধারে গোল হয়ে বসে।

লক্ষ্মী গুনে দেখলো পাঁচজন। যা রান্না হয়েছে ওতে ওরা পাঁচজন খেতে পারবে। ওদের চোখগুলো চকচক করছে, যেন টলটলে বিলের জল, কালো মণিটা শাপলার মতো ফুটে আছে। শঙ্খ বললো, আমরা কি কাজ করবো লক্ষ্মী দিদি?

এই কলসিতে করে জল নিয়ে আয়।

আমি কি করবো?

কলাপাতাগুলো ধুয়ে ফেল।

আমি?

পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আয়। অনেক পাতা দরকার। নইলে আঁচ নিভে যায়।

সুষমা দেখলো পাখির মতো কলকল করতে করতে ছোটরা ছুটোছুটি করে শুকনো পাতা কুড়োচ্ছে। অল্পক্ষণে দু'টুকরি পাতা কুড়োনো হয়ে গেলো। এর মধ্যে শঙ্খ আর অংশু মারামারি করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আবার উঠে পড়লো। বাকি ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে মারামারিতে ওদের উৎসাহিত করলো। সুষমা ওদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়েও দিলো না। ভাবলো, থাক, ও কেন ওদের মধ্যে ঢুকবে। এটা মারামারি নয়, চড়ুইভাতির খেলা। একটু পর ওরা আবার উনুনের পাশে জড়ো হয়ে বললো, এবার আমরা কি করবো?

রান্না না হওয়া পর্যন্ত খেলবি?

কি খেলবো?

তোরা বল কি খেলবি?

শঙ্খ লাফিয়ে উঠে বললো, আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবো। এটা আমার বন্দুক। ও পাশ থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে সবার দিকে তাক করে বললো, শত্রুরা সাবধান, গুড়ুম, গুড়ুম। কিন্তু অন্যদের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ও বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, গুলি খেয়ে তোরা তো পড়ে যাবি। নইলে খেলা হয় নাকি?

অংশু বুক টান করে বললো, আমরা কি শত্রু নাকি যে পড়ে যাবো। অন্যরাও চেঁচিয়ে বললো, না আমরা শত্রু হবো না। তুই শত্রু হ, আমরা তোকে মেরে ফেলি।

হি-হি করে হাসতে হাসতে জয়া বলে, শঙ্খ পাকিস্তানি মিলিটারি।

না কখ্খনো আমি মিলিটারি না, কখ্খনো না, শঙ্খ চেঁচাতে থাকে। আমি খেলবো না, আমি চড়ুইভাতির ভাতও খাবো না।

ভাত খেতে হবে না। তোকে আমরা গুলি করে মারবো। তুই আমাদের শত্রু।

ছেলেমেয়েরা একটা একটা লাঠি হাতে তুলে নিয়ে ওর দিকে তাক করে — গুডুম গুডুম।

চিৎকার করে কাঁদতে থাকে শঙ্খ। আমি কখনোই শত্রু হবো না। সুষমা ওকে জাপটে ধরে, না তোকে শত্রু হতে হবে না শঙ্খ। তোরাও কেউ মিলিটারি হবি না, তাই তো?

হ্যাঁ। চেঁচিয়ে ওঠে সবাই।

ঠিক আছে, শঙ্খও মিলিটারি হবে না। তবে এটা তো ঠিক যে ও তোদের সবার আগে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে?

ঠিক।

তাহলে এখন থেকে তোরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। আর শঙ্খ তোদের লিডার। আয় আমরা সবাই মিলে বলি, জয় বাংলা। কচিকণ্ঠের উচ্চারিত ধ্বনিতে মুখর হয় বাগান, যেন একসঙ্গে হাজার পাখি কিচকিচ করছে। ওরা ওদের লাঠির-বন্দুক ঘাড়ে ফেলে জয় বাংলা বলতে বলতে বাগানে ঘুরতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গাঁয়ের ছেলেরা তো কাঠের বন্দুক নিয়ে এভাবে ঘুরতো। সুষমা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের কেউ কিছু বলেনি অথচ ওরা কেমন করে নিজেরা খেলাটা সহজ করে নিয়েছে। একটুপর ওরা দেখলো বাগানের এককোণ থেকে ওরা চুপিচুপি বেরুনোর ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছে, যেন সামনে শত্রু। তারপর জয় বাংলা বলে লাফিয়ে সামনে দৌড়ে গিয়ে গুডুম গুডুম শব্দে চিৎকার করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সেকি হাসি ওদের, যেন যুদ্ধে জিতে গেছে। ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈ শুনে বেরিয়ে আসে নিখিল আর সরলা। ওদের খেলা দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় ওরা। নিখিলের মনে হয় যুদ্ধের সময় এই জয় বাংলা খেলাটা ওদের বেশ মানিয়েছে। ওর আর ভয় করছে না। সবাই মিলে ওদের সঙ্গে জয় বাংলা খেলার জন্য উনুনের ধারে লাইন করে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান বলতে থাকে। দেখে ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। ওরা দ্বিগুণ জোরে চেঁচাতে থাকে। বিকাল পড়ে গেছে। গাছ-গাছালির ফাঁকে রোদ ঢোকে না বলে বাগানে আলো কম। একটুপর সন্ধ্যা নামবে। ছেলেমেয়েরা খেলা শেষ করে নিখিলের কাছে এসে বলে, কাকু আমরা যুদ্ধে জিতেছি। বন্দুকগুলো আপনাকে দিচ্ছি। নেন।

নিখিল লাঠিগুলো নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। ওরা কলাপাতা নিয়ে বসে পড়ে, লক্ষ্মী দিদি রান্না হয়নি তোমার?

হয়েছে, বোস।

সাঁজ হয়ে যাচ্ছে যে, ঘরে ফিরতে হবে না? দেরি হলে মা বকবে।

বকবে না, মাকে গিয়ে বলবি যে আজ আমরা যুদ্ধে জিতেছি। হি-হি করে হেসে ওঠে সবাই। সরস্বতী ওদের কলাপাতায় খিচুড়ি দেয়।

তোরা খা, আমি তোদের বন্দুকগুলো ঘরে রেখে আসি।

নিখিলের মনে হয় এ এক অমূল্য ধন, স্বপ্নের মতো ওর কাছে চলে এসেছে। ছেলেমেয়েরা জানলো না, ওরা নিখিলকে কতোটা অভয় দিলো। ছোট ছোট লাঠিগুলো বারান্দার কোণায় সাজিয়ে রাখতে রাখতে নিখিলের মনে হলো ওদের কাছে যেটা খেলা সেটা নিখিলের বাঁচা। নিখিল বাঁচার একটা ভরসা পেয়েছে।

সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর বসে থাকে সবাই। চড়ইভাতির খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে। নিখিল আর সরলা কুপির সামনে বসে পান খায়। লক্ষ্মী গুনগুনিয়ে কীর্তন গাইছে। সরস্বতী বুকের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে

আছে। সুভাষের চিঠিটা বের করে পড়তে থাকে সুষমা। চিঠিটায় চুমু দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে দেবেশের চিঠি বের করে। ঐ একগাদা চিঠি দেখে মন খারাপ করে সরস্বতী, এতোটা বয়স হলো কেউ একটি প্রেমপত্র লিখলো না। আর কি কেউ লিখবে? যুদ্ধে কে বাঁচবে কে বাঁচবে না তার ঠিক নেই। জীবনটা কি এখন থেমে যাবে? না, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে সরস্বতী।

কী হলো?

সরস্বতী হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুষমা আর লক্ষ্মী আবার বলে, কি হলো বলছো না যে?

তোমার চিঠিগুলো দেখে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে বৌদি। তোমার চিঠি লেখার মানুষ ছিলো। চিঠিগুলো এখন স্মৃতি। আমার আর লক্ষ্মীর চিঠি লেখার মানুষ হবে কিনা জানি না। আমরা বাঁচবো কিনা তাও জানি না।

সরস্বতী আবার বালিশে মুখ গোঁজে। সুষমা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। লক্ষ্মী আর কীর্তন গাইতে পারে না। সরস্বতীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দিদি রে কেন তুই এমন কথা বললি?

সরস্বতীর হেমন্তর কথা মনে হয়, কি নিষ্ঠুর লোকটা। এ জীবনে আর বুঝি দেখা হবে না। ওতো একটা চিঠিও পাঠাতে পারতো। লিখতে পারতো, সরস্বতী আমার জন্য অপেক্ষা করো। বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। এ রকম একটা লাইন পেলেই ও এক জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এখন যে ওর দিন কাটে না।

লক্ষ্মী ওকে আবার ধাক্কা দেয়, দিদি? কথা বলিস না কেন?

আমাকে জ্বালাস না লক্ষ্মী। আমার কিছু ভালোলাগছে না।

বাইরে বাতাসের জোর ধাক্কায় দরজা নড়ে ওঠে। সরলা কান খাড়া করে। নিখিলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, কেউ বুঝি এসেছে। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

এই ঝড়-বৃষ্টিতে আবার কে আসবে? বাতাসের শব্দ।

না গো, তুমি কান খাড়া করে শোনো।

দু'জনে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয় যে দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকছে, কাকাবাবু, কাকাবাবু?

নিখিল উঠে দাঁড়ায়। পাশের ঘর থেকে মেয়েরা এসে দাঁড়ায়। সুষমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, বাবা কেউ ডাকছে।

তাইতো মনে হচ্ছে মা। যাই দেখি।

হয়তো কেউ সুভাষের খবর নিয়ে এসেছে। না জানি, আমার সুভাষ কেমন আছে।

তুমি ভেবো না তো বৌদি। সুভাষ ভালো আছে।

দিদিদের বাড়ি থেকেও কেউ আসতে পারে।

ঠিক বলেছিস সরস্বতী। সরলা সায় দেয়। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, পার্বতী কারো কোনো খবর পাইনি। ভগবান, কেমন যে আছে ওরা।

নিখিল ততোক্ষণে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। হা-হা খোলা পথে ঝড়ো বাতাসের ধাক্কা এলোমেলো করে দেয় ভেতরের মানুষগুলোকে। প্রত্যেকের গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগে। সরলা দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়ায়। মেয়েরা বারান্দায় বেরিয়ে আসে। বৃষ্টি আর বাতাসের একরকম শব্দ সবার বুকের ভেতর জমাট হয়ে আছে। ওদের দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চায়। পারে না, পারলে ওরা দেখতে পেতো যে কে এসেছে। শুধু

দেখা যায় ছাতা মাথায় একজন মানুষ। বৃষ্টির মধ্যে উঠোন পেরিয়ে হেঁটে আসছে। ওর সামনে নিখিল, তার মাথায়ও ছাতা। মেয়েদের সাধ্য কি যে ওই মানুষের মুখ দেখতে পায়? তিন-জনই ঘরে ঢুকে পড়ে সরলার নির্দেশে।

বারান্দায় উঠে নিখিল জোরে জোরে বলে, দেবেশের মা হেমন্ত এসেছে।

হেমন্ত? সরলার কণ্ঠ আর্তনাদের মতো শোনায়।

হেমন্ত? সুষমা চাপাস্বরে উচ্চারণ করে সরস্বতীর হাত চেপে ধরে।

দিদির কি বিয়ে? লক্ষ্মী চেঁচিয়ে উঠতে গেলে ওর মুখে হাত চাপা দেয় সরস্বতী।

বিয়ে না হলে হেমন্ত আসবে কেন?

কোনো খবর নিয়েও তো আসতে পারে।

লক্ষ্মী, লক্ষ্মীরে হেমন্তর জন্য গামছা নিয়ে আয়! বেচারা ভিজে সারা হয়েছে।

মাঝপথে বৃষ্টি নামলো কাকাবাবু।

তোমার বাবা-মার খবর ভালো তো বাবা।

শরণার্থী ক্যাম্পে কষ্ট হচ্ছে, তবু সবাই ভালো আছে। আমার ছোট বোন শশীর বিয়ে হয়েছে।

ওমা তাই নাকি। বড়ো সুখবর দিলে। তুমি গা মুছে কাপড় বদলে নাও বাবা। আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি।

সরলা ঘরে ঢুকে মেয়েদের তাড়া দেয় রান্নার আয়োজন করতে। মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যায়। বাটনা বাটে, কুটনা কোটে, চাল ধোয়, আগুন জ্বালায়। ওদিকে হেমন্তর জন্য সুভাষের ঘর খুলে দিয়েছে নিখিল। ও গা মুছে একটি পরিষ্কার ধুতি পরে পা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসেছে। কাছেই জলচৌকির ওপর বসেছে নিখিল। হেমন্ত কেন এসেছে একথা ও এখনো বলেনি। শোনার জন্য উদগ্রীব নিখিল, উসখুস করে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে না। নিখিলের বড়ো আশা হেমন্ত যদি সরস্বতীকে বিয়ের কথা বলে। যুদ্ধজয়ের আনন্দের মতো তা নিখিলের বুকে এসে বাজবে! হেমন্ত শরণার্থী শিবিরের গল্প করছে, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলছে, প্রবাসী সরকারেরও কথা বলছে — বলছে না নিজের কথা। নিখিল বিরক্ত হতে থাকে। রাত বাড়ে, ওর ঝিমুনি আসে। মেয়েদের রান্না শেষ হয়নি। একসময় চিৎকার করে লক্ষ্মীকে ডাকে। ছুটে আসে সরলা, কি হয়েছে?

তোমরা কি সারা রাত ধরে রাঁধবে নাকি?

এই তো হয়ে গেলো। বাতাসে উনুনের আগুন জ্বলতে চায় না। একটু তো সময় লাগবেই।

নিখিল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভেংচি কাটে, একটুতো সময় লাগবেই। ওই মুখভঙ্গি দেখে সরলা লজ্জা পেয়ে যায়। হেমন্ত অবাক হয়। কেন এতো রেগে যাচ্ছে লোকটা?

ও কি জানে না যে হেমন্ত ওর মেয়েকে বিয়ে করে ওকেই উদ্ধার করতে এসেছে? ওরতো বুঝে নেওয়া উচিত যে হেমন্ত কেন ভারতের শরণার্থী ক্যাম্প থেকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওর বাড়িতে এসেছে? এটুকু বুদ্ধি না থাকলে ও বেঁচে আছে কেন? নাকি হেমন্ত কিছু বলছে না দেখে ওর রাগ হচ্ছে। বেশ রাগতেই থাকুক। যুদ্ধের সময় মানুষের ভয় থাকে। ভয় না পেয়ে মানুষ যদি রাগে তাহলে তো সেটা ভালো, রাগ এক রকম সাহস।

তুমি বসো, একটু গড়িয়েও নিতে পারো। আমি ওদিকে দেখি।

নিখিল উঠে যায়। হেমন্ত সুষমার অপেক্ষা করে। নিজের বিয়ের কথা হবু শ্বশুরকে ও

কিভাবে বলবে? এটুকু লজ্জা তো ওর আছে। বাবা-মাকে কিছু বলে আসেনি। সরস্বতীর যদি কোনো বিপদ হয়? ভাবতেই প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে তাড়িত হয়ে ছুটে এসেছে হেমন্ত। যুদ্ধের সময়ে মানুষের এ ধরনের দায়িত্ববোধ থাকা উচিত বলে ও মনে করে। সরস্বতীর বাবার কাছ থেকে কেমন পণ পাবে না পাবে এসব ভাবার সময় এটা নয়। এখন মানুষকে মানুষের কাছাকাছি হতে হয়। সামাজিক বন্ধনগুলো সরিয়ে দিতে হয়। হেমন্ত চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে – টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে শুধু, ঝড়ো বাতাস আর নেই। হেমন্ত গায়ের ওপর পাতলা কাঁথাটা টেনে নেয়। দপদপিয়ে নিভে যায় হারিকেন, হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। যাক, অন্ধকারই ভালো, ও ভাবলো, অন্তত সময় পাওয়া গেলো। এ সময়টুকু শুধু ওর আর সরস্বতীর – এক আশ্চর্য সময়ে শুরু হবে ওদের জীবন। পঞ্চাশ বছর পর ওরা যখন বুড়ো হয়ে যাবে, তখন নাতি-নাতনিদের কাছে ওদের বিয়ের গল্প করবে। চোখ বড়ো করে ওরা তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে। ও ওদের বলবে, আমি বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করিনি, কিন্তু সরস্বতীকে বাঁচানোর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। সরস্বতীকে নিয়ে গিয়েছিলাম নিরাপদ জায়গায়। ওরা বলবে, এটা কি যুদ্ধ দাদু? আমি বলবো, হ্যাঁ এটাও যুদ্ধ, অন্যরকম যুদ্ধ। সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয় না, কিন্তু মানুষের সহযোগিতার জন্য মানুষের কাছাকাছি যেতে হয়। দেখতে হয় মানুষের সাহস যেন নষ্ট না হয়। কাল থেকে এ পরিবারের সাহস দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। ছোটরা হাততালি দিয়ে হেসে বলবে, দাদু আমরা যুদ্ধ দেখবো। ও বলবে তোদেরকে আমরা আর কোনো যুদ্ধ দেখতে দেবো না। তোরা সুখে বেঁচে থাক সোনারা।

হেমন্তর তন্দ্রার মতো এসেছিলো। দরজায় নিখিলের পায়ের শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায়।

ওমা তুমি দেখছি অন্ধকারে শুয়ে আছ বাবা। আমাদের ডাকলেই তো হারিকেনটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতাম।

অন্ধকারই ভালো কাকাবাবু।

ঠিকই বলেছো। এখন অন্ধকারই ভালোলাগে। পূর্ণিমা নয়, অমাবস্যার রাতে ভরসা বেড়ে যায়। মনে হয় চেনা পথঘাটে কোনো ভয় নেই।

সারাটা পথ আসার সময় আমিও তাই ভেবেছি। যেন অমাবস্যা থাকে। অন্ধকারে আমি ঠিক পথ চিনে চলে যেতে পারবো।

সরলা ডাকে ওকে, হেমন্ত খেতে এসো বাবা।

রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে ওকে খেতে দেয় সরলা। পেছনে সুষমা দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্ত ওকে দেখে লাজুক হাসে, বৌদি ভালো আছেন?

হ্যাঁ, তোমরা কেমন আছ? কাকাবাবু? কাকীমা?

বোধহয় ভালো আছে। আসার আগে কারো সঙ্গে দেখা হয়নি।

ও মা, ওদেরকে না বলে চলে এসেছো তুমি?

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে বৌদি।

মা আপনি ঘুমুতে যান। আমি হেমন্তকে খেতে দেবো।

সরলা চলে যায়। লক্ষ্মী এসে সুষমার পাশে বসে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সরস্বতী। ওর বুক টিপটিপ করছে। ওর মন বলছে, হেমন্ত ওর জন্য এসেছে। কিন্তু সাহস করে ভেতরে যেতে পারে না, লজ্জাও লাগছে। হঠাৎ করে বেড়ার গায়ে খসখস শব্দ হলে হেমন্ত চকিতে তাকায়। সরস্বতীর পা কাঁপে, কেমন করে এতো আনন্দ ধরে রাখতে হয় ওতো

জানে না। দেখতে পায় লক্ষ্মী সুষমার পিঠের আড়ালে বসে অপার কৌতূহলে হেমন্তকে দেখছে। এই যুদ্ধের সময়টা যখন ওদের সবকিছু কেড়ে নিতে চাইছে, তখন হেমন্ত এসেছে *কিছু দিতে। ও কি হেমন্তকে বলে দেবে যে বাবা মসজিদে যাবে বলে আজ টুপি মাথায় দিয়েছে। আমরা মরে যাচ্ছি হেমন্তদা, কিন্তু বাবা কিছুতেই মানবে না। বাবার ভীষণ গোঁ।*

অল্প আয়োজন তবু হেমন্তর ভীষণ ভালো লাগছে। শরণার্থী ক্যাম্পে তো তেমন রান্না হয় না। শুধু বেঁচে থাকা। অনেকদিন পর আজ বাড়ির পরিবেশ পেয়েছে।

সুষমা বলে, এমন সময়ে এলে যে তেমন কোনো আয়োজনই আমরা করতে পারলাম না।

এইতো অনেক বৌদি। একদম অমৃত।

লক্ষ্মী সোৎসাহে বলে, হেমন্তদা আজ বিকেলে আমরা চড়ুইভাতি করেছি।

তো আমার ভাগ কৈ?

ভাগ পেতে হলে সময় মতো থাকতে হয়।

থাকতেই তো এসেছি, ঠিক সময় মতো।

সে আমি বুঝেছি। সুষমা ঠোঁট চেপে হাসে। প্রথমে ভেবেছিলাম সুভাষের বুঝি কোনো খবর আছে। এতোক্ষণেও সুভাষের কথা যখন কিছু বললে না তখন মনে হলো—

জানি আপনারই মনে হবে।

এজন্যই তো মাকে সরিয়ে দিলাম।

সত্যি বৌদি আপনাকেই আমার ভীষণ দরকার।

বলে ফেলো।

কাল সন্ধ্যায় বিয়ের লগ্ন আছে। আমি চাই কালই। পরশু দিন সরস্বতীকে নিয়ে চলে যাবো।

পরশু দিন?

হ্যাঁ, বৌদি। থাকা ঠিক হবে না। জানাজানি হলে বিপদ হবে। বিপদটা আমার একলার নয়, সবার। আপনি সব ঠিক করুন বৌদি।

ও মা, দিদির বিয়ে। লক্ষ্মী এক দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে বড়ো ঘরের বারান্দায় ওঠে, দিদির বিয়ে, দিদির বিয়ে–। বাবা, বাবা, মা...। দিদি কৈ? অ, দিদি? লক্ষ্মী ডাকতে ডাকতে বাড়ি মাথায় তোলে। দৌড়ে আবার রান্নাঘরে যাবার সময় মাঝ-উঠোনে আছাড় খায়। সরস্বতী দৌড়ে এসে ওকে টেনে তোলে, কি যে পাগলামি করছিস লক্ষ্মী। পিছল উঠোনে কেউ এমন করে ছুটোছুটি করে? চল ঘরে চল।

তখন লক্ষ্মী ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।

দিদি তুই চলে গেলে আমার কে থাকবে?

আহ চুপ, সরস্বতী ওর মুখে হাত চাপা দেয়। দু'বোন কুয়োতলায় যায়। লক্ষ্মীর ফ্রক কাদায় মাখামাখি হয়েছে। সরস্বতী কুয়োয় বালতি ফেলে জল তোলে। ভরা বালতি টানতে কষ্ট হয় ওর — বৃষ্টিতে ভিজে দড়িটা পিছলা হয়ে গেছে, প্যাচপ্যাচ করছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কুয়োর জল যখন অনেক নিচে নেমে যায় তখন এ বাড়িতে জলের জন্য সরস্বতীই ভরসা। বাবা বলে, মেয়েটা আর জনমে জলের পরী ছিল, নইলে এতো নিচের জল ও নাগাল পায় কি করে? কেমন অনায়াসে জল টেনে তোলে। কিন্তু আজ কি হলো ওর।

এখন তো বর্ষাকাল, জল কতো কাছে। তবু তুলতে কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্মীর কান্না ওর মন খারাপ করে দিয়েছে। হেমন্তকে দেখার পর থেকে যে উত্তেজনা ছিলো, বিয়ের কথা শোনার পর সে উত্তেজনা থিতিয়ে গেছে। সত্যি কি পরশু দিন ওকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে? আর কোনোদিন কি দেখা হবে বাবা-মার সঙ্গে? যদি পথে মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে? সরস্বতী লক্ষ্মীর কাদা ধুয়ে দিতে দিতেই ও লক্ষ্মীরে বলে কাঁদতে শুরু করে।

ঘরে বসে নিখিল ও সরলা শুনতে পায় তাদের দু'মেয়ে কুয়োতলায় বসে কাঁদছে। দুজনে দুজনের হাত চেপে ধরে। সত্যি কি সরস্বতীর বিয়ে? এই যুদ্ধের সময়ে? সরলা জিজ্ঞেস করে, ওরা কেন কাঁদছে? আনন্দে না দুঃখে?

নিখিল নিজের কপালে হাত রেখে বলে, দুঃখে এবং আনন্দে।

ভাতের শেষ গ্রাস মুখে দিয়ে হেমন্ত বলে, কাঁদছে কে?

কাঁদবে আবার কে? শেয়ালের ডাক।

না বৌদি, শেয়ালের ডাক না। মা কি কাঁদছে?

মা কাঁদবে কেন? মেয়ের বিয়েতে মাতো খুশি হবেন।

তাহলে কি সরস্বতী?

সুষমা চুপ করে থাকে। ওর মনে হয় কান্না ওর বুকের ভেতর থেকে বেরুচ্ছে। সরস্বতী চলে গেলে ওর ভীষণ খারাপ লাগবে, একলা হয়ে যাওয়ার কষ্ট ওকে বিভিন্ন সময়ে এভাবেই অনুভব করতে হয়। দেবেশ হারিয়ে যাবার পর থেকে ও যে কতো নিঃসঙ্গ সেটা ও কাউকে বোঝাতে চায়নি, নিজেকেই ভুলিয়েছে বারবার। ও বুঝতে পারছে হেমন্ত ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তবু ও চোখ তুলতে পারছে না। ওর গাল ভিজে যাচ্ছে। হেমন্ত খুব ব্যথিত কণ্ঠে ডাকে, বৌদি! সুষমা চোখ মুছে বলে, আজ আমাদের কতো খুশির দিন, তবু কেন যে চোখে জল আসে। তুমি কতো ঝুঁকি নিয়ে সরস্বতীর জন্য এসেছো। ও কতো ভাগ্যবতী। আমাদের উচিত ওকে হাসিমুখে বিদায় দেয়া। আমরা কাঁদবো কেন হেমন্ত?

বৌদি সরস্বতীও কি কাঁদছে?

কাঁদবেই তো! ওর বিয়ে -- উলু হবে না, ঢোল বাজবে না, ছেলেমেয়েরা বাড়ি জুড়ে ফূর্তি করবে না — ওতো কাঁদবেই হেমন্ত।

কেন কাঁদবে? এটা তো যুদ্ধের সময়।

সুষমা স্খলিত কণ্ঠে নিজেও বলে, যুদ্ধের সময় – হ্যাঁ যুদ্ধের সময়ে অনেককিছু থেকে আড়াল হয়ে থাকতে হয়।

জ্বলে ওঠে হেমন্তর চোখ। কঠিন গলায় বলে, যুদ্ধের সময়ে উলুধ্বনি থামিয়ে রাখতে হয় বৌদি। শব্দতো হতেই থাকে, শুধু কানে শোনা যায় না। যুদ্ধের সময়ে নীরবতাই শব্দ। ও গলা নরম করে আবার বলে, আমি খুব খুশি যে এমন একটা সময়ে আমার বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের দিনের কথা আমি যদি ভুলেও যাই, যদি তারিখটা মনে রাখতে না পারি তো ক্ষতি নেই, এ সময়ের কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। মরার আগে ছেলেমেয়েদের বলতে পারবো যুদ্ধের সময়ে আমার বিয়ে হয়েছিলো। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ কি সবাই পায় বৌদি? এরজন্য ভাগ্যবান হতে হয়।

হেমন্ত ভাই আমার, তোমাকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি। আমরা তো দুঃখে কাঁদছি না।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষ কমে যাবে এজন্য—।

থাক বৌদি, জল দিন।

হেমন্তর কঠিন কণ্ঠ সুষমাকে আহত করে। কতো বয়স হবে ওর? যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ও কলেজ থেকে পাস করেছে। বাইশ/তেইশ হবে হয় তো, কিন্তু কেমন বয়স্ক মানুষের মতো কথা বলছে। বলবেই তো, ওতো শরণার্থী ক্যাম্প থেকে উঠে এসে যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছে, সীমান্ত পেরিয়েছে প্রতি মুহূর্তে বুটের নিচে পিষ্ট হওয়ার ভয় নিয়ে, হেমন্ত তো সত্যিকার বয়সের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি বয়সের মানুষ হবে। ওতো কঠিন কণ্ঠেই কথা বলবে। সুষমার গলার কাছ থেকে কান্না সরে যায়। ও একটা বড় ঢোক গিলে হেমন্তকে জল দেয়।

জল খেয়ে হেমন্ত বলে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমি তবলা বাজাই। সাতদিনের জন্য এসেছি। সরস্বতী গাইতে পারে। ঠিক করেছি ওকে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম শিল্পী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেবো। ওদের সঙ্গে শরণার্থী ক্যাম্পের বিভিন্ন এলাকায় গান গাইতে হবে। এভাবেই হবে আমাদের শুরু। বৌদি যুদ্ধের সময়ে সংসার এমনই। কান্নাকাটি আমার অসহ্য লাগে।

সুষমা বুঝে যায় হেমন্ত কি বলতে চায়। ও আর কথা বাড়ায় না। হেমন্তকে নিয়ে শোবার ঘরে আসে। বিছানা ঠিক করে দেয়, মশারি টাঙায়। তারপর আস্তে করে বলে, এমনও তো হতে পারে যে সরস্বতীর সঙ্গে সুভাষের দেখা হয়ে যাবে।

নাও হতে পারে। সুভাষ সরাসরি যুদ্ধ করছে।

ও ফিরতে পারবে তো হেমন্ত?

বলা কঠিন। আমিও তো জানি না যে সরস্বতীকে নিয়ে আমি ফিরে যেতে পারবো কি না?

তুমি ঘুমোও।

সুষমা দরজা ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে। রাতে কেউ আর ঘুমুতে পারলো না। বিয়ের আয়োজনে মেতে উঠলো।

উষা লগ্নে সরস্বতীর বিয়ে।

মন্ত্র পড়ার জন্য পুরোহিত নেই। নিখিল ঠিক করেছে পঞ্জিকা দেখে ও মন্ত্র পড়বে। উঠোনে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে।

মসজিদ থেকে ফজরের নামাজের আযান ভেসে এলে নিখিল উঠোনে স্তব্ধ হয়ে যায়। এক্ষুণি হয় তো আবদুর রহমান আসবে ওকে মসজিদে নিয়ে যেতে, এমনই কথা হয়েছিলো তার সঙ্গে। নিখিলের মনে হয় ফতুয়ার পকেটে টুপিটা ভাঁজ করা আছে, ওটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা হয়নি, সেটা এখন ওর সঙ্গে। ভাবতেই নিখিলের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে বসে থাকে। ও জানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সরস্বতীর বিয়ে।

সরলা রান্নাঘরে। কি রান্না হচ্ছে ও জানে না, কিন্তু চমৎকার গন্ধ আসছে। নিখিল বড় করে শ্বাস টানে, বুঝতে পারে ওর খিদে পায়নি, পেটটা ভার হয়ে আছে। বাকি কাজ শেষ করার জন্য ও উঠি উঠি করছে তখন আবদুর রহমান আসে। নিখিল ওর দু'হাত চেপে ধরে বলে, আজ আর মসজিদে যাওয়া হলো না মাস্টার সাহেব। আজ সরস্বতীর বিয়ে।

বিয়ে? রাতের মধ্যে ছেলে কোথায় পেলেন?

হেমন্ত ফিরে এসেছে মাস্টার সাহেব।

একা? না ওর বাবাও এসেছে?

একা। ভগবান আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন মাস্টার সাহেব। বিয়ের কথাবার্তার পর ওরা যখন ইণ্ডিয়া চলে গেলো তখন খুব ভেঙ্গে পড়েছিলাম। ছেলেটি কালই সরস্বতীকে নিয়ে চলে যাবে মাস্টার সাহেব।

আত্মতৃপ্তিতে নিখিলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আবদুর রহমানের মনে হয় কি সরল হাসি! বুকের খুশি মানুষকে অন্যরকম করে ফেলে, সেটা অন্যরাই দেখতে পায়, যার খুশি সে দেখতে পায় না।

আপনার আনন্দে আমিও খুব আনন্দিত নিখিল বাবু। শুভ কাজ ভালোয় ভালোয় শেষ হোক। আসি।

আবদুর রহমানের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে নিখিল ভাবলো, মেয়ের বিয়ের জন্য একদিন মসজিদে যাওয়া ঠেকলো – প্রতিদিন যদি এমন একটা কিছু ঘটে আর মসজিদে যেতে না হয়? হায় ভগবান, কতোদিন এমন করে দিন ঠেকিয়ে বাঁচা যাবে? ওর মনে হয় শরীরটা ভারী লাগছে, পা বুঝি মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। লক্ষ্মী এসে ওর হাত ধরে, বাবা চলো।

উঠোনে ফিরে এসে ও মুগ্ধ হয়ে যায়। ওর সরস্বতী আজ বৌ সেজেছে, শ্বশুরবাড়ি যাবে। ওর জন্য নতুন কাপড় এনেছে হেমন্ত, শাঁখা-সিঁদুর এনেছে। ও নিজে নতুন কিছু কিনতে পারেনি, সরস্বতী ওকে বাজারে যেতে দেয়নি। বলেছে, বাবা বেঁচে থাকলে নতুন কাপড় হবে। তুমি শুধু আশীর্বাদ করো।

ও নিজেও বিয়ের সময়ে ওর বাবাকে বলেছিলো, বাবা আশীর্বাদ করো। সরস্বতীর সাত পাক শুরু হয়েছে, পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত। এক পাক ঘুরে ও হেমন্তর পায়ে তেল-জল-ফুল দিচ্ছে। উলুধ্বনি নেই, সেটা নীরবে বয়ে যাচ্ছে এই উঠোনের ওপর দিয়ে। নিখিল পঞ্জিকা দেখে মন্ত্র পড়তে শুরু করে। মালাবদল হয়েছে, শুভ দৃষ্টিও। নিখিলের মনে হয় ম্যাজিকের মতো ঘটে গেলো সবকিছু। এখন থেকে সরস্বতী অন্যবাড়ির বৌ, ওখানেই ওর জীবন-বাঁধা হয়ে গেলো। দূরের লোক হয়ে গেলো নিখিল আর সরলা।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমন্ত সবাইকে ডেকে বললো, এই বোরকাটা পরে সরস্বতী যাবে আমার সঙ্গে।

বোরকা?

সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

আমার বন্ধু হাসান ওর মায়ের বোরকাটা আমাকে দিয়েছে। ফিরে যেতে পারলে এটা আমি ওদের ফেরত দিয়ে দেবো। মা আপনার কি মন খারাপ হলো?

না বাবা। বাঁচার জন্য তো এসব দরকার। সংস্কার মেনে তো যুদ্ধের সময়ে বাঁচা যায় না।

সুষমা হাসতে হাসতে বলে, গতকাল এ বাড়িতে টুপি এসেছে, আজ বোরকা।

দুঃখ পাচ্ছেন বৌদি?

সুষমা চুপ করে থাকে। নিখিল ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে, যুদ্ধের সময়ে ধর্ম বলে কিছু থাকে না, যুদ্ধই ধর্ম হয়ে যায়। তবুতো আমরা সরস্বতীর বিয়ে আমাদের বিশ্বাস মতো করেছি।

ভগবানের অসীম করুণা যে আমরা কোনো বাধার মুখে পড়িনি। এমন তো হতে পারতো যে আজই এ গাঁয়ে মিলিটারি আসতে পারতো।

বাবা, এসব কথা বলো না।

লক্ষ্মী চেঁচিয়ে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, কাল দিদি চলে গেলে আমি কেমন করে থাকবো?

সুষমা লক্ষ্মীর মুখে হাত চাপা দেয়, কাঁদিস না। চলো হেমন্ত তোমাদেরকে ঘরে দিয়ে আসি।

ওরা ঘরে গেলে সরলা নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললো, বোরকা পরলে সরস্বতীকে তো সিঁদুর মুছে ফেলতে হবে।

নিখিল চুপ করে থাকে। সরলা নিজেই আবার বলে, আজ সিঁদুর পরে কাল কিভাবে সিঁদুর মুছবে মেয়েটা? তা কি হয়?

খুব হয়? ওতো মাত্র একদিনের সিঁদুর মুছবে। তুমি কতো বছরের সিঁদুর মুছতে রাজী হয়েছো, ভেবে দেখো।

সরলা চোখ পাকিয়ে নিখিলের দিকে তাকায়। মনে হয়, লোকটা ভীষণ নিষ্ঠুর। এতো বছর সংসার করার পর ও একটু বেশি অন্যরকম হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময়টাকে জীবনবাজীর মতো করে ভাবছে। এতোটা ভাবার কি খুব বেশি দরকার ছিলো? সরলার মন খারাপ হয়। অন্য মেয়েগুলোর কথা মনে হয়। কতোদিন হলো ওদের কোনো খবর নেই। ও নিজের ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে কেঁদে বুক ভাসালো। ওর এটাই অভ্যেস। স্বামীর ওপর অভিমান হলে মেয়েদের কথা মনে করে কাঁদে।

রাতে হারিকেন নিভিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত এবং সরস্বতীর জীবনে শুরু হয় যুদ্ধের নতুন অধ্যায়। সরস্বতীর ভাবনায় যুদ্ধ শব্দটা তেমন প্রবল ছিলো না, হেমন্ত শব্দটাকে তীক্ষ্ণ করে দেয়। যুদ্ধের সময়ে এই শব্দটার কতো ধরনের অর্থ হতে পারে, যুদ্ধের সময়ে জীবনযাপনের প্রচলিত ধারণা দিয়ে জীবন চলে না, যুদ্ধ মানুষকে বদলে দেয়, এ সময়ে শত্রু এবং মিত্র চেনার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হয়, ইত্যাদি সরস্বতী মুগ্ধ হয়ে হেমন্তর কাছ থেকে শোনে। হারিকেন নিভিয়ে দেয়ার পর অন্ধকারের শুরুতে হেমন্ত যখন বলে, যুদ্ধ একটা চুমু, তখন সরস্বতী শারীরিক কামনায় নয়, মানসিক আবেগে বিহ্বল হয়ে ওঠে। ভাবে, কটা মেয়ের ভাগ্যে এমন নতুন জীবনের শুরু হয়? গভীর চুমুতে ভরিয়ে দিয়ে হেমন্ত বলে, তোমাকে শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে যদি আমি মরে যাই তাহলে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

আমি তো তোমার মানুষ হয়েছি সরস্বতী। আমি গ্রেনেড খোলা শিখেছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যেসব গান মুক্তিযোদ্ধাদের মাতিয়ে তোলে আমি তার সঙ্গে তবলা বাজাই। তখন আমার মনে হয় আমার শরীরের ধ্বনি যোদ্ধাদের কানে পৌঁছে যায়। আমি ওদের শরীরে ঢুকে যাচ্ছি। ওদেরকে মাতিয়ে তুলছি আর ওরা জয় বাংলা' বলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে — তখন সেটা আমার যুদ্ধ হয়। মনে হয় গ্রেনেডের পিন খুলে আমি নিজেই ছুটে যাচ্ছি।

সরস্বতী প্রবল আবেগে হেমন্তকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনে দু'জনের শরীরকে যুদ্ধক্ষেত্র বানায়, এখানে শত্রু-মিত্র নেই, হারজিৎ নেই। হেমন্তর কণ্ঠ থেকে বারবারই উচ্চারিত হয়,

আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই সরস্বতী। ওই কণ্ঠ শুনে সরস্বতীর মনে হয় সুখই তো যুদ্ধজয়। যুদ্ধে বিজয়ী না হলে কেউ তো সুখী হতে পারে না। ও হেমন্তকে বলে, আমিও তোমাকে সুখী করবো। তুমি যে সিঁদুর আমার সিঁথিতে দিয়েছো সেটা মুছে যাওয়ার আগেই যেন আমার মরণ হয়।

না, কখ্খনো না। সরস্বতী তোমার কোলেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চাই।

কখ্খনো না।

শুরু হয় দু'জনের হুটোপুটি। একসময় পরিশ্রান্ত হেমন্ত বলে, আজ এক আশ্চর্য গ্রেনেডের পিন খুলেছি আমি। সরস্বতী হাসতে হাসতে বলে, কাজটিতে তুমি ভীষণ পটু। সত্যি করে বলতো তুমি এই প্রথম গ্রেনেড হাতে নিয়েছো কি না? না কি আগেও পিন খুলেছো?

দিব্যি, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। আর কাউকে না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সরস্বতী।

এতো ঘাবড়ে গেলে কেনো?

এমন করে বললে ঘাবড়ে যাবো না। দুষ্টু কোথাকার।

যুদ্ধের প্রথম হারাটা তুমি হারলে কিন্তু।

সরস্বতী হাসিতে মাতিয়ে তোলে ওকে। হেমন্ত ওর মুখে হাত চাপা দেয়, আস্তে, সবাই শুনতে পাবে।

এতো রাতে কেউ জেগে নেই। চলো না বাইরে যাই, আজ পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা! হেমন্ত সরস্বতীর হাত ধরে, এমন মেয়েই আমি চেয়েছিলাম, যার মধ্যে হাসি আছে, স্বপ্ন আছে, যে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে জানে, যুদ্ধ বুঝতে পারে। তোমাকে আমার বোঝা হয়ে গেছে সরস্বতী, তুমি সব পারো।

দুজনে বাইরে আসে। উঠোনে কলাগাছগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল-আঁকা পিঁড়িটাও কেউ সরায়নি। ওটার ওপর একগাদা জবা আর সন্ধ্যামালতী শুকিয়ে গেছে। সরস্বতী ফুলসহ পিঁড়িটা বারান্দায় উঠিয়ে রাখে। হেমন্ত কলাগাছগুলো তুলে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনে রেখে কোদাল দিয়ে মাটি সমান করে দেয়। বলে, এখন সব সাফ।

কেন?

শত্রু এলে বুঝতে পারবে না যে এখানে কোনো বিয়ে হয়েছে।

ওই উর্দুভাষী মুসলমানগুলো কি জানে যে হিন্দুর বিয়ে কিভাবে হয়?

ওরা না জানুক, খবর দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। যাকগে, বলো এখন আমরা কি করবো?

এই ফকফকে জ্যোৎস্নায় কানামাছি খেলবো।

কানামাছি? ঠিক আছে। হেমন্ত বারান্দার দড়িতে ঝোলানো গামছাটা নিয়ে আসে। কার চোখ বাঁধবো?

আমার। সরস্বতী মাথা বাড়িয়ে দেয়, বাঁধো।

হেমন্ত ওর চোখ বেঁধে দিয়ে বলে, কানামাছি ভোঁ-ভোঁ, যাকে খুশি তাকে ছোঁ। কানামাছি—

সরস্বতী গামছাটা টান দিয়ে খুলে বলে, হলো না। আমি যাকে খুশি তাকে ছুঁতে পারে-

বা না।

হা-হা করে হেসে ওঠে হেমন্ত। অপূর্ব জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে সে হাসি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে সরস্বতীর সামনে। ও হাসির রঙ দেখতে থাকে। নিজেকেই বলে, এ রঙের নাম জ্যোৎস্না। এ রঙ আমার একলার। কোনোদিন আর কারো হবে না। হাসি থামিয়ে হেমন্ত ওর ঘাড়ে হাত রাখে, কি হলো দাঁড়িয়ে পড়লে যে? খেলবে না?

ওগো তোমাকে আমি একটি নামে ডাকতে চাই।

ডাকো, যে নামে তোমার খুশি সে নামে ডাকো।

কেউ যেন জানতে না পারে?

কেউ জানবে না। স্বামীকে নাম ধরে ডাকার জন্য কেউ তোমাকে লজ্জা দেবে না সরস্বতী।

এখন থেকে তুমি আমার কাছে রঙ।

রঙ? হেমন্ত বিস্ময়ে তাকায়।

তুমি যখন হাসছিলে তখন সে হাসিতে আমি রঙ দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রঙের নাম রেখেছি জ্যোৎস্না।

বাহ্, চমৎকার। হেমন্ত ওর গালে চুমু দেয়!

চোখ বাঁধো।

আবার শুরু হয় খেলা। সরস্বতী দু'হাত বাড়িয়ে হেমন্তকে খুঁজতে থাকে— কানামাছি ভোঁ-ভোঁ রঙের বুক ছোঁ পেট ছোঁ, হাত ছোঁ, চুল ছোঁ। অনেকক্ষণ ঘুরেও সরস্বতী হেমন্তকে ছুঁতে পারে না। ও ওর নাগালের বাইরে থেকে ওকে ডাকে। একসময় ও সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরে বলে, কানামাছি এবার পুরো রঙটাকেই ছুঁয়ে দেখো।

সরস্বতী ওর বুকে মাথা রাখে। এতোক্ষণের ছুটোছুটিতে হাঁফিয়ে গেছে। নিজেই চোখের বাঁধন খুলে বলে, তোমাকে কি সারাজীবন এমন করে খুঁজতে হবে আমার? তুমি ধরা না দিলে ধরতে পারবো না?

না, কানামাছি, না। তোমার চোখ কেউ বাঁধবে না। আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

ঠিক তো?

এই তোমাকে ছুঁয়ে বললাম।

দু'জনে ঘুমুতে যায়। দু'জনের চোখে ঘুম নামে। দু'জনের চোখে রাত পোহায়। দরজা খুলতেই সরস্বতী দেখতে পায় বারান্দায় সুষমা বসে আছে। উস্কুখুস্কু চেহারা, বোঝাই যায় যে রাতে ঠিকমতো ঘুমোয়নি। ও সুষমার পাশে এসে বসে, বৌদি? সুষমার বিষাদমাখা দৃষ্টি দেখে সরস্বতীর বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ওর মুখে কথা আসে না। সুষমা মৃদু হেসে বলে, ঠিক মতো ঘুমিয়েছিলি তো?

হ্যাঁ, তুমি ঘুমোওনি?

অনেক রাত পর্যন্ত তোদের হাসি শুনলাম। আর ঘুম এলো না।

অ। সুষমার কথা শুনে খুশি হতে পারে না সরস্বতী।

কাল রাতে পূর্ণিমা ছিল না রে?

হ্যাঁ।

জ্যোৎস্না খুব সুন্দর না রে?

বৌদি আমি চান করতে যাচ্ছি। আমাকে তো আবার যেতে হবে।

সুষমার কাছ থেকে কোনো কিছু শোনার আশা না করে সরস্বতী গামছা কাঁধে ফেলে নাইতে যায়। সুষমা বুঝতে পারে, প্রথম রাতেই সরস্বতী নারী হয়ে গেছে। ওর যে বয়সে বিয়ে হয় ও কিছুই বুঝতো না। দেবেশ ওকে সব শিখিয়েছিলো। পূর্ণিমা রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে দুজনে চুপিচুপি বেরিয়ে আসতো। দেবেশ ওর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কবিতা বলতো। ওর অনেক কবিতা মুখস্থ ছিলো। বলতো, ঢাকায় গেলে তোমাকে আমি বলধা গার্ডেনে নিয়ে যাবো। ফুল আর পাখি দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। বলবে, এ কোন রাজ্যে এলাম। তুমি আর ফিরতে চাইবে না সুষমা। বলধা গার্ডেন দেখা হয়নি ওর। দেবেশের ইচ্ছেরও কমতি ছিলো না, কিন্তু ওর কপালে জোটেনি। সরস্বতীর অনেক কিছু দেখা হবে--আজ ও স্বামীর হাত ধরে অন্য গাঁয়ে নয়, অন্য দেশে চলে যাবে। সরস্বতীর সৌভাগ্যে ওর ঈর্ষা নেই, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য যন্ত্রণা আছে। শুনতে পায় সরস্বতীর শরীরে জল ঢালার শব্দ। ও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সুষমার বুক ফেটে যায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। ও বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে আকাশ দেখে— সূর্য ওঠেনি, কিন্তু চারদিকে আলো ফুটছে— চমৎকার লাগছে এই ভোর। কখনো কখনো এমন সময়ে মানবজনম সার্থক মনে হয়। থাকুক দুঃখ, কষ্ট, বেদনা তাতে কি এসে যায়? তবু এই বেঁচে থাকা ওর ভীষণ প্রিয় মনে হচ্ছে। ও আলোর মধ্যে রঙ দেখতে থাকে। হঠাৎ মনে হয়, গত রাতে সরস্বতীর যদি গর্ভ হয়ে থাকে, যদি ভারতে ফিরে যাবার পথে হেমন্তকে মিলিটারি ধরে নিয়ে যায়, যদি সরস্বতী বাবার বাড়িতে ফিরে আসে, নয় মাস দশ দিন পর সরস্বতীর যদি একটি ছেলে হয়-- তারপর হেমন্ত যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসে, তাহলে সরস্বতীও কি সুষমার মতো এয়োতী থাকবে? এসব কি ভাবনা? ভয়ে আতঙ্কে ও নিজের মনের দিকে তাকায়, একি দৃশ্য সেখানে? না, ও সচেতনভাবে ভাবছে না। আসলে ও নিজের জীবনের পুরো ব্যাপারটা এভাবে সাজিয়ে দেখছে। ও দেখে ভেজা কাপড়ে সরস্বতী এগিয়ে আসছে। ওর ভেজা মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি, গতরাতে কৌমার্য হারিয়ে ওর লাবণ্য বেড়েছে।

সরস্বতী কাছে এসে বলে, তোমার কি হলো বৌদি? এখনো এমন একঠায় বসে আছো?

তোকে খুব সুন্দর লাগছে সরস্বতী।

ও লাজুক হেসে বলে, তুমি যেন আমাকে কেমন করে দেখছো।

যা, হেমন্তকে বল চান করে নিতে।

সরস্বতী ঘরে ঢুকলে হেমন্ত বেরিয়ে আসে। সুষমা হেসে বলে, ঠিকমতো ঘুম হয়েছে তো?

হ্যাঁ। ও মাথা নাড়ে।

অনেক রাত পর্যন্ত তোমরা কানামাছি খেলেছো।

জ্যোৎস্না রাতে কানামাছি খেলা ভীষণ মজার বৌদি। দাদার সঙ্গে আপনি কখনো খেলেছিলেন?

সরস্বতীকে তুমি ভালোবাসো হেমন্ত?

হ্যাঁ, ওকে আমি যেটুকু দেখেছিলাম তাতেই আমার হয়ে গিয়েছিলো। ওকে ছেড়ে ভারতে গিয়ে আমি একটুও শান্তি পাইনি বৌদি। তাইতো ছুটে এসেছি। বাবা-মা কেউ কিছু

জানে না।

তুমি সুখী হও হেমন্ত।

এতোক্ষণে সুষমার কান্না পায়। হেমন্ত কিছুতেই বুঝতে পারে না যে একজন মানুষকে সুখী হওয়ার কথা বলে কান্না পাবে কেনো। ও কিছু না বুঝে স্নান করার জন্য চলে যায়। স্নান করে ফিরে আসার সময় দেখতে পায় সুষমা উনুনে আঁচ দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। হেমন্ত মনে মনে বলে, বেচারা দুয়োরানী।

ঘরে ঢুকলে সরস্বতী ওকে বলে, আমরা চলে যাবো তাই বৌদির খুব মন খারাপ।

উঁহু, তোমার বিয়ে হয়েছে তাই বৌদির মন খারাপ।

মোটেই না।

বৌদি আমাদের হাসি শুনেছে, কানামাছি খেলা দেখেছে।

তো কি হয়েছে?

তুমি বুঝবে না সরস্বতী। আমি বুঝি বৌদির কি হয়েছে।

আমিও বুঝি।

স্বীকার করতে চাচ্ছো না, এইতো?

সরস্বতী কথা বাড়ায় না। আয়না সামনে রেখে সিঁথিতে সিঁদুর পরে।

হেমন্ত হেসে বলে, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

সরস্বতী মোহনীয় হসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, আমরা কখন বেরুবো?

বৌদির রান্না হলে ভাত খেয়ে তারপর।

তোমার কি এখনই খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ, কতো রকম খিদে পায়।

দু'জনে উচ্চ হাসি হাসতে গিয়েও থমকে যায়। লক্ষ্মী এসে দরজায় দাঁড়ায়, ওমা তোমরা দু'জনে দেখছি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছো?

যেতে দেবে না লক্ষ্মীরানী?

ইস, যেন আমি বললেই আপনি থেকে যাবেন আর কি?

তুমি বলেই দেখো না?

জানি, জানি। এখন তো দিদিকে নিয়ে পালাবার তালে আছেন।

ওমা, তুমি তো একদম পেকে ঝানু হয়ে গেছো দেখছি।

যাহ্! লক্ষ্মী লজ্জা পেয়ে সরে যায়। শুনতে পার সরলা ওকে ডাকছে।

দরজা বন্ধ করে হেমন্ত বললো, এমন সুন্দর করে সিঁথিতে সিঁদুর পরলে সরস্বতী, একটুপর যে বোরকা পরতে হবে।

পরবো, সিঁদুর তো বোরকার নিচে ঢাকা পড়বে।

তা হবে না। যদি ধরা পড়ি তাহলে ওই সিঁদুরই কাল হবে।

মুছে ফেলতে হবে? সরস্বতী বিস্ফারিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ। তবে তোমার মুছতে হবে না, আমি মুছবো।

না। সরস্বতী আঁতকে ওঠে।

হেমন্ত ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, হাত দিয়ে মুছবো না। দেখো কি করি।

ও চুমু দিয়ে সিঁদুর ঘঁষে ফেললে চুল লাল হয়ে ওঠে। হেমন্ত গ্লাস থেকে পানি নিয়ে ধুয়ে

দেয় চুল। সরস্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে, টপটপ করে জল ঝরে চোখ থেকে। হেমন্ত ওর মুখটা উঁচু করে ধরে বলে, কেঁদো না। বেঁচে থাকলে আমি রোজ তোমার কপালে সিঁদুর দিয়ে দেবো। আমাদের বেঁচে থাকা আগে, তবে তো সিঁদুর।

সরস্বতী চোখের জল মোছে, কিন্তু বারবারই মনে হয় চোখটা মোছা হচ্ছে, কিন্তু জল মোছা হচ্ছে না। এতো জল কোথা থেকে যে গড়ায়, মাত্র গতকাল বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে। ও কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পাবে না। চুপ করে বসে থাকে। হেমন্ত হাসতে হাসতে বলে, চোখের জল বেয়াড়া হয়ে গেছে। ওই কাজটাও আমাকে করতে হবে। আমাকে ছাড়া তুমি যে কিছু করতে পারবে না, তাও আমার বোঝা হয়ে গেছে। দেখি তোমার চোখ দুটো — সরস্বতীকে জাপটে ধরে আবারও ঠোঁট দিয়ে চোখের জল মুছতে হলো হেমন্তকে। সরস্বতীর ভীষণ ভয় করে, এতো আদর-সোহাগ হারিয়ে যাবে না তো? ও দুহাতে জড়িয়ে ধরে হেমন্তকে, আমি আর কাঁদবো না। বুকের মধ্যে মাথা রাখলে ভুলে যায় সিঁদুর মোছার কষ্ট।

দরজায় টুকটুক শব্দ করে সুষমা, কি হলো তোমাদের? খাবে এসো।

আসছি বৌদি। সুষমার ক্লান্ত, বিষণ্ণ কণ্ঠের ওপর দিয়ে হেমন্তর উচ্ছল কণ্ঠ পাগলা হাওয়ার মতো বয়ে যায়। শিউরে ওঠে সুষমা, যেন শরীরের কোথাও কোনো ভাঙনের শব্দ হলো, হিসেব করে দেখলো যে বয়সে সরস্বতীর বিয়ে হলো এ বয়সেই ওর জীবন থেকে দেবেশ হারিয়ে যায়। কেমন করে পেরিয়ে গেলো দিনগুলো।

ওদের খেতে দেয় সুষমা আর লক্ষ্মী। বারান্দায় শুকনো মুখে বসে থাকে নিখিল আর সরলা। এ বাড়িতে এই মুহূর্তে কোনো আনন্দ নেই। কারো মুখে হাসি নেই। কিশোরী লক্ষ্মী পর্যন্ত প্রবল দুঃখে ভারাক্রান্ত। নিখিল এ সময় রোজই ভাত খায়, আজ খেতে পারছে না। হেমন্ত সাধাসাধি করার পরও বসতে পারেনি। সরলা তো একদম চুপ, বারবারই মনে হয় ওর কিছু বলা উচিত, কিংবা কিছু করা উচিত, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। শরীর যে এমন ভারী হয়ে যায় ও তা আগে কখনো টের পায়নি।

হেমন্তর মনে হয় বিদায়ের সময়টা বেশ দীর্ঘ হচ্ছে। সরস্বতীকে বোরকা পরাতে গিয়ে কাঁদলো সবাই। এই পোশাকটি ওরা দূর থেকে দেখেছে, কেমন করে পরতে হয় জানে না। কালো রঙের পোশাকটি ওদের ঘর অন্ধকার করে ফেলে। বোরকা-পরা সরস্বতী মায়ের বুক ভেঙে দিলো, বাবার বুক খালি করলো, বৌদি আর ছোট বোনকে আতঙ্কিত করলো। ভাত খাবার সময় ওরা সবাই দেখেছে যে সরস্বতীর সিঁথিতে সিঁদুর নেই, চুলের ফাঁকে ফাঁকে হালকা লাল রঙ লেগে আছে। এটা কিভাবে হলো কেউ ওকে তা জিজ্ঞেস করেনি, হয়েছে এই সত্যিটুকু সবার বুকের ভেতর গেঁথে আছে। বোরকা পরার পর সরস্বতী নিজেই হাউমাউ করে কাঁদলো কতোক্ষণ। নিখিল ফতুয়ার পকেট থেকে কাপড়ের টুপিটা বের করে হেমন্তকে দিলো, বাবা এটা রাখো, পরে যদি দরকার হয় তাহলে মাথায় দিও।

এখনই দিয়ে নেই বাবা। বোরকার সঙ্গে টুপি থাকাই উচিত। তাহলে ওদের বিশ্বাস হবে।

ফুলপ্যান্টের সঙ্গে টুপি মাথায় হেমন্ত বেশ চটপট নিজেকে তৈরি করে নিলো। টুপি নিয়ে ওর কোনো মন খারাপ নেই। ও সরলাকে প্রণাম করলো। সুষমাকে প্রণাম করতে গেলে ও দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, থাক, থাক। ভালো থেকো। পৌঁছে খবর দিতে ভুলে যেওনা কিন্তু।

হেমন্ত মৃদু হাসলো। লক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়ে আদর করলো। নিখিলকে প্রণাম করলে ও বললো, তোমাদের সঙ্গে আমি বাজার পর্যন্ত যাবো।

মেঠোপথে বাবার সঙ্গে কতোই তো হেঁটেছে সরস্বতী, আজ ও হাঁটতে পারছে না। একটু পরপরই মনে হচ্ছে উল্টে পড়ে যাবে। বোরকা পরে কি হাঁটা যায়? হেমন্ত চাপা কণ্ঠে বলে, এমন করে হাঁটলে মিলিটারি ঠিকই বুঝতে পারবে যে—

আহ্, চুপ করো হেমন্ত। নিখিল ওকে মৃদু ধমক দেয়। সরস্বতী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, বাবা আমি তোমার হাতটা ধরি।

ধর মা। তুই তো আমার সেই ছোট্ট খুকী। আমি তোকে ঘাড়ে নিয়ে কতোদিন বাজারে গিয়েছি।

বলতে বলতে নিখিল চোখ মোছে। এরপর তিনজনে নীরবে হাঁটে। নিখিল সরস্বতীর হাত ধরলে ওর মনে হয়, বাবার হাত ধরে ও যদি ভিনদেশে যেতে পারতো? বাবা যদি পৌঁছে দিতো ওর সুখের দোরগোড়ায়? পরক্ষণে মনে হয় বাবার হাত ধরলে আসলে বোরকাটাকে বোরকা মনে হয় না।

মাঝপথ পর্যন্ত গেলে আবদুর রহমানের মুখোমুখি হয় তিনজনে। নিখিল বলে, মাস্টার সাহেব ও হেমন্ত।

সে আমি আগেই বুঝেছি। বেঁচে থাকো বাবা। মাকে বুঝি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভালো, খুব ভালো।

আজ সন্ধ্যায় আমি আপনার সঙ্গে মসজিদে যাবো মাস্টার সাহেব।

বাবাকে আপনি একটি টুপি দেবেন মাস্টার কাকা। বাবার টুপিটা ওকে দিয়েছে। বোরকার ভেতর থেকে সরস্বতী কথা বলে। ও নেকাবটা ওঠায় না।

ঠিক আছে। ভালো মনে করেছো। বাজারে মিলিটারি ঘোরাঘুরি করছে। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে যা খুশি তা নিয়ে যাচ্ছে। গেরস্থ বাড়ি থেকে গরু—ছাগলও নেয়া শুরু করেছে। আপনি এই টুপিটা মাথায় দিয়ে রাখেন।

নিখিল মাস্টারের টুপিটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দেয়। বেশ স্বস্তি বোধ করে। এতোক্ষণে সরস্বতীও মানিয়ে নিয়েছে। ওর আর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। খানিকটা দূরে গিয়ে নিখিল ফিরে আসে। আবদুর রহমানের হাত চেপে ধরে, মাস্টার সাহেব আপনার জন্য টুপি আছে তো?

আছে, ঘরে আছে।

নিখিল কাতর কণ্ঠে বলে, হঠাৎ বুকটা জানি কেমন করে উঠলো। ভাবলাম, টুপি না থাকলে আপনার যদি কিছু হয়। তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।

নিখিল বাবু আপনি যান। মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসেন। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মাস্টারের হাত ছাড়িয়ে নিখিল ছুটে যায়। আবদুর রহমানের মনে হয় বোরকা পরা মেয়েটা নিখিল সরকারকে অসহায় করে দিয়েছে। যেতে যেতে মনে হয় অনেকদিন ওর দু'ছেলের কোনো খবর নেই। শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার শুনলে যুদ্ধের খবর পাওয়া যায়। আশাবাদ নিয়ে ঘুমুতে পারে।

বাজারে পৌঁছুতেই দু'জন মিলিটারির মুখোমুখি হয় ওরা। তিনজনকে লাইন করে দাঁড়

করায়। নিখিলের মনে হয় ওর চৈতন্যরহিত হয়েছে, ওর সামনে সাক্ষাৎ যমদূত— এখনই গর্জে উঠবে রাইফেল। হেমন্ত নিখিলের হাত চেপে ধরে। ফিসফিসিয়ে বলে, বাবা ভয় পাবেন না। শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

তোমলোগ কাঁহা যা রাহে হো?

স্টেশন মে, ঢাকা যায়েঙ্গে।

ইয়ে আওরাত তুমহারা কৌন হায়?

মেরি বিবি হায়।

তোমলোগ মোসলমান?

হ্যাঁ।

তুমহে কেয়া কলেমা জানতি হায়?

নিখিল সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে কলেমা পড়তে থাকে। একদম নিখুঁত পড়া। নিখিলের হাঁটু কাঁপছে, তারপরও কোনো ভুল নেই। ঢোক গিলতে হয় না। নিখিল নিজেও বুঝে উঠতে পারে না যে এতো অল্প সময়ে এমন চমৎকার করে এটা শেখা হলো কিভাবে? নিখিলের সঙ্গে হেমন্তও ঠোঁট মেলায়।

ঠিক হায় যাও, শালা গাদ্দার।

তিনজনে হাঁটতে শুরু করে। পেছন দিকে তাকায় না। স্টেশনে গাড়ি আসেনি। ফাঁকা স্টেশন, যাত্রী তেমন নেই। কোণায় দাঁড়িয়ে সরস্বতী বলে, বাবা আমরা কি খুব বাঁচা বেঁচে গেলাম।

হয়তো। নিখিল ছোট করে শ্বাস ফেলে। হেমন্ত বলে, বাবা আপনার বসে থাকতে হবে না। আপনি বাড়ি ফিরে যান।

ট্রেন আসুক। আমি তোমাদের চলে যাওয়া দেখবো। হেমন্ত বিদায় যে আনন্দের হয় এটা আমি এই প্রথম অনুভব করছি।

নিখিল কাঠের বেঞ্চে বসে গা এলিয়ে দেয়। দু'একজন করে যাত্রী আসছে। সরস্বতী বাবার গা-ঘেঁষে মৃদু কণ্ঠে বলে, বাবা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কেন রে পাগলি মা আমার।

বাবা আমি স্বার্থপরের মতো তোমাদের রেখে চলে যাচ্ছি।

যার যেটুকু সুযোগ সেটা ব্যবহার করতে হয় মা।

তাই বলে স্বার্থপরের মতো?

না, স্বার্থপর নয়। সবাই মরে গেলে তো চলবে না। কাউকে কাউকে তো বেঁচে থাকতে হবে। আমি তোকে কংসের কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করছি মা। মনে রাখিস তোর সন্তান কৃষ্ণ হয়ে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে।

বাবা! ফুঁপিয়ে ওঠে সরস্বতী।

আহ্, চুপ।

মাকে, বৌদিকে, লক্ষ্মীকে বলো আমাকে ক্ষমা করে দিতে। আমার অপরাধের শেষ নেই।

সিগনাল ডাউন হয়। ট্রেন আসছে। নিখিল বুকের মধ্যে সরস্বতীর মাথা চেপে ধরে। কালো বোরকার আড়ালে থাকায় ওর মুখটা আর দেখা হয় না। নিখিলের খুব ইচ্ছে হয়

বলতে, তোর মুখটা খোল মা, আমি দেখি, কিন্তু বলা হয় না, শুধু বলে, তুই বেঁচে থাক।

হেমন্ত দ্রুত কণ্ঠে বলে, ট্রেনে বসে তুমি জল খেতে চাইবে না। বলবে পানি। ভুলেও ভগবান উচ্চারণ করবে না। বলবে, আল্লাহ।

দরকার না হলে কথাই বলিস না মা। হেমন্তর মতো তুই তো এতোকিছু শিখতে পারিসনি।

বাবা দেশে ঢোকার আগে আমি ভাঙা ভাঙা উর্দু আর আরবি ভাষার অনেক কিছু শিখে নিয়েছি।

ট্রেন স্টেশনে ঢোকে। ছোট স্টেশন, এক মিনিট কি দু'মিনিট দাঁড়াবে মাত্র। ওরা প্লাটফরমের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। সরস্বতী বাবাকে প্রণাম করতে গেলে হেমন্ত বাধা দেয়, শক্ত হতে হবে সরস্বতী। ও নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। সবাই উঠে গেছে। শেষ যাত্রী হেমন্ত। প্লাটফরমে নিখিল একা দাঁড়িয়ে, আশেপাশে আর কেউ নেই। দূরে সবুজ পতাকা বের করেছে লাইন-ম্যান। গার্ডের বাঁশি বাজে। হেমন্ত মৃদুকণ্ঠে নিখিলকে বলে, জয় বাংলা বাবা। নিখিল চেয়েছিলো হেমন্তর মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করতে, কিন্তু পারেনি। ও লাফিয়ে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে। নিখিলের মনে হয় গার্ডের বাঁশির শব্দ তীব্রভাবে ওর কানে বাজছে আর ট্রেনটা জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে ছুটে চলে যাচ্ছে। কতোদূর যাবে ওটা? একসময় নিখিলের চোখের সামনে থেকে সরে যায় ট্রেন, ফাঁকা রেল লাইন – চারদিক জনশূন্য। ওর গা ছমছম করে ওঠে। যদি এখন একজন যমদূত ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি কেড়ে নেয় ওর হৃৎপিণ্ড, তাহলে কি এই মানবশূন্য প্রান্তরে ও একা পড়ে থাকবে? কেউ থাকবে না ওর লাশ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য? ও দ্রুত চারপাশে তাকায়, দ্রুত প্লাটফরম ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে যায়, দেখতে পায় দূর থেকে একদল সৈনিক এগিয়ে আসছে। ও ভয়ে পাশের একটা গর্তে নেমে দাঁড়িয়ে থাকে— আসলে ওদের ও দেখতে না পেলে কি হবে, ওই মাটি কাঁপিয়ে হেঁটে আসার শব্দ ওর ভেতরে ধ্বনি তুলছিলো, তাই অমন ছমছম করছিলো ওর শরীর। ওরা ওকে খেয়াল করে না, খনিকটা তফাৎ দিয়ে চলে যায় নিজেদের ক্যাম্পে। নিখিলের মনে হয় যুদ্ধের সময়ে দখলদার বাহিনীর পায়ের শব্দ এমন ভয়াবহ থাকে, ওটা কখনো কখনো কানে ঢোকে না, ঢুকে যায় শরীরের চামড়া ভেদ করে। তখন সমস্ত শরীর কান হয়ে যায়। ও গর্তে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারে যে ওরা চলে গেছে — ও এখন নিরাপদ। ও বেরিয়ে এ পথ-ওপথ ঘুরে হেঁটে যায় বাড়ির দিকে, উত্তেজনায় ওর অনেক কিছু মনে থাকে না, শুধু বুকের মধ্যে জেগে থাকে হেমন্তর বিনীতভাবে বলা জয়বাংলা ভঙ্গিটি — নিখিল এখন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, ওর সামনে জয় বাংলা শব্দভরা এক অলৌকিক প্রান্তর। এই প্রান্তরে বুটের শব্দ নেই, থাকলেও সেটা জয়বাংলা ধ্বনির কাছে পরাস্ত। কিন্তু বেশিক্ষণ এই অলৌকিক প্রান্তর স্থির থাকে না, ওর মনোযোগ ছুটে যায় এবং ভীত হয়। ভীত হলে এক ভয়াবহ মর্মযাতনা ওকে ম্রিয়মান করে ফেলে। ও মনে মনে প্রার্থনা করে, মেয়েটি যেন নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারে নিরাপদ এলাকায়।

৯

লোকটি এখন সৈয়দপুরে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় শুনতে পায় মাইকের ঘোষণা। ঘোষণাটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে বলে ও চায়ের দোকানে এসে বসে। ওর কানে কানে কে যেন বলে :

তাহারা দুই দিন ধরিয়া শহরে মাইকযোগে একটা ঘোষণা করিতেছে।

যে ভাষায় ঘোষণা দিতেছে তাহা একটি নতুন ভাষা। উর্দু–বাংলা মিশাইয়া তাহারা এইরকম ভাষা তৈয়ার করিয়াছে। না করিয়া উপায় কি। এখন যে শহরে কিছু কিছু বাঙালিকে তাহাদের কথা জানাইতে হইবে। একুশ বছর ধরিয়া এই সৈয়দপুরে বসবাস করিয়াও তাহারা বাংলা ভাষা শিখিতে আগ্রহী হয় নাই। দুই–চারটি শব্দ শিখিয়া থাকিতে পারে। ইহাতে দোষের কিছু নাই। অন্য আর একটি ভাষা শিখিতেই হইবে এমন কোনো লেখাজোখা নিয়ম নাই। কিন্তু এখন প্রয়োজনটি এমনই যে ভাষা তৈয়ার না করিয়া উপায় নাই।

তাহারা অবশ্য একজন বাঙালিকে দিয়া এই ঘোষণাটি দেওয়াইতে পারিতো, কিন্তু দেওয়াইবে না। কারণ তাহারা বাঙালিদের বিশ্বাস করে না। একুশ বছর ধরিয়া একত্রে বসবাস করিয়াও তাহারা কখনো বাঙালিদের বিশ্বাস করে নাই। যদিও তাহারা জানে বাঙালিদের কোনো কোনো কুকুর তাহাদের পাকিস্তানী প্রভুদের পা চাটিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে। তাহাদের অপেক্ষার রজনী পোহায় না কেন এই চিন্তায় তাহারা অস্থির। যাহা হোক এতো কথা এইখানে বলার প্রয়োজন নাই। তাহারা ঘোষণায় কি বলিতেছে তাহা বোঝা গেলেই হইলো। ভাষার ক্ষমতা অনেক। বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে মানুষ না বলা কথাও বুঝিয়া লয়। বর্তমানে সৈয়দপুরের বাঙালিরা সেই না বলা কথা বুঝিয়া লইতেছে। তাহাদের ভাষায় যদি শব্দ না থাকিয়া শুধু ধ্বনি থাকিতো তাহা হইলেও তাহারা বুঝিয়া লইতো।

ঘোষণায় বলা হইতেছে, আপনাদের জন্য একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সেই ট্রেন আপনাদিগকে সীমান্ত এলাকায় পৌছাইয়া দিবে যাহাতে আপনারা নিরাপদে ভারতে চলিয়া যাইতে পারেন, আপনারা নিজেদেরকে আশঙ্কামুক্ত করিয়া আনন্দিত রাখুন।

শহরের অলিগলি, প্রধান সড়ক হইতে ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহাদের কণ্ঠস্বর। অবরুদ্ধ বন্দী বাঙালিরা জানালায়, দরজায় কিংবা ক্যাম্পের মাঠে দাঁড়াইয়া ঘোষণাটি শুনিল। আনন্দ প্রকাশ করিবার আহ্বানে তাহারা উৎফুল্ল হইতে পারিলো না। কিন্তু খানিকটুকু স্বস্তি অনুভব করিলো। সত্যি কি ভারতের মাটিতে পৌছাইতে পারিবে? এই অবাঙালিদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? তাহারা আশঙ্কামুক্ত হইতে পারিলো না। নানারকম প্রশ্নে আক্রান্ত হইয়া ঘুমাইতে গেলো। তাহারা জানে না তাহাদের দুঃখের রজনী পোহাইবে কিনা!

ক

অনেক রাতে সুনন্দা অমলকে বলে, সত্যি কি ওরা আমাদের ভারতে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে?

ঘুমোও সু। আমাকে সকালে কাজে যেতে হবে।

অমলের ঘুম-জড়ানো কণ্ঠস্বরে সুনন্দার মায়া হয়। বেচারা সারাদিন পরিশ্রম করে। তাই আর কথা বাড়ায় না। রাতে কথা না বললে ওর সঙ্গে তো আর তেমন কথা বলা হয় না। সারাদিন অমল থাকে না। কেমন করে এই দিনগুলো কাটে ওর? একটুপর ও আলতো করে অমলকে ঠেলা দেয়। আবার সেই ঘুমজড়ানো কণ্ঠ, কি হয়েছে, ঘুম আসছে না?

শোনো ভারতে গিয়ে তুমি কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে। আমি হাসপাতালের নার্স হবো।

অমল ওকে বুকে টেনে নেয়। এতো ঘুম যে কথা বলার সাধ্যি নেই। ও জানে সুনন্দা এমনই। ওর কল্পনা হরিণীর চেয়েও তীব্র গতিতে দৌড়ায়। অমলের বুকের মধ্যে মুখ রেখে দু'চোখ ভিজে যায় সুনন্দার। নিজেকে শাসন করে, কেন ওর স্বপ্ন এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে? কেন পাটের দড়িটা ওর কাছে রেশমি সুতো হয়ে যায়? এ বছরের তেইশ মার্চ ছিলো ওদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকী। প্রথম বছরটি অন্যরকম করে উদ্‌যাপন করার জন্য দু'জনে নানারকম পরিকল্পনা করেছিলো অনেকদিন আগেই। অমলের ছোট চাকরি। অনেক দিন ধরে না জমালে একটু একটু করে অনেক কিছু বেরুবে না থলে থেকে। কিন্তু ইচ্ছে তো হাজার রকম। অমল বলেছিলো, সেদিন তোমাকে বাসন্তী রঙের শাড়ি কিনে দেবো।

আর তোমাকে একটা গরদের পাঞ্জাবি কিনে দেবো আমি। কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবো।

তুমি ছোট ছোট কালচে লাল রঙের গাঁদা ফুল দিয়ে সাজবে। আমরা আমাদের বসন্ত রাজ্যের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবো। রাজা আর রানীর মতো।

আমাদের প্রজা কারা হবে?

পাখিরা।

ফুলেরা।

গাছেরা।

ঘাস?

হ্যাঁ, ঘাসও।

সুনন্দা ঘুমুবার আগে ভেবে দেখতে চাইলো এগুলো কতোদিন আগের কথা? মাত্র তিন-মাস। তিনমাস আগে দু'জনের ভেতর এমন স্বপ্ন ছিলো। তারপর জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোতেও দু'জনের স্বপ্নের কোনো ঘাটতি ছিলো না। মিছিল করে ঘরে ফিরলে নিজেরা নিজেদের গল্পে মগ্ন হয়ে যেতো। অমলের একটাই কথা ছিলো, ব্যক্তিগত আনন্দের সঙ্গে দেশের এতোবড় আন্দোলনের কোনো বিরোধ নেই। বেঁচে থাকার জন্য দুটোই আমাদের কাছে ভীষণ জরুরি।

অমলের কথা সুনন্দাকে মুগ্ধ করে দিতো। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতো, শোনো সেদিন কিন্তু আমরা দু'জনেই দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের বরণ করবো। কলাপাতায় করে দই আর মিষ্টি খেতে দেবো।

অমল হাসতে হাসতে বলতো, আর আমি কি খাবো?

তুমি কি খাবে?

আমাদের ভাগ্যেও কি দই আর মিষ্টি, না অন্য কিছু?

সুনন্দা উজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে বলতো, আমরা কিছু খাবো না।

কারণ আমাদের খিদে নেই। অমল কথা যোগ করতো।

হ্যাঁ খিদে নেই। কারণ আমাদের পেট-ভরা।

কি সে?

ভালোবাসায়।

বোকা মেয়ে, ভালোবাসায় পেট ভরে না। বুক ভরে।

আমাদের সব ভরে।

সত্যি সুনন্দা? অমল গভীর আবেশে ওর হাত ধরে। সুনন্দা আমরা এমনই থাকতে চাই। এমন অটুট ভালোবাসা নিয়ে সারা জীবন।

কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পালাবে না তো?

দিব্যি, কখনো না।

যেদিন আমার শেষ বিদায় হবে সেদিন কিন্তু তুমি আমার সামনে থাকবে। আমি তোমা-কে বিদায়ের কথা বলে যেতে চাই।

বিবাহিত জীবনের এক বছরে মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়ার বাইরে এসব কথাইতো হতো দুজনের। এর মধ্যে রাষ্ট্রের এতো কিছু? তাহলে বিবাহিত জীবনের সুখের সময় কি মাত্র এক বছরের? ভাবতেই আবারো কান্না আসে। এতো সুখের স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও কান্না আসছে কেন? সুনন্দা কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবারো ঘুম জড়ানো কণ্ঠ অমলের, আহ্ সু কাল সকালে আমাকে কাজে যেতে হবে। রাতে ভালো ঘুম না হলে শরীর খারাপ থাকে। ঠিকমতো কাজ করতে পারিনা। ঠিকমতো কাজ না করলে ওরা চাবুক দিয়ে মারে।

অমলের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে যায়। রাজ্যের ঘুম ওর চোখে। সুনন্দার মন খারাপ হয়। সত্যি বেচারার হাড়-ভাঙা পরিশ্রম। ভোরবেলা মিলিটারির ভ্যান এসে দাঁড়াবে ওদের নিতে। দিন-াজপুর-ঠাকুরগাঁও সড়কের ভাঙা ব্রিজটা মেরামত করা হচ্ছে। সেখানে ওদের কাজ। সৈয়দপুর বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। সেখানে ওদের কাজ।

সুনন্দা ঘুমুনোর চেষ্টা করে। আলতো করে অমলের হাত সরিয়ে দিয়ে একটুখানি সরে আসে, যেন ওর শরীরের স্পর্শ অমলকে জাগিয়ে না দেয়। ও যেন দুঃস্বপ্নের রাত না কাটায়, যেন একটি নির্ভেজাল ঘুমের পর নতুন ভোরে প্রশান্ত মনে ঘুম-ভাঙে অমলের। কিন্তু সুনন্দা জানে ঘুমুতে পারে না অমল। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম ওকে ঘুমের ভেতরও তাড়া করে। কখনো আচমকা জেগে গিয়ে গোঙানির স্বরে বলে, না, না মারবেন না। মারবেন না। আমি-তো মন দিয়ে কাজ করছি। এসব অমল জানে না। ভোরে ওর কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু এমন কথা শুনলে কষ্টে বুক ভেঙে যায় সুনন্দার। অশ্রু ডুবিয়ে দেয় চোখ।

এই ক্যাম্পে আসার আগে ওদের দু'কামরার বাড়িতে ছোট্ট একটা বারান্দা ছিলো। মন খারাপ হলে অনেক রাতে ও বারান্দায় বসে থেকে আকাশ দেখতো। এখানে সে উপায় নেই। এখানে ঘরের মধ্যে ঘর। কয়েক হাত দূরে দূরে মানুষ। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই। স্কুল বিল্ডিং বলে বেঞ্চ-টেবিল ইত্যাদি পাওয়া গেছে আড়াল তৈরি করার জন্য। কিন্তু ইচ্ছা করলেও অন্ধকারে বসে থাকা যায় না। ভয় করে। দৈত্যের মতো লোকগুলোর চেহারা। সুনন্দা বিছানায়

উঠে বসে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। আজ ওর কি হয়েছে যে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

ঢাকায় পঁচিশ তারিখে গণহত্যা শুরু হলেও সৈয়দপুরে তেইশ তারিখ থেকেই নিধন শুরু হয়ে যায়। অবাঙালিরা আর্মির অপেক্ষা করেনি। নিজেরাই দা, কুড়োল, বল্লম, তলোয়ার নিয়ে পাকিস্তান রক্ষায় নেমেছিলো। সুনন্দার মনে হয় এসব ভাবলে ওর মাথার ভেতর রক্ত জমাট হয়ে যায়। ওর ভাবনা বেশিদূর এগোয় না। শুধু অসংখ্য স্মৃতি রক্তের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। সুনন্দা গুম হয়ে থাকে। ও চুপচাপ বসে থাকে। ঘুমের জন্য পাগল হয়ে যায় অমল, কারণ ওর মগজে কাজে যাবার তাড়না আছে। ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে হাতের সঙ্গে মুখও চালায় ওরা, শালা গাদ্দার বাঙাল, শুয়োর কা বাচ্চা। অমল বলে হাত এবং পায়ের আঘাতের চেয়ে জিহ্বার এইসব কঠিন উচ্চারণ অনেক বেশি মর্মভেদী। মনে হয় যেন বুকের ভেতর ধরে রাখতে হচ্ছে হাজার মেশিনগানের গুলি। এসব কথা শুনলে সারাদিন মাথার দুপাশের শিরা দপদপ করে। সুনন্দা বাথরুমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। শুনতে পায় মঈনের মা কাশছে। কাশি আর থামছে না। যাবে কি একবার দেখতে? পরক্ষণে পিছিয়ে আসে। থাক, মঈন হয়তো ঘুমিয়ে আছে। ও কথা বললে মঈনের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। ওকেওতো কাজে যেতে হবে। ও অমলের মতো কাজে যাবার দুঃস্বপ্নে ভোগে না।

ভোরবেলা বেশ সতেজ হয়ে ঘুম থেকে ওঠে অমল। ওর স্বাস্থ্য ভালো। এতো ধকলেও ভাঙেনি। অভ্যেস মতো হাত বাড়াতেই টের পেলো সুনন্দা নেই। উঠে গেছে। অধিকাংশ দিনেই ওকে পাওয়া যায় না। খুব ভোরে উঠে ও অমলের জন্য রুটি বানায় নয়তো ভাত রান্না করে। সকালে খেতে দেয়, দুপুরেরটা বেঁধে দেয়। ও চায় না খাবারের জন্যে অমলের কষ্ট হোক। কোনো কোনো দিন অমল ঘুমুবার আগে বলে দেয়, কাল সকালে ঘুম ভাঙলে তোমাকে ছুঁতে চাই সু। উঠে যাবে না কিন্তু। সেদিন ওঠে না সুনন্দা। জেগেও শুয়ে থাকে। আজ কেন হাত বাড়ালো অমল? কাল রাতে তো ওকে বলা হয়নি। সেই পুরনো অভ্যেস। মাইকে ঘোষণা শোনার পর পুরনো অভ্যেস ওকে প্রথম ধাক্কা দিলো। কেননা ভয় ওকে তাড়া করেছে প্রথমে। ঠিক ভয় নয়, আতঙ্ক। মনে হলো সুনন্দাকে জড়িয়ে ধরলে ও একটা অবলম্বন পাবে এবং নিজেকে আতঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারবে। কিন্তু শূন্য হাত নিজের কাছে ফিরে এলে প্রথমেই মনে হলো, দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও সড়কের ভাঙা ব্রিজটি ঠিক করতে আরো সাত দিন সময় লাগবে। যারা কাজ করছে তাদের বাদ দিয়ে কি ট্রেন চাউলহাটি সীমান্তে পৌঁছাবে? বিশ্বাস হয় না অমলের। শুনতে পায় সুনন্দা মৃদু কণ্ঠে ডাকছে, উঠবে না। বেলা হয়েছে। আজও কিন্তু আমাকে ভাত খাইয়ে দিতে হবে।

ঠিক করেছি এই লোভেই রোজ রোজ দেরি করে উঠবো। ভাত মাখাও আমি আসছি।

ঘড়ির দিকে তাকাতেই অমল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আজ আর খাওয়ার সময় হবে না। ফিরে এসে দ্রুত কাপড় পরতে থাকে। সুনন্দা ওর পাশে দাঁড়িয়ে ভাত গোল্লা গোল্লা করে মুখে দেয়। ওপাশ থেকে মঈন ডাকে, অমলদা হয়েছে?

তুমি রেডি?

হ্যাঁ।

বলতে বলতেই গেটের সামনে হর্ন শোনা যায়। ভাত খাওয়া আর হয় না। সুনন্দা জানে ভাতটুকু শেষ না করতে পারার জন্য মন খারাপ থাকবে অমলের। ও গ্লাস বাড়িয়ে দেয়। এক চুমুকে জলটুকু শেষ করে ও দৌড়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় সুনন্দার মাথা আর গালে হাত

ছুঁয়ে যায়। ও এভাবেই যায়। বলবে, তোমাকে ছুঁয়ে রেখে যাই। ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয়। সময়টা এমনি খারাপ। বেঁচে যে আছি এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

সামনের বিয়ে–বার্ষিকীটি কি আমরা উদ্‌যাপন করতে পারবো? কতোদিন এমন বন্দী হয়ে থাকতে হবে?

হয়তো খুব বেশি দিন নয়। হয়তো অনেকদিন। কে জানে।

ক্যাম্পের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলা ও শিশুরা। পুরুষগুলো ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারো যেন দেরি সয়না। দেরি মানে— । না এমন কথা ওরা মনে করতে চায় না। ওরা ভাবতে চায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। অবরোধ করে ফেলেছে এই শহর। অমলকে নিয়ে গাড়িটা চলে গেলে সুনন্দা নিজের ভেতরে একটি অবরুদ্ধ শহরের গল্প ফেঁদে বসে। গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে ওর মনে হয় শহরের চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল অগ্রগতি। হানাদার বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে কোনোরকমে শহরের পতন ঠেকিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তাই বন্দী শিবিরে আটকে রাখা সমস্ত মানুষকে ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসে। কামানের গোলার সামনে বসিয়ে রাখে। নারী এবং শিশুদের আর্তনাদে বাতাস ভারী। থমথমে হয়ে যায় চারদিক। মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে যায়। হতবাক ওরা। কাদের দিকে গুলি ছুঁড়বে? ওরাতো ওদেরই লোক। এদেরকে লাশ বানিয়ে কি শহর দখল করা যায়? দু'পক্ষেরই গোলাগুলি বন্ধ। শুধু শিশুদের কান্না বুলেটের মতো বিদ্ধ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে। আর উল্লাস করে হানাদার বাহিনী। শিশুদের কান্নাইতো ওদের যুদ্ধে জিতিয়ে দেবে। ফিরে যাবে মুক্তিবাহিনী। যতোদিন এই শহরের একজন লোকও থাকবে ততোদিন এরা এইসব লোকদের তোপের মুখে বসিয়ে রাখবে। ভাবতেই হানাদার বাহিনীর স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। ওদের ঘুম পায়। ওদের বিশ্রাম প্রয়োজন। ওদের আনন্দ দরকার। দীর্ঘদিন ওরা কঠোর পরিশ্রর করেছে।

দিন যায়। রাত যায়। একজন দু'জন করে মরতে থাকে শিশু। মায়েদের আহাজারি থামে না। একজন চুপ হয়ে গেলে আর একজনের বুক খালি হয়। সামান্য খাবার দেয়া হয়। পেট ভরে না কারো। কতোদিন এভাবে চলবে? এতোকিছু দেখে নিজেদের ভেতর সিদ্ধান্ত নেয় কতিপয় নারী। সে এক রাত। রাত তো নয় যেন পূর্ণিমার অপরূপ লীলা। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত মানুষের ওপর সাদা ছায়া বিছিয়ে দেয়। অলৌকিক আলো সর্বত্র। সেই আলোর ভেতর থেকে ফুটে ওঠে একটি মুহূর্ত। একজন নারী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে দৌড়ে যায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বাতাসে চুল ওড়ে। শাড়ির আঁচল লুটায়। কে এই নারী? বিস্মিত সকলে। আস্তে আস্তে দেখা যায় ওরা একলা নয়, ওরা কয়েকজন। নদীর তরঙ্গের মতো পূর্ণিমা রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আলোর ঢেউ ওঠে। হানাদার সৈনিকেরা লোলুপ হয়। পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কে আগে পাবে সেই উন্মাদনায় ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। যুদ্ধের কথা ভুলে যায় ওরা। কতিপয় নারীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের ময়দান রূপান্তরিত হয় আনন্দের ময়দানে। নাচে গানে মেতে ওঠে হানাদার সৈনিকেরা। আর সেই ফাঁকে হামাগুড়ি দিতে দিতে কতিপয় পুরুষ পৌঁছে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। উত্তেজিত কণ্ঠ, এখনই সময়। ওদের

বেসামাল করে রাখা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে দ্বিধা, আমাদের সেইসব বোনদের কি হবে। তারাতো আমাদের আক্রমণের মুখে বাঁচতে পারবে না।

পুরুষের নির্ভীক কণ্ঠ, ওরা বলছে এটাই ওদের যুদ্ধ। ওরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। ওরা চায় স্বাধীন স্বদেশ।

মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে কলরব ওঠে, ওরা শহীদ হবে, ওরা শহীদ হবে। এগিয়ে চলো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না।

ওরা দেখতে পায় নারী-পুরুষের দল শিশুদের বুকে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে অনেক-টা এগিয়ে এসেছে। ওদের খালি করে দিচ্ছে জায়গা। শিশুদের কান্না নেই। ওরা বুঝে গেছে এখন কান্নার সময় নয়। আশ্চর্য নিঃশব্দে একটি বড় দল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার আগেই গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিন গান। হানাদার বাহিনী অস্ত্র হাতে তুলে নেবার সময় পায় না। মুক্তিবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে। এক সময়ে থেমে যায় গোলাগুলির শব্দ। ভোর হয়। সূর্য ওঠার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকজন নারীর লাশ খুঁজে বের করে। অল্পক্ষণে অন্য মানুষেরা যুক্ত হয় তাদের সঙ্গে। সবাই মিলে শহীদ নারীদের নিয়ে আসে শহরের কেন্দ্রস্থলে। বেলা বাড়ে। দুপুরের আগেই তাদের সমাহিত করা হয়। রাতারাতি গড়ে ওঠে স্মৃতিসৌধ। শহরের সব মানুষ তাদের জন্য প্রার্থনা করে। সন্ধ্যার আগেই যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। সবাই বলাবলি করে, ওদের জন্যই আমাদের জীবনে স্বাধীনতার প্রভাত এসেছে। আমরা কোনোদিন ওদের ঋণ শোধ করতে পারবো না।

একটি অবরুদ্ধ শহরের এমন একটি গল্প বানিয়ে সুনন্দা এই ক্যাম্পের দিনগুলো খানিকটুকু অন্যরকম করে রাখার চেষ্টা করে। ও কি সেই শহীদ নারীদের একজন হবে, যার সুললিত কণ্ঠে আলোকিত হয়ে যাবে যুদ্ধক্ষেত্র? সত্যি কি দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করার সুযোগ ও পাবে? নাকি এভাবে প্রতিদিন একটি করে গল্প বানিয়ে নিজের জন্য নিজেই ফাঁকি তৈরি করবে? আসলে ও ভেবে দেখেছে একটি অবরুদ্ধ শহরের গল্প নিজের মধ্যে রাখলে চারপাশে স্মৃতি জেগে ওঠে। সে স্মৃতি যখন-তখন সামনে এসে দাঁড়ায়। কখনো ওকে ভীত করে তোলে। কখনো ক্রুদ্ধ করে। কখনো সাহসী হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়। নিজের সঙ্গে এই খেলায় ওর ভেতরের ফাঁকির ভাব মুছে যায়। স্বপ্ন গাঢ় হতে থাকে। সুনন্দার মনে হয় স্বপ্ন গাঢ় হওয়া মানেই ওর মুক্তি নয়। স্বপ্ন রঙের বিপরীতে রঙ। স্বপ্নটা যদি লাল হয়, তবে বিপরীতটা কালো। অন্ধকারের কালো। ও বুঝে যায় যে এমন রঙের একটি জায়গা থাকে। যে প্রতিবেশি অন্য প্রতিবেশির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সেই শহরে অন্ধকার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। স্বপ্নের বিপরীতের সেই ভয়াবহ রঙ সুনন্দার দৃষ্টি পথে পাহাড়-সমান হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ও দেখতে পায় পঁচিশ তারিখের আগেই সেনানিবাসের বাঙালিদের নিরস্ত্র করা হয়। গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগের নেতা-দের। শিউরে ওঠে সুনন্দা। কতো মানুষের রক্তে ভেসে গিয়েছিলো সৈয়দপুরের রাস্তা? ও জানে না। শুধু জেনেছে প্রতিদিনের দেখা প্রতিবেশি বিহারিরা আর মানুষ নেই। ওদের

দাঁতগুলো মাংশাসী জন্তুর আকার ধারণ করেছে — নখ ধারালো থাবা। ওরা হত্যাযজ্ঞ নিয়ে উন্মত্ত। শহরের বাতাসে মানুষের আর্তনাদ আর রক্তের গন্ধ। যারা গ্রামের দিকে পালিয়ে যেতে পেরেছে তারা বেঁচে গেছে, যারা পারেনি তাদের মাথার ওপর ঝুলে আছে বিহারিদের হাতে ধরা খড়্গ। ভাবতে এখনো অবাক লাগে সুনন্দার। বিহারিদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা-অফিসারের নির্দেশে সৈয়দপুর হাইস্কুল আর দারুল-উলুম মাদ্রাসায় ক্যাম্প বানিয়ে অবরুদ্ধ শহরের টিকে-থাকা বাঙালিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মঈন দুঃখ করে বলে, দেখলেন বৌদি যাদের সঙ্গে একুশ বছর প্রতিবেশি হয়ে বাস করলাম তারা কেমন নিষ্ঠুর আচরণ করলো। আর আমাদেরকে বাঁচালো ওরা যাদেরকে চোখেও দেখিনি। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকরা খারাপ আচরণ করলে কষ্ট পাই না কিন্তু বিহারিরা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি ভুলে যেতে চাই যে ওরা এই মাটির মানুষ।

নঈমের কথা শুনলে সুনন্দা বোবা হয়ে যায়। ওকে বলার মতো কথা এ জন্মে বলা হবে না। বিহারিদের হাতে নিহত হয়েছে নঈমের বাবা আর বড় ভাই। ওর মা বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই। মাঝে মাঝে নিজে নিজেই বিড়বিড় করে। কি বলে বোঝা যায় না। কখনো সুনন্দাকে বলে, নঈমের জন্য একটা মেয়ে দেখো বৌমা। এই ক্যাম্পেই আমি ওর বিয়ে দেবো। ধুমধাম করে বিয়ে। তোমরা সবাই গান গাইবে। আমি তোমাদের জন্য কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করবো। বোরহানি থাকবে। মুরগির কোর্মা আর জর্দাও রান্না হবে। অনেক বড় বড় পাতিল আনবো। আমি একাই সব পাতিল দু'হাতে ওঠাতে পারবো। একটুও কষ্ট হবে না।

বলতে বলতে নঈমের মা নিজের ছোট বিছানার ওপর গিয়ে বসে। তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদ-তে থাকে।

সুনন্দা সইতে পারে না। অমল ফিরলে ওর ক্লান্ত শরীর জড়িয়ে ধরে বলে, চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

কিভাবে যাবো?

অমলের সমস্ত শরীরে ঘাম। সারাদিনের খাটুনির ফলে শার্ট-প্যান্ট ঘামে ভেজে আর শুকোয়। আবার ভিজতে শুরু করে। আবার শুকোয়। ও জানে না কতোবার এমন হয়। বাড়ি ফিরলে সুনন্দা প্রথমেই জামা-প্যান্ট ধুয়ে দেয়। এভাবে হয়তো ঘাম দূর করা যায়, কিন্তু ক্যাম্প জীবনের গ্লানি কি দূর করা যায়? দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করে বিবাহিত জীবনের একটি বছর নয়, যেন ওরা দীর্ঘ বছর পেরিয়ে এসেছে। এখন ওদের প্রৌঢ়ত্ব চলছে। সুনন্দার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অমল বলে, ভয় পেয়ো না সু। দেশ স্বাধীন হলে আবার তোমাকে নতুন করে সিঁদুর পরাবো। নতুন বাসর সাজাবো। দেখবে আমরা যে সময়টা হারিয়েছি সেটা ঠিকই ভরিয়ে তুলবো।

বয়স? সুনন্দা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে।

বয়স কোনো ব্যাপার হলো? যদি মনটা সতেজ থাকে তাহলে বয়সকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবো।

সুনন্দা অমলের বুকে মাথা রাখে। এই স্বস্তিটুকুই এ সময়ের দিনযাপনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু স্বস্তি তো সবার জীবনে নেই। কতো জনের আচমকা চিৎকারে ফুটো হয়ে যায় অন্যের কলজে। এই ক্যাম্পের কজনের খবরই বা কজন রাখে।

খ

পরদিন আবার শহরের আকাশে-বাতাসে মাইকের ঘোষণা ছড়াইয়া পড়ে। বলা হইতে থাকে, হিন্দু ও মাড়োয়ারি অধিবাসীগণ ভারতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন। আপনাদেরকে সীমান্তে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। আপনারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকু মাত্র সঙ্গে লইবেন। আমাদের লক্ষ্য যতো বেশি সংখ্যক মানুষ বহন করা যায় তাহার দিকে। মালের চাহিতে মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান। আপনারা মালপত্র সঙ্গে লইয়া ট্রেনের কামরায় অধিক জায়গা দখল করিবেন না। নেহাৎই মালের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সামান্য লইবেন। নইলে শুধু নিজের জীবনটুকু লইয়া ট্রেনে উঠিবেন। মালপত্র একবার গেলে আর একবার আসিবে। কিন্তু জীবন ফিরিয়া আসেনা। আপনারা মনে রাখিবেন জীবন ফিরিয়া আসে না।

গ

শেষের বাক্যটি ঘোষক বারবার বলে। যেন সে একটি ভীষণ জরুরি কথা বলছে। কিন্তু তার কণ্ঠে দানবীয় উল্লাসের ধ্বনি। ক্যাম্পের সবার বুক কেঁপে ওঠে। ওরা শুনতে চায় না ওই কণ্ঠ। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। সব চুপচাপ। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে আছে। যেন অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এসেছে ক্যাম্পের মানুষগুলোর মধ্যে। শিশুরা পর্যন্ত চুপ করে আছে। চারদিকে কোলাহল করে না। মায়ের বুকের ভেতর মুখ রেখে নিঃশব্দ। নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দও ওরা বুঝতে পারে না। সুনন্দা অমলের কানে ফিসফিস করে বলে, সবার কি নিশ্বাস ফেলাও বন্ধ হয়ে গেলো?

আহ্ চুপ করো।

চলো মাঠে নেমে যাই। একজন কেউ নড়লে সবাই নড়বে।

ঠিক বলেছো।

ওরা দু'জনে মাঠে নেমে গেলে ওদের বয়সীরা একসঙ্গে হয়। বুড়োরা বারান্দায় বসে থাকে। শিশুরা ছুটোছুটি করে। সুনন্দার মনে হয়, এভাবেই অকস্মাৎ বাতাসে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। এই ফুলের গন্ধ বুকে নিয়ে নঈম অমলকে ডাকে, অমলদা?

বলো। অমল ওর দিকে তাকায় না। ওর এখন কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। বিবর্ণ, পাংশু, ভয়ে পীড়িত মুখ দেখতে ওর ভালোলাগে না। ওতো শুধু সুনন্দার মুখ দেখতে চায়, যে মুখ তারুণ্যে উজ্জ্বল, কুসুমিত, স্বপ্নভরা এবং প্রবল আশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নঈমের দিকে না তাকিয়ে ও আবার বলে, তুমি কি যেন বলতে চেয়েছিলে নঈম?

একটি বিষয় লক্ষ করেছেন? ঘোষণায় ওরা কিন্তু বলেছে শুধু হিন্দু আর মাড়োয়ারিদের নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, সেটা আমিও লক্ষ করেছি। যমুনাপ্রসাদ কেডিয়া নঈমের কথায় সায় দেয়। ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়। কারণ ওরা আমাদেরকে এ দেশের মানুষ মনে করে না।

সেজন্য নয়। নঈম বাধা দেয়। তোমরা চলে গেলে তোমাদের বাড়িঘর, জায়গা-জমি, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বিহারিরা দখল করে নেবে। আমি শুনেছি যখন ঘোষণা করা হয় তখন শহরের বিভিন্ন মহল্লার বিহারিরা খুশিতে নাচতে থাকে।

যমুনাপ্রসাদ নঈমের হাত চেপে ধরে, ওরা কি আমাদের দোকান-পাট দখল করতে বাকি রেখেছে নঈম। মাড়োয়ারি বলে ওরা আমাদের ঘৃণাও করে।

যমুনাপ্রসাদ কেডিয়ার কণ্ঠে বেদনা। সঙ্গে ক্ষোভ মেশানো, আমরাতো বিহারিদের কোনো ক্ষতি করিনি নঈম।

এটা শুধু ক্ষতির কথা নয় যমুনা। এটা যুদ্ধ।

যুদ্ধ! যমুনাপ্রসাদ কেডিয়া আর কিছু বলতে পারে না। ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়ায়। ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। চব্বিশ মার্চ আরো অনেকের সঙ্গে ওর বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো পাকিস্তানি আর্মি। আটকে রেখেছিলো ক্যান্টনমেন্টে। নির্যাতন করেছে। তারপর শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে গুলি করে মেরেছে। ওর বাবা রামেশ্বর কেডিয়া ছিলো বিত্তশালী মাড়োয়ারি। তার ছেলে এখন বিমানবন্দর বানানোর কাজে মাটি কাটছে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। সম্পত্তি সব বেহাত হয়ে গেছে। পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওর মা এই ক্যাম্পে আছে। যমুনা মাটি কেটে যা পায় সেটুকুই সম্বল। ওরা সবাই মিলে অপেক্ষা করে যমুনার কান্না থামবার জন্য কিংবা সবাই মিলে ওর চোখের জলের ভেতর যুদ্ধকে অনুভব করতে চায়। একসময় কান্না থামে। যমুনাপ্রসাদ জামার হাতায় চোখ মোছে। নঈম ওর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলে, ওদের ঘোষণা অনুযায়ী তুমিতো আর কদিন পরই ভারতে চলে যেতে পারবে। কিন্তু আমার কি হবে? আমাকে তো নেবে না ওরা।

কেউ কোনো কথা বলে না। নঈম আকস্মিকভাবে অমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো অমলদা। এই ক্যাম্পের দুঃসহ জীবন আমার অসহ্য লাগছে। ভারতে যেতে পারলে মাকে আপনাদের কাছে রেখে আমি মুক্তিযোদ্ধা হবো। স্বাধীনতার জন্য লড়বো। বৌদি আপনি কিন্তু আমার মাকে দেখবেন? দেখবেন তো?

মাসীমা আমার কাছে একটা যুদ্ধ। মাসীমাকে দেখাশোন করলে আমার যুদ্ধ করা হবে নঈম ভাই।

উহ্, বাঁচালেন আমাকে। কিন্তু একটা কথা অমলদা আমি যে যেতে চাইছি তা কাউকে বলবেন না। তাহলে ওরা আমাকে নেবে না।

নেবে। তুমি এতো ঘাবড়িও না। আমরা তো ওদের বোঝা। আমাদের বিদায় করতে পারলে ওদের লাভ।

তাই যেন হয়।

সবাই গোল হয়ে ক্যাম্পের মাঠে বসে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বুড়ো আগরওয়ালার কাশির শব্দ ভেসে আসছে। সন্ধ্যা হলেই তার কাশি বেড়ে যায়। অনেকদিন ধরে কাশিতে ভুগছে। ক্যাম্পে আসার পর থেকে মাত্রা ছাড়িয়েছে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে আগরওয়ালার। বউ নেই। ছেলের বউ ঘর সামলাতে হিমশিম খায়। শ্বশুরকে দেখার সময় তেমন একটা পায় না। তবু বেচারি চেষ্টার ত্রুটি করে না। কাশি শুনলে ক্যাম্পের অনেকে বিরক্ত হয়। বিরক্ত হয় না নঈম। ওর বাবার এমন কাশি ছিলো। কাশতে কাশতে চোখ ফেটে যেতে চাইতো —মুখ দিয়ে ফেনা উঠতো। কষ্ট মানুষকে কতো অসহায় করে দেয় সেটা নঈম বাবার চেহারায় দেখেছে। কারো কিছু করার ছিলো না। সেই অসুস্থ মানুষটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে —। নঈম হাঁটুতে মুখ গোঁজে। ওরা বুঝতে পারে নঈম কেন মুখ আড়াল করলো। অমল ওর পিঠে হাত রাখে, মুখ তোলো নঈম। সারাদিনের খাটুনির পর মন খারাপ করলে শরীর আর চলবে না। আমরা কিছুতেই শরীর খারাপ হতে দিতে পারি না। আমরা তো এখনও যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত যেতেই পারলাম না।

কিন্তু ওই কাশি শুনলে —

আমি জানি তুমি বলবে বাবার কথা মনে হয়। আমি এও জানি ওই কাশি না শুনলেও বাবা তোমার বুকেই থাকবে। কাশি তো উপলক্ষ মাত্র। একটা সূত্র আর একটা সূত্রকে ধরিয়ে দেয়। এভাবে আমরা রশির গিঠঠুগুলো গুণতে পারবো নঈম। কিন্তু খুলতে পারবো না।

শুনেছি ক্যান্টনমেন্টে বন্দী থাকার সময় খুব টর্চার করেছে বাবাকে।

আহ্ নঈম তুমি গিঠ্ঠু গুণছো।

শুনেছি গুলি খেয়েও বাবা পানি পানি করে চিৎকার করেছেন।

প্লিজ নঈম তুমি গিঠ্ঠু গুণো না।

গিঠ্ঠু গোণাই আমার নিয়তি। জীবনভর গুণতে হবে।

দেখো সপ্তর্ষি জেগেছে আকাশে। উপরে তাকাও।

নঈম তাকায় না। ও নখ দিয়ে মাঠের ঘাস খুঁটতে থাকে।

সুনন্দা গান গাইবে নঈম।

আমার সোনার বাংলা—

সুনন্দা মৃদু স্বরে গান ধরলে সবাই মিলে আমার সোনার বাংলা গাইতে থাকে। নিচু স্বরে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে। ওদের কাছাকাছি কেউ নেই। তবুও ওরা চাইলেই গলা ছাড়তে পারে না। নিচু স্বরে গেয়েই আনন্দ পায়। অনুভব করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেসে আসা বুলেটের শব্দ আবহ সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলে ভেসে যায় শহরের ওপর দিয়ে। গান গাইতে গাইতে কতোটা সময় চলে যায় — সপ্তর্ষি কোথায় অবস্থান নেয় কিংবা ছায়াপথটা দেখা যায় নাকি? আকাশটাতো ওদেরই। সময়টাতো ওদেরই। সন্ধ্যা, মধ্যরাত, ভোররাত মিলিয়ে পুরো রাতটাতো ওদেরই। শুধু দিনটা বিক্রি করতে হয়। ঘাম বিক্রি করতে হয়। আঙ্কল টমস কেবিন — চিত্রটা কি এমন ছিলো? চাবুকটা উঠতো আর নামতো; চাবুকের গায়ে লেগে যেতো রক্ত —তবুও তুলো ক্ষেত থেকে ভেসে আসতো সঙ্গীত। মানুষের শিল্পের আদিম প্রকাশ। মানুষ গিঠ্ঠু ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায়। মানুষই তো আবার গিঠ্ঠু খোলে। কে এসব মনে করছে? অমল? নাকি নঈম? যমুনাপ্রসাদ? নাকি সুনন্দা? কে আকাশের তারা গুণতে চাইছে? তিনজন নর, একজন নারী? একজন নারী কি তিনজন নরের সমকক্ষ? যে নারী গান জানে, যে গান গাইলে সপ্তর্ষি থেকে

ওদের কাছে ছিটকে আসে আলো। ওই আলো তৈরি করে মহাকাশ। ওরা স্বাধীনতার মতো মহাকাশ ছুঁতে চায়। গান থামে। নঈম ভগ্ন কণ্ঠে বলে, মাকে কারো কাছে রেখে যেতে পারলে আমি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতাম।

তুমি ছাড়া তোমার মায়ের কেউ নেই নঈম।

আমিও মাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবো না। কিন্তু মায়ের যা অবস্থা তাকে নিয়েও আমি পালাতে পারবো না। তাহলে স্বাধীনতার জন্য কি আমি এই ক্যাম্পে অপেক্ষা করবো? এর চেয়ে মৃত্যুই তো ভালো। ওদের একটাকে খুন করে মরে যাই না কেন?

অমলের ভগ্ন কণ্ঠও ফ্যাসফ্যাস করে, আমিও পালাতে চাই। কিন্তু আমার চলে যাওয়া ফাঁস হয়ে গেলে ওরা সুনন্দাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমি চাইনা সুনন্দা ধর্ষিত হোক।

সুনন্দার কণ্ঠ ফ্যাসফেসে নয়। বলে, আমরা দু'জনেই পালিয়ে যাই না কেন?

পথ খোলা নেই। চারদিক থেকে শহরটা অবরোধ করে রেখেছে। আমাদেরকে ওই ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ট্রেন? যমুনাপ্রসাদের কণ্ঠে ট্রেন শুনে প্রত্যেকে উচ্চারণ করে শব্দটা।

ট্রেন? ট্রেন? ট্রেন? ট্রেন... ট্রেন... ট্রেন... ট্রেন... ট্রেন... ট্রেন

যেন ওরা কেউ কোনোদিন ট্রেন কি তা দেখেনি। এ রকম একটি শব্দ থাকতে পারে সেটি শোনেনি। অদ্ভুত তো। সৈয়দপুর রেলের শহর। এই শহরে একটি বিশাল রেলওয়ে কারখানা আছে। এই রেলের চাকরি সূত্রেইতো শহরটি বিহারিদের দখলে। পার্টিশনের সময় ওরা অপশন দিয়ে এ শহরে এসেছে। স্থানীয় বাঙালিরা ওদেব চাপের মুখে কোণঠাসা হয়ে গেছে। সেই শুরু থেকেই। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর এখন আর্মির সহায়তায় একটা নকল স্বর্গ বানিয়েছে। ভাবছে পুরোটাই পাওয়া হয়ে গেছে। একসময়ে এ শহরের উপর দিয়ে ইংরেজরা দার্জিলিং যেতো গ্রীষ্মের অবকাশ কাটানোর জন্য। কলকাতা কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে ট্রেনে দার্জিলিং যাবার জন্য আর কোনো রাস্তা ছিলো না। ওরা এ দেশের মাটিতে শোষণের যাঁতাকল চাপিয়ে দু'শো বছর নির্বিবাদে গিলে খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ দেশের মানুষ তাড়িয়েছে ওদের। পাততাড়ি গুটিয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্য। তখন এ শহর যুদ্ধের মধ্যে পড়ে নি। কোনো রক্তপাত দেখেনি। শুধু স্থির চোখে বিহারিদের আগমন দেখেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আগমন। রেলের চাকরি ওদের সহায়ক ছিলো। ওদের নিয়ে এসেছিলো ট্রেন। এখন ওরা নিজেরা এ দেশের মানুষকে নিরাপদ জায়গায় পার করে দেয়ার জন্য একটি ট্রেন তৈরি করছে। কেমন সেটা? সোনার না রুপার? নাকি আকারহীন? নাকি অদ্ভুত আকারের? ওরা তিনজনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবনায় গুমরাতে থাকে। তিনজনের বুক গুমগুম। তিনজনের পায়ের নিচে ঘাস গুমগুম। আগরওয়ালার কাশি গুমগুম। থামে না। কোনোকিছু থামে না। শব্দ বড় অদ্ভুত। যেন চারদিকে গুমগুম ধ্বনি—ট্যাঙ্ক ছুটে আসছে। গ্রেনেড ফাটছে। উড়ে যাচ্ছে পুল। দুম। মেশিনগানের ব্রাশফায়ার। তিনজনের ভেতর গুমগুম। যেন কাঁদছে নঈমের মা। স্বামী এবং বড় ছেলের লাশ দেখতে পায়নি। এ শোক কাটাতে পারেনি। শোক আরো গভীর। অন্যরকম শোক। ওদেরকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মানুযায়ী কবরে নামানো হয়নি। গোসল হয়নি। কাফন পরানো হয়নি। জানাযা হয়নি। মৃত্যুতো হবেই। প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কেন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী শেষকৃত্য হবে না? কি অপরাধ? নঈমের মার কাছে এর কোনো যুক্তি নেই। তাকে কেউ বোঝাতেও চায় না। গুমগুম যমুনাপ্রসাদ। ওর মা কাঁদে না। নিষ্পলক তাকি–

য়ে থাকে। চোখের জল নামের কোনো জিনিস তার শরীরে আছে বলে মনে হয় না। তার চোখ ভিজে না। যমুনাপ্রসাদ বুঝতে পারেনা যে এ কেমন হাহাকার। এই হাহাকার কোনো দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে কেন প্রতিফলিত হয় না? কেন অদৃশ্য থাকে? কিংবা শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় মুখায়বয়বের কতিপয় আকৃতিতে কিংবা ত্বকের কুঞ্চনে। যমুনাপ্রসাদের বুক ফেটে যায়। মায়ের বুকের হাহাকার নিজের বুকে ধারণ করে ও হাহাকারের স্বরূপ বুঝতে চায়। চিহ্ন আবিষ্কার করতে চায়। পারে না। সেখানে প্রবল শূন্যতা সমস্ত আকার মুছে দিয়ে ব্যাপ্ত হয় অসীমে। যমুনাপ্রসাদের আর কিছু করার থাকে না। শুধু বোঝে নিজের ভেতর স্তব্ধ হয়ে যাওয়াই চরম হাহাকার। এই উপলব্ধির ভেতর ডুবে গিয়ে যমুনাপ্রসাদ কথা বলতে পারে না। অথচ ওর মনে হয় ও ওদেরকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলো। বুঝে উঠতে পারছেনা কিংবা ভাবনাটা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না কিংবা যমুনাপ্রসাদের কিছুই বলার নেই। এ কেমন সময়? মুখের ভাষা কেড়ে নেয়? মুহূর্মুহু স্তব্ধ করে দেয় এবং সপ্তর্ষির দিকে তাকালে মনে হয় ওটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে মর্ত্যের দিকে। দু'হাত বাড়ালে সে হাতের মুঠোয় বাঁধা পড়বে সপ্তর্ষির গতি। এই গতি চায় যমুনাপ্রসাদ। সকলের সঙ্গে এক হয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে নয়। প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এক হলেই তো একক হবে। একক না হলে শক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

সেই মুহূর্তে চটুল হাসি হেসে সুনন্দা বলে, আমরা সবাই এমন গম্ভীর হয়ে গেলাম কেন? কেউ কোনো কথা বলে না। যেন কেউ ওর কথা শুনতে পায়নি। ও আবার একই প্রশ্ন করে। বুঝতে পারে উত্তর পাওয়াটা ওর জন্য জরুরি। এটা কি গম্ভীর হয়ে যাওয়ার সময়? এমন খোলা আকাশের নিচে? একটি হাই স্কুলের মাঠে? যেখানে একদিন বালকেরা ফুটবল খেলতো কিংবা লাইন করে দাঁড়িয়ে একটি ভিন্ন ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গাইতো? যে গানের অর্থ কখনো কেউ ওদের বলে দেয়নি। শুধু নির্দেশ করেছে যন্ত্রের মতো গাইতে; প্রাণহীন, অনুভূতিহীন। অর্থ জানতে না চাওয়ার তাড়না থেকে মুক্ত ওরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে। সৈয়দপুরের এই বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের আকাশে-বাতাসে বালকদের কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। ওরা আপ্রাণ চেষ্টায় একটি ভিন্ন ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গায় না। এখানে এখন বারুদের গন্ধ। বালকেরা এই মাঠে মার্বেল খেলে এবং কখনো উদাস হয়ে কানপেতে থাকে। সুনন্দা কখনো ওদের কাউকে কাউকে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গাইতে শেখায়।

কেউ কোনো কথা না বললে ওর সুলেরা কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয়, আমরা সবাই এমন গম্ভীর হয়ে গেলাম কেন? তারপর ও আবার নিজেই যোগ করে, আমরা তো বালক নই। আমাদের তো সিদ্ধান্ত নেবার বয়স হয়েছে।

সুনন্দার কণ্ঠ শুনে অমলের মনে হয় ওর সারাদিনের খাটুনির ক্লান্তি আর নেই। মাটি ভেদ করে ফুটে ওঠা অঙ্কুরের নির্যাস এবং সজীবতা নিয়ে ও এক নবীন বালক—এই স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেই ও ফুটবলে লাথথি মারার তালিম নেবে। প্রতিদিন ঘরে ফিরে ও সুনন্দার কণ্ঠ শোনে। এটা কোনো বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে ও একটা গানের পাখি হয়। ওই কণ্ঠ থেকে নির্গত ধ্বনি শুধু ধ্বনিত না থেকে মাধুর্যে রূপান্তরিত হয়। এই মুহূর্তে সুনন্দা খোলা আকাশের নিচে দারুণ মাদকতা, হাজার বছরের আবেদনে স্নিগ্ধ—শরীরের ভেতর প্রবেশ করে মুছে দিচ্ছে যাবতীয় দুঃখবোধ।

সুনন্দা তৃতীয় বার আর প্রশ্ন করে না। একটুখানি নীরবতা। নঈম এই নীরবতাকে ওর

কৈশোরের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে। এই স্কুলের ছাত্র হিসেবে ওর কৈশোর এখানে দাঁড়িয়ে আছে। ও বুঝতে পারে এই সন্ধ্যা উতরে যাওয়া সময়ে সেই কৈশোরের মুখোমুখি হয়ে ও গম্ভীর হয়ে আছে। এই স্কুলের মাঠে ও দুরন্ত বালক হয়ে দৌড়ে বেড়িয়েছে। ওর বিরুদ্ধে প্রতিদিনই কোনো না কোনো নালিশ যেতো টিচারের কাছে। নীলডাউন, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, হাতের তালুতে বেত খাওয়া, আঙুলের দু'ফাঁকে পেন্সিলের চাপ ইত্যাদি কতো যে শাস্তি পেতে হয়েছে। আরো কতো ধরণের শাস্তি পেয়েছে তা ওর মনে নেই। মনে রাখার প্রয়োজনও ছিলো না। শাস্তি খাওয়া ও গ্রাহ্য করেনি। বরং দুরন্তপনাই ছিলো ওর চ্যালেঞ্জ। এখন সেই স্কুলেই ওর বন্দী জীবন। পুরো স্কুলটা একটা আশ্রয় শিবির। কি আশ্চর্য, নিজ দেশে পরবাসী।

নঈমের গলা খুসখুস করে। ভীষণ কাশি আসছে। খোলা আকাশের নিচে বসে থাকলে ওর এমন হয়। ও হালকা ভাবে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে। ইদানীং এমন হচ্ছে। মা টের পায়। বলে, কেন খোলা আকাশের নিচে বসতে যাস বাবা। ঘরে থাক।

না ঘরে থাকতে পারে না নঈম। একে বন্দী শিবিরে বসবাস, তার ওপর ঘর। ওকে কি ঘর বলে? মার কণ্ঠে মাঝে মাঝে আক্ষেপ ধ্বনিত হয়, এমন পোড়াকপালি আমি। ছেলেটাকে একটু যষ্টি মধু খাওয়াতে পারিনা। নঈম মাকে বলতে পারে না যে সময় আমাদের অনুকূলে না। তারজন্য দুঃখ কোরো না। কেন মাকে তা স্মবণ করাবে? মা তো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ছে। স্বামী দিয়েছে, ছেলে দিয়েছে। একজন মানুষ এর বেশি আর কিইবা দিতে পারে। এখন যদি সে একটুখানি যষ্টি মধু সংগ্রহ করতে না পারার জন্য দুঃখ করে তবে সে দুঃখ তার ভেতরে থাক। সেটাই এখন তার সুখ। এই যষ্টি মধু কোনো না কোনো সূত্র ধরে মাকে নস্টালজিক করবে। নস্টালজিয়া বেঁচে থাকার মিথ। নঈম নড়েচড়ে বসে। তারপর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলে, বৌদি আমরা গম্ভীর হয়ে যেতে চাইনি। বন্দী শিবিরের যন্ত্রণা নিয়ে আমরা খানিকটা সময় নিজেদেরকে পারিপার্শ্বিক থেকে আলাদা করে ফেলি। আমাদের অক্ষমতার হিসেব করি।

যমুনাপ্রসাদ তীব্র কণ্ঠে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, আমাদের কোনো অক্ষমতা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একই অনড় কণ্ঠস্বরে সায় দেয় অমল, আমাদের কোনো অক্ষমতা নেই।

এই দৃঢ়তার মুখে নঈমের কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়। চেঁচায় না। কণ্ঠে যন্ত্রণা ধরে রেখে বলে, একটি ভাঙা ব্রিজ ঠিক করার জন্য আমরা শ্রম দিচ্ছি। একটি বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি, এটা কি দাসবৃত্তি নয়? এটা কি অক্ষমতা নয়?

না। সুনন্দার আশ্চর্য কণ্ঠে ছন্দ ওঠে। যেন এটা প্রতিবাদ নয়। সেই কণ্ঠ তিনজন যুবকের বুকের কন্দরে চমৎকার স্রোতস্বিনী। কুলুকুলু ধ্বনি তুলে বলে, যে কাজগুলো তোমরা করছো সেটা আমাদের সঞ্চয়। আমরা স্বাধীন হবো। ব্রিজ, রাস্তা, বিমানবন্দর সবই আমাদের থাকবে। তোমাদের কোনো অক্ষমতার কষ্ট নেই।

তিনজন যুবক ওর দিকে তাকায়। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু প্রচণ্ড অনুভব। শরীর নীথর করে দেয়। নঈমের মনে হয় ওর কি উচিত প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দৌড়ে এই মাঠটা প্রদক্ষিণ করে আসা? এই শিবিরের সব লোককে বলে দেয়া যে আমরা যা করছি তা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়? ও প্রাণপণে বুড়ো আগরওয়ালার কাশির শব্দ শুনতে চায়। নেই। কখন যে কাশি থেমে গেছে ও টের পায়নি। হয়তো আগরওয়ালা রুটি আর পেঁয়াজ দিয়ে

রাতের খাবার শেষ করেছে। এখন ঘুমুবে। কি করছে ওর মা? গুণগুণ করে গান কি? মায়ের কণ্ঠ সুনন্দার মতো নয়। মায়ের কণ্ঠস্বর ক্ষণিকের ভালোলাগা। শরীরের ভেতর প্রবেশ করে না। মায়ের মতো কণ্ঠস্বরের মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। যারা প্রত্যেকে আলাদা। তাদেরকে সহজে চেনা যায়। কিন্তু সুনন্দার কণ্ঠস্বর শুধু আলাদাই নয়, সেটা শুধু চেনা যায় না। বোঝাও যায় যে কণ্ঠস্বরটি কার। এমন কণ্ঠস্বর একের ভেতর লক্ষ। এই কণ্ঠস্বর এ দেশে একজনেরই আছে। তিনি বঙ্গবন্ধু। তিনি এখন কোথায়? তখন নঈম ফিসফিস করে বলে, এসো আমরা সবাই মিলে স্লোগান দেই।

স্লোগান?

বলো, জয় বাংলা।

জয় বাংলা।

জয় বঙ্গবন্ধু

জয় বঙ্গবন্ধু।

তারাভরা আকাশের নিচে আশ্রয় শিবিরের বড় একটা মাঠের মাঝে গোল হয়ে বসে থাকা চারজন নারীপুরুষের নিচু কণ্ঠে স্লোগান ওঠে। বারবার বলে। বারবার।

কেউ একজন প্রশ্ন করে, বঙ্গবন্ধু এখন কোন বন্দী শিবিরে?

প্রশ্ন হাজার মানুষের বুকের ভেতরে, বেঁচে কি আছেন?

নাকি প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছেন?

তাঁর চোখ কি উপড়ে ফেলা হয়েছে?

সেই শক্তিশালী তর্জনীটি কি কেটে ফেলা হয়েছে?

বজ্রকণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে কি?

তার বিরাট কলজে কি প্রতিদিন খুবলে খায় ঈগল?

না। আর্তনাদ করে সুনন্দা। তারপর ধমকের সুরে বলে, থামো তোমরা। এসব কি বলছো?

যুবকেরা আবার অনুভব করে কি আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ সুনন্দার। ওরা কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে বলে, আমরা বাস্তব কি হতে পারে সেটা বুঝে দেখতে চাচ্ছি।

প্রয়োজন নেই।

কেন?

এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের জন্য জরুরি নয়।

কি বলছো তুমি?

ঠিকই বলছি। তোমরাই সব গুলিয়েছো। অতিরিক্ত খাটুনি তোমাদের চিন্তাশক্তি হ্রাস করে দিচ্ছে।

মানি না।

বোকারা বুঝতে পারছো না কেন যে তিনি অক্ষত শরীরে এ দেশের সবখানে বিরাজমান, এ সত্যটুকু মেনে নিয়ে আমরা লড়াই করছি।

তাহলে এ সত্যের ভিত্তি নেই।

যুদ্ধের সময় সত্যের ভিত্তি অনিবার্য নয়। জরুরিও নয়। যুদ্ধের সত্য প্রতীকী।

হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো।

হয়তো নয়। আমি ঠিকই বলছি। বঙ্গবন্ধু এখন আমাদের জীবনে মিথ। বঙ্গবন্ধুর মিথের ভেতরে আমরা আমাদের শক্তি একত্র করে বিজয়ের জন্য লড়ছি।

চারজন যুবকের কণ্ঠস্বর কলকল করে ওঠে, কে তুমি নারী? আমাদেরকে এমন করে বেঁচে থাকার অমর বাণী শোনাচ্ছো?

প্রশ্নের উত্তর দেয় না নারী। ওরা শুনতে পায় নারীর কণ্ঠে গান। বিষাদের। উদ্দীপনার। কষ্টের। যোশের। কি আশ্চর্য নারী তিনি। সব অনুভবকে একটি কণ্ঠস্বরে ধারণ করেন। সেজন্য তিনি একটি ভিন্ন কণ্ঠস্বরের অধিকারী। যেটা সবার থাকে না। থাকে না বলেই তিনি অদৃশ্য। তার আকার নেই।

নঈম শুনতে পায় মার কণ্ঠ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে ওকে ডাকছে, বাবা নঈম, বাবারে। ঘরে আয়। কালতো আবার মাটি কাটতে যেতে হবে। হায় আল্লাহ, এই বয়সে আমার ছেলেটার কি যে হাল হলো। বেঁচে থেকে এতোকিছু দেখতে হলো আমাকে। আরো কতো কিছু যে কপালে আছে কে জানে। ও বাবা নঈম?

নঈম সাড়া দেয় না। চায় মা এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াক। এখন তাঁর একমাত্র জীবিত ছেলেটির জন্য সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ। তাঁর আটটি সন্তান হয়েছিলো। ছয়টি সন্তান মারা গেছে দশ বছর বয়সে পৌঁছুনোর আগেই। সাত নম্বর ছেলেটি গেছে ছাব্বিশ বছর বয়সে বাপের সঙ্গে। আট নম্বর ও। জীবিত এবং বয়স একুশ বৎসর। ও ছাড়া মায়ের আর কেউ নেই। ওর নিজেরও মা ছাড়া কেউ নেই। তাহলে কে কার সম্পূবক? একজন কি অন্যজন-কে ছাড়া টিকতে পারবে?

কি রে কথা বলছিস না যে?

আমাদের সঙ্গে আপনি বসুন না মাসীমা।

আমি তো সারাদিন শুয়ে বসে থাকি মা। কিন্তু ছেলেগুলোর তো কাজ করতে হয়।

আপনারও অনেক কাজ মাসী। বসুন না।

এখন আর বসবো না রে। ও বাবা নঈম—

নঈম সাড়া দেয় না। ওর ইচ্ছে হয় মায়ের কোলে মাথা রেখে এই ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে। স্কুলে পড়ার সময় মায়ের সঙ্গে রাগ করে কতোদিন এই মাঠে এসে শুয়ে থাকতো। বন্ধুরা টানাটানি করে বাড়িতে নিয়ে যেতো। রাস্তার উল্টোদিকে ওদের বাড়ি, যেটা এখন সলিমুল্লাহ বিহারির দখলে। মা জানতো ছেলেটা স্কুলের মাঠেই থাকবে। বেশিদূর যাবে না। না, বেশিদূর যেতে পারেনি নঈম। সাধ্যিও ছিলো না। মায়ের কাছ থেকে বেশি দূরে যাবার কথা ও কখনো ভাবেনি। আচ্ছা এমন যদি হয় যে ওই বিমানবন্দরের কাজ থেকে ও আর ফিরে এলো না? তখন কি হবে ওর মায়ের? মাথাটা কেমন করে উঠলে ও লাফ দিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

মার ভেজা কণ্ঠ, কি হয়েছে সোনা আমার?

আমি যদি কাজ থেকে কোনোদিন ফিরে না আসি আপনি কি করবেন আম্মা?

আমি কি করবো? প্রশ্নটা সামনে নিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে নঈমের মা। তারপর অদ্ভুত নির্বিকার কণ্ঠে বলে, কাঁদিস না বাবা। কাঁদার আর কিছু বাকি নেই। আয় তোদের সঙ্গে এই মাঠে খানিকটা সময় বসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন মাসীমা।

সুনন্দা তার হাত ধরে নিজের কাছে বসায়। নঈম মার আচরণে বিমূঢ় হয়ে যায়। ওর কেমন খটকা লাগে। মা সুস্থ আছে তো? এ কেমন অন্যরকম মা হয়ে গেলো? এতো কাছের তবু এতো অচেনা? ও মায়ের গা ঘেঁষে বসে। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নঈমের মা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, যদি তুই কোনো একদিন মাটি কাটার কাজ থেকে ফিরে না আসিস সেদিন সারা রাত তোর জন্য জেগে বসে থাকবো। ক্যাম্পের অন্য ছেলেরা ফিরে এসে যদি মুখ নিচু করে থাকে; যদি বলে, নঈমের খবর আমরা জানি না, তখন সবকিছু বুঝতে পেরেও আমি সারারাত জেগে থাকবো। ভোরবেলা বড় এক ডেকচি খিচুড়ি রান্না করে এখানকার ছেলেমেয়েদের খাওয়াবো। তারপর ওদের মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবো যে, একটি বিহারি খতম করেই তবে মরবো। তার আগে নয়।

কিভাবে? আপনার তো অস্ত্র নেই।

যমুনাপ্রসাদের কণ্ঠ অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে যায়। ওর ভীষণ কৌতূহল। ও যদি কোনো একটি সূত্র ধরে নিজেও এগিয়ে যেতে পারে।

বলুন না, কিভাবে?

রান্নাঘরের বটি তো আছে আমার কাছে। ওটা দিয়ে ভীষণ জোরে ঘাড়ের ওপর একটা কোপ দিতে পারলেই হয়ে যাবে। তুই ভেবেছিস তোর কিছু হলে আমি কাঁদবো? একটুও না। আমার সব কান্না তোর বাবা আর সাঈদ নিয়ে গেছে।

সুনন্দা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে নঈমের মা এমন স্বাভাবিক কথা বলছে। কি করে সম্ভব। স্বামী এবং ছেলের মৃত্যুর পর তাকে ঠিকমতো কথা বলতে শোনেনি সুনন্দা। আজ কি হলো? কেমন করে এমন ঘটনা ঘটছে। সময়টা কি এখন তাহলে সন্ধ্যা নয়, কোনো এক গাঢ় রঙে নিজেকে ঢেকে রেখেছে, মানুষগুলো সে রঙের ভেতর জ্যোতি দেখতে পাচ্ছে। নঈমের মা চুপ করে আছে। সবাই চুপ। প্রত্যেকে হয়তো কিছু একটা ভাবছে। সুনন্দা মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মাসী।

তুমি একটা গান করো মা।

সুনন্দা গান করতে পারে না। চুপ করে থাকে। কেবলই মনে হয় একটু আগে নঈম একটি গান গেয়েছে। ওটাতো গানই। হু-হু করে ঢুকে পড়ে বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়েছে। আজ রাতে কি এ গানের রেশ ফুরোবে? এরপর আর কি গান গাইবে ও? না, এখন আর গান হয় না।

মাসী আপনি ওদের ঘুমুতে যেতে বলেন। নইলে ভোরে উঠতে পারবে না। আর ভোরে গাড়ি আসার আগে রেডি হতে না পারলে— । ওহ্ মাগো!

সুনন্দা দু'হাতে মুখ ঢাকে। অমল এক ঝটকায় ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, গাড়ি আসার আগে আমরা ঠিকই তৈরি হতে পারবো সু। তুমি ভেবো না।

হ্যাঁ আপনি ভাববেন না বৌদি। আমরা ঠিকই রেডি হতে পারবো।

কেমন করে জাগবে? তোমাদের ক্লান্তি কি কাটবে? ঘুম কি ভাঙবে?

প্রশান্ত কণ্ঠে নঈমের মা বলে, ওরা তো জেগেই থাকে মা। ওদের ঘুম কোথায় যে ভাঙবে?

সুনন্দার বিস্ময়ের শেষ থাকে না। বুঝতেই পারে না যে কিভাবে এই মহিলার দিব্যদৃষ্টি

খুলে গেলো? কতো হাজার চোখ দিয়ে তিনি এতোকিছু দেখছেন? ও তো বলতে চেয়েছিলো, গাড়ি আসার আগে ওরা রেডি হতে না পারলে লাশ হয়ে গেটের সামনে পড়ে থাকবে। এক মুহূর্তের গাফিলতি সহ্য করবে না আর্মি।

কিন্তু এখন আর তার সামনে কথা বলার সাহস হয় না সুনন্দার। এতোদিন যাকে ও দেখেছে শুধু নিঃশব্দে কাঁদতে কিংবা কোরান শরীফ পড়তে সে কি একই মানুষ? না, তার ভেতর এখন অন্য কেউ। সুনন্দা দু'পা পেছনে সরে আসে। এই মানুষকে ছুঁয়ে ফেলতেও ভয় করছে। নঈম ওর মাকে ডাকে, চলেন আম্মা।

হ্যাঁ, চলো।

যেতে যেতে পেছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, সুনন্দা তুমি আমার নঈমের জন্য একটি মেয়ে দেখো। এই ক্যাম্পে তো কতো মেয়ে আছে। তোমাকেই আমি পছন্দের ভার দিলাম।

এখন এসব কথা বলবেন না আম্মা।

কেন বলবো না? এখনইতো সময়। তোরা বুঝিস না। আমি বুঝি। আমি নাতিপুতি চাই। মানুষ বাড়াতে চাই। একজন একজন যাবে, আর একজন করে আসবে। শুধু গেলে তো ঘর খালি হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় খালি জায়গা থাকে না রে। কি বলো মা সুনন্দা।

ঠিকই বলেছেন মাসী।

তাহলে তুমি কালই একটি মেয়ের খবর দেবে আমাকে।

দেবো। আমরা সবাই মিলে আপনার ছেলের জন্য একটি মেয়ে দেখবো। কেমন মেয়ে দেখবো মাসীমা?

রূপবতী, গুণবতী। স্বাস্থ্যবতী। তিনি গড়গড় করে বলেন।

নঈম হেসে উঠে বলে, এই ক্যাম্পে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে কোথায় পাবেন আম্মা? কেউ তো ঠিকমতো খেতেই পায় না।

আহারে, সত্যিতো ঠিকমতো খেতে পায় না। আমি কাল সকালে বিরিয়ানি রাঁধবো। কোরমা, মাংসের রেজালা, টিকিয়া, জর্দা কতো কি করবো। ক্যাম্পের সব ছেলেমেয়েদের খেতে দেবো। মেয়েদের স্বাস্থ্যবতী দেখতে চাই। তরতাজা স্বাস্থ্য নিয়ে ওরা যুদ্ধ করবে।

যুদ্ধ? সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে।

হ্যাঁ, যুদ্ধইতো। নঈমের মায়ের নির্বিকার কণ্ঠ, যেন কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তের জন্য গতিরোধ করে বাতাসের। ওরা সবাই সেটা বুঝতে পারে। সুনন্দা তবু দ্বিধা নিয়ে বলে, যে মেয়েকে আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন সে কি করে যুদ্ধ করবে?

যুদ্ধের বিপরীতে যুদ্ধ। এটা অন্যরকম লড়াই। ওরা ছেলেমেয়েদের গর্ভে ধরবে। লালন করবে। স্বাস্থ্যবান করবে। যুদ্ধের পেছনে থেকে যুদ্ধ। একজন গুলির মুখে পড়ে গেলে ওরা আর একজনকে এগিয়ে দেবে।

সুনন্দা ঘোরের মধ্যে ঢোকে। ও বুঝতে পারে ওর পা ঘাসে নেই। সেটা খানিকটুকু উপরে। ও কি হাঁটছে? নাকি উড়ছে? নাকি ও শূন্যের ভেতরে একটি জায়গা খোঁজার জন্য—। ও আর কিছু ভাবতে পারে না। মাথাটা টলে গেলে অমলের হাত ধরে। অমল ফিসফিস করে বলে, মাসীমা ঠিকই বলেছেন। এই ক্যাম্পটাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

সুনন্দাও ফিসফিস করে, তুমি কি মাসীমাকে দেখতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি তো। ঐ যে তিনি আমাদের সামনে হেঁটে যাচ্ছেন। বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখলেন।

না, এই মাসীমা না। অন্য মাসীমা। যাকে আমরা রোজ দেখতে পাই।

বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। এখনকার সময় এমনই সু। যুদ্ধ প্রতিটি মানুষকে স্পিলিন্টারের টুকরো বানায়। ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয় মানুষ। আমরা সকালে একটা টুকরো দেখিতো বিকেলে আর একটা। রাতে একটাতো দুপুরে আর একটা। তুমি আজ মাসীমার হাজার টুকরো দেখলে। তোমার লোডটা বেশি হয়ে গেছে।

আমার ঘুম পাচ্ছে অমল। সুনন্দা ঘাড় কাত করে অমলের ঘাড়ে মাথা রাখে। অমল ওকে আস্তে আস্তে সোজা করে দিয়ে বলে, আমরা এখনো ঘরে পৌঁছিনি। তুমি একটু সোজা হয়ে হাঁটো সু।

আমরা কি টুকরো হয়েছি অমল?

কবেইতো হয়েছি। যুদ্ধের আগে কলেজের মাস্টার ছিলাম। যুদ্ধের পর মাটি কাটছি। প্রধান দু'ভাগতো এভাবে হয়েছি। এখন প্রতিনিয়ত ভাঙছি। কোনোটা ইতিবাচক ভাঙা। কোনোটা নেতিবাচক। ভাঙতে ভাঙতে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি।

বলতে বলতে ঘরে পৌঁছায় দুজনে। সুনন্দা বিছানায় যেতে যেতে বলে, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে অমল।

খাবে না?

না। তোমার জন্য রুটি আর ডাল ঢাকা আছে। খেয়ে নাও।

সুনন্দা শুয়ে পড়ে। ওর কাজে যাবার তাড়া নেই। তবু কেন যে আজ এতো ঘুম পেলো। ওর দু'চোখের পাতা জড়িয়ে যায়। নিদ্রামগ্ন সুনন্দার মুখ কলেজে পড়া এবং কলেজে মাস্টারি করার দিনগুলো অমলের কাছে ফিরিয়ে আনে। ওর মনে হয় ওরও খিদে নেই। ও হাটু গেঁড়ে সুনন্দার পাশে বসে। প্রথমে চুল স্পর্শ করে, তারপর কপাল, ভুরু, চোখ, নাক, গলা, চিবুক এবং গ্রীবা। কলেজে পড়ার দিনগুলোতে সুনন্দার সঙ্গে পরিচয় হয়। ছিমছাম পরিপাটি ভাব ছিলো ওর মধ্যে। অমলকে সে বিষয়টিই মুগ্ধ করেছিলো বেশি। সুনন্দা সুন্দরী নয়, তবে ওর মসৃণ ত্বক ওকে ঔজ্জ্বল্য দেয়। শ্যামলা ত্বকের আঁধার থেকে উঁকি দেয় আলোর সূর্য। ওর ঔজ্জ্বল্যকে দ্যুতি বলা যায়। এই দ্যুতিকে অমল ভালোবাসার নদী বলে আবিষ্কার করেছিলো। যে নদী ভাসিয়ে নেবেনা; অবগাহনে প্রশান্ত করে দেবে। এমন অনুভবের পরই সুনন্দাকে ভালোবাসার কথা জানাতে পেরেছিলো। অমল ভেবে দেখলো এই জানানোর জন্য ওকে বেশ অনেকদিনের প্রস্তুতি নিতে হয়েছিলো। কি অস্থিরতার দিন ছিলো তখন। মনে হয়েছিলো একটি বড় যুদ্ধে যাবার জন্য ওর ভেতরে প্রবল ভাঙচুর হচ্ছে। সেই ভাঙনের একটি টুকরো এখন ওর স্মৃতি। এখন এই অনিশ্চিত সময়ে সেই স্মৃতিটুকুই বেঁচে থাকার মিথ। সুনন্দা বলেছিলো, আমি তো জানতাম তুমি আমাকে ভালোবাসার কথা বলবে। তুমি মুখে কিছু বলার আগেই তোমার দৃষ্টি সব বলে দিয়েছে।

অমল ওর মুখে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি এখন সুনন্দা নও, সুমগ্না। তোমার চোখের পাতা নামানো। আমি তোমার দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো জানো, দৃষ্টি প্রতারক নয়, দৃষ্টি সত্যের প্রকাশ। সে কারণে মৃত্যুর আগে নিষ্প্রভ হয়ে যায় দৃষ্টি। কারণ সেটা আর কোনো সত্যকে ধারণ করতে পারে না। আমাদের এখন চোখ খোলা রেখেই ঘুমুনোর সময়। মাসী তো ঠিকই বলে। তাহলে এসো আজ আমরা চোখও বন্ধ করবো না। জেগে থাকুক পুরো শরীর।

অমল সুনন্দাকে নাড়া দিয়ে বলে, সু ওঠো।

তুমি খেয়েছো?

না, আমার খিদে নেই।

প্লিজ খেয়ে নাও। মাটি কাটতে তোমার খুব কষ্ট হয়।

আজ আমি খাবো না।

অমল আমাকে কষ্ট দিও না। সুনন্দা পাশ ফিরে শোয়। বালিশে ছড়িয়ে পড়ে এলো খোঁপা। অমল ওর চুল দু'হাতে জড়াতে জড়াতে বলে, ওঠো সু।

কেন? ও বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে গুটিসুটি হয়ে যায়। যেন বিয়ের আগের সুনন্দা। ওই গ্রীবা পর্যন্ত দেখার অধিকার ছিলো অমলের। হাত ধরলেও লজ্জায় আঁতকে উঠতো। ভীষণ মায়া হয় অমলের। থাক, ডেকে কাজ নেই। ও ঘুমোক। অমল বাতি বন্ধ করে দেয়। কতো রাত হয়েছে? বেশি নিশ্চয় নয়। এখানে কিছু করার নেই। তাই কেউ রাত জাগে না। চারদিক সুনসান হয়ে গেছে। বিছানায় ওকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা পাশ ফিরে অমলের বুকে মুখ রাখে। অমল বুঝে যায় জেগে আছে সুনন্দার শরীর। ও ওর গ্রীবায় ঠোঁট ঘঁষতে ঘঁষতে বলে, এখন আমি অনায়াসে গ্রীবা থেকে নিচে নেমে যেতে পারি। তোমার সব লজ্জা ধারণ করেছি নিজের মধ্যে।

অমল।

এই তো আমি।

অমল।

আমি তোমারই সু।

অমল।

আমরা ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

অমল।

এখন আমাদের জীবনে যুদ্ধ।

আমাদের যুদ্ধটা অন্যরকম।

মাসীমা ঠিকই বলে। আমাদের একজন গেলে আর একজনকে তৈরি করতে হবে।

তুমি আমি হয়তো থাকবো না। আমাদের বিয়ে বার্ষিকী আর পালন করা হবে না।

থাকবে আমাদের সন্তান।

স্বাধীনতা ওদের জন্যই।

আজই আমাদের একজন মানুষ বাড়ানোর প্রকৃত সময়।

তুমি প্রস্তুত তো সু?

হ্যাঁ, প্রস্তুত।

সুনন্দার জেগে থাকা শরীর আশ্চর্য সংবেদনশীল। শরীরের ভেতর থেকে ফুটে ওটে নতুন দ্বীপ। অমলের সামনে থেকে যুদ্ধের সব রকম বীভৎসতা মুছে গিয়ে জেগে ওঠে নতুন যুদ্ধ। সুনন্দার মসৃণ ত্বকের ওপর শকুনের আঁচড় নেই। সে ত্বক ক্রমাগত নবীন হয়। অনেক রাতে পরস্পরের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে অন্ধকারে তাকালে দুজনেরই মনে হয় অদ্ভুত রাত। এমন করে অন্ধকারকে কোনোদিন দেখা হয়নি।

ঘ

পরদিন আবার শহরের রাস্তায় সেই বিশেষ রিকশাটি নামিয়া আসে। এই রিকশাটি হইতে যে একটি অমোঘ আহ্বান ঘোষিত হইবে তাহা সকলে জানিয়া গিয়াছে। সেই রিকশায় দুইজন আরোহী থাকে। তাহারা রঙিন সালোয়ার ও কুর্তা পরিধান করে। পায়ে জরির কাজ করা নাগরা। মাথায় রঙিন টুপি। তাহাদেরকে দেখিতে রাস্তার দুইপাশে লোক জমিয়া যায়। একজনের হাতে মাইক থাকে। পাদানীতে মাইকের ব্যাটারি ও তারগুলো অন্যজন বাম হাত ও বাম পা দিয়া নাড়াচাড়া করে। ইহা তাহার অভ্যাস। ইহা না করিয়া সে ঘোষণায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা একজন কিছুক্ষণ বলিয়া অন্যজনের হাতে মাইক ধরাইয়া দেয়। দুইজনে উর্দুভাষী। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলিতে পারে মাত্র। তাই তাহারা নিজেদের ইচ্ছামতো জগাখিচুড়ি ভাষা বানাইয়া লহে। তাহারা যখন উচ্চারণ করে, ভাইসব আপনাদের জন্য একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দুই একদিনের মধ্যে আপনাদিগকে ট্রেনে চড়িবার সময় জানাইয়া দেওয়া হইবে, তখন শহরের রাস্তায় উল্লসিত বিহারিরা নামিয়া আসে। তাহারা নৃত্য করিতে থাকে। গান গাহিতে থাকে। শিস বাজাইতে থাকে। কেহ কেহ অশ্লীল ভঙ্গি করিতে থাকে। যাহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখে এক সময় তাহারাও নৃত্য করিতে শুরু করে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া থামিয়া যায়। লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। যেন শহর জুড়িয়া উৎসব শুরু হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে বিহারিরা বুঝি সৈয়দপুর শহর স্বাধীন করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য তাহারা এমন উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে রিকশা হইতে এই ঘোষণা শুনিয়া ক্যাম্পের ভিতর বসবাসরত বাঙালিরা ক্রন্দন করিতে শুরু করে। তাহারা বুঝিতে পারে না চলিয়া যাইবার এমন আহ্বান সত্ত্বেও কেন তাহাদের বুক ফাটিয়া যায়। কেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কেন তাহারা বিহারিদের মতো উল্লসিত হইতে পারে না। মায়েরা শিশুদের বুকের [illegible] জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহারা জানে শিশুরা না বাঁচিলে তাহাদের কোনো ভবিষ্যৎ থাকিবে না। মায়েরা আতঙ্কে অস্থির হইয়া ভাবিতে থাকে বিশেষ ট্রেনটা দেখিতে কেমন হইবে? ট্রেনটা সৈয়দপুর স্টেশনে দেখা ট্রেনের মতো কি নহে? কবে তাহারা শেষ আহ্বান জানাইবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে মায়েরা শিশুদের মুখে খাবার তুলিয়া দেয়। আর বয়স্করা নিজ নিজ ভাষায় প্রার্থনা করিতে [illegible]। যেন তাহারা শেষ যাত্রার জন্য নিজেদিগকে প্রস্তুত করিতেছে। সকলের বুকের ভিতর গুমরাইয়া উঠিতেছে চরম আর্তনাদ। হা ঈশ্বর— হা ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাণ করো।

রিকশাটি কতোক্ষণ ধরিয়া শহরের বুকে এমন উল্লাস ধ্বনি ও আর্তনাদ ছড়াইয়া রাখে তাহা কেহ বলিতে পারে না। শুধু দুই বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘর্ষ হইতে থাকিলে এক অদৃশ্য ঘূর্ণি চক্রাকারে ক্রমাগত আকাশের দিকে উত্থিত হইতে থাকে। তাহা কেহ দেখিতে পায় না। কেননা তাহা দেখিবার জিনিস নহে। শুধু সেই ঘূর্ণির ঝড় বুকের ভেতর দাপাইতে থাকিলে শরীরের ভেতরের কলকব্জাগুলি বিকল হইয়া যায়। অসংখ্য মানুষ এই বিকল কলকব্জার দিকে বোবা চোখে তাকাইয়া থাকে।

৬

বিশেষ ট্রেনের ঘোষণাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে নঈম। ও মনোযোগ দিয়ে ঘোষণাটি শোনে। কিছুক্ষণের জন্য আর কাজ করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে বিহারি সুপারভাইজার। হাতের বেতটি দিয়ে পিঠের ওপর দুটো বাড়ি দিয়ে বলে, শুয়োরেরবাচ্চা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হারামখোর কাজ না করে পয়সা নিবি? বাঙালি কুত্তা।

নঈম মুহূর্তের মধ্যে কোদালের কোপ দেয় মাটিতে। পিঠটা জ্বলে যাচ্ছে। চোখে পানি। কিন্তু থামার উপায় নেই। লোকটি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র কয় সেকেন্ড থমকে গিয়েছিলো হাত, মাত্র কয়েক সেকেন্ড—নঈম বিড়বিড় করে বাক্যটি বলে। ওই ঘোষণাটি শোনার জন্য ওকে মার খেতে হলো। আশ্চর্য! ওটি শোনার জন্যইতো মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। তবে ওর পিঠে পড়ার জন্য বেতটি লকলকিয়ে উঠবে কেন?

দুপুরে খাবার জন্য একঘন্টা ছুটি। মাঠে বসেই খেতে হয়। গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে অনেকে। সেদিন নঈম সবার সঙ্গে বসতে পারলো না।

খানিকটা ফাঁকে ডোবার ধারে বসে রইলো। রুটি মুখে দিতে গেলে ওর কেবল বুক ভেঙে কান্না আসে। খাওয়া হলো না। রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলে উড়ে এলো একঝাঁক কাক। অমল ওর পাশে এসে বসে ঘাড়ে হাত রেখে বললো, না খেলে চলবে কেন? এখানে আমাদের কেউ নেই যে কষ্ট বুঝবে।

খেতে ইচ্ছে করছে না। আমার কষ্টটা বেত খাওয়ার জন্য নয়। কোনো অপরাধ না করেও তুমি আমি তো বেত খেয়েছি অমলদা।

আমি তো তোমাকে বলেছি ওই বিশেষ ট্রেনে আমি যেতে পারলে তুমিও যাবে। তবে আনমনা হলে কেন?

আমি ভেবেছিলাম আজ ওরা হয়তো কোনো তারিখের কথা বলবে। তাই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমি আর এই শহরে এক মহূর্ত থাকতে চাই না অমলদা। আমি পালা-তে চাই। এই ক্রীতদাস হয়ে থাকার চেয়ে যুদ্ধ করে মরতে চাই।

কিন্তু ওরা কোনো তারিখের কথা বলেনি।

কেন বলছে না অমলদা? কবে ওদের বিশেষ ট্রেন তৈরি হবে?

অমল চুপ করে থাকে। ও নিজেও ঘাবড়ে যায়। কবে ওদের সময় হবে? কিন্তু নঈমের সামনে ওর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে না। নঈমের জামা উল্টে পিঠটা দেখে। লাল হয়ে ফুলে আছে। নঈম বিকৃত কণ্ঠে বলে, মাকে বলবেন না। বৌদিকেও না।

আমরা না বললেও ওরা আমাদের মুখ দেখে ঠিকই টের পেয়ে যাবে।

কেমন করে টের পাবে? আমরা হাসিখুশি থাকবো।

অমল হো-হো করে হেসে ওঠে, তুমি এখনও ভীষণ ছেলেমানুষ।

ও অবাক হয়ে বলে, বাহ সুন্দর!

কি?

আপনার হাসি। হাসিটা ওষুধের মতো আমার ভেতরে কাজ করছে। আমার ভালো লাগছে। আমার পিঠের চিনচিনে জ্বালা কমে যাচ্ছে।

ওঠো। চলো।

দুজনে কাজে ফিরে আসে। বিমানবন্দরের কাজ প্রায় শেষ। আর মাসখানেকের মধ্যে চালু

হয়ে যাবে। তখন ওরা কি করবে? মজুরি নিয়ে ফেরার সময়ে অমল সরদারকে জিজ্ঞেস করে, হুজুর আমি কি ওই ট্রেনে যেতে পারবো?

হ্যাঁ, পারবে।

কাজ তো শেষ হয়নি।

কাজ শেষ হওয়ার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। তুমি চলে যাবে।

যাবো? বিস্ময়ের ঘোর কাটে না ওর। বড় রাস্তায় উঠে নঈমকে জড়িয়ে ধরে, আমরা চলে যেতে পারবো। ট্রেনটা যাবার সময় হলেই আমাদের ছুটি হয়ে যাবে।

বিমানবন্দরের কাজ কে শেষ করবে?

ওরা যদি না পারে তাহলে দেশ স্বাধীন হবার পর আমরাই করে নেবো।

ওহ্ কি আনন্দ, মুক্তির আনন্দ!

নঈম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। একে দুয়ে অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে ওরা গাড়িতে উঠবে। যমুনাপ্রসাদ এখনো আসেনি। কোথায় গেলো? অমল এবং নঈম দুজনেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সময়টাই এমন। অল্পতেই অধৈর্য হয়ে যায়। একটুপর দেখা গেলো যমুনাপ্রসাদ ছুটতে ছুটতে আসছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। মুখ ফ্যাকাসে, বিবর্ণ। চোখে পানি নেই, কিন্তু চেহারা দেখলে বোঝা যায় কান্নার দলা গলার কাছে আটকে আছে। কাছে আসতেই নঈম দু'হাত জড়িয়ে ধরে, কি হয়েছে যমুনা?

শালা সুপারভাইজার মজুরির টাকাটা পুরো রেখে দিয়েছে।

কেন?

বললো ওর বউয়ের অসুখ। ওষুধ কিনতে হবে। কতো করে বললাম যে আমার বাড়িতে চাল নেই। মা বলেছে বাজার থেকে চাল কিনে বাড়ি ফিরতে। শুনলো না। শালা খচ্চর।

নঈম লুঙির খুঁতি থেকে পাঁচ টাকা বের করে যমুনাপ্রসাদকে দেয়। ও চোখ তুলে তাকায় না। নিঃশব্দে টাকাটা নেয়। ওর বাবা সৈয়দপুরের এক নম্বর ব্যবসায়ী ছিলো। লক্ষ লক্ষ টাকা। নঈম ভাবলো এজন্যই কি লোকপ্রবাদ যে আজ রাজা কাল ফকির? ও নিঃশব্দে যমুনাপ্রসাদের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তোমার সঙ্গে আমিও বাজারে যাবো।

যমুনাপ্রসাদ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। অমল দুটো টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলে, আমার জন্য ডিম কিনে এনো। যমুনাপ্রসাদ বলতে পারে না যে আমি দু'টাকার ডিম কিনতে শিখিনি। ও ডজন ডজন ডিম কিনেছে। কষ্ট নয়, দুঃখ নয়, যমুনাপ্রসাদ নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়। ও ভাবতে পারেনি যে নস্টালজিয়া বেঁচে থাকার মিথ। ক্যাম্পে বাস করা মানুষেরা চেতনে-অবচেতনে এসবের ভেতরেই ঘুরপাক খায়।

ঘরে ফিরে অমল অবাক হয়। আশেপাশে সুনন্দা নেই। কোথায় গেলো? অমলের ঘরে ফেরার সময় ও অপেক্ষা করে থাকে। কোথাও যায় না। তবে কি পাকিস্তান আর্মি—? তবে কি কোনো রাজাকার—? নাকি অন্য কেউ নিয়ে গেলো সুনন্দাকে? মুহূর্তে অমল না বলে জোরে চিৎকার করতে গেলে সেটা অস্ফুট আর্তনাদ হয়ে যায়। অমল দ্রুত হাতে ঘামে ভিজে থাকা শার্টটা খুলে নিয়ে বালতিতে ধরে রাখা জলে ভিজিয়ে দেয়। কোথায় গেলো ও? ঘরটাও

পরিপাটি নয়। ঘরের কোণে রাখা হাঁড়িকুড়ি উল্টেপাল্টে আছে। অমল ছুটে নঈমের মায়ের কাছে যায়, মাসী?

নঈমের মা দু'হাতে মুখ ঢাকে। তারপর গুণগুণ করে কাঁদতে শুরু করলে অমল অধৈর্য হয়ে ওঠে, মাসী কি হয়েছে? সুনন্দা কোথায়?

নঈমের মা মুখ থেকে হাত সরায় না। কান্নাও থামায় না। বরং সেটা বেড়ে যায়। অমল অসহায়ের মতো তার ভাঙাচোরা শরীরটা দেখে। আশ্চর্য, এখন এমন দৃশ্য দেখার সময় নয়। তবু অমলের যে কি হয় নড়তে পারে না। ও পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে থাকে। ও বুঝতে পারে ওকে দেখে আশেপাশের নারী-পুরুষ-শিশুরা ভিড় জমাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না। ওর মনে পড়ে ক্যাম্পে ঢোকার সময় বুড়ো আগরওয়ালা ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। সে দৃশ্যের ভেতর কোনো অর্থ থাকতে পারে সেটা ও ভেবে দেখেনি। ও ছুটে যায় আগরওয়ালার কাছে, দাদু সুনন্দা কৈ?

নিয়ে গেছে।

নিয়ে গেছে? অমল বুড়োকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়। বুড়ো ওর হাত ধরে বলে, শান্ত হ। আয় আমার কাছে বস।

অমল বুড়োর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। ক্যাম্পের অন্যরা এসে ঘিরে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের চোখে জল। বুড়ো আগরওয়ালা রূপকথার মতো করে বলতে থাকে, তোর বউতো রোজই ক্যাম্পের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। ও আমাকে বলেছিলো, দাদু আমি চাইনা যে আমাদের ছেলেমেয়েরা এতোদিন যা শিখেছে তা যেন ভুলে যায়। ওদের চর্চা চালু রাখতে হবে। কি বলেন? মেয়েটির এতো গুণ ভেবে আমি তো মহা খুশি। আমি ওকে আশীর্বাদ করে বলেছিলাম, ভগবান তোর মঙ্গল করুক দিদিভাই। রোজকার মতো আজও মেয়েটি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিলো। কে কোথা থেকে কি লাগিয়েছে কে জানে। একজন রাজাকার আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে খবর দিয়েছে যে, ও নাকি ছেলেমেয়েদের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি শেখাচ্ছিলো। আর যাবে কোথায় দুজন সেপাই এসে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো। মেয়েটি তোর নাম ধরে খুব চেঁচিয়েছিলো রে। আমাকে বলেছিলো, ওর সঙ্গে কি আমার শেষ দেখা হবে না দাদু? আমার মুখে উত্তর ছিলো না। যে কথা বুক ফাটিয়ে দেয় তার কি উত্তর হয় দাদু?

আমিও ক্যাম্পে যাবো। অমল এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ছুট দেয়। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি পেরিয়ে মাঠ। গেটের কাছে যেতেই আগরওয়ালা চেঁচিয়ে বলে, ওরে ওকে ধর ধর। সে সময়ে গেট দিয়ে ঢুকছিলো যমুনাপ্রসাদ আর নঈম। দুজনে কোনো কিছু ভেবে ওঠার অগেই ওকে জাপটে ধরে।

ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে।

ছাড়বো না। ঘরে চলুন। আগে শুনবো আপনার কি হয়েছে তারপর ছাড়বো।

সুনন্দা নেই নঈম।

কাঁদতে থাকে আমল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে বারান্দায়। সিঁড়ির ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। আশেপাশে গোল হয়ে বসে থাকে অন্যরা। অবোধ শিশুরা কিছু বোঝে না। একজন বলে, দিদি যেতে চায়নি। ওরা দিদিকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে গেছে।

দিদির শাড়িটা খুলে গিয়েছিলো।

দিদি শাড়িটা উঠিয়ে নিতে চেয়েছিলো। ওরা ধরতেই দেয়নি।

ওরা খুব বিশ্রী ভাবে হাসছিলো।

আমার হাতে একটা বন্দুক থাকলে আমি শয়তান দু'টোকে গুলি করে দিতাম।

অমল দাদা আপনি কখন দিদিকে কেড়ে আনতে যাবেন? আমরা আপনার সঙ্গে যাবো।

আমরা ওদের সঙ্গে ঠিকই লড়তে পারবো।

আপনি শুধু আমাকে বন্দুক দেবেন। দেবেন তো অমল দাদা?

শিশুদের এইসব কথায় অমলের প্রবল কান্না পায়। ও দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ও শিশুদেরকে চোখের জল দেখাতে চায় না। চোখের জল বড় লজ্জার কথা। এমন পরিস্থিতি তো চোখের জল চায় না, চায় আগুন। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কথা নয়। শিশুরা বুঝে যায় যে অমল কাঁদছে। ওদের কেউ কেউ ওর গলা জড়িয়ে ধরে।

দাদা আমরা দিদির শেখানো গানটা করি? 'আমার সোনার বাংলা'—।

আমার সোনার বাংলা? অমল বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকায়।

করবো গানটা? ছেলেরা সিঁড়ির এক ধাপ নিচে নেমে লাইন করে দাঁড়ায়।

করো।

অমল দু'হাত চোখ মুছে ফেলে। শিশুদের সুললিত কণ্ঠে ভুল সুরে গানটি গীত হতে থাকে। ওরা ঠিকমতো সুর রপ্ত করতে পারেনি। তাতে কি? গানটা তো শিখতে চেয়েছে ওরা। মুখস্থ করেছে। কি অদ্ভুতভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ক্যাম্প। কারো মুখে কথা নেই। মায়ের কোলের শিশুদের কান্না নেই। অমল ওদের কণ্ঠের ভেতর সুনন্দার কণ্ঠ শুনতে পায়, এই ক্যাম্পটাই আমার যুদ্ধক্ষেত্র। সবাই যদি বন্দুক হাতে তুলে নেবে তো এদের দেখবে কে? এইসব বুড়ো এবং অসহায়দের? ছোটদের? তুমি কাজে গেলে আমি একটুও সময় পাই না। সারাদিনই কারো না কারো কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। ভালোই লাগে। মনে হয় দেশের জন্যই কিছু করছি।

শিশুদের কণ্ঠ নেমে আসছে। মনে হয় নেমে আসছে সুনন্দার কণ্ঠও, জানো আগরওয়ালা দাদু বেশি দিন বাঁচবে না। আমি যখন তাঁকে ওষুধ খাওয়াই মনে হয় হাতদুটো ভীষণ ঠাণ্ডা। মানুষ মরে গেলে যেমন ঠাণ্ডা হয় তেমন। বাঁচবে না যমুনাপ্রসাদের মাও। ওর ভাইবোনগুলোও। সবার চেহারার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া দেখতে পাই। যে ছায়া আমি বাবার চেহারায় দেখেছিলাম। তুমি দেখো বাঁচবে না নঈমের মাও। মাসীমা না ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দেই। তিনি আমাকে বলেন, আমি যদি বেঁচে যাই তুমি আমার পাশে থেকো মা।

সেদিন অমল ওইটুকু শুনে সুনন্দার মুখ চেপে ধরে বলেছিলো, আমরা বাঁচবো তো সু? ও ঠিকমতো উত্তর দেয়নি। ব্যাকুল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলো, জানি না। সেদিন অমল কি ওর চোখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলো? না তো, ওর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ফুটে ছিলো। ও প্রবল আবেগে সুনন্দাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, আমরা মরবো না। আমাদের মৃত্যু নেই।

খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়েছিলো ও।

ঠিক বলেছো। আমার কোনোদিনই বুড়ো হতে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে ভিন্ন ভিন্ন জীবন ফিরে পেতে।

আজই কি সুনন্দার ভিন্ন জীবন ফিরে পাওয়ার শেষ দিন? আজ থেকে কি বুড়ো হয়ে গেলো ও? মুছে গেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত, সামনে শুধু বিপুল, বিপুল অন্ধকার। ও টের পায় না যে কখন শিশুদের গান থেমে গেছে। ও টের পায় না যে শিশুরা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

অমল দাদা গানটা কি আবার গাইবো আমরা?

গান?

হ্যাঁ, সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

সোনার বাংলা?

একজন সবাইকে বলে, দাদা আমাদের কথা শুনতে পায়নি।

কেন শুনতে পাবে না? দাদার কান কি বন্ধ হয়ে গেছে?

নাকি আমরা জোরে বলতে পারি নি?

নাকি আমাদের—

ওই যে দিদি এসেছে, দিদি এসেছে—

শিশুরা ছুটে যায় গেটের দিকে। অন্যরাও ছুটে যায়। মুহূর্তে গেটের সামনে ভিড় জমে ওঠে। অমল এক পলকে দেখতে পায় দুজন রাজাকার সুনন্দাকে গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। ওদেরকে ও চেনে। অমল উঠতে পারে না, যেন ওর শরীরটা সিঁড়ির সঙ্গে আটকে গেছে। এখান থেকে ও সুনন্দাকে ঠিকমতো দেখতেও পাচ্ছে না। দিদির শাড়ি, দিদির শাড়ি বলতে বলতে মীরা ছুটে যায় ঘরের দিকে। অমল দেখতে পায় সুনন্দা ব্লাউজ আর পেটিকোট পরে আছে। হয়তো যেভাবে গিয়েছিলো সেভাবে ফিরেছে। সেভাবে ফিরতে পেরেছি কি ও? মীরা শাড়ি হাতে ছুটে যায়। হয়তো ওর গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে অমল সেটা দেখতে পাচ্ছে না। ছোটখাটো দলটি গেট থেকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। অমল শুনতে পায় কোনো একজন শিশু জিজ্ঞেস করছে, দিদি তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

তোমার গায়ে এতো দাগ কেন? ওরা কি তোমাকে মেরেছে?

তুমি কথা বলছো না কেন দিদি?

তুমিও কি অমল দাদার মতো আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছো না?

ও দিদি, দিদিরে—

এই বাচ্চারা তোরা সর এখান থেকে।

নঈম বাচ্চাদের সরিয়ে দেয় সামনে থেকে। সুনন্দা মীরার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছিলো। অমল বুঝতে পারছে যে ও ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। নঈম সুনন্দার হাত ধরে বলে, এসো বৌদি।

ও নঈমের হাত ধরে ঠিকই, কিন্তু মীরাকে ছাড়ে না। অমল বুঝতে পারে সুনন্দা ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ও মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। ও কি আর অমলের দিকে তাকাবে না? অমলের বুক কেঁপে ওঠে। এই সুনন্দা কি ওর জীবনের স্বপ্ন? এই সুনন্দাকে কি ও বলেছিলো, আমরা মরবো না। সুনন্দা বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে একটা পা দিয়েই বসে পড়ে। ও দ্বিতীয় সিঁড়িতে আর পা দেয় না। সবচেয়ে উপরের সিঁড়িতে অমল বসে আছে। সিঁড়িতে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। পুরো ক্যাম্প স্তব্ধ হয়ে ওর কান্না শোনে। কেউ সুনন্দাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করে না। ওরা বুঝতে পারে একজন নারীর সর্বস্ব হারানোর কান্না বুঝি এমনই।

অনেকক্ষণ ওকে কাঁদতে দেয়ার পর ক্যাম্পের মেয়েরা এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়। গরম

জল করা হয়েছে। জলে ডেটল মিশিয়ে শরীরের ক্ষত মুছে দেয়। তারপর গায়ে জল ঢেলে প্রাণভরে স্নান করে সুনন্দা। সারাদিনের যে দুঃস্বপ্ন বজ্রপাতের মতো গর্জন করছিলো সেটা থেমে আসে, আকাশজুড়ে ফুটে থাকে ঘন কালো মেঘ। অসংখ্যবারতো এই শরীরের ওপর বাজ পড়েছে। পুড়ে গেছে সবটুকু। এখন জল গড়ায় শরীরে। চেতনায় মেঘ। মেঘ থেকেইতো বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি এবং মেঘ তো পাথর নয় যে থেঁতলে দেবে ওর শরীর। বরং ওর পুড়ে যাওয়া শরীরের লোকালয় শ্যামল করে দিতে থাকে। তবু কেন এমন লাগছে? কেন ও দু'হাতে নাড়া দিয়েও মেঘের কাছ থেকে বৃষ্টি ঝরাতে পারছে না? বৃষ্টি কি এমনই দুর্লভ বস্তু? সুনন্দা প্রবল গ্লানিবোধ থেকে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

নারীরা বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। গামছা দিয়ে আলতো করে ওর শরীর মুছিয়ে দেয়। কেউ একজন বলে, চান হয়ে গেছে এখন আর কান্না কেন?

কান্না থামায় সুনন্দা। বুঝতে পারে না স্নানের সঙ্গে কান্নার কি সম্পর্ক। স্নান করলে কি ধুয়ে যায় সব গ্লানি? হা-হা করে হেসে ওঠে ও। একজন ওকে শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে দিতে দিতে বলে, এমন করছিস কেন? পাগল হয়ে যাবি নাকি? চুপ কর। কিছু হয়নি যে এমন করতে হবে।

বুড়ো মহিলার ধমকে হাসি থেমে যায় ওর। কিছু হয়নি? কেমন করে কিছু হলো না? ও তো বুঝে গেছে যে ওর অনেক কিছু হয়েছে। ও আর আগের সুনন্দা নেই। অমল আর ওর জীবনে নেই। ও কোনোদিন বিয়ে-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারবে না।

চল, ঘরে চল।

চুলের গোছা বেশ করে ঝেড়ে দেয়ার পর সবাই মিলে ওকে ঘিরে ধরে। লম্বা বারান্দার অন্য মাথায় ওর ঘর। ওরা ওকে যাবার জন্য পথ করে দিয়ে সবাই পিছু নেয়। হাঁটতে সুনন্দার ভয় করে। পড়ে যাবে না তো? নতুন করে কি হাঁটা শিখতে হচ্ছে? পা টলে যাচ্ছে কেন? ও ঝর্ণার ঘাড়ের ওপর হাত রাখতে গেলে ও দু'পা সরে যায়। বলে, নিজে নিজে হাঁটো। তোমার কি হয়েছে যে অন্যের ঘাড়ে হাত রেখে হাঁটতে হবে?

সুনন্দা সোজা হয়ে পা ফেলে। ঠিকই তো বলেছে ঝর্ণা। পেছনে নারীরা নানা কথা বলছে। সুনন্দার ঘটনা ওদের জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এমন একটি মেয়ে ওরা আগে দেখেনি, যাকে একসঙ্গে অনেকে খুবলে ফেলে। এই না দেখার অভিজ্ঞতা থেকেও নারীরা প্রচলিত ধারণার বাইরে চলে আসতে পারে। ওরা অনায়াসে বুঝতে পারে যে ওর কোনো দোষ নেই। যুদ্ধ এভাবে নারীদের অবমাননা করে। এটা যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। এ ঘটনায় পাপপুণ্যের হিসেব হয় না। খানিকটা পথ এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সুনন্দা।

কি হলো দিদি? তুমি কি আবার আমার ঘাড়ে হাত রাখবে?

না। বাচ্চাগুলো কি চলে গেছে?

হ্যাঁ। আমরা ওদেরকে ঘুমুতে বলেছি।

ওরা কি আমার শেখানো গানটা মনে রেখেছে?

রেখেছে। তুমি আসার আগে ওরা অমলদাকে গানটা গেয়ে শুনিয়েছে। ওরা বারবার গানটা গাইতে চেয়েছিলো।

বারবার, বারবার, বলতে বলতে সুনন্দা আবার হাঁটতে শুরু করে। ওর মনে হয় বেশ

লাগছে হাঁটতে। তবে কেন ও মীরা, ঝর্ণা, শীলার ঘাড়ে হাত রেখেছিলো? ভয় পেয়েছিলো কি? সেই যে ছোটবেলায় অন্ধকারকে ভয় পেতো? রাত হলেই বুক শুকিয়ে যেতো? একা একা কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারতো না। মনে হতো অন্ধকারে মুণ্ডুহীন ভূতগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলেই মটকে দেবে ঘাড়। তেমন ঘটনাই কি ঘটে গেলো আজ? ভয়াবহ অন্ধকারের ভেতর মুণ্ডুহীন ভূতেরা ছিঁড়ে নিলো ওর মুণ্ডু? প্রবল চিৎকার করে ওঠার আগেই বিশাল থাবা বন্ধ করে দেয় শৈশব থেকে এ পর্যন্ত শিখে আসা সমুদয় শব্দ। ওরা কি বলেছে ও তা বুঝতে পারেনি। ভূতদের কথা বোঝা যায় না এটা ও শুনেছিলো মায়ের কাছে। তার ওপর ভূত যদি বিদেশি সৈনিক হয় সে ভাষা বোঝা আরো কঠিন। শৈশব থেকে অবচেতনে থেকে যাওয়া ভূতের ভয় ওর জীবনে সত্যি হয়ে গেলো।

কি হলো দিদি, চলো?

বুঝলি মীরা এখন থেকে আমার জীবনে আর কোনো অন্ধকার নেই।

তুমিতো ভীষণ ভূতের গল্প করতে।

হ্যাঁ, আমার খুব ভূতের ভয় ছিলো।

আজ তুমি ভূত দেখেছো?

দেখেছি। ওরা বলেছে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ-মানুষের গন্ধ পাঁউ। বলে হি-হি করে হেসে ওঠে সুনন্দা। তারপর দম নিয়ে বলে, বুঝলি ভূতেরা মানুষ খায়।

চুপ করো।

পেছন থেকে কেউ একজন বলে। সুনন্দা চুপ করে যায়। নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার চিৎকার করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। বুক-ভরা কান্নায় চোখ ভিজে যায় নারীদের। কারো শুধু চোখ মুছে হয় না, শব্দও উঠে আসে কষ্ট থেকে। নারীরা একে-দুয়ে সরে যেতে থাকে। ওরা বুঝতে পারে এ কান্না শুধু থামাতে পারবে অমল। অমলের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া উচিত। নারীদের ভিড় কমে গেলে বুড়ো আগরওয়ালা দরজায় এসে দাঁড়ায়। যে মেয়েটি এতোদিন ওকে ঘড়ি ধরে ওষুধ খাইয়েছে তার জন্য নিজের হাতে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসেছে ও। সুনন্দার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে বলে, দিদিভাই ওঠো।

দিদিভাই? কে ডাকে ওকে দিদিভাই বলে?

সুনন্দার কান্না থেমে যায়। ও উঠে বসে। বুড়ো ওর মুখের কাছে গ্লাসটা ধরে বলে, খাও। তোমার কোনো ভয় নাই। আমরা তো আছি।

সুনন্দা নিজে গ্লাসটা ধরে না। বুড়োর হাত থেকেই ঢকঢক করে দুধ খায়। ছোটবেলায় বাবার হাত থেকে দুধ খাওয়ার মতো খেতে পেরে ওর নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগে। ডান হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে নিয়ে বলে, ছোটবেলায় বাবা আমাকে দুধ খাইয়ে দিতেন। আমি খেতে চাইতাম না।। বাবার কোলে মুখ গুঁজে রাখতাম। বাবা বলতেন, যদি বলতে পারিস দুধের রঙ সাদা কেন তাহলে আর দুধ খেতে বলবো না। দুধের রঙ সাদা কেন এ বলার সাধ্য কি আমার ছিল। কোনোদিনই বলতে পারিনি। আসলে আমাকে ভাবনায় ফেলে দিয়ে বাবা নানা প্রশ্ন করতে করতে মুখে গ্লাস তুলে দিতেন। কখন যে একটু একটু করে খেয়ে ফেলতাম টেরই পেতাম না। কি আশ্চর্য, আজ আপনার হাতে দুধ খেয়ে মনে হলো আপনার হাতটা বাবারই হাত।

বুড়ো আগরওয়ালা মৃদু হেসে বলে, আমার হাতটা ধর।

সুনন্দা হাত ধরলে বলে, ভুলে যাসনা যে বাবার মতো অনেক মানুষ থাকে। আমরা তোর পাশেই আছি। ঠিক ছোটবেলায় যেমন পেয়েছিলি বাবাকে, তেমন।

সুনন্দা বুড়োর দু'হাত ধরে সে হাতের তালুতে নিজের মুখ ঘঁষে নেয়। আগরওয়ালা খালি গ্লাসটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলে, কাল থেকে তোর হাতেই ওষুধ খাবো কিন্তু।

সুনন্দা ঘাড় নাড়ে। তখন যমুনাপ্রসাদের মা ভাত আর ডিমের তরকারি নিয়ে আসে। সঙ্গে আলু-পটল ভাজি। আগরওয়ালা মাথা নেড়ে বলে, বাহ্ সুন্দর গন্ধ আসছে। ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড় দিদিভাই।

ঘুমিয়ে পড়বে কি? আজ ওর সঙ্গে সারা রাত গল্প করবে ছেলেরা। যমুনা আমাকে তাই বলেছে। ওরা সবাই একসঙ্গে এখানে ভাত খাবে।

তাহলে আমি যাই। এখন ছেলেদের সময়।

আপনি আমার সঙ্গে খান দাদু।

নারে, এখন না। কাল দুপুরে আমি তোর সঙ্গে খাবো।

আগরওয়ালা চলে যাবার পর ওরা তিনজন আসে। সুনন্দা মুখ নিচু করে বসে থাকে। ও বুঝতে পারে সবাই মিলে ওকে প্রস্তুত হবার সময় দিয়েছে। সবাই মিলে ওকে প্রস্তুত করেও দিয়েছে। আসলে কি ও প্রস্তুত হতে পেরেছে? নাকি আর কোনোদিন সবকিছুর মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে? শুনতে পায় পায়ের শব্দ, অনেকগুলো। ওরা আসছে। বুঝতে পারে ওরা আসছে। এখন ওর এমন কিছু খারাপ লাগছে না। ও মনে মনে ঠিক করে নেয় যে ও নিজেই ওদের খেতে দেবে। ঠিক আগের মতো। ওরা যখন বলতো, বৌদি খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো। কয়েকদিনই তো ও ওদের রান্না করে দিয়েছে। আজ পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। ওর এমন কিছু খারপ লাগছে না। কিন্তু একটু পর কি হবে যখন অমলের সঙ্গে একা হয়ে যাবে ও? সুনন্দা সে কথা ভাবতেই মুখ তুলে তাকায়। দেখে, অমল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নঈম কতোগুলো প্লেট হাতে ঢোকে। পেছনে যমুনাপ্রাসাদ। হাতে জলের গ্লাস আরো কি যেন সুনন্দা বুঝতে পারে না। ও উঠে দাঁড়াতে গেলে অমল আস্তে করে বলে, বোসো। উঠতে হবে না।

কেন? ও অস্ফুট স্বরে বলে।

আজ আমরা তোমাকে খেতে দেবো বৌদি।

কেন? সুনন্দা আবারও একই শব্দ উচ্চারণ করে। কেউ কোনো কথা বলে না। মুখ নিচু করে থালা, জলের গ্লাস গোছাতে থাকে।

কেন আজ তোমরা আমাকে খেতে দবে? আমার কি হয়েছে?

তোমরা ঠোঁট ফুলে গেছে। অমলের কণ্ঠ।

তাতে কি? আমি এটুকু কাজ করতে পারবো।

তোমার শরীরে ব্যথা। অমলের কণ্ঠ।

ওহ্ না, আজ আমিই তোমাদের খেতে দেবো।

তোমার কষ্ট হোক আমরা চাই না। অমলের কণ্ঠ।

আসলে তোমরা আমাকে দূরে রাখতে চাইছো।

না, বৌদি, না। অপর দুজন যুবকের কণ্ঠ। সুনন্দা মুখ নিচু করে বসে থাকে। আর কথা বাড়ায় না। শুধু অমলের কণ্ঠ আবার একই ভঙ্গিতে বলে, তুমি আমাদের অবিশ্বাস করছো

কেন? আমরা চাইছি তোমাকে–

আমার কিছু হয় নি। এখনো ভাত বেড়ে দেয়ার মতো শারীরিক শক্তি আমার আছে।

সুনন্দার কণ্ঠ প্রতিবাদী! জোরালো। সুনন্দার চোখ আগুন ছড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন যুবক অনুভব করে, সুনন্দার চোখ আহত হয়নি। কণ্ঠস্বর অক্ষত আছে। শরীরের যেসব অংশে আঁচড় পড়েছে সেসব অংশ জ্বলে উঠতে পারে না। জঙ্ঘা, উরু, বুক, পিঠ ওগুলো আড়ালে থাকে। যে অংশ নিয়ে ও যুদ্ধের কথা বলবে সেটুক সামনে রেখে সুনন্দা অক্ষয় হোক। তিনজন যুবক একই সঙ্গে তিনটি কাঁসার থালা ওর সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে, দাও, আমাদের ভাত দাও।

আনন্দে সুনন্দার চোখ চিকচিক করে ওঠে। শুনতে পায় বারান্দায় পদশব্দ। হয়তো কোনো উদ্বিগ্ন স্বজন বাইরে অপেক্ষা করছে। কেউ কেউ দরজায় উঁকি দিয়ে সরে যায়। সুনন্দা আব-ারো বোঝে সবাই মিলে ওর জন্য পরিবেশ তৈরি করেছে। বৈরি পরিবেশে কেউ ওকে ঠেলে দেয়নি। ও সবার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে। ওর সামনে বসে থাকা যুবকদের থালা ভাত দিয়ে সাজিয়ে দেয়। ভাল, ডাল, ডিম, আলু ভাজি, ঘি। প্রত্যেকে খেতে শুরু করে।

তোমারটা কই? অমলের কণ্ঠ।

নিচ্ছি।

সারাদিন কিছু খাওনি তো? অমলের কণ্ঠ।

সুনন্দা উত্তর দেয় না। নিজের থালায় ভাত নিলে ওর চোখ আবার জলে ভরে ওঠে। দ্রুত চোখে মুছে নিতে গিয়ে মনে হয়, আসলে অমল খুব কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছে। অমলের আচরণের যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটা যুদ্ধে জেতার প্রত্যাশা থেকে বিচ্ছুরিত। যেটুকু আড়াল আছে সেটুকু ক্ষত, যুদ্ধ থেকে পাওয়া ক্ষত।

যমুনাপ্রসাদ তখন সুনন্দাকে নিজের কথা বলে। বিহারি সুপারভাইজার কিভাবে ওর দিনের মজুরি কেড়ে নিয়েছে সে কথা বেশ মজা করে বলতে থাকে। যেন এটা একটি দারুণ মজার ঘটনা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাওয়া উচিত। কিন্তু না সুনন্দার হাসি পায় না। বরং গলায় ভাত আটকে যেতে চায়। যমুনাপ্রসাদ হাল ছেড়ে দিলে নঈম বলে, জানেন বৌদি বিহারিগুলো আজ আমাদের সঙ্গে বাজারে ভীষণ মজা করেছে। আমি আর যমুনা তো হেসেই কুল পাই না যে ওরা আমাদের এতো ঠকাতে চায় কেন। দোকানিরা বলে, বাঙালিরা এক হালি ডিম কিনলে তার দাম বারো আনা। অন্যদের কাছে ডিমের হালি আট আনা। ভীষণ মজা না বৌদি? আমরা কেমন স্পেশাল? হা-হা করে হেসে ওঠে অমল। বলে, হ্যাঁ, ভীষণ মজা। আমাদের রমণীরা ওদের কাছে স্পেশাল। আমরা সবাই ওদের কাছে স্পেশাল। অমলের হাসির রেশে যুক্ত হয় নঈম ও যমুনাপ্রসাদের হাসি। সুনন্দা বুঝতে পারে অমল হাসতে হাসতে যে কথাটা বলেছে আসলে সেটা ওর কান্না। ওর হাসির সঙ্গে নঈম আর যমুনাপ্রসাদ যুক্ত হওয়ার ফলে অমলের দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে গেছে। ওটা কারো কানে পৌঁছালো না। না, আমার কানেও পৌঁছায়নি, এমন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ আমরা ভীষণ স্পেশাল। ওরা তো যুদ্ধ করতে শেখেনি। আমরা শিখেছি।

এমন প্রাণখোলা হাসির শব্দ শুনে ক্যাম্পের অন্যরা দরজায় এসে দাঁড়ায়। সবার কৌতূহল, কি হয়েছে? ওরা উত্তর দেয় না। হাসতে থাকে। যমুনাপ্রসাদের মা রেগে বলে, ভাত শেষ না করে এতো হাসি কেন?

অমলের কণ্ঠ, ভাবছিলাম কাল কাজে যাবো না। ওদের সঙ্গে মজা করবো।
কাজে না গেলে মজা তুমি করবে? নাকি তোমাকে নিয়ে ওরা মজা করবে?
যমুনাপ্রসাদের মা তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না। গটগটিয়ে বের হয়ে যায়। নঈমের হাসি থেমে গেছে। বলে, কাজে যাবেন না কেন? কি হয়েছে অমলদা?
আমার বৌ অসুস্থ। তাকে কে দেখবে?
তোমরা বৌ মোটেও অসুস্থ নয়।
অবশ্যই অসুস্থ। যুদ্ধে আহত হলে অবশ্যই তার শরীরে ক্ষত হয়। সে ক্ষতের পরিচর্যা করতে হয়।
তোমার বউ অসুস্থ নয় অমল।
হ্যঁা, অসুস্থ। একশোবার অসুস্থ। ওকে রেখে আমি কোথাও যাবো না। আবার কেউ আসবে, আবার কেউ ওকে নিয়ে যাবে, তা হবে না।
কাজে না গেলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না অমলদা।
না ছাড়লে না ছাড়বে। আমি মরে যেতে চাই। সুনন্দাকে নিয়েই আমি মরে যাবো।
সুনন্দা কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়। ওহ্ অমল, অমল, ও নিজের ভেতরে শব্দের ধ্বনি তোলে। ও আর কিছু ভাবতে পারে না। দিনভর যা ঘটে গেছে সে কথাও না। ওরা ওকে বের করে দেবার সময় বলেছে, ফিরে যা হারামজাদী। এবার ছেড়ে দিলাম। এরপর যদি গান শেখানোর খবর পাই তাহলে দুটোকে এনে একসঙ্গে লটকে দেবো। ভাবতেই সুনন্দার শরীর শিউরে ওঠে। ভাবে, মন্দ হবে না। অমল আর আমি একসঙ্গে স্বর্গে যাবো। সুনন্দার চোখের তারায় আলোর ফুটকি। ওর দৃষ্টি দেখে অমল স্তব্ধ হয়ে যায়। সুনন্দাকে এমন করে হাসতে ও কখনো দেখেনি।
যমুনাপ্রসাদের মা সবাইকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা এখন ঘুমোবে। তোমরা যাও।
সবাই চলে গেলে অমল বলে, তোমার ঘুম পাচ্ছে সু?
ঘুমতো পাচ্ছেই না, টায়ার্ডও লাগছে না।
আমারও ঘুম পাচ্ছে না। আমিও ঘুমুবো না।
কাল তো কাজে যেতে হবে।
যাবো না।
আমি অসুস্থ হইনি অমল। ঠিক আছি। কাল ঠিকই তোমার জন্য ভাত রাঁধতে পারবো। দাদুকে ওষুধ খাওয়াতে পারবো। মাসীর মাথায় তেল দিয়ে আঁচড়ে দেবো। জল ধরে রাখবো। ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারবো।
তবু আমি কাজে যাবো না। আমি দিনের বেলা তোমাকে পাহারা দেবো। সারা রাত ধরে তোমার শরীরের আঁচড়গুলো দেখবো। মনে আছে বিয়ের রাতের কথা? আমরা দুজনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেদের দেখেছিলাম?
হ্যাঁ, খুব মনে আছে। আমি হাসতে হাসতে তোমাকে বলেছিলাম, আমরা কি দেশ দেখছি? তুমি বলেছিলে, দেশ নয়। আমরা মহাকাশ দেখছি।
সুনন্দার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে অমল বলে, হ্যাঁ, আমি মহাকাশের কথা বলেছিলাম। কারণ মাটির ওপর আমরা হাঁটতে পারি। গাছ ছুঁয়ে দেখতে পারি। নদীতে নামতে পারি। কিন্তু

মহাকাশ আমাদের নাগালের বাইরে। যে দেখাটা সহজ নয়, সেই দেখার জন্য আমরা মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। একটা সম্পূর্ণ রাত তৈরি করেছিলাম আমরা।

হ্যাঁ, অপূর্ব রাত। আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। ওই রাতের স্মৃতি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। অমল তেমন রাত আমাদের জীবনে আর আসবে না।

আজও আমরা তেমন একটি রাত তৈরি করবো সু।

না। চেঁচিয়ে ওঠে সুনন্দা। আজ তুমি আমাকে ছোঁবে না। আমি চাই না।

সু! আর্তনাদ ধ্বনিত হয় অমলের কণ্ঠে।

ওহ্, না। কাঁদতে থাকে সুনন্দা। ও কি করে ভুলবে যে আজ থেকে ও অন্যরকম নারী। নারীর সনাতনী ধারণা থেকে ছিটকে পড়ে গেছে। ওর চারপাশের দেয়ালে ধ্বস নেমেছে। অমল ওকে কাঁদতে দেখে। যেটুকু দেখা যায় সেই অনাবৃত অংশে ও দেখতে পায় নখের আঁচড়। আঁকাবাঁকা রেখা উঁচু নিচু হয়ে ফুটে আছে। যেটুকু দেখা যায় সেটুকু এমন, হয়তো ওর গোপন অঙ্গগুলো আরো বেশি রক্তাক্ত। সুনন্দা সেগুলো আড়াল রাখার জন্য স্বাভাবিক থাকছে। যেমন ও নিজে স্বাভাবিক থাকার জন্য স্মৃতিকে ব্যবহার করছে। আসলে তো ওর বুক গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ও কি আজ রাতে পাগল হয়ে যাবে? সুনন্দা কি এখন তেমন একটি মহাকাশ যেটি বিশাল এবং অচেনা? সুনন্দার কান্না থামে না। সে কান্নায় অমলের বুকের ভেতরের সংকোষ নদীটা যুক্ত হয়। দুজনে অনেকক্ষণ কাঁদে। দুজনে অনেকক্ষণ দুজনকে দেখেনা। কতোক্ষণ? তা ওরা জানো।

সে রাতে ঘুমুতে পারে না নঈমও। ভাবে, দুজনের কি প্রচণ্ড ভালোবাসা! ওদেরই বেঁচে থাকা সার্থক। ওর কি এমন জীবন হবে? যে মেয়েকে ওর মা খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কি এমন ভালোবাসার পৃথিবী গড়তে পারবে? বারান্দায় পায়চারী করে নঈম। ওর ঘুম পায় না। বুঝতে পারে ওর মতো আরো অনেকে বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে। এই ক্যাম্পে আজকের রাতটা একদমই ভিন্ন। যে রাতে গুলি করা হয়েছিলো একদল মানুষকে ঠিক সে রাতের মতো।

পরদিন ভোরে কাজে নিয়ে যাবার গাড়িটি এসে দাঁড়ায় ক্যাম্পের গেটে। সবাই দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। যমুনাপ্রসাদ ফিসফিস করে বলে, নঈম অমলদা তো এলো না। ঘুম কি ভাঙেনি?

কাল যে বললো যাবে না।

যমুনাপ্রসাদ কিছু বলার আগেই দেখতে পায় গণনা শুরু হয়েছে। ও আর কথা বাড়ায় না। বিহারি সুপারভাইজার খেঁকিয়ে ওঠে, একজন নেহি। বলো কে নেই?

কেউ কথা বলে না। হাতে ধরা বেতটি প্রত্যেকের মুখের ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, অমল নেহি। ও কোথায়?

বোখার হয়েছে স্যার।

বোখার?

হ্যাঁ, স্যার খুব জ্বর। মাথা ভি ওঠাতে নেহি পারে।

আচ্ছা, আমি দেখছি। চাবুক পড়লে বোখার ঠিক হয়ে যাবে।

হাতের বেতটা ঘোরাতে ঘোরাতে লাফ দিয়ে নেমে যায় সুপারভাইজার। একটুপর ক্যাম্পের নারী-পুরুষ শিশুরা এবং ট্রাকের ওপর বসে থাকা যুবকেরা দেখতে পায় সুপারভাইজার বাম হাতের মুঠিতে অমলের চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ডান হাতে

ধরে রাখা বেতটা সপাং সপাং পিঠের ওপর পড়ছে। অমলের মুখে কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ও প্রতিরোধ করছে। ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা ছাড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। পারছে না। সুপারভাইজারের সঙ্গে আরো দু'জন বিহারি যুক্ত হয়েছে। ওরা বেশ উল্লাসের সঙ্গে ওকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে আসছে। নঈম আর যমুনাপ্রসাদ ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। নঈম ফিসফিস করে বলে, চল ঝাঁপিয়ে পড়ি। পরক্ষণে দুজন পাহারারত সেপাইটির দিকে তাকায়। লোকটি প্রতিদিন রাইফেল নিয়ে ওদের সঙ্গে যাওয়া-আসার পথে ট্রাকে থাকে। যুমনাপ্রসাদ উত্তেজনায় দাঁড়িয়েছিলো, আবার বসে পড়ে। ওর ভয় করছে। পা কাঁপছে। নঈমকে আঁকড়ে ধরে ও দম নেয়। ততোক্ষণে ওরা অমলকে নিয়ে এসেছে। তিনজনে ওকে চ্যাংদোলা করে উঠিয়ে ধরে গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে মারে। অমল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কপাল কেটে যায়। নঈম নিঃশব্দে ওকে টেনে তোলে। ট্রাক ছেড়ে দেয়। অমল কেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলে, আজ যদি ক্যাম্পে ফিরে যেতে না পারি। আজ যদি আমার সুনন্দার কাছে ফিরে না যাওয়ার দিন হয়। আমি তো সুনন্দার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারিনি। কথা ছিল আমরা একসঙ্গে মরবো।

কেউ কোনো কথা বলে না। সেই হৃদয় নিংড়ানো হাহাকারের পর আর কথা চলে না। মানুষরো চুপ থাকে। কারণ মানুষের হৃদয় স্তব্ধ হয়ে যায়। এসব সময়ে যন্ত্রের শব্দ প্রবল হতে পারে। কারণ যন্ত্রের হৃদয় নেই। চিৎকার করাই স্বভাব। তাই বিশাল ট্রাকটি বিকট শব্দ তুলে থেমে যায়। ওরা বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছে। ওদের নামতে হবে।

চ

সেইদিন শহরে আবার মাইকের ঘোষণা ধ্বনিত হয়। লোকটি তখন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। মাইকের ঘোষণা শুনিয়া সে গোলাহাটার দিকে হাঁটিতে থাকে। ও জানে গোলাহাটার রেললাইনের পাশে বিশাল মাঠ আছে। হাঁটিতে হাঁটিতে ও দেখিতে পায় অন্যান্য দিনেব মতো আজ আর শহরের বিহারিরা মাইকের ঘোষণা শুনিয়া রাস্তায় নামিয়া আসে না। কোথাও উল্লাসের ধ্বনি নাই। যেন নিরিবিলি শান্ত একটি শহর মানুষের বিদায়ের কথায় চুপ হইয়া গিয়াছে। শুধু শহর জুড়িয়া কাকদের চিৎকার শোনা যায়। কাকেরা মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের কর্কশ ধ্বনি মানুষেরা নকল করিতে পারে। এমন ধ্বনি উর্ধ্বগামী হয় মাইকে যাহারা ঘোষণা দিতেছে সেইসব যুবকদ্বয়ের কণ্ঠ হইতে। তাহারা বলিতেছে, আমরা আপনাদেরকে নিরাপদে সীমান্তে পৌছাইয়া দিবার জন্য যে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করার কথা বলিয়াছিলাম সেই ট্রেন প্রস্তুত হইয়াছে। আগামীকাল সকাল ছয়টায় সৈয়দপুর স্টেশনে সেই ট্রেন তৈরি থাকিবে। মনে রাখিবেন শুধু হিন্দু ও মাড়োয়ারিদিগকে লইয়া এই ট্রেন যাত্রা করিবে। মনে বাখিবেন আপনারা যাহাতে বিশেষ সময়ে স্টেশনে জড়ো হইতে পারেন সেইজন্য পরদিন ভোর চারটা হইতে তিনবার সাইরেন বাজানো হইবে। প্রথম সাইরেন জাগিয়া উঠিবার জন্য। দ্বিতীয় সাইরেন তৈরি হওয়ার জন্য। তৃতীয় সাইরেন যাত্রা করিবার জন্য।

সাইরেন শব্দটির উপর জোর প্রয়োগ করিয়া এমনভাবে উচ্চারণ করা হইতেছে যেন উহা

বিশেষ কোনো বাণী বহন করিতেছে। মাইকের ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিক হইতে 'আল্লাহু আকবর' শব্দ উঠিতেছে। শহরবাসী খেয়াল করিতেছে যে আল্লাহু আকবর ধ্বনি ক্রমাগত বাড়িতেছে। আস্তে আস্তে তাহা পুরা শহর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কোথাও কাহাকেও উচ্চারণ করিতেছে দেখা যাইতেছে না কিন্তু শব্দ চারিদিক হইতে আসিতেছে। যেন কোথাও একদল লোক কোরবানী করিবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করিতেছে। শাণিত হইয়া উঠিতেছে ছোরা, দা, কুড়াল।

ছ

ঘোষণাটি শোনার পর আগরওয়ালা ভাবে, এই শান্ত নিরিবিলি শহরে একটি সাইরেনের শব্দ শুনে আমাদের জেগে উঠতে হবে। অর্থাৎ আমরা এমন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবো যে আমা-দের স্বাভাবিকভাবে নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। প্রয়োজন শব্দের। কানফাটানো শব্দ। এমন একটি অদ্ভুত শব্দ যে শব্দ শুনে আতঙ্কিত মানুষ যুদ্ধের সময়ে ট্রেঞ্চে প্রবেশ করে। মাথার ওপর উড়ে আসে শত্রুর বোমারু বিমান। না, এ শব্দটি শুনে আমি ঘুম থেকে উঠতে চাই না। ওরা আমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে জানলেতো আমি সারারাত জেগে বসে থাকবো। আনন্দে আমার দুচোখের পাতা এক হবে না। তবে সাইরেন বাজবে কেন?

নঈমের মা মাইকের ঘোষণা শোনার পর থেকে আর এক লাইনও কোরান শরীফ পড়তে পারে না। নঈম কাজে চলে যাবার পর সংসারের কাজ শেষ করে সে এ সময় প্রতিদিন কোরান শরীফ পড়ে। আজ জায়নামাজ বিছিয়ে সবে পড়া শুরু করেছিলো, এক পৃষ্ঠা শেষ হয়নি। রেহেলের ওপর কোরান শরীফ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। কেবলই মনে হয় ফজরের আযানের শব্দেইতো তার ঘুম ভাঙে। একদিনও এর অন্যথা হয়নি। কখনো কোনো কাল-ঘুম এসে ওর চোখের পাতা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়নি। ও ভাবতে পারে না যে আযানের মধুর ধ্বনির চেয়ে অন্য কোনো বিশেষ ধ্বনি থাকতে পারে যা ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে। তবে সাইরেনের শব্দ শুনে ওকে জাগতে হবে কেন? নঈমের মা কোরান শরীফ কপালে ঠেকায়, বুকে রাখে, চুমু খায়। এই পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডেকে-ইতো ও সব বিপদ থেকে পার পেতে চায়। তাহলে ওরা কেন সাইরেন বাজাবে? নঈমের মা কিছুতেই মানতে পারে না। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, আমি সাইরেনের শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠতে চাইনা। আযানের ধ্বনিই প্রথম আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে।

অমলকে নিয়ে যাবার পর থেকে সুনন্দা বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। ও বুঝতে পারে ওর কান্নার শক্তি নিঃশেষিত। ও কাঁদতে চায়, কাঁদতে পারলে ভালো লাগতো মনে হয়। কিন্তু কাঁদতে পারে না। কেমন একটা অদ্ভুত চৈতন্যরহিত অবস্থা। ও কিছুক্ষণ পর পর বিছানার চাদর খামচে ধরে। শরীরে ব্যথা। ব্যথাটা কোন অঙ্গে বেশি সেটাও অনুভবে আসে না। চৈতন্যরহিত অবস্থার ভেতর থেকে পাকিয়ে ওঠে রেশমি সুতো, যেটা ফাঁস হয়ে আটকে ধরে যাবতীয় বোধ। সুনন্দা বুঝতে পারে নিজের সঙ্গে এই বোঝাপড়ার সময়টাতেই মাইকের ঘোষণা ধ্বনিত হয়। শরীরের ব্যথা নিয়েই উঠে বসে। কান খাড়া করে শোনে। শোনা শেষ হলে বুঝতে পারে গতকাল নিজের শারীরিক অবস্থা ও কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি। কারণ ও ঘটনার আকস্মিকতার ঘোরের মধ্যে

ছিল। এখন ও কঁকাচ্ছে। কঁকানি শারীরিক এবং মানসিক। ঘোরের ভেতর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে। মনে পড়ছে গতকাল রিকশায় উঠিয়ে দেবার সময় রাজাকারটা বলেছিলো, প্রয়োজন হলে আবার উঠিয়ে নিয়ে আসবো। দু'চারদিন বিশ্রামে থাকো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কি অর্থপূর্ণ হাসি। শিউরে ওঠে সুনন্দা। এই শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওর কিছু একটা খামচে ধরার দরকার হয়। কারণ ও কারো অদৃশ্য হাসি শুনতে পায়— ভয়াবহ, গগনবিদারী, অন্ধকার নামিয়ে দেয়ার হাসি। মাইকের ঘোষণাটি ওকে আপন শক্তিতে উত্থিত হতে সাহায্য করে, যেন সঞ্জীবনী সুধা। শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মুছে দেয় বিষ, মুক্ত হয় গগন, ভেসে ওঠে অজস্র তারা। সুনন্দা বুঝতে পারে না যে সাইরেনের শব্দ শুনে ওকে জাগতে হবে কেন? ওতো কাকডাকা ভোরে ওঠে। সূর্য-ওঠার আগে অমলদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি আসে। ওকে অমলের জন্য ভাত রান্না করতে হয়। গরম ভাত আলুভর্তা ঘি দিয়ে না খেলে ও সারাদিন মাটিকাটার কাজ করবে কিভাবে? বেঁচে থাকার সঙ্গেই তো ওর ভোরে ওঠার সম্পর্ক তবে ওকে শব্দ শুনে জাগতে হবে কেন? না ও শব্দ শুনে জাগবে না। ওরা দুজনে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেবে। নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আনন্দে ওরা কিছুতেই ঘুমুতে পারবে না। সুনন্দা গায়ের ব্যথা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এ কোণে ও কোণে যায়। যে কয়টি কাপড় ছিলো তা গুছিয়ে নেয়। যত্ন করে পোটলা বাঁধে। আজ সন্ধ্যায় অমলের ঘামে ভেজা শার্ট জলে ভেজানো হবে না। বাতাসে মেলে রাখবে। বেরুনোর আগে ওটাকে ওই অবস্থায় পোটল-য় ভরে নিলেই হবে। ওর মনে হয় না যে সারাটা দিন পড়ে রয়েছে এই সামান্য কটি জিনিস গুছিয়ে নেয়ার জন্য, তাড়াহুড়ো তো নেই। ওর কেবলই মনে হয় সময় মোটেও নেই। তড়িঘড়ি গুছিয়ে না নিলে সময় হবে না। বেলা দ্রুত বয়ে যায়। একটুপর ওর মনে হয় শরীরের কোথাও কোনো ব্যথা নেই। বেশ হাঁটতে পারছে। ও গুনগুনিয়ে গান করতে করতে ঘরের কাজ করে। ছোটবেলায় শোনা রেলের কু-উ-ঝিকঝিক শুনতে যেমন লাগতো তেমন আনন্দে ওর পায়ের পাতা মাটিতে পড়ে না। ও বুঝি মাটি থেকে উঁচুতে উঠে হাঁটছে। ঝুমঝুম করে বাজছে ওর দু'পায়ের মল। ওর পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাজাকারটা। ও মল বাজিয়ে বেজন্মাটা-কে বলছে, পাখি ফুড়ুৎ। শুয়োরের বাচ্চা তুই আর আমাকে ধরতে পারবি না। কাল আমি চলে যাচ্ছি। ভাবতেই আপন মনে হেসে ওঠে সুনন্দা।

দরজায় এসে দাঁড়ায় ছেলেমেয়েরা। হাসতে হাসতে ওদের দিকে তাকায় সুনন্দা। ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই জিজ্ঞেস করে, দিদি হাসছো কেন?

আমাদের ট্রেন রেডি হয়েছে সেজন্য আনন্দ লাগছে?

তোমাকে আর কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না দিদি।

অমলদাকেও না।

তুমি দেখে নিও আমরা ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনী হবো।

ওই বিহারিগুলোকে মেরে সাবাড় করবো।

ওরা মরে ভূত হবে।

ভূত হয়ে ঠ্যাং উল্টোদিক করে তেঁতুল গাছে ঝুলে থাকবে।

হি-হি করে হেসে ওঠে ছেলেমেয়েরা। সুনন্দা ওদের হাত ইশারায় ঘরের ভেতর ডাকে। ওরা এসে সুনন্দার চারপাশে গোল হয়ে বসে। একজন আগ বাড়িয়ে বলে, আজ পড়ালেখা নেই। আজ আমাদের ছুটি।

কি করবি তোরা?

আমাদের জিনিসপত্তর গোছাবো।

কে কি নিবি?

পুষি বেড়ালটাকে রেখে আমি যেতে পারবো না।

আমার মার্বেলগুলো তো নিতেই হবে।

যে কটা বই আছে সেগুলো সব নেবো।

কাঠের ঘোড়াটা আমি কি রেখে যেতে পারি।

কদিন আগে যে মা আমাকে কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে দিলো সেগুলো তো আমাকে নিতে হবে। নাকি?

গুলতিটা নেবো আমি। ট্রেনটা ছেড়ে দিলে স্টেশনে যদি কোনো বিহারি দেখি গুলতি মেরে চোখ ফুটো করে দেবো।

আবার হি-হি করে হেসে ওঠে ওরা। হাসতে হাসতে সোনার বাংলা গানটা গাইতে থাকে। সুনন্দাও ওদের সঙ্গে গলা মেলায়। ওর মনে হয় আজ একটা সত্যিকারের আনন্দের দিন। আগামীকাল উৎসব। ভোরবেলা ও সবাইকে গাঁদাফুল আর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে কলাপাতায় দই খেতে দেবে। শিশুরা প্রভাত সঙ্গীত গাইবে। গানটি শেষ হয়ে গেলে ও বাচ্চা-দের বলে, তোরা সবাই বসে থাক। আমি তোদের একটার পর একটা গান শোনাবো।

তখন মাথায় মাটির ঝুড়ি টানতে কষ্ট হয় অমলের। চুল ধরে টেনে আনার ফলে ঘাড়ের ডান দিকের রগে টান পড়েছে। শরীর চলতে চায় না। কাজ তো নয় যেন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। অমলের বুক ফেটে যেতে চায়। মাঝে মাঝে নঈম দৌড়ে এসে ঝুড়িটা ধরে। ফিসফিসিয়ে বলে, খুব কি কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ, খুব।

গাছের নিচে একটুখানি বোস।

না, আবার বেত নিয়ে ছুটে আসবে।

কালকে থেকে আমাদের ছুটি।

উঃ, ছুটি। অমলের কণ্ঠ বাতাসে চিরে যায়।

নঈম দাঁড়ায় না। ঝুড়ি মাথায় ছুটে যায়। মাইকের ঘোষণাটা শোনার পর থেকে নঈম চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কাল থেকে আর মাটিভরা ঝুড়ি টানতে হবে না। ইঁট বিছাতে হবে না। বালু সিমেন্ট মাখাতে হবে না। সুরকি চালতে হবে না। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঝুড়ি বোঝাই করতে হবে না। মুক্তি, মুক্তি — ইচ্ছে করে বাংলাদেশের পতাকাটা নিয়ে ওদের চোখের সামনে সারা শহর দৌড়ে বেড়াতে। একসময় নঈম আবার অমলের মুখোমুখি হয়। অমল বলে, আমি আর পারছিনা নঈম। মনে হচ্ছে পড়ে যাবো। আবার ঘাড় ভেঙে যাবে।

তোমার ঝুড়িটা আমাকে দাও। এই ঝুড়িটা নিয়ে যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে ধাম করে শুয়ে পড়ো। তারপর দেখি ওরা কি করে? এমন ভাব করবে যেন অজ্ঞান হয়ে গেছো।

অমলের মনে হয় ভান করতে হবে না। তেমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে। ওর বুক ফেটে

যাচ্ছে — চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে এবং একসময় ও পড়ে যায়। ছুটে আসে অনেকে। অমল সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়েছে। একজন ছুটে পানি আনতে যায়। সুপারভাইজার অমলের গায়ে লাথ্থি দিয়ে বলে, শুয়োর কা বাচ্চা। গাদ্দার। কুছ নেহি হুয়া।

হাতের বেতটা উপরে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে নঈম ওটা দু'হাতে ধরে বলে, ও ঠিকই অসুস্থ হয়েছে। আপনি নিজে দেখুন হুজুর। সাচ বাত হুজুর।

সুপারভাইজার দেখতে পায় যমুনাপ্রসাদ মুখে পানির ঝাপটা দেওয়ার পরও অমলের সাড়া নেই। তখন নঈমকে হুকুম দেয় ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার জন্য। সঙ্গে যমুনাপ্রসাদও যাবে। এই প্রথম ওরা তিনজনে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঘরে ফিরে আসে।

আবার ক্যাম্পের মানুষ জড়ো হয় ওদেরকে কেন্দ্র করে। ডাক্তার আসে।

অমলের জ্ঞান ফিরলে ওকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। সুনন্দার মুখে কথা নেই। অমলকে আনার পর শুধু অস্ফুট আর্তনাদ করেছিলো। তারপর থেকে নীরব। ক্যাম্পের অন্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। কেউ দেয়ালে বা থামে হেলান দিয়ে বসেছে। কেউ কেউ গোল হয়ে বসে কথা বলছে। কেউ বারান্দার নিচে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে আছে। সবাই আগামী কালের ট্রেনযাত্রার কথা ভাবছে। অমল সুস্থ হয়ে যাবে, ডাক্তারের কাছ থেকে এই আশ্বাস পাওয়ার পর থেকে সবাই আশ্বস্থ হয়। প্রত্যেকে পরদিনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। নিজেদের চিন্তায় ব্যাগ্র কেউ আর অমল-সুনন্দায় স্থির নেই। কেমন হবে ট্রেন যাত্রা? সত্যি কি যেতে পারবে নিরাপদ জায়গায়? শুধু শিশুরা ভাবনাহীন। ওবা মাঠে ছুটোছুটি করছে। চিৎকার করছে। কেউ কেউ উল্টে পড়ে কাঁদছেও। নঈমের মনে হয় পুরো ক্যাম্পটা ছবির মতোন। কোনো একটি বিদেশি সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো এই ক্যাম্পের জীবন স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হয়ে যাওয়া চিত্রের পটভূমিতে মিউজিক বাজছে। স্যাড মিউজিক। ভায়োলিন নিশ্চয়ই। নাকি সানাই? ও বুঝতে উঠতে পারে না। এই ক্যাম্পে সুনন্দাই এসব বোঝে। কিন্তু ওকে তো এখন কিছুই জিজ্ঞেস করা যাবে না। ওর বুকের ভেতর —। থেমে যায় নঈম। ওর বুকের ভেতর কি? নঈম নিজের মুঠি চেপে ধরে। সুনন্দার বুকের ভেতরেই কি ভায়োলিন? না, সুনন্দা একা নয়। একটা করে ভায়োলিন ক্যাম্পের সব বয়স্কের বুকের ভেতর সুরে তুলেছে। যে যার মতো করে বিষণ্ন হয়ে গেছে। নিজেদেব চৈতন্যের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে যে এ এক অনিশ্চিত যাত্রা। কারো মনেই যাওয়ার আনন্দ প্রবল হয়ে উঠছে না। অমলের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখার জন্য ঢুকতেই সুনন্দা জলভরা চোখে তাকায়। ফিসফিস করে বলে, নঈম ভাই ভায়োলিন বাজাচ্ছে কে?

নঈম প্রথমে চমকে ওঠে। তারপর বিষাদ কণ্ঠে বলে, জানি না।

আমার মনে হচ্ছে অমলের বুকের ভেতর থেকে সুরটা আসছে।

আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম আপনার বুঝি।

তাহলে আপনিও শুনতে পাচ্ছেন? আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝি একা।

নঈম আরো বিষণ্ন হয়ে যায়। বলে, বৌদি অমলদার ঘুম ভাঙলে আমাকে ডাকবেন।

সুনন্দা অমলের বুকের ওপর কান পাতে। ধুকধুক শব্দ শুনতে চায়। যেন ওটা ওকে না জানিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে নঈম আর দাঁড়ায় না। ও মায়ের কাছে আসে। ওর মার গোছগাছ শেষ। রেহেলসহ কোরান শরীফের পোটলাটা নিজের জন্য রেখেছে। ওটা

নঈমের কাছে দেবে না। নঈমের জন্য অন্য পোটলা। বাদবাকি জিনিস ওটায় আছে। বড় করেনি, নঈমের টানতে কষ্ট হবে বলে। হাঁড়িকুড়িতো সবই ফেলে রেখে যাচ্ছে। বিছানা বালিশও। মায়ের কাছে আসতেই ওর মনে হয় এখানে ভায়োলিন নয়, মায়ের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে দরুদের শব্দ। প্রিয়জনের লাশের সামনে বসেই মানুষ এমন করে দরুদ পড়ে। মা ওকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? বুকটা খাঁ-খাঁ করছে কেন?

আপনি কি দরুদ পড়ছেন আম্মা?

তুই শুনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

হায় আল্লাহ, মাবুদ তুমি অশেষ মেহেরবান। আমার ছেলেটি পরহেজগার বান্দা হয়েছে তোমার। যে দরুদ আমি মনে মনে পড়ি সেটা ও শুনতে পায় কিভাবে?

আম্মা আপনি কি আব্বা আর ভাইয়ার জন্য দরুদ পড়ছেন?

হ্যাঁ সারাদিন পড়েছি। সারারাতও পড়বো। কাল যে আমরা চলে যাচ্ছি। আবার কবে এই সৈয়দপুরে বসে পড়তে পারবো কে জানে বাবা।

নঈম মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

আমার খুব ইচ্ছা করছে আপনার কাছে শুয়ে থাকতে। আবার কবে —

এসব কথা থাক বাবা। তুইও আমার সঙ্গে দরুদ পড়।

নঈম অনুভব করে দরুদ পড়তে হয় না। সুরটা বুকের ভেতর থেকে আপনা-আপনি উঠে আসছে — কখনো সেটা ভায়োলিনের সুরের মতো বিষাদময়। আশ্চর্য সব কিছু মিলেমিশে একটাই হয়ে যায়। আজ হলো কি?

সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙে অমলের। উঠেই বলে, ঘাড়ে ব্যথাটা নাই। বেশ ঝরঝরে লাগছে।

দুহাত টানটান করে মাথার ওপর তুলে ঘাড় ঝাঁকিয়ে নেয়। সকালের ঘটনাটা ও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে — কারণ কাল থেকে মুক্তি। সুনন্দাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, সু সব বাঁধাছাঁদা শেষ তো?

সুনন্দা অপলক দৃষ্টিতে অমলকে দেখে। কথা বলে না। ওর চোখে জল নেই, জ্বালা নেই। মনে হয় দৃষ্টির শূন্যতায় ও অমলকে দেখতে পাচ্ছে না। অমল হারিয়ে যাচ্ছে ওর সামনে থেকে।

কি হলো ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন? আমার জন্য একটুও ভেবো না। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

তোমার জন্য লুচি আর সুজির হালুয়া করেছি। দেই?

দাঁড়াও, মুখে জল দিয়ে আসি।

অমল চলে গেলে সুনন্দার মনে হয় ও অমন চিৎকার করে বলতে পারবে না যে, আমি ঠিক হয়ে গেছি। ও নিজেকেই বলে, এই জীবনে আমার আর ঠিক হওয়া হবে না। আমার জন্য তোমাকে ভীষণ ভাবতে হবে অমল।

জ

রাতে বড়দের ঘুম ভালো হয় না। সারারাত ক্যাম্পে আলো জ্বললো। গোছগাছ চললো। ছোটরা অনেকরাত জেগে তারপর ঘুমিয়েছে। বড়রা আজ ওদের ঘুমুনোর জন্য তাড়া দেয়নি।

যার যা সঙ্গে করে নেবার আছে তারা সেগুলো বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ঘুমিয়েছে। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে যমুনাপ্রসাদের মা গণেশের মূর্তিটা পোটলায় বেঁধে কোলের ওপর রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলো। সে অবস্থায় খানিকক্ষণের জন্য তার দু'চোখের পাতা এক হয়। অল্পক্ষণে নিজেই আবার চমকে জেগে ওঠে, ওই বুঝি যাবার সময় হলো। ট্রেন কি ছেড়ে দিয়েছে? চেঁচিয়ে ওঠে, যমুনা, যমুনা?

মা, কি হয়েছে?

কয়টা বাজে? আমরা বেরুবো না?

প্রথম সাইরেন পড়েনি মা।

ও। যমুনাপ্রসাদের মা আবার দেয়ালে ঠেস দেয়। কিন্তু ঘুম আসে না। বুঝতে পারে ভীষণ ক্লান্তি। একবার মনে হয় যাবে, আর একবার মনে হয় যাবে না। এই শহরে তার বিয়ে, এই শহরে স্বামীর স্মৃতি — এতোকিছু রেখে অন্য কোথাও যেতে মন চায় না। না গেলে কি হয়? আবার চিৎকার করে যমুনাকে ডাকে। ছুটে আসে যমুনা, কি হয়েছে মা?

আমি এই শহর ছেড়ে কোথাও যাবো না।

কি বলছো মা? না গেলে ওরা জোর করে গাড়িতে তুলে দেবে। ঠিক যেভাবে অমলদাকে নিয়ে গিয়েছিলো। আমরা যে মাড়োয়ারি মা।

আমি লুকিয়ে থাকবো। ওরা টের পাবে না।

তুমি কি চাও ওই ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে ওরা মেরে ফেলুক?

না, না। যমুনাপ্রসাদের মা গণেশের মূর্তি বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। তোর বাবার স্মৃতি-।

পাগলামি কোর না মা। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ফিরে আসবো।

স্বামীর স্মৃতির শহরে জীবনের শেষ দিনগুলো থাকতে চাওয়া কি পাগলামী? এটা কেমন পাগলামী যমুনাপ্রসাদ? তুই আমাকে বুঝিয়ে দে।

তখন প্রথম সাইরেন বাজে। স্তব্ধ হয়ে যায় ক্যাম্পের মানুষগুলো। শিশুরা জেগে ওঠে। বিছানায় বসে থাকে। ওরা নড়তে পারে না। প্রবীণরা প্রত্যেকে নিজেদের ভঙ্গিতে প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ প্রার্থনায় একাগ্রতা থাকে না। কারণ সাইরেন অনেকক্ষণ ধরে বাজে। প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন এতোক্ষণ ধরে বাজছে কেন? মানুষের ঘুম তো সামান্য শব্দেই ভেঙে যায়। তখন যুবকেরা বুঝতে চায় যে কিভাবে শব্দটা হচ্ছে ওঁ-ওঁ-ওঁ কি? নাকি অন্যরকম? গোঙানির মতো? নকি কোনো অন্তিম সুর বাজছে? বিউগলে যেমন বাজে। যুবকরা বুঝতে পারে এটা যদি কোনো আহ্বান হয়, তাহলে যুদ্ধে যাবার আহ্বান। যুদ্ধটা কেমন হবে? সামনাসামনি লড়াই? হাতিয়ার কি হবে? তখন যমুনাপ্রসাদ অমলকে বলে, খালি হাতে ট্রেনে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নঈম বলে, আমারও। এ সময়ে নিরস্ত্র থাকা খুব বোকামী।

একটা যদি মেশিনগান থাকতো আমার। অমলের কণ্ঠ।

তখন সুনন্দা দু'হাতে পোটলা নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, আমি প্রস্তুত। তিন-জনে ওর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে। যেন সুনন্দার কণ্ঠেই বিউগলের অন্তিম সুর বাজছে। হঠাৎ যমুনাপ্রসাদের কি হয় কে জানে ও গড় হয়ে সুনন্দাকে প্রণাম করে।

তখন দ্বিতীয় সাইরেন বাজে। চঞ্চল হয়ে ওঠে সবাই। শিশুরা নিজেদের জিনিসগুলো নিয়ে দৌড়ে মাঠে নেমে যায়। বৃদ্ধদের হাতে তেমন কিছু নেই। সামান্য কিছু তাদের বহনের জন্য

দেয়া হয়েছে। নিজেদের খাবার বাসন কিংবা জলের গ্লাস কিংবা পানের ডিব্বা। দু'একটা কাপড়ও কেউ নিজেদের সঙ্গে নিয়েছে। বড় পোটলাগুলো যুবকরা টানছে। মহিলারাও কম যায় না। শক্ত-সমর্থ যারা তারা নিজেদের ঘরঘেরস্থির যাবতীয় জিনিস ছাড়তে চায়নি। গেটের সামনে জড়ো হয়েছে সবাই। বাইরে বিহারিরা রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে যে হাঁটতে পারবে না তাদেরকে রিকশায় করে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। এখন কেউ আর ঘরের ভেতরে নেই। শূন্য ঘরে উড়ে বেড়ায় ছেঁড়া কাগজ, ন্যাকড়া, ঘরগেরস্থির যাবতীয় জঞ্জাল। ছোটরা বসে থাকতে পারে না। ওরা আবার মাঠের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। কতোক্ষণ বসে আছে ওরা তা কেউ হিসেব করতে পারে না। সময়ের হিসেবটা প্রবীণরাই বেশি করছে। ওদের মনে হয় এক যুগ পেরিয়ে গেলো বুঝি, নাকি দুই যুগ? ওরা যেন দেখতে পায় মাঠের মধ্যে ছুটে বেড়ানো শিশুরা যুবক হয়ে গেছে। ওরা অনায়াসে দেশটার ভাঙা ব্রিজগুলো মেরামত করে ফেলেছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দর তৈরি হয়ে গেছে। উড়ে যাচ্ছে বিমান। না, সেগুলো বোমারু বিমান নয়। যাত্রীবাহী বিমান। শত শত মানুষ নামছে সে বিমান থেকে। শিশুরা দৌড়াতে দৌড়াতে কাছে এলে তৃতীয় সাইরেন বাজে। হঠাৎ করে প্রবীণদের কর্ণকুহরে সাইরেনের শব্দ বোমারু বিমান থেকে ফেলে দেয়া বোমার পতনের মতো ধ্বনিত হতে থাকে। ওদের মনে হয় এই সাইরেনের শব্দ যদি কোনো আহ্বান হয়, তবে সে আহ্বান মৃত্যুর।

ঝ

তৃতীয় সাইরেন বাজতে থাকা অবস্থায় ওরা স্টেশনে আসে। সাইরেন বাজা শেষ হয়ে গেলে ওরা ট্রেনে ওঠে। কে আগে উঠবে, কে ভালো জায়গাটি দখল করবে তা নিয়ে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি শুরু হয়। অনেকক্ষণ পর তারা সুস্থির হয়ে বসে। নিজেদের পোটলা-পুটলি গুছিয়ে রাখে। কেউ কেউ কাঠের বেঞ্চের ওপর চাদর পেতে নেয়। যতোক্ষণ ওরা হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে না বসে ততোক্ষণ ট্রেন ছাড়ে না। কখন যেন একসময় হুইসেল বাজে। সুনন্দা অমলকে বলে, আমার খারাপ লাগছে। তোমার ঘাড়ে একটু মাথা রাখি?

অমল নিজেই ওর মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর হেলিয়ে নেয়। তারপর ডান হাতটা সুনন্দার পিঠের ওপর রেখে ওকে ধরে রাখে। যেন ওর আয়েশটুকু নষ্ট না হয়।

ততোক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

ধীর গতিতে স্টেশন ছাড়ে।

সামনে এগোয়। শহরে বাইরের যেতে থাকে।

কিন্তু বেশিদূর যায় না। গোলাহাটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। ফাঁকা জায়গা। ধূ-ধূ মাঠ। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে রেলওয়ে কারখানা দেখা যায়। কারখানার উত্তর পাশের এই মাঠটা এই মুহূর্তে ভূতুড়ে থমথমে মনে হয় অনেকের কাছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না। একদল বিহারি পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় কামরায় কামরায় ঢুকে পড়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে আসে কামরাগুলোতে।

নারী-পুরুষ শিশুদের আর্ত-চিৎকার কামরাগুলোর ভেতর গুমরাতে থাকে। কেউ

কাউকে ঠিকমতো দেখতে পায় না। সুনন্দা প্রথম ধাক্কায় অমলের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে। ও চেঁচিয়ে ডাকে, অমল?

এইতো আমি।

কি হচ্ছে?

জানি না তো।

আমি তোমার হাতটা ধরবো।

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

এগিয়ে আসো। ঠিক যেখান থেকে সরে গিয়েছিলে সে জায়গাটা মনে করে।

এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার—।

কথা শেষ হয় না। একটি প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনের বগি খুলে যায়। ঝাঁকুনিতে ওরা উল্টেপাল্টে পড়ে। নারী-পুরুষ শিশুরা এখন ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করছে না। সবাই মিলে কাঁদছে না। অমল আর সুনন্দা কাছাকাছি হতে পারে না।

মুহূর্তে ওরা দেখতে পায় দরজা ফাঁক হচ্ছে আর এক একজনকে টেনে বের করে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এভাবে একের পর এক।

নঈমের মা চেঁচিয়ে বলে, ও বাবা নঈম। তুই ছাড়া আমার তো কেউ নাইরে বাবা। তুই আমার কাছে আয়। দুজনে একসঙ্গে মরবো। ও আমার সোনা।

সবাই মরবো কেন আম্মা। বাঁচার চেষ্টা করি না কেন?

বাঁচা? ও আল্লারে কেয়ামত, কেয়ামত বাবা।

চিৎকার করে দরুদ পড়ে নঈমের মা। কিছুক্ষণ পর তার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

মানুষ মরীয়া হয়ে জানালা ভেঙে বেরুনোর চেষ্টা করছে। ধমাধম শব্দ হচ্ছে। কানফাটা চিৎকারের সঙ্গে জানালা ভাঙার শব্দ ভয়াবহ করে তুলেছে কামরার পরিবেশ। সবার আপ্রাণ চেষ্টায় জানালা খানিকটা ফাঁক হয়েছে। আর খানিকটা হলে সে ফাঁক গলিয়ে বের হতে পারবে একজন। কিন্তু এখন কি একজন একজন করে বের হওয়ার সময় আছে? পেছন থেকে সুনন্দা অমলের ঘাড়ে হাত রাখে, আমি বের হতে পারবো তো? শাড়ি পরে এই ফাঁক দিয়ে —।

অমল ওর দিকে তাকায় না। ঘাড় ঘোরায় না। নঈমের মাও একই কথা বলে, আমার তো বের হওয়া হবে না রে বাবা। আমি এইটুকু ফাঁক গলিয়ে কেমন করে—। নঈম মায়ের দিকে তাকায় না। যমুনাপ্রসাদের মা বুঝতে পারে তার বিশাল থলথলে বপু নিয়ে এই জানালা দিয়ে বের হতে পারবে না। তাই কোনো কথা বলে না। ওরা তিনজনে জামা খুলে, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে, জুতো খুলে ফেলে বেরুবার জন্য তৈরি হয়। প্রথমেই যমুনাপ্রসাদ লাফিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় নঈম। ও মায়ের দিকে তাকায় না। বিহারিদের হাতে রক্তাক্ত খোলা তরবারির দৃশ্যটি চিন্তা করলে ও পারিপার্শ্বিকের সবকিছু ভুলে যায়। জানালা গলিয়ে বের হয়ে মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটতে থাকে।

তৃতীয় অমল।

সুনন্দা ওর হাত চেপে ধরে, কথা ছিল একসঙ্গে মরবো।

অমল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। জানালা দিয়ে নিজেকে বের করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুনন্দা চিৎকার করে কাঁদে, অমল। অমল, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

অমল শুনতে পায় না। অমল বধির হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ও বাতাস কেটে তীব্র বেগে ছুটছে। এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথে একবার উল্টে পড়ে যায়। মুহূর্তে উঠে আবার ছুটে। ও জানে না কোথায় যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা তিনজনে একসঙ্গে হয়। তিনজনে হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না যে আর দৌড়াতে হবে কিনা। ওদের পেছনে বধ্যভূমি। যারা পালতে পারেনি তারা তরবারির নিচে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে যে ওদের স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছে। ওদের কিছুই মনে পড়ছে না।

তখন তিনজনে লোকটির মুখোমুখি হয়। নঈম ওর হাত চেপে ধরে, তুমি? কোথায় যাচ্ছো?

যমুনাপ্রসাদ বলে, আমরা আপনাকে খুঁজছি। আমরা আপনার সঙ্গে যাবো।

অমল ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, আপনি কি আমাদেরকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে পারবেন?

লোকটি কথা না বলে ওদেরকে ইশারা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ওরা ওর সঙ্গে যায়।

১০

লোকটি হেঁটে যাচ্ছে। অভ্যেস মাফিক লম্বা পা ফেলছে। গত কয়েক মাসে এভাবে হাঁটতে ও অভ্যস্ত হয়েছে। এভাবে না হাঁটলে ওর মনে হয় সময়টাকে ধরতে পারছে না। যুদ্ধের সময় তো বুলেটের গতিতে ছোটে। সময়ের মানুষ সময় ধরতে পারবে না কেন?

ও থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। এটা চৌরাস্তার মোহনা, যে কোনোদিকেই ও যেতে পারে। সব পথ-ঘাট চেনা। কোথায় যাবে? সামনে দীর্ঘপথ। ওর বারুয়া মাঝির কথা মনে পড়ে। শুনতে পায় গুমগুম শব্দ। মিলিটারি কনভয় আসছে। ও বড় সড়ক থেকে নেমে দাঁড়ায়। আশেপাশের ডালে বসে থাকা পাখিগুলো দ্রুত পালাচ্ছে। মানুষ তো পাখি নয়, লোকটির ভাবনায় বিদ্যুৎ চমকায়। ও শুনতে পায় গুলির শব্দ। দু'একটা পাখি হয়তো ঝরে পড়েছে আশেপাশে কোথাও। ওর ভাবনায় আবার বিদ্যুৎ চমকায়, বন্দুকের নলের মুখে মানুষ পাখিও হয়। পাখির মতো গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ও বোঝে মিলিটারি কনভয়ের পেছনে হেঁটে হেঁটে বেশি দূর যাওয়া যায় না। মেঠো পথে নেমে যাওয়ার এটাই প্রকৃত সময়। কারণ মিলিটারি কনভয় দেখলে মাথার ভেতর এ্যামবুশ শব্দটা স্থির হয়ে যায়। সেই স্থির শব্দ থেকে বিচ্ছুরিত হয় গোলাবারুদ। ও হাঁটতে থাকে।

অনেকটা পথ এসেছে। দু'পাশে ধানক্ষেত, কুঁড়েঘর, ছনে ছাওয়া আটচালা, জলাভূমি, কড়ই গাছ, ঝোপঝাড়। ও অ্যামবুশের জন্য জায়গা খোঁজে। সামনে নদী। খেয়া পার হতে হবে। বারুয়া মাঝি খেয়া পারাপার করে। সদা প্রস্তুত থাকে — জানে কাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। শুধু নদীর এপার-ওপার নয়। নদীর লম্বা পাড়ি ওর সুখ। ওর বউ সোনামিথি। নদীর ধারে

বাড়ি। বাইশ বৎসরের সংসার। ছেলেমেয়ে হয়নি। সোনামিথির কালো কুচকুচে শরীর – জোয়ান তাগড়া। দেখতে মা কালীর মতো মনে হয়, যেন অযুত শক্তির অধিকারী, অনায়াসে হাতের তালুতে পৃথিবী তুলে নিতে পারে। তার শরীরের মতো মন। হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বুকের ভেতরে নদীর সব বাতাস ভরে ফেলে। সেজন্যই বুঝি এমন বুক উজাড় করা ভালোবাসা। দু'চোখে কি যে মায়া। কাছে গেলে জুড়িয়ে যায় মন। এতো শারীরিক শক্তি নিয়ে এমন মায়াবতী হয়ে যাওয়া লোকটির অনুভবে অলৌকিক হয়ে ধরা পড়ে। ও আপন মনে হাসে। বারুয়া মাঝি সোনামিথির উল্টো মানুষ। শুকনো। চোয়াল ভাঙ্গা চেহারা। মাথার চুল শনের মতো পাকিয়ে গেছে। ওগুলোর জন্য আর চিরুনির দরকার হয় না। কালো কুচকুচে ঠোঁটে সারাক্ষণ বিড়ি জ্বলে। কথা বলে খনখনে গলায়। জবা ফুলের মতো লাল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় বাঘ। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু আচরণে উল্টো। মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলোকে বুকের ভেতর আগলে রাখে। ভাবাই যায় না। সে মানুষের চোখের হিংস্রতা বুকে ঢুকলে মাণিকরতন হয়। কি করে যেন হীরের দ্যুতি ছড়ায়। তাই যোদ্ধারা ওকে আঁধারমানিক ডাকে। ও ভীষণ খুশি হয়। বারুয়া মাঝি আর সোনামিথির কথা ভাবতে ভাবতে লোকটি সাঁকো পার হয়। ওর ডান পাশে একটি গ্রাম। বাম পাশে আর একটি। দু'পাশের গ্রামের দুটি নাম। একটি বৈশাখী অন্যটি চন্দ্রদ্বীপ। বৈশাখী গ্রামটা দু'মাস আগে মিলিটারি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওরা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজতে এসেছিলো। পায়নি। কিন্তু লোকটি জানে সেই ছেলেটি গাঁয়েই ছিলো। কেউ জানলো না কেমন করে ও মানুষের ভেতর মিশে থাকলো — কেমন করে গোবরা মোড়লের কচুরিপানাভরা পুকুরে নাক ভাসিয়ে সারাদিন ডুবে থাকলো। তারপর ভিক্ষুকের বেশে পেরিয়ে গেলো লোকালয়। সারাদিন সোনামিথি দরজায় বসে বাঁশের টুকরি বোনার নামে পাহারা দিলো ওকে। রাতে বারুয়া মাঝি নৌকায় করে দিয়ে এলো মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। লোকটি আবার আপন মনে হাসে। ও নাম দিয়েছে ভোজবাজির খেলা। সোনামিথি ঘরের চৌকির নিচে অনেক বড় গর্ত খুঁড়ে লুকোনোর জায়গা করে রেখেছে। গর্তের ওপর কাঁথা-বালিশের স্তূপ। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। ও বলে রোজ খানিকটা করে মাটি খুঁড়ি। নদী পর্যন্ত সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলবো। ছেলেরা যেন নদী সাঁতরে ওপার চলে যেতে পারে। ডর কি?

সত্যি তো ডর কি? মনে করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে। ক্যাপ্টেন তিয়ারি ওকে কস্থা বলে ডাকতে শিখিয়েছিল। নদীর ওপার থেকে বাতাস এসে লোকটিকে ছুঁয়ে যায়। ও জানে কস্থা কোনো মানুষের নাম নয়। ওটা কোনো গোত্রের নাম, নইলে এমন কোনো শব্দ যার মানে যুবক। ছেলেটি ওকে যৌবনের ভিন্ন একটি মানে শিখিয়েছিলো। দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বুঝিয়েছিলো হেরে যাওয়া মানুষের কাছে যৌবনের কোনো মানে থাকে না। ওরা তখন দেরাদুনে। তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বাস। অস্ত্র চালনা শিখছে। প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন তিয়ারি। একদিন কস্থাকে এনে বললেন, ও তোমাদের তাঁবু পাহারা দেবে। ফাই-ফরমাস খাটবে। ভীষণ অনুগত। যা বলবে তাই শুনবে।

পরদিন লোকটি ওকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি?

ও মাথা নেড়ে বললো, নেই।

নাম নেই? কি বলছো তুমি?

আমার বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না। কাজ থাকলে হুকুম করো।

আমি কি তোমার প্রভু যে শুধুই হুকুম করবো? আমি তোমার বন্ধু হতে পারি না?

বন্ধু!

কম্থা ঠাণ্ডা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টি যেন কিছু খুঁজে ফেরে। লোকটির মনে হয় ফেলে আসা অতীত ওকে তাড়া করছে। ও এখন দুমড়ে-মুচড়ে থাকা বুকটা হাতড়াবে একটু স্বস্তি-একটু আনন্দ যদি কোথাও অবশিষ্ট থাকে। দেরাদুনের দূরের পাহাড়ের দিকে তাকায় লোকটি। ওখানে মেঘ নেমে এসেছে। গাছের ফাঁকে সূর্যের শেষ রশ্মি। ওর মনে দুঃখ নেই। ও একটি ব্রত নিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। ট্রেনিং শেষ হলে ঢুকবে স্বদেশে। অস্ত্রের সঙ্গে জমে উঠবে খেলা। হয় বাঁচা নয় মরা – ও এই ভাবনার সঙ্গে গান গাইতে পারে। ও কখনোই কম্থার মতো বিষাদে আক্রান্ত হবে না।

একদিন অনেক রাতে কম্থার সঙ্গে জমে ওঠে ওর গল্প। আসর জমানোর গল্প নয় – আড্ডায় বানানো ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দেয়া গল্প নয় – কম্থা বলতে থাকে পাহাড়ের মতো বিশাল শব্দে। ওর ক্ষুদে চোখ চ্যাপ্টা নাক চওড়া কপাল বড়সড় ভরাট মুখ। সুঠাম দেহ। ওর কণ্ঠে পরাজিত মানুষের আক্ষেপ বড্ড বেমানান। তবু তাই ওর নিয়তি। সেদিন তাঁবুর বাইরে কম্থার হাত চেপে ধরলে যেন কথা বের হয় হাত থেকে। একজন কম্থার হাতই মুখ হয়ে যায়।

ও কোমল স্বরে বলে, বন্ধু নাও। টানো। ভালো লাগবে।

না ক্যাপ্টেন দেখলে বকবে।

টানো। এতো রাতে কেউ জেগে নেই। শুধু তুমি আর আমি।

দূরের পাহাড় জেগে আছে।

তাতে কি?

পাহাড়ের ওপারে একটি দেশ আছে।

তোমার?

কম্থা আর কথা বলে না। চুরুট জ্বালায়। গভীর করে টানে। নিশ্বাসটা বুকের তলদেশে, না ওটা নিশ্বাস নয় ধোঁয়া। যেন চুরুটের ধোঁয়া কম্থার কণ্ঠস্বর। ওর অন্য কোনো স্বর নেই। লোকটি ওকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য বলে, আমার দেশ স্বাধীন হলে আমি তোমার সঙ্গে তোমার দেশে বেড়াতে যাবো?

স্বাধীন? পারবে?

কম্থার ধোঁয়ার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত। ওই কণ্ঠস্বর মানুষের নয়, যেন কণ্ঠস্বর একটি দেশের – যে দেশ পাহাড়ের ওপাশে-তাকিয়ে থাকলে কম্থার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে আর বিষণ্ন কম্থা তাকিয়ে থেকে প্রহর গোনে। লোকটি ওর হাত শক্ত করে ধরে বলে, পারবো। আমরা স্বাধীনতা আনতে পারবো।

না পারলে মনে রেখো তোমরা নতুন কম্থা হবে। আমার চোখের সামনে কেউ কম্থা হবে তা দেখতে চাই না।

কি বলছো?

ও আর কথা বলে না। চুরুটে শেষ টান দেয়।

এসব তুমি কি বলছো? কম্থা আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

তোমার কণ্ঠে আর্তনাদ কেন? শুনতে পাচ্ছো তোমার কণ্ঠ পাহাড়ে ধ্বনিত হচ্ছে। যাই আমার ঘুম পাচ্ছে।

না তুমি যেতে পারবে না। তোমার কথা শেষ করো।

আমার তো কথা নেই। তোমার মতো আমার কথা পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে আসে না। আমার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না।

ওই ফিরে না আসার কথা আমি শুনবো। বলো তোমার নাম নেই কেন? বলো তুমি কেন কম্থা হয়েছো? নতুন কম্থা কি?

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর শোনা যেতে থাকে ওর কণ্ঠস্বর। প্রথমে আস্তে একটু একটু করে বাড়ে — মৌমাছির গুঞ্জনের মতো সেটা হাজার মানুষের ধ্বনি হয়। যেন কম্থা একজন নয়– হাজার হাজার।

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে কোথাও হুল ফোটাবে বলে। পারছে না। জায়গা নেই। হুল ফোটানোর জায়গা ওদের নাগালের বাইরে। তাই টুপটাপ ঝরে পড়ছে; এক–দুই তিন–চার...। ঝরে যাচ্ছে ধুলোয়। মাধবকুণ্ডের পথে হেঁটে যাওয়ার সময় ও ধুলোর মধ্যে জ্বলতে দেখেছিলো জোনাকি। জোনাকির তো ধুলোয় থাকার কথা নয়? দুপাশে বিশাল পাহাড়। ঘন গাছের সারি। হাজার রকমের পোকার শব্দ মুখরিত করে রাখে এলাকা। সেই অপরূপ সুন্দর বনরাজির মাঝে জোনাকির তো উড়ে বেড়াবার কথা। ও ধুলোর রাস্তায় আলো ছড়িয়ে মানুষের পায়ের নিচে পড়ে থাকবে কেন? কম্থা হলে কি মানুষ মানুষের পায়ের নিচে চলে যায়? মৌমাছির হুলের তীব্রতা নিয়ে ধুলোয় মিশে থাকে? কম্থার কণ্ঠস্বর শ্রুতিযোগ্য হলে লোকটি বুঝতে পারে কম্থার মাথায় মৌমাছির গুঞ্জন তীব্র হয়ে উঠেছে। ওর কণ্ঠস্বর থেকে ধোঁয়া উড়ে গেছে। ওটা এখন অন্ধকারের স্বর, সেই কোন ছোটবেলায় ভগবানের হাত ধরে দেশ ছেড়ে চলে আসি।

ভগবান?

আমাদের ধর্মগুরু আর দেশ শাসক দালাইলামা। তিনি এখন ওই পাহাড়ের চূড়ায় থাকেন।

কি হয়েছিলো?

একদিন চীন আক্রমণ করলো আমার তিব্বত। নিয়ে গেলো নিজেদের দখলে। ভগবান দেশ ছাড়লেন। বললেন, কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের লড়তে হবে। তিনি ভারতে চলে এলেন। আমরাও এলাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু দেশ উদ্ধারের সব চেষ্টা ভেস্তে যায়। দিন গড়ায়। বছর গড়ায়।

কতো বছর হলো।

কুড়ি বছর। এখন বুঝতে পারছি আর দেশে ফেরা হবে না। যেদিকে তাকাই দেখি শূন্য।

শূন্য?

একদম শূন্য। আগে কতো আদর–যত্ন ছিলো। মানুষের সহানুভূতি ছিলো – আস্তে আস্তে সব গেছে। লোকে এখন অবজ্ঞার চোখে দেখে। আমরা করুণার পাত্র হয়ে গেলাম।

কথাগুলো বলতে বলতে নিজের আস্তানার দিকে চলে যায় কম্থা।

অন্ধকারে ওর ছায়া নেই। অন্ধকার ওর নিয়তি হয়ে গেছে কি? লোকটির বুক হিম হয়ে যায়। কম্থাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ও কি বলতে চেয়েছে তা বোঝা হয়ে গেছে লোকটির। ও ওকে কঠিন সত্যের মুখোমুখি করে দিয়েছে। লোকটি দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে – উঠতে পারে না নড়তে পারে না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কি? চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হয়তো মেঘ চাঁদটা ঢেকে রেখেছে। পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় না। কিন্তু তাকানোটা সত্যি। ও জানে পাহাড়টা ওখানে আছে। সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু এই সত্য ও মিথ্যের মধ্যে

দূরত্ব অনেক। এটাকে অতিক্রম করাই ধ্রুব। ওর শরীর কি অসাড় হয়ে যাচ্ছে? নকি বুঝতে পারছে পাহাড়টা ওর মা হয়ে গেছে তার কোলে মাথা রাখার জন্য প্রবল ব্যাকুলতা। বোনটা কি করছে? ভাইটা? বাবা কি ফজরের নামাজটা মসজিদে পড়তে পারে? অবরুদ্ধ শহরে কি ভালো আছে ওরা? চারদিকে শত্রু? না ও বেশি ভাবতে চায় না। বেশি ভাবলে বুকের একটি অংশে এক অদৃশ্য হাত খুবলে নেয়। ও খাণ্ডিত সাহস নিয়ে যুদ্ধ করতে চায় না। যুদ্ধ পরিপূর্ণ সাহস দাবি করে। ও শরীর ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আড়মোড়া ভেঙে দ্রুতপায়ে তাঁবুতে ঢোকে। কম্বলের নিচে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঘুম আসে না। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে বুকের ভেতর যে হিমটুকু জমা হয়েছিলো সেটা বাড়ছে। একসময় সেটা হিমবাহ হবে। ও পানি খায়।

পরদিন কস্থা ওর জুতোয় কালি দিতে দিতে বলে, একদিন গুর্খারা আমাদের জুতোয় কালি দিতো। স্নানের পানি উঠিয়ে দিতো। দোকান থেকে সিগারেট আনার জন্য ছুটে যেতো। এখন আমি ভারতীয় সৈনিকের জুতোয় কালি দেই। এখন তোমারটায় দিচ্ছি। কারণ ভারতীয় ক্যাপ্টেন আমাকে তোমাদের ব্যাটম্যান করেছে। আর আমার তো কাজ করতেই হবে। কাজ না করলে খাবো কি? বেঁচে থাকতে হবে। দেশে ফিরতে হবে। দেশ বলেই ও আনমনা হয়ে যায়। বড় করে ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে নেয়। লোকটি বুঝতে পারে ও কান্না চাপছে। কিন্তু ও কান্না চাপছে কেন? কাঁদুক না। কেঁদে ভাসিয়ে দিক। তখন কস্থার কণ্ঠ আবার ফুটে ওঠে, কতোকাল মাকে দেখি না। মা নিশ্চয় এতোদিন বুড়িয়ে গেছে। বোনটার বোধহয় বিয়ে হয়েছে। ভাইটাকে কি কম্যুনিস্টরা কারখানার কাজে লাগিয়েছে নাকি ওদের চাকর বানিয়েছে? কে জানে।

বাবার কথা আমি ভাবতে চাই না। বাবা কম্যুনিস্ট হতে পারবে না। না পারার জন্য কি ওরা বাবাকে মেরে ফেলেছে? কস্থার চোখ চিকচিক করে। দু'হাতের তালুতে মুখ ঢাকে। লোকটি বলে, তুমি যদি এখন চেঁচিয়ে কাঁদো আমি কিছু মনে করবো না কস্থা।

কস্থা জুতো জোড়া ওর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। লোকটির মনে হয় কস্থা ওর বন্ধু হতে পেরেছে – ওর কাছে এলে বুক খুলে যায়। নিজেকে ধরে রাখতে পারে না।

সেদিন ট্রেনিংয়ের সময় লোকটি খুব উৎফুল্ল থাকে। দু'এক কলি গানও গেয়ে ফেলে। ওর কোনো ভুল হয় না। ক্যাপ্টেন তিয়ারি হেসে জিজ্ঞেস করে, আজ তুমি বেশ ভালো মুডে আছো মনে হয়।

দারুণ স্বপ্ন দেখেছি।

জেগে কিংবা ঘুমিয়ে যেভাবেই থাকো না কেন তোমাদের স্বপ্ন তো একটাই।

হ্যাঁ একটাই। যুদ্ধে জেতা।

লোকটি ক্যাপ্টেন তিয়ারিকে পরের বাক্যটি বলতে দেয় না। কারণ পরের বাক্যটি বলার দায়িত্ব ওর নিজের। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো ক্যাপ্টেনের নয়। ওর কথা শুনে তিয়ারি চেঁচিয়ে বলে, ব্রেভো। তারপর ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। লোকটি অকস্মাৎ কেমন ভয়ার্ত চোখে তিয়ারির দিকে তাকায়। কতোকাল এই লোকটি ওকে সহযোগিতা করবে? কতোকাল? লোকটির মগজের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত একটি সাদা রেখা টানা হয়ে যায়। বুঝতে পারে যুদ্ধে জিততে না পারলে এই লোকটির জুতো সাফ করতে হবে ওকে। উহ্ না!

কি হলো? তিয়ারি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়।

কিছু না। এমনি।

খবরদার মন খারাপ করবে না। একটুও বাড়ির কথা মনে করবে না। অতীত ভুলে যাও। এখন শুধু তোমার চারপাশে একটি ভয়াবহ বর্তমান। তোমার ভালোবাসার বিষয় অস্ত্র। তোমার স্বপ্ন গ্রেনেডের পিন খোলা এবং লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানা। তোমার সাধনা ট্রিগারের দক্ষতা। বুলেট যেন মিস না হয় — ফুটো করে দেয় যেন শত্রুর বুক।

জানি ক্যাপ্টেন।

লোকটি ঠাণ্ডা মাথায় ক্যাপ্টেন তিয়ারির ইন্সপায়ারিং কথা শোনে। ক্যাপ্টেন দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ চোখ নামিয়ে বলে, একবার ভুল হয়ে গেলে সে ভুলের মাশুল হয় ভয়াবহ। তোমরা চেষ্টা করবে আমরা সাহায্য করবো। যুদ্ধ তোমাদেরকেই করতে হবে।

ইয়েস ক্যাপ্টেন।

লোকটির দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠ। তিয়ারি বুটের শব্দ তুলে চলে যায়। মুখ ফেরাতেই কন্থার চোখে চোখ পড়ে লোকটির। অন্য সময়ে তাঁবুর সামনে টুল নিয়ে বসে থাকে ও। বিষণ্ন উদাসীন হয়ে। আজ বসে নেই। ও খানিকটা অস্থির, যেন নিজেকে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। লোকটি মনে মনে ভাবে আজ ওর বন্ধুত্বে কাজ হবে না। আজ কন্থা এই ভুবনের বাইরের মানুষ। পাছে লোকটি কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সেজন্য ও দ্রুত অন্যদিকে চলে যায়, বনের দিকে। লোকটি দূর থেকে দেখে ও হেঁটে যাচ্ছে, গভীর বনের ভেতরে চলে যাচ্ছে। শুকনো পাতায় লাথি দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে নুয়ে পড়া ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ছে – যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধ। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র নেই, শত্রু নেই – জেগে থাকে শুধু তীব্র যন্ত্রণা। ও কতোদূর যাবে? ওকে তো ফিরতে হবে। লোকটি হাতের মেশিনগানের দিকে তাকায় — এই অস্ত্রটি কন্থার যন্ত্রণা গভীর করেছে। নিজের হারানো দেশ, ফেলে আসা প্রিয়জন – দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেলো। ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। তিব্বত পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ অঞ্চল, একটি মালভূমি – একদিকে হিমালয় অন্যদিকে কুইনলাল পর্বত। প্রকৃতির অপার বিস্ময়। ওর স্বপ্নে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কি এখন জেগে উঠেছে? নাকি মালভূমির অধিবাসী হওয়ার ভিন্ন রকম থ্রিল নিয়ে ওর কৈশোরের টানটান দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে? কি ভাবছে আজকের যুবক কন্থা। লোকটির ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলে ওর গাট্টাগোট্টা অবয়বের মধ্যে হয়তো দেখতে পেতো চিত্রিত হয়ে আছে যুদ্ধের ছবি – তীর-ধনুক হাতে বীরদের ফিগার – ঘোড়া-হাতি এবং শত শত উড়ন্ত বর্শা। কি আশ্চর্য, যুদ্ধ এভাবে শারীরিক রূপ পায়, যদি সে যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়। কন্থার চোখের সামনে এখন অন্য দেশের স্বাধীনতার সৈনিক, তাদের জন্য দিনরাত কাজ করতে হচ্ছে ওকে। এই ভিন্ন দেশে কুড়ি বছর কাটিয়ে দেয়া জীবনে কষ্ট ছিলো, শান্ত দিন পার করার স্বস্তি ছিলো, কিন্তু যন্ত্রণার তীব্রতা এমন ঘায়েল করেনি – পীড়া দেয়নি। এখন বুকের ভেতরে হারানো স্বদেশের জন্য জমে থাকা কান্নার দলা আর্তচিৎকার হয়েছে। ক্রীতদাস হয়ে যাবার উপলব্ধি বুলেটের চেয়েও তীব্রভাবে ফুটো করে দিচ্ছে বুক। কেউ নেই যে বুক খুলে দেখানো যায়। অন্য দেশের একজন মুক্তিযোদ্ধার জুতো মোছার গ্লানি যে কি ভয়াবহ। লোকটি মেশিনগানে মাথা ঠেকায়। ভাবে, যদি যুদ্ধে হেরে যাই – যদি ফিরে যেতে না পারি প্রিয় স্বদেশে তাহলে আমার নিয়তি হবে ঐ কন্থার মতো। আর নেতারা হবেন দালাইলামা। নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা সমতলভূমিতে কিংবা জনারণ্যে হারিয়ে যাবে তাঁদের ঠিকানা। না, তা হবে না। লোকটি অস্ত্রাগারে মেশিনগানটি জমা দিয়ে

কম্থাকে খুঁজতে যায়। ওকে ও ওর দেশের সঙ্গে নিজের দেশের বন্ধুত্বের কথা শোনাবে। খুঁজতে খুঁজতে বনের অনেক ভেতরে পাওয়া গেলো ওকে। গাছের নিচে বসে আছে। এমন একটি জায়গা যেখান থেকে দূর পাহাড় পরিষ্কার দেখা যায়। মাঝে গিরিখাদ। অনেক নিচে নদী। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। আশেপাশে কতোরকমের পাখি, কতো রকমের ডাক – ডাক তো নয় যেন প্রাণের কাকলী। লোকটি মুগ্ধ হয়ে যায়, প্রায় নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে বসে, কম্থা?

আমার নাম অমরজ্যোতি। ও না তাকিয়ে বলে, এমন একটা ভাব যেন ও জানতো যে লোকটি আসবে। ওর পাশে বসবে। একটু পর আবার গাঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করে, দেশ নেই বলে সবাই আমার নামও ভুলিয়ে দিয়েছে। ওই ক্যাপ্টেন তিয়ারিরা আমাকে নাম ধরে ডাকে না।

চলো ফিরে যাই।

না।

এখানে কি করবে?

পাখির গান শুনবো। ওরা কতো স্বাধীন।

ঠিক আছে তাহলে এখানে বসে আমি তোমাকে একটি গল্প শোনাই।

গল্প?

তুমি কি জানো আমার দেশ বিক্রমপুরের জ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর তোমার দেশে গিয়েছিলেন?

প্রভু দালাইলামার কাছে আমি অতীশ দীপঙ্করের নাম শুনেছি। বেশি কিছু জানি না।

লোকটি বলতে থাকে, অনেক, অনেক কাল আগের কথা। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাজবংশে তাঁর জন্ম। তিনি যখন রাজার ছেলে তখন নাম ছিলো চন্দ্রগর্ভ। জ্ঞানী মানুষ হওয়ার পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিনি এতো বড় পণ্ডিত হয়েছিলেন যে তখনকার দিনে চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো। তোমার দেশের রাজা তাঁকে তাঁর দরবারে নিতে চান। অতীশ চেতে চান না। রাজা ঘোষণা দেন যে অতীশের দেহের যতো ওজন সেই পরিমাণ সোনা তিনি তাঁকে দেবেন। অতীশ তবুও রাজি না। অনেক পরে যখন সেই রাজা মারা গেলেন তখন তিনি মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে তিব্বতে যান। ভেবে দেখো সেই অষ্টম-নবম শতকের কথা। যানবাহন তেমন ছিলো না। তোমাদের তো পর্বতমালাবেষ্টিত দুর্গম এলাকা, সেসব জায়গায় যাওয়া কতো কঠিন। তিনি গেলেন। যেখানে গেলেন সে জায়গার নাম ঞারি এবং ঞেথাং। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি ঞেথাং বিহারে ছিলেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তুমি কি জানো যে ঞেথাং বিহার কিন্তু রাজধানী লাসা থেকে বেশি দূরে নয়?

জানি। কিন্তু তুমি আমাকে এ গল্প কেন শোনালে?

শোনালাম এজন্য যে আমরা দুজনে একজন জ্ঞানী মানুষের উত্তরাধিকার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমার দেশে। মৃত্যুবরণ করেছেন তোমার দেশে। তাই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট অমরজ্যোতি।

ট্রেনিং শেষ হলে তুমি তো চলে যাবে। আর কি দেখা হবে?

যুদ্ধে শহীদ না হলে হতেও তো পারে।

যুদ্ধে শহীদ? এমন একটি যুদ্ধে শহীদ হতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

কম্থা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, কম্থা হতে চাই না। আমি আমার দেশের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হতে চাই।

লোকটির মনে হয় ও তো অমরজ্যোতির কান্নাই শুনতে চেয়েছিলো। কিন্তু এখন এটা কান্না মনে হচ্ছে না কেন? একজন মানুষ কি বিলাপ করছে? নাকি জাগতিক বোধের ভেতর দিয়ে একটি প্রলয় ঘটে যাচ্ছে – যে প্রলয় মানুষের স্থিতি এবং বিলুপ্তিকে একই সঙ্গে ধারণ করে? বিলাপ থমিয়ে দেয় পাখির কূজন, গাছেদের বেড়ে ওঠা, গিরিখাদের তলদেশে বয়ে যাওয়া জলধির স্রোত পথ হারায় – মানব জমিনের জন্য মানব জীবনের কান্না এমন চৈতন্যরহিত। লোকটি কান দিয়ে শোনে না – এখন কর্ণবধির, ও শোনে হৃদপিণ্ড দিয়ে, যে হৃদপিণ্ডের শব্দটি থেমে গেলে স্তব্ধ হয়ে যায় জীবন। কন্থার বিলাপ এমনই উথাল-পাতাল করা। ভাবতে চেষ্টা করে কতোক্ষণ কাঁদলো অমরজ্যোতি? এক শতাব্দী? নাকি মহাকালের সবটা সময় ধরে? আস্তে আস্তে ফোঁপানি কমে আসে, আস্তে আস্তে পাখির কূজনে প্রাণ ফিরে আসে। অমরজ্যোতির কাঁধে হাত রাখে ও।

চলো ফিরে যাই। তোমাকে খুঁজবে সবাই। ক্যাম্পে তোমার অনেক দায়িত্ব।

অমরজ্যোতি চোখ মুছে উঠে পড়ে। যেতে যেতে বলে, আমার ঘর হবে না, ভালোবাসার মানুষ হবে না।

মিথ্যে ভাবনা, হবে। তুমি চাইলেই হবে।

আমি সন্তান চাই না।

কেন?

বোঝ না কেন? কন্থার বংশধর বাড়াতে চাই না।

লোকটি চুপ করে থাকে। ভাবে, কতো বেলা হলো? গাছগাছালির ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে বেলা টের পাওয়া যায় না। ঘন পত্রগুচ্ছ সূর্যরশ্মি আড়াল করে রাখে। পায়ের নিচে ঘাস, শুকনো পাতা, গুল্ম, স্যাঁতস্যাঁতে মাটি একই তো সবকিছু, তবে ভিন্ন কেন কতিপয় সীমারেখা? মুছে গেলে কন্থার তো কাঁদতে হয় না। ওর যুদ্ধ করতে হয় না। কেউ কি পারবে পৃথিবীর যাবতীয় সীমারেখা মুছে দিয়ে এটাকে একটি দেশ করে দিতে? যার যা ইচ্ছেমাফিক – যেখানে খুশি সেখানে দিনযাপন? কোনো কাঁটাতারের সীমানার এপার-ওপার নয়? নদীগুলোর এক স্রোত? হা হা করে হেসে ওঠে লোকটি। কি অসম্ভব চিন্তা, কি পাগলামি, আরো কতো কি–।

হাসছো যে? পেছন থেকে কন্থার কণ্ঠস্বর।

তুমি নিশ্চয় একজন ভালোবাসার নারী পাবে।

তেমন নারী কি আছে, যে সন্তান চাইবে না?

বোকা, তুমি বোকার মতো ভাবছো। তোমার সন্তানের হারানো স্বদেশের জন্য কান্না থাকবে না। তোমার গল্পের ভেতর থেকে ফিরে পাওয়া এক অদৃশ্য মালভূমির জন্য ওর কষ্ট হবে না। ও যেখানে বড় হবে সেটাই হবে ওর স্বদেশ।

কন্থা দু'পা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। বলে, তোমার কাছ থেকে আমি নতুন কথা শুনতে পাচ্ছি। আমাকে বেঁচে থাকার তৃণখণ্ড ধরিয়ে দিচ্ছো তুমি। তুমি আসলেই আমার বন্ধু।

লোকটি ওকে জড়িয়ে ধরে। ভাবে, ও যা বললো তার পেছনে যুক্তি থাকুক আর না থাকুক, খানিকটুকু শান্তি, খানিকটুকু স্বস্তি তো ও একজন মানুষকে দিতে পেরেছে। ওর বুক হালকা হয়েছে। এই আনন্দে গান গায়। আপন ভাষার গান। কিছুক্ষণ গেয়ে বলে, এবার তুমি একটা গান গাও অমরজ্যোতি।

আমি গান জানি না। কোনোদিন শিখিনি।

মিথ্যে কথা। তুমি কিছু না কিছু জানো। তোমার বুকে সুর আছে।

নেই।

হতেই পারে না। তাহলে শুধু সুর করে শব্দ করো। মনে করো তোমার মা তোমাকে ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনাতেন। মনে করো বন্ধুদের সঙ্গে খেলা শেষ করে তোমরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতে।

ঠিক বলেছো, মনে পড়ছে।

কম্থা তার বেসুরো হেঁড়ে গলায় গান গাইলো। লোকটি কিছু বুঝলো না। ওর ভাষা তো ও বুঝতে চায়নি। চেয়েছে সুর শুনতে। গান গেয়ে, চোখ মুছে কম্থা বলে, কতো কাল পর তুমি আমার বুকের ভেতরটা জাগিয়ে দিয়েছো বন্ধু।

দু'জনে হাত ধরে ক্যাম্পে ফিরে।

মাসখানেকের মধ্যে ট্রেনিং শেষ হয়ে যায়। এবার ফেরার পালা। দু'দিন ধরে কম্থার খুব মন খারাপ। লোকটি বুঝতে পারে কম্থা ওর কাছ থেকে সরে সরে থাকে। এর মধ্যে দু'জনের ভীষণ বন্ধুত্ব হয়েছে। ক্যাম্পের কড়া নিয়ম-কানুনের ফাঁকে, ট্রেনিংয়ের অবসরে কতো সুখ-দুঃখের কথা হয়েছে – কতো রাত বাইরে বসে কাটিয়েছে দু'জনে। চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে গেছে দূর পাহাড়ের ওপর ভেসে বেড়ানো মেঘ। ও বলেছে, দেশ স্বাধীন হলে আমি তোমাদের দেশে বেড়াতে যাবো।

নিশ্চয় যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। আমার বাড়িতে থাকবে। বাবা-মা তোমাকে দেখে ভীষণ খুশি হবে।

কেবল বেড়ানো নয়। আমি কাজও করবো। আমি তো জানি শত্রুরা দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। দেশটাকে গড়তে কতো হাজার রকমের কাজ পড়বে ঘাড়ে। একা সামলাতে পারবে না।

ঠিক।

ও হাসতে হাসতে বলে, আমার মতো শক্ত সমর্থ মানুষ দরকার। দেখবে একটা ব্রিজ আমি একাই ঠিক করে ফেলতে পারবো।

কম্থার ক্ষুদে চোখ। চোখের মণি ভেসে থাকতে দেখা যায় না। তবু লোকটির মনে হয় কম্থার চোখ দু'টো দেরাদুনের পাহাড়। সে চোখে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায় স্বপ্ন। আশ্চর্য স্বপ্ন। নিজের দেশের জন্য নয় বন্ধুর জন্য বুকের ভেতর কট করে ওঠে লোকটির। কম্থার সঙ্গে আর কোনোদিন কি দেখা হবে?

কি ভাবছো?

ভাবছি তোমাকে কোন ব্রিজটা সারাতে দেবো আমরা। বলেই লোকটি হা-হা করে হেসে ওঠে।

কম্থা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, হেসো না। মনে রেখো আমি একাই একটা ব্রিজ ঠিক করে দিতে পারবো।

খবর পেয়েছি পাকিস্তান আর্মি হার্ডিঞ্জ ব্রিজের খানিকটা অংশ উড়িয়ে দিয়েছে। তোমাকে সেটাই ঠিক করতে দেয়া হবে।

ও আবারও গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তাই দিও। এবার আর হাসতে পারে না লোকটি। বুঝতে পারে কম্থা তামাশা করার জন্য কিছু বলেনি। যেটা বলেছে সেটা ওর মনেরই কথা। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ও আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে রেখো একটি ব্রিজের দায়িত্ব আমার।

যাবার দিন টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত গোছগাছ নিয়ে। ওদের তাঁবুতে একটি নতুন ছেলে কাজ করছে। লোকটি অবাক হয়। ওকে জিজ্ঞেস করে, কম্থা কোথায়? ও বললো, জানি না। গাড়ি ছাড়ার সময় পর্যন্ত কম্থা এলো না। এখানকার লোকদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা শেষ। লোকটি চোখের পানি রাখতে পারছে না। রুমাল দিয়ে বারবার চোখ মোছে। ক্যাপ্টেন তিয়ারি ঘাড়ে হাত রেখে হাসতে হাসতে বলে, এতো অস্ত্র চালনা শিখলে তাও মন শক্ত করতে শিখলে না। বাঙাল মুলুকের লোকেরা আসলেই বেশি নরম।

অমরজ্যোতি কোথায় ক্যাপ্টেন?

ক্যাপ্টেন তিয়ারি ভুরু কুঁচকে তাকায়, অমরজ্যোতি?

ইয়ে মানে ঐ ছেলেটি, যে আমাদের তাঁবুতে কাজ করতো।

ওর নাম অমরজ্যোতি নাকি? ওতো কাউকে নাম বলে না। ভেরি গুড। তোমাকে নামটা বলেছে। আমরাও ওর নাম নিয়ে বদার করি না।

ও কোথায়? দেখছি না?

কম্থা তো দু'দিনের ছুটি নিয়ে কাল রাতে শহরে গেছে।

লোকটি আর একটিও কথা না বলে ক্যাপ্টেন তিয়ারির কাছ থেকে বিদায় নেয়। গাড়ি বনের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দু'পাশে গাছের ঘন মাথা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। কতো হাজার রকমের পাখির যে কূজন। লোকটির কানে সব কম্থার কণ্ঠ হয়ে যায়, যেন বলছে, যুদ্ধে কোনো অলসতা করবে না, কোনো ঢিলেমিও না। তাহলে ফিরতে পারবে না মায়ের কাছে। দেখবে না বাবার মুখ। ভুলে যাবে ছোট ভাইবোনের চেহারা কেমন ছিলো। আর দেশে ফিরতে না পারলে এই কম্থার মতো ভারতীয় সেনাদের জুতা সাফ করতে হবে। মনে রেখো কঠিন সময়, বন্ধু মনে রেখো।

লোকটির মনে পড়ে অসংখ্যবার কম্থা ওকে এমন করেই সাবধান করেছে। সাবধান করতে কসুর করেনি। আর শেষবার যাতে বলতে না হয় সেজন্য ওর সামনে থেকে পালিয়ে গেছে। আর কি দেখা হবে? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। গাড়ির ঝাঁকুনিতে লোকটি সোজা হয়ে বসে। আবার চোখ ভিজে ওঠে। গাড়িতে ওঠার পর ক্যাপ্টেন তিয়ারি ওদের সবাইকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে, মনে রেখো যুদ্ধ তোমাদেরকেই করতে হবে।

এতো কিছু ভাবনার মাঝেও কতোটা পথ এসেছে ও জানে না। ও পথের হিসেব রাখে না। ও কম্থার কথাগুলো ছড়িয়ে দেবার জন্য হেঁটে যায়। হাঁটতে থাকে। ক্যাপ্টেন তিয়ারির কথা মনে পড়তেই ও থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে দিগন্ত জুড়ে তিয়ারির কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যেদিকে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বলে কোনো কথা নেই। যতোদূর চোখ যায় সব সমান। আশেপাশে কেউ নেই। ও চেঁচিয়ে নিজেকেই বলে, হ্যাঁ যুদ্ধ তো আমাদেরকেই করতে হবে।

ও আর সামনে যায় না। চন্দ্রদ্বীপ গ্রামের পথে নেমে যায়। এই গাঁয়ের মকবুল মিয়ার বাড়িতে একজন আহত মুক্তিযোদ্ধা আছে। তার খোঁজ নিতে হবে। সে বাড়িতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেলো। ও জানে বুড়ো-বুড়ি ঘরের বারান্দায় বসে থেকে পথের দিকে খেয়াল রাখে। ওদের দুই ছেলে রজব আর তরফ যুদ্ধে যাবার আগে বলে গেছে, কোনো মুক্তিযোদ্ধার লাশ পথেঘাটে পড়ে থাকলে বাড়িতে এনে কবর দেবেন। আপনারা বেঁচে থাকতে যেন কোনো যোদ্ধার লাশ শেয়াল-কুকুরের মুখে না ওঠে।

বুড়ো-বুড়ি হাঁ করে তাকিয়েছিলো ছেলেদের মুখের দিকে। দ্বিধা ওদের মুখের কুঁচকে

যাওয়া চামড়ার ফাঁকে লেপ্টে থাকে। বলে, আমরা কি পারবো?

কেন পারবেন না। পারতে হবে। আর শোনেন, যখন যে আসবে তাদের আশ্রয় দেবেন। দরকার হলে আমরা ওদের আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বলবো।

বুড়ো উৎসাহের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ বলবি। আমাদের বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে কাছে। খানিকটা পথ এগুলো নারকেল-সুপারি-জাম-জামরুল-আম-কাঁঠালের বাগান। এদিকে তেমন কেউ আসে না।

আব্বা, যুদ্ধের সময় এমন জায়গাই দরকার হয় যোদ্ধাদের । যেখানে লুকিয়ে থাকা যায়, যেখান থেকে ধাম করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

ছেলেরা বাবা-মাকে সালাম করে চলে গেছে। তারপর তো গ্রামের ক্যাম্পে একজন মুক্তিযোদ্ধার পায়ে গুলি লাগলে ছেলেরা রাতের আঁধারে ওকে এখানে রেখে গেছে। ও কেমন আছে? বেঁচে আছে তো? লোকটি বুড়োর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বারান্দায় বুড়ো একা। বসে জাল বুনছে। পায়ের শব্দে চমকে তাকায়। লোকটি অস্ফুট স্বরে বলে, চাচা আমি।

বুড়ো আস্তে করে বলে, ধুধুচর?

না, সাতকান্দি।

বেঁচে আছে। কিন্তু বড় কষ্ট।

দেখেই চলে যাবো।

না, বোস। তোমাকে থাকতে হবে। একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেবো।

লোকটি পা গুটিয়ে বসে। বুড়ো জালের সুতো গুছিয়ে রাখে। লোকটি জানে বুড়ো একজন পেনিলোপি। প্রতিদিন যেটুকু বানায়, পরদিন সেটুকু আবার খোলে। এটা তার প্রতীক্ষা। বলা যায় অপেক্ষার খেলা। কোন কোন ঘাঁটিতে যুদ্ধ হচ্ছে সেটা সে জানে। নতুন কাউকে দেখলে সেভাবেই প্রশ্ন করে। এসব কিছুই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের শিখিয়েছে।

আপনি কি জানতেন আমি আসবো?

জানতাম। যখনই আমার সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হয় তখনই একজন না একজন যোদ্ধা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য চলে আসে।

কেন এমন হয়?

জানি না। সবই আল্লার ইচ্ছা। চলো, ভেতরে যাই।

লোকটি পেনিলোপি বুড়োর সঙ্গে ঘরে ঢোকে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চমকে ওঠে ও। অস্ফুট গোঙানির শব্দ ভেসে আসে। ও বুড়োর কাঁধ খামচে ধরে বলে, কি হয়েছে ওর?

পায়ে পচন ধরেছে।

বুড়ো ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলে।

আজ কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

দু'দিন ধরে ও বলছে পা'টা কেটে ফেলতে।

ওহ্ না। লোকটি আর্তনাদ করে।

তাহলে কি তুমি চাও যে ওর পুরো শরীরটা পচে যাক? লোকটি চুপ করে থাকে। পেনিলোপি বুড়োর খ্যাঁকানি শুনে ওর নতুন করে ভাবনা হয়। পা কেটে ফেললে পচন বাড়বে না। ছেলেটি বেঁচে যাবে। তখন ও অনুচ্চ স্বরে বলে, একজন ডাক্তার তো দেখাতে পারতেন।

এ গাঁয়ের ডাক্তারটা রাজাকার। লুকিয়ে গাঁয়ের কবরেজকে এনেছিলাম। ও ব্যাটা কি

লতাপাতার ওষুধ দেয়, কাজ হয় না। ওর পায়ে পোকা হয়েছে।

লোকটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটি বিছানায় ছটফট করছে।

বুড়ি হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে। লোকটিকে দেখে কেঁদে ফেলে, কতোদিন পরে এলি। কোথায় ছিলিরে?

কে এসেছে নানী?

লোকটি চৌকির পাশে এসে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে, কেমন আছিস মাখন?

আমার পা'টা কেটে ফেলো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বুড়ি নিঃশব্দে কাঁদে, এমন করে কোনো মানুষকে তো আমি আগলে রাখিনি কোনোদিন। তোরা একটা কিছু কর। এক সপ্তাহ ধরে বুড়ো আর বাজারে যেতে পারে না। বরিক পাউডারও কিনে আনতে পারে না। লোকে সন্দেহ করে। বলে, বুড়ো তোর ঘরে কে ব্যারামে পড়লো। এতোকাল তো আমার কথা বলেছে। এখন ওরা বলে, বুড়ির কি হয়েছে, ব্যারাম সারে না কেন? রাজাকার ডাক্তারটা বলেছে, আমাকে দেখতে আসবে। দু'দিন ধরে ছেলেটার ঘা বরিক পাউডার দিয়ে ধুয়েও দিতে পারি না। এ আমি দেখতে পারি না রে। আমার যে কেন মরণ হয় না।

বুড়ির ক্যাবল প্যাচর প্যাচর। ওঠো, সরো এখান থেকে। বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে।

ওকে বাতাস করবে কে? ঘামে যে গা ভিজে যায়।

লোকটি বুড়ির হাত থেকে পাখা নেয়, আমি বাতাস করবো নানী।

বুড়ি চোখ মুছে উঠে যায়। বুড়ো তার জায়গা দখল করে। লোকটির মনে হয় বুড়োকে আজ বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তার পর কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারার দৃঢ়তা বুড়োর চেহারায়। লোকটিকে পেয়ে সে আরো শক্ত হয়েছে।

বুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে চুলো জ্বালায়। চা বানিয়ে আনে। সঙ্গে মুড়ি। ফিরে গিয়ে এক হাঁড়ি গরম পানি বসায়, সঙ্গে নিমপাতা। কড়া জ্বালে সিদ্ধ হতে থাকবে পাতাগুলো। বুড়ি আজ রাতে বড় অস্থির। ছেলে দুটো যেদিন যুদ্ধ করতে গেলো সেদিনও এমন অস্থির লাগেনি। ও জানে গতকাল বুড়ো বাজার থেকে ধারালো কুড়োল কিনে এনেছে। রাতে ছেলেটির পা কাটা হবে। কবরেজ বলেছে, কেটেই ফেলতে হবে। বুড়ি সারাদিন কবরেজের দিয়ে যাওয়া লতাপাতা বেটেছে। পা কাটার পর সেটা লাগিয়ে বেঁধে দিতে হবে। গতকাল বুড়ি তার একটি পুরনো শাড়ি সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে রেখেছে। বুড়ির মনে হয় সব আয়োজন সম্পন্ন। ও কেমন করে এই যোদ্ধা ছেলেটির চিৎকার শুনবে? ও তো জীবনে কখনো এমন ঘটনা দেখেনি, ও জানে না কিভাবে এমন ঘটনা দেখতে হয়। ছেলেটি চিৎকার করছে, নানী, নানী কৈ?

বুড়ি চুলোয় দুটো ঘুঁটে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে ওর ঘরে যায়, কি রে মানিক? ডাকছিস কেন?

আপনি আমার পাশে বসেন। আপনি না থাকলে আমার ভয় করে।

আহা রে সোনা আমার।

বুড়ি লোকটির হাত থেকে পাখা নিয়ে বাতাস করে। আঁচল দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দেয়। ওর মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কবে যে বড় হয়ে গেলো। বুড়ি আঙুল দিয়ে চুলের জট ছাড়ায়। ছেলেটি বুড়ির হাত ধরে বলে, নানী আমার পায়ের ফেলে দেয়া অংশটা আপনি নিজের হাতে মাটিতে পুঁতে ফেলবেন। আমার মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম। আপনি তখন বারবার আমার

মায়ের নাম বলতে থাকবেন। যেন মা বিষম খায়, তখন যেন বলে, মাখন বুঝি কোথাও বসে আমাকে ডাকছে।

মাখনের কণ্ঠ ঘরের ভেতর উড়ে বেড়ায়। বুড়ি প্রাণপণ চেষ্টায় কান্নার দলা গলার কাছে ধরে রাখে। বুড়ো মুখ নিচু করে রেখেছে। এতোক্ষণে তাকে যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তখন লোকটি বলে, আমি সবাইকে একটি গল্প বলবো।

গল্প? তিনজনের অস্ফুট কণ্ঠ।

হ্যাঁ, একজন কন্থার গল্প।

গল্প শুরু হয়, গল্প শেষ হয়। স্তব্ধ হয়ে থাকে ঘরের গুমোট বাতাস। চুলোয় ঘুঁটের আগুন নিভে গেছে। নিমপাতা সেদ্ধ হয়েছে। বুড়ি এখন ধারালো কুড়োলটি নিয়ে এসে লোকটির হাতে দেবে। কাজটি একজন জোয়ান ছেলে করবে বলেই তো বুড়ো তিন দিন ধরে অপেক্ষা করেছে। তখন মাখন বলে, আমারও একটি গল্প আছে। কন্থা না হওয়ার গল্প।

বাকিরা নড়েচড়ে বসে। আবার কি বলবে ছেলেটি? এই সাহসী ছেলেটি সম্পূর্ণ পচে যাওয়ার আগে নিজেই পা'টি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারছে না বলে কান্নাকাটি করেছে। কবরেজকে বলেছে, যে কবরেজ একজন যোদ্ধাকে সারিয়ে তুলে যুদ্ধে পাঠাতে পারে না তার কবরেজি করা ঠিক নয়। ও বুড়োকে বলেছে, নানা আমি শুয়ে শুয়ে নানীকে পাহারা দেই, আপনি যুদ্ধে যান না কেন?

তোর সঙ্গেই যাবো রে নাতী। তুই ভালো হয়ে নে। মরদ পোলা এতো শুয়ে থাকলে কি হয়?

হয়তো না। ইচ্ছে করে নিজের পা'টা নিজেই উড়িয়ে দেই। দেন না একটা পিস্তল এনে।

বলেই নিজে হা-হা করে হাসতো। পরক্ষণে বিবর্ণ হয়ে যেতো ওর মুখ। ও এখন একটি গল্প বলবে। তিনজনে ঘন হয়ে ওর কাছে এসে বসে। মাখনের কণ্ঠে অসুস্থতার ক্লান্তি। লোকটির ডান হাত নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, আজ রাতে পা কাটা হয়ে গেলে আমি ভালো হয়ে যাবো। কিন্তু আমিতো আর যুদ্ধে ফিরে যেতে পারবো না। তোমরা আমাকে ভিক্ষার ছলে রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখবে। বুকে মাইন বেঁধে দেবে। বড় সড়ক দিয়ে যখন সৈন্য ভর্তি লরিগুলো যাবে তখন সুযোগ বুঝে আমি লরির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ওহ্ কি আনন্দ। প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাবে মাইন। উড়ে যাবে লরি। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সৈন্যগুলো। কি দেবে তো?

লোকটি চুপ করে থাকে।

নানা আপনি কি বলেন?

পেনিলোপি বুড়ো চুপ করে থাকে।

কি হলো নানা?

আমারও একটি গল্প মনে পড়েছে নাতী।

বলেন।

জেয়ানকালে মাছ ধরতে আমার খুব ভালো লাগতো। মাঝে মাঝে খ্যাপে মাছ না উঠলে উদবিড়াল ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরতাম।

উদ্‌বিড়াল?

তোরা তো জানিস না উদবিড়াল পানিতে থাকে। মাছ খায়। আমরা নদীতে জাল পেতে পানিতে উদবিড়াল ছেড়ে দিতাম। উদবিড়ালগুলো চারদিক থেকে মাছ তাড়া করতো আর

মাছগুলো ভয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জালের ভেতর ঢুকে যেতো। আমরা মহা আনন্দে জাল টেনে তুলতাম।

মাখন হা-হা করে হেসে ওঠে, বাঁচার আশায় একদম মৃত্যুর গুহায় ঢুকে যেতো ওরা। কিন্তু নানা আমি উদ্‌বিড়াল নেবো না। আমি নিজের হাতেই সাফ করবো। শত্রুকে নিজের হাতেই মারতে চাই। বুঝলেন?

আমি এমন গল্প শুনতে চাই না। বুড়ি ফোঁস করে শব্দ করলে ও লোকটির হাত ছেড়ে দিয়ে বুড়ির হাত ধরে, আপনি কাঁদবেন না নানী।

আমিও তোর মতো বুকে মাইন বেঁধে—

মাথা খারাপ, তাহলে আমাদের যত্ন করবে কে? এমন সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে কে?

বুড়ি চোখ মুছে উঠে যায়। মাখন আবার লোকটির হাত ধরে। বলে, তুমি তো বললে না তুমি আমার জন্য একটি মাইন আনবে কিনা? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে তো তোমার এতো দেরি হওয়ার কথা নয়? একটু আগে তুমি একজন কন্থার গল্প বললে?

লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক আছে আমি তোর জন্য একটি মাইন নিয়ে আসবো।

মনে আছে গুলি খাওয়ার পর তুমিই আমাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছিলে? বলেছিলে ভয় পাস না। যুদ্ধে এমন হয়।

তুই কি বলেছিলি সেটা আমার মনে আছে।

বলো দেখি কি বলেছিলাম?

বলেছিলি আমার মা যেন খবরটা জানতে না পারে।

হ্যাঁ। গুলি খাওয়ার পর মার কথাই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছিলো। তুমি তো জানো আমার মায়ের নাম মনোয়ারা বেগম।

কেন মনে করাচ্ছিস বারবার?

আর বলবো না।

তোমাকে আর একজনের নাম বলেছিলাম।

যাকে তুই ভালবাসিস।

নামটা মনে আছে?

বেণু।

হ্যাঁ বেণু, বেণু। আমরা দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসি।

আমি জানি।

তুমি জানো? কি করে জানো?

তোর মুখ দেখে মনে হয়েছে।

তুমি কি জানো বেণু কোথায় আছে?

লোকটি চুপ করে থাকে। মাখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা, যদি আমি মরে না যাই। দেশ স্বাধীন হলে বেণু কি এই ল্যাংড়া মাখনকে আর ভালোবাসবে?

ল্যাংড়া? বলছিস কি তুই? তুই কখনোই ল্যাংড়া নস। তুই আহত মুক্তিযোদ্ধা। তুই স্বাধীনতার জন্য তোর পা দিয়েছিস।

সত্যি বলছো? বেণু আমাকে অবহেলা করবে না? ওর জীবনের বোঝা মনে করবে না?

আমি সত্যি বলছি মাখন। তুই দেখিস এ দেশের নারীরা স্বাধীনতার শত্রুদের ঘৃণা করবে। ভালোবাসবে মুক্তিযোদ্ধাদের।

মাখন লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে, তুমি আমাকে বাঁচার স্বাদ দিচ্ছো। বেঁচে থাকলে বেণুকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধবো। তুমি কিন্তু বেড়াতে আসবে আমার বাড়িতে।

শুধু বেড়াতে যাবো না। তোর প্রথম ছেলে বা মেয়ের নামটি আমি রেখে দেবো।

মাখন লাজুক হাসে।

মনে থাকবে তো তখন আমার কথা?

এই মুহূর্তে তুমি আমার সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছো। তোমার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

লোকটি দেখতে পায় মাখনের চোখে অপরূপ আলো – স্নিগ্ধ, মায়াময়। একটুপর যে পা'টা কেটে ফেলা হবে তার ওপর হাত বুলোচ্ছে। লোকটির দিকে আর তাকাচ্ছে না। যেন ওর সব পাওয়া হয়ে গেছে। লোকটি তখন ওকে বলে, তুই সুস্থ হয়ে গেলে আমি তোকে তারামনের কাছে নিয়ে যাবো। ও ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে যুদ্ধ করছে।

মাখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, ব্রহ্মপুত্রের পাড়েই তো আমার বেণু আছে। তারামন বেণুর বন্ধু। ওকে আমি চিনি।

তুমি বেনুকে নিয়ে আসতে পারো? আমরা দু'জনে একসঙ্গে যুদ্ধ করবো। কথাটা শেষ করতে না করতেই ও আর্তনাদ করে ওঠে, ওহ্ মাগো। লোকটি ওকে জড়িয়ে ধরে, আর কিছুক্ষণ সহ্য কর।

অনেকক্ষণ আগে বুড়ো উঠে গেছে। ঘরের কোণ থেকে কুড়োলটা নিয়ে গেছে। ও নিমপাতা সেদ্ধ পানি দিয়ে কুড়োলটা ধুয়ে পরিষ্কার ন্যাকড়ায় মুছে ফেলে। ঘরের কোণে এক টুকরো নতুন কাঠ রাখা আছে। ওটার উপর মাখনের পা রাখা হবে। তারপর কুড়োলের কোপে সেটা কেটে ফেলা হবে। মাখন লোকটির হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, তুমি যাও। দেখো ওরা কি করছে। রাত বাড়ছে।

লোকটি রান্নাঘরে ঢোকে। বুড়োর কুড়োল পরিষ্কার করা শেষ হয়েছে। বুড়ি ওর পুরনো শাড়িটা ছিঁড়ে টুকরো বানাচ্ছে। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, যেন এতো বড় শোক সামলানো তার পক্ষে কঠিন। ওকে দেখে ছটফটিয়ে উঠে বলে, হ্যাঁরে, ও যে গল্পটি বললো–

ওটা গল্প না নানী।

মাইন ফেটে গেলে—

ওটা গল্প না নানী।

বুড়ি অসহিষ্ণু কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, ও কি বাঁচবে?

বুকে মাইন নিয়ে গাড়ির তলায় গড়িয়ে গেলে কেউ বাঁচে না নানী।

ওহ্, মাগো–।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠলে বুড়ো হাতের কুড়োলটা তার মুখের সামনে উঁচিয়ে ধরে বলে, চুপ। একটা কথাও না। এখন যুদ্ধ। চারদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলছে।

আমার বাড়িটা কি তাহলে যুদ্ধক্ষেত্র?

লোকটি অকস্মাৎ আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ যুদ্ধক্ষেত্র। মনে নেই বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা?

প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

বুড়ি নিচু কণ্ঠে বলে, মনে আছে। আমার ছেলে দুটো বক্তৃতাটা মুখস্ত করে ফেলেছিলো। কতোবার যে আমাদের শুনিয়েছে।

পেনিলোপি বুড়ো ভীত কণ্ঠে বলে, দূর্গ? আমরা তো দূর্গই গড়েছি। সে লোকটির চোখের দিকে তাকালে লোকটি দেখতে পায় তার ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টি, ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর, আমার একটি কথার জবাব দে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বসে কি করছে?

তিনি তো বন্দী। শুনেছি তাঁকে দেখিয়ে তাঁর কবর খোঁড়া হয়।

তিনি যদি মত বদলান? যদি তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেয় ওরা? যদি পূর্ব পাকিস্তানকে কব্জা করে ফেলতে পারে তাহলে তো আমরা কস্থাই হয়ে যাবো।

অসম্ভব। অসম্ভব। এটা হতে পারে না। ইয়াহিয়া বলেছেন, দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড।

পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকানোর জন্য যদি ওরা কৌশল বদলায়? তিনি যদি রাজি হন তাহলে আমরা কস্থা হয়ে যাবো।

বুড়ো হাতের কুড়োল দিয়ে ফেলে রাখা কাঠের ওপর আঘাত করে। লোকটি বুড়োর গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, তিনি রাজি হলে আগেই হতেন। তিনি তাঁর দেশের মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করবেন না।

অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায় বুড়োর কণ্ঠ। জোরে জোরেই বলে, আমি জানি তিনি জীবন দেবেন তবু আমাদের কস্থা বানাবেন না। বঙ্গবন্ধু একজনই হয়।

লোকটি সায় দেয়, হ্যাঁ, একজনই হয়।

বুড়ি সোজা হয়ে বসে। বলে, মাখন বসে আছে। চলো ওর কাছে যাই। ও আমাকে না দেখলে অস্থির হয়ে ওঠে।

সবাই মিলে আবার ফিরে আসে আহত যোদ্ধার সামনে। লোকটির মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের ছোট ছোট জায়গা থাকে – সেটা কখনো রান্নাঘর কখনো শোবার ঘর – ছোট কুঠুরি, উঠোন কিংবা বারান্দা অথবা বড় সড়ক। যে সড়ক ধরে চলে যায় সৈন্য বোঝাই লরি কিংবা কনভয়। ওরা ঘরে ফিরে আসতেই ছেলেটি বলে, নানা দেরি করছেন কেন?

মকবুল কথার উত্তর দেয় না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে মাখনের হাত ধরে। হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে বসে। বলে, আমার কথাটি মনে রেখো কিন্তু। পঙ্গু জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক প্রিয় আমার কাছে। যুদ্ধ তো আমাদেরকেই করতে হবে। আমি জানি আমি জ্ঞান হারানোর পরই তুমি চলে যাবে। আবার কবে আসবে বলো?

পেনিলোপি বুড়ো যে কাঠের ওপর মাখনের পা বসানো হবে সে কাঠটি দড়ি দিয়ে বাঁধছিলো। মাখনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আমি দশটা জাল বুনবো এবং খুলবো। এর মধ্যে তোমাকে আসতে হবে।

বুড়িও যোগ করে, আমার নাতির পা শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে।

লোকটি নিজেকেই বলে, দিন দিন যুদ্ধ বাড়বে। পরিস্থিতি খারাপ হবে। এর মধ্যেও বুকের ভেতর মাইন নিয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে আসছো। পরিস্থিতি খারাপ হলে ওদের চলাচল বেশি হবে। চলাচল বেশি হলে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না?

আমি জানি। এসো।

লোকটি ওকে কোলে করে নিয়ে এসে কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ডান পা'টা কাঠের ওপর লম্বা করে রেখে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় মকবুল। মাখন হাতলঅলা চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রাখে ঘাড় হেলিয়ে দেয় চেয়ারের পেছনে। বুড়ি ওর মাথা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। নিজের মাথা নামিয়ে এনে ওর কপালে ঘঁষে দেয়। ছেলেটি চোখ বন্ধ করে। মকবুল গামছা দিয়ে শক্ত করে ওর মুখ বাঁধে, যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলে সে শব্দ বাইরে না যায়। এমনকি উঠোনেও না, উঠোনের সুপারির পাতাগুলো যেন সে সঙ্গে কেঁপে না ওঠে। বুড়ির শরীর হিম হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারছে ওর শরীরে ছেলেটির জন্য আর কোনো উত্তাপ নেই, যতোক্ষণ পর্যন্ত না এই পুরো কর্মটি শেষ হচ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবেই থেকে যাবে।

মকবুল এবার চেয়ারের হাতলের সঙ্গে মাখনের দু'হাত দু'টি গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধে, তারপর বুড়িব শাড়ি দিয়ে ওর বুক পিঠ চেয়ারের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলে। লোকটি কুঠার নিয়ে তৈরি। বুড়ির হাত দু'টো ছেলেটির চোখ ঢেকে রেখেছে। ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। লোকটি কুঠার নিয়ে পায়ের কাছে এগিয়ে আসছে। যেখানে কাটতে হবে সে জায়গাটায় লাল সুতো বেঁধে চিহ্ন দেয়া হয়েছে। বুড়ো চেয়ারের পাশে বসে ওর বাম পা'টা জড়িয়ে ধরে ওর কোলে মুখ গুঁজে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কুঠারটা প্রবল বেগে উত্থিত হয়ে পায়ের হাড়ের ওপর পতিত হয়। একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। দ্বিতীয়বার আঘাত করতে হয়। কাঠের নিচে গামলা পাতা ছিলো। রক্তস্রোত সেখানে গিয়ে নিপতিত হতে থাকে। মাখনের মুখে কোনো শব্দ নেই। বুড়ি বুঝতে পারে ও জ্ঞান হারিয়েছে। বুড়ো দ্রুতহাতে লতাপাতা বাটা লাগিয়ে দিয়ে শাড়ির টুকরো দিয়ে বাঁধে প্রচণ্ড মমতায়, প্রবল চোখের জলে। লোকটি কুঠারটি ধোবার জন্য বাইরে আসে। দেখতে পায় উঠোনে জ্যোৎস্না। এমন জ্যোৎস্না রাতে সেই কন্যাটি ঘুমুতে পারতো না। বলতো, দেশে থাকতে এমন জ্যোৎস্না রাতে আমরা ছোটরা কানামাছি খেলতাম। আমাদের মায়েরা মুড়ি ভাজতেন। ভরা পূর্ণিমায় মুড়িভাজা উৎসব ছিলো। তোমাদের দেশে কি জ্যোৎস্না রাতে -

হ্যাঁ, আমার দেশে জ্যোৎস্না রাতে আমরা উঠোনে গোল হয়ে বসে রূপকথা শুনতাম। কেউ কেউ পুঁথি পড়তেন। কি সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে সেইসব পড়া। এখনো আমার মনে আছে। আমি তোমাকে গেয়ে শোনাই?

না, গেয়ো না। আমার মন খারাপ হবে।

লোকটি কুঠার নিয়ে পুকুরে যায়। ঘাটে বসে ওটাকে ধুয়ে ফেলে। ফিরে আসতে আসতে ভাবে মাখনের জ্ঞান ফিরলে ওকে বলতে হবে সে রাতে আকাশে অদ্ভুত জ্যোৎস্না ছিলো, যেন আকাশের পরীরা নেমে এসেছিলো দেখতে। ওরা অলৌকিক ভাষায় প্রার্থনা করেছিলো তোমার জন্য। আর যেদিন তুমি বুকে সাহস বেঁধে কনভয় উড়িয়ে দেবে সেদিন আকাশের সব নক্ষত্র তোমার জন্য বিজয় সঙ্গীত গাইবে। দেখবে আলোক রশ্মির বর্ষণে ধুয়ে গেছে তোমার শরীরের রক্ত। তুমি আসলে একজন দেবদূত আমার সহযোদ্ধা মাখন।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটি দেখতে পায় বুড়ো-বুড়ি দুজনে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। ওর শরীর চমৎকার একটি নকশিকাঁথায় ঢাকা। ওর জ্ঞানহীন মুখটা স্নিগ্ধ, যেন পৃথিবীর সব হলাহল শরীর থেকে বের করে দিয়ে ও এখন অমৃতের সন্তান। বুড়ো-বুড়ি নানা কাজে ব্যস্ত। ঘর পরিষ্কার করছে। এটা-ওটা গুছিয়ে রাখছে। বুড়ি রান্নাঘরে। দুপুরের ভাত-তরকারি ছিলো। সেগুলো সানকিভরে বেড়ে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে খাবার আয়োজন করছে।

যেন ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এখন ওদের সময় হয়েছে বিশ্রাম নেবার।

ভাত খেয়ে বারান্দার মাদুরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে লোকটি। বুড়ি মাখনের চৌকির কাছে বিছানা করে শুয়ে আছে। মকবুল দরজার কাছে বসে আছে। বলছে, ঘুম আসছে না। সারারাত জেগে থাকবো। কাল আমি জাল বুনবো না। ওই কাজে মন বসাতে পারবো না। কাল আমার পাহারার কাজ।

শেষ রাতে ফজরের আজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বাড়ি থেকে বেরুনোর প্রস্তুতি নেয়। বুড়ো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। ছেলেটির শিয়রে একটি প্রদীপ, নিভু নিভু। ও একই ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে আছে। ওর জ্ঞান ফেরেনি। লোকটি ওর কপালে চুমু দেয়। বুড়ি ঘুমে নিঃসাড়। বুড়োর পায়ে হাত রেখে সালাম করার সঙ্গে সঙ্গে মকবুল যে ভঙ্গিতে ছিলো সে ভঙ্গিতে থেকেই বলে, মনে রেখো দশটা জাল বুনবো আর খুলবো।

লোকটি কথা না বলে নেমে আসে। ওর মাথায় টুপি। গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি। গাঢ় নীল রঙের লুঙ্গি। ও দ্রুতবেগে হেঁটে যাচ্ছে। আকাশে সূর্য ওঠেনি। ফ্যাকাশে আলো, মনে হয় চাক বেঁধে আছে, ধাক্কা খেলেই ছড়িয়ে পড়বে। মনে পড়ে সেকান্দারের কথা। ও কি যুদ্ধে গেছে? গতবার বলেছিলো পরের বার এসে তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না বাড়িতে। লোকটির বিশ্বাসে কাঁটা ছিলো। মাসখানেক আগে বিয়ে করেছে সেকান্দার। নতুন বউ ঘরে রেখে ও কি মুক্তিযোদ্ধা হবে? অল্পসময়ে ও সেকান্দারের বাড়িতে পৌঁছে যায়। দিনমজুর সেকান্দার। শুধু ভিটেটুকু আছে। মা আর বৌ নিয়ে থাকে। আশেপাশে তেমন কেউ নেই। কখনো কাজের খোঁজে দূরে কোথাও চলে যায়। মাসে দু'মাসে ফেরা হয় না। একা মা পুত্রবধূ নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। এখন কি করছে ও? লোকটি উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে ঘন গাছগাছালি। এখানে আলো এতো স্পষ্ট নয়। ও উঠোনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে ডাকে, সেকান্দার, সেকান্দার? দরজা খোলে ওর মা।

কে? কে বাহে?

হামি।

বারান্দায় এগিয়ে আসে সেকান্দারের মা।

আসো বাহে, ইকানে আসো।

লোকটি বারান্দায় উঠে আসে। দেখতে পায় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সুরুজি। সদ্য ঘুমভাঙ্গা স্নিগ্ধ মুখ মায়াময়।

সেকান্দার নাই বাহে।

কুন্ঠে?

বুড়ি ফিসফিস করে বলে, যুদ্ধে গেছে। হামরা কোনু খোঁজ জানি না। তুমি বসো বাহে।

লোকটি আনন্দে, উত্তেজনায় বসে পড়ে। সেকান্দার কথা রেখেছে। ও মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কি হতে পারে। ও তৃষ্ণার্ত হয়। ওর ঘুম পায়। ও এখানে একবেলা ঘুমুতে পারলে পাঁচ বেলার পথ হেঁটে যেতে পারবে।

চাচী পানি খিলান।

ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে পানি নিয়ে আসে সুরুজি।

ক্যাংকা আছেন ভাবী?

সুরুজি মাথা নেড়ে জানায় ভালো।

চাচী হামি ঘুমাবো।

হামকেরে একটাই ঘর। তুমি হামার বিছানাত ঘুমাও। হামি তোমার জন্য ভাত রান্ধি। না খায়া যাবার পারবা না। এখনও তো ভালো করে রাত পোহায়নি।

আসেন, আপনি ঘরে আসেন।

সুরুজ্জির ডাকে লোকটি ঘরে ঢোকে। সেকান্দারের মা উঠোনে নেমে যায়। সুরুজি একটা বড় পোটলা খুলে অর্ধেক সেলাই করা একটা নকশি কাঁথা বের করে বিছানার ওপর পেতে দেয়।

কাম্থাতো সেলাই শ্যাষ হয়নি। বিছাইল্যান ক্যান ভাবী?

হামাকের নতুন চাদর নাই। এইডার উপরে নিদ পাড়েন বাহে।

লোকটি ইতস্তত করে। কতো ফুলপাতা আঁকা হয়েছে কাঁথাটায়, আরো নকশা করা হবে। সুরুজি লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলে, ও যাবার সময় বলে গেছে এই কাথা যেন শেষ করে রাখি। দেশ স্বাধীন —

বুঝবার পারছি দেশ স্বাধীন হলে সেকান্দার ফির‍্যা আইসে আপনাক লিয়ে এই কাম্থার নিচে নিদ পাড়বি।

সুরুজি লজ্জায় মুখ তোলে না। সেকান্দার তাই বলেছিলো। বলেছিলো, কাঁথাটায় নকশা করতে থাকো। যেইদিন শেষ হবে, বুঝবা সেইদিন আমি বাড়ি ফিরে আসবো। আমরা দু'জন একসাথে কাম্থার নিচে নিদ পাড়বো।

এই কাঁথা বিছাবেন না ভাবী। আমি চাচীর বিছানায় ঘুমাবো। আমার কাঁথা লাগবে না।

অকস্মাৎ সুরুজি কঠিন কণ্ঠে বলে, লাগবি। আপনে যুদ্ধ করতে যাবেন।

যোদ্ধা মানুষরাই এই কাম্থার ভেতরে নিদ পাড়বে। আপনি শুইয়ে পড়েন।

সুরুজি দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওর শাশুড়ি রান্নাঘরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সেকান্দার মাসখানেক আগে চলে গেছে। দুজনের এখন খুবই খারাপ অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়। ঘরে যা চাল আছে তা দিয়ে লোকটিকে ভাত দেয়া যাবে। ওদের জন্য কিছু থাকবে না। তাতেও দুঃখ নেই, কিন্তু ভাত দেবে কি দিয়ে? যে মুরগিটি অবশিষ্ট আছে সেটা তো ডিম পাড়ে। সেটাই কি জবাই দেবে? ও সুরুজির জন্য অপেক্ষা করে। সুরুজি শাশুড়িকে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আম্মা?

বুড়ি ওকে খুব পছন্দ করে। শক্ত মেয়ে। বুঝেশুনে কাজ করতে পারে। ছেলে বাড়িতে নেই। এই মেয়েটিই এখন ওর ভরসা। ও আবার ডাকে, আম্মা?

এক্যান কি হবি মা?

কি আবার হবি, হামি সব করতি পারবো। আপনি বইসে থাকেন। খুব দ্রুত চিন্তা করে সুরুজি। ঘরে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ঘুমুতে দিয়ে খাবারের চিন্তা করতে নেই। মুক্তিযোদ্ধাকে যুদ্ধে পাঠাতে হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় পাঠাতে হয়। কাল কি খাবে এটা ও ঘরে বসে ভাববে কেন?

যোদ্ধারা তো জীবন নিয়ে ভাবে না। জীবন নিয়ে ভাবলে তো যুদ্ধ হয় না। স্বাধীনতা আসে না। ও খোপ খুলে একমাত্র মুরগিটি বের করে আনে। শাশুড়িকে ধরতে বলে নিজের হাতে জবাই করে। কেটে ধুয়ে রান্না করতে বসার সময় দেখতে পায় সূর্য উঠেছে। উঠোন রোদে ভরে গেছে।

ঘরে নতুন কাঁথার গন্ধে ঘুম আসে লোকটির। গতরাতের ঘটনার পর ওর দুচোখের পাতা

এক হয়নি। এখন ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত শব্দে ওর ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। শব্দ এবং আলোর সংমিশ্রণ হলে মানুষটির করোটিতে বাস্তব এবং স্বপ্ন এক হয়ে যায়। ফুটে ওঠে অলৌকিক চিত্র, যে চিত্র এক অনাদিকালের অবিনশ্বর পটভূমিতে অনন্ত জীবনের সঙ্গী হয়। লোকটি এখন তেমন অবস্থায়। তার তো এই জনপদ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা, সে হেঁটে যাচ্ছে — ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে একজন কষ্টার জীবনের অভিজ্ঞতা - যে অভিজ্ঞতা সমুদ্রের বাতি হয়ে যোদ্ধা মানুষদের পথ দেখাবে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারে ওর পথের শেষ নেই। ওর করোটির ভেতর জেগে উঠেছে করাচির মসরুর বিমান ঘাঁটি। সেই ঘাঁটি থেকে সাঁই করে টি-৩৩ বিমানটি আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেলো ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। সে মনে মনে ঠিক করেছিলো যে এই ঘাঁটি থেকে একটি বিমান ছিনতাই করে ভারতের আকাশে ঢুকে পড়বে। কাছেই গুজরাটের জামনগর বিমান ঘাঁটি। সেখানে অবতরণ করতে পারলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। লোকটির স্বপ্নের ভেতর জেগে ওঠে আজ শুক্রবার। সকাল এগারোটায় পাইলট অফিসার মিনহাজের টি-৩৩ বিমান নিয়ে আকাশে উড়বার কথা। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য টি-৩৩ বিমানটির সাংকেতিক নাম ছিলো ব্লুবার্ড ১৬৬। মিনহাজ ব্লুবার্ড নিয়ে ওড়বার অনুমতি চাইলে কন্ট্রোল টাওয়ার অনুমতি দেয়। স্ট্যান্ডার্স ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেলে মিনহাজ চার নম্বর ট্যাক্সি-ট্র্যাক দিয়ে এগিয়ে টিলার আড়ালে চলে যায়। ও সাতাশ নম্বর রানওয়েতে ঢুকবে। এক মুহূর্ত দেরি নয়। মতিউর নিজের মুঠোয় সময়কে ধরে নিজের গাড়ি চালিয়ে ছুটে যায় ট্যাক্সি- ট্র্যাকে। মিনহাজকে বিমান থামানোর সংকেত দেখায়। মিনহাজ তার ছাত্র। মতিউর ওকে জেট বিমান ওড়ানো শেখায়। মতিউর এখন ফ্লাইট সেফটি অফিসার। এই অফিসার বিমান থামানোর নির্দেশ দিলে বৈমানিক থামতে বাধ্য। মতিউর মিনহাজকে দেখতে পায় না। মনে হয় ও এখন ক্যানোপির ভেতরে। আর একটু পরই সময় হবে। কিসের সময়? ভাবতেই থরথর করে কেঁপে ওঠে পা। নামার আগে নিজের গাড়িটা এমনভাবে পার্ক করে যেন অন্য কোনো বিমান ওর হাইজাক করা বিমানটির পিছু নিতে না পারে। মিনহাজ বিমান থামিয়ে ক্যানোপি খুললে মতিউর লাফ দিয়ে ককপিটে উঠে যায়। আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর হয়ে যায় ব্লু বার্ড ছিনতাই হয়েছে। কারণ বিমানটি যে ট্যাক্সি-ট্রাকের মাঝপথে থেমে গিয়ে ক্যানোপি খুলেছে এটা নজরে পড়ে কন্ট্রোল টাওয়ারের ফরিদের। সে ভুরু কুঁচকে থাকে। বিচলিত বোধ করে। জিজ্ঞেস করে, মিনহাজ হোয়াটস দ্য প্রবলেম? এ্যানিথিং রং? কিন্তু কোনো জবাব আসে না। বিমান অস্বাভাবিক গতিতে রানওয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রানওয়ে ফাঁকা। কিছুক্ষণ আগে অন্য একটি বিমান নেমেছে। এই সুযোগ ব্লুবার্ড ১৬৬ সাঁই করে উপরে উঠে যায়। ওড়ার সময় দেখা যায় বিমানটি স্বাভাবিক গতিতে এগুচ্ছে না। দুলছে। ডানে-বামে। উপরে --নিচে। কি হলো? কন্ট্রোল টাওয়ারে হুলুস্থুল পড়ে যায়। এদিকে বিমান নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মতিউর এবং মিনহাজের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি হচ্ছে। এর ফাঁকে কন্ট্রোল টাওয়ারে মিনহাজের কণ্ঠস্বর ভেসে যায়, ব্লুবার্ড ১৬৬ ইজ হাইজ্যাকড।

পাইলট অফিসার ফরিদুজ্জামান বাঙালি। সে কন্ট্রোল টাওয়ারে ডিউটিতে আছে। মিনহাজের কণ্ঠস্বর শুনে বিমূঢ় হয়ে যায়। অবসন্নবোধ করে। তবু গলা উঁচু করে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চিত করে জানাও ছিনতাই কিনা?

বেতার সেটে ভেসে আসে মতিউরের পরিষ্কার কণ্ঠ, হ্যাঁ, নিশ্চিত।

বেস নিচু দিয়ে উড়ে যায় ব্লুবার্ড। মতিউরের লক্ষ্য বিমানটি যেন রাডারে ধরা না পড়ে। বিমানের ডানা দু'টি প্রবল কাঁপছে। মতিউরের তখনো মনে হয় সময় ওর হাতের মুঠোয়। নিমিষে রাডারকে ফাঁকি দিয়ে আকাশে হারিয়ে যায় ব্লুবার্ড।

বেশ কমান্ডারকে খবরটি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কন্ট্রোল টাওয়ারে চলে আসে। চারদিকে থমথমে পরিস্থিতি। উত্তেজনা। অল্পক্ষণে এফ-৮৬ জংগী বিমান ব্লুবার্ডের খোঁজে উড়ে যায়। খবর নেই। বাম্বীন এবং থাট্টারে অবস্থিত পাকিস্তানের শক্তিশালী রাডার স্টেশন। তাদের কাছে নির্দেশ যায় পলাতক ব্লুবার্ডের খোঁজ দেওয়ার জন্য। তারা হতবাক। জানায় বিমানটির গতিবিধি রাডারে ধরা পড়ছে না। মতিউর এভাবেই বিমানটিকে রাডারের রক্তচক্ষু থেকে আড়াল রেখেছিলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দু'জনের ধ্বস্তাধস্তিতে থাট্টারের কাছেই বিধ্বস্ত হয়ে যায় ব্লুবার্ড। শহীদ হয় মতিউর। অদ্ভুত স্বরে চিৎকার করে লোকটি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ছুটে আসে এই গৃহের দুজন নারী। ওদের উৎকণ্ঠা অনুভব করে লোকটি বিব্রত হয়ে বলে, স্বপ্ন দেখেছি। একটা ভীষণ স্বপ্ন। একজন মানুষ —

কি হয়েছে মানুষটার?

মানুষটা পাগল হয়্যা গেছলো।

ক্যান পাগল হয়্যা গেলো? তার বউ আছলো না?

আছলো।

ছাওয়াল-পাওয়াল?

দুইডা মাইয়্যা। খুব ছোট।

তাইলে?

স্বাধীনতা।

লোকটি নারী দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে। দু'জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায়। কারণ ওরা স্বাধীনতা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। তখন লোকটি মৃদুস্বরে বলতে থাকে, বিকালের দিকে খবর পাওয়া যায় থাট্টারের অদূরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। নিহত হয়েছে বৈমানিক দুজনেই। স্বাধীনতা যুদ্ধ করবে বলে মতিউর স্ত্রী-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি। নিজের জীবনের কথা ভাবেনি। সব টান পিছে ফেলে ঘূর্ণির মতো প্রবল বেগে পাক দিয়ে উঠেছিলো। সেই সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সময়ের খানিকটুকু। সেই সময়টা একান্তই তার নিজের হয়ে গেলো। মহাকাল যখন বীর মানুষের জন্য সময় ভাগ করবে তখন মতিউরকেও খানিকটুকু দিতে হবে। স্বাধীনতার উন্মাদনা বুকে ছিলো বলেইতো ও পাইলটের পোশাক আর প্যারাসুট ছাড়াই বিমানে উঠেছিলা। মনে হয় যখন ব্লুবার্ড নিচু দিয়ে উঠে যাচ্ছিলো তখনই পাইলট অফিসার মিনহাজ প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে যেতে চেয়েছিলো। মাটি থেকে বিমানের উচ্চতা প্রয়োজন মতো না থাকায় প্যারাসুট খোলেনি। নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মিনহাজ। মতিউরও ছিটকে পড়ে। কিন্তু তার দেহ প্রায় অক্ষত ছিলো। পাকিস্তানিরা তাকে কবর দেয় করাচির মসরুর বিমান ঘাঁটিতে। সেই কবরস্থানে যেখানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের কবর দেওয়া হয়। ধর্মীয়ভাবে তাকে কবর দেয়া হয়নি। এমনকি জানাজাও পড়া হয়নি।

কি বলল্যা বাহে মানুষটা মর্যা গেছে?

হ, শহীদ হয়্যাছে।

সুরুজির শাশুড়ি কাঁদতে আরম্ভ করে। সে বিলাপ করে, ওহ্ রে, সোনার ছাওয়াল—

লোকটি সুরুজির দিকে তাকায়। উঠতি বয়স। নতুন সংসার। এখনো মা হয়নি। কিন্তু ওর চোখে পানি নেই। বরং শাশুড়িকে সান্ত্বনা দেয়, থ্যামেন আম্মা, কাইন্দে কি হবে।

সুরুজির শাশুড়ি আঁচলে চোখ মোছে। লোকটি কি বলতে গেলে সুরুজি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, থাক আর কহাতে হবে না। আপনে উঠেন। ভাত খ্যাবেন। যুদ্ধের সময় কতো স্বপ্ন দেখে মানুষ। সব স্বপ্ন সত্যি হয় না।

না, এ স্বপ্ন সত্যি। আমরা এভাবে লড়ছি।

লোকটির আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়। ওর গভীর বিশ্বাস করাচির মসরুর বিমানবন্দরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। এ মিথ্যে নয়। হয়তো কাল কিংবা তার পরের দিন ঘটনাটি জানা যাবে। ও এটাও বুঝে যায় যে আগামীকালের পত্রিকায় বড় করে ছাপা হবে 'বিশ্বাসঘাতক মতিউর রহমান'। ছাপা হবে দেশপ্রেমিক রাশেদ মিনহাজ। তারপর একটা অদ্ভুত গল্প তৈরি হবে। সেই গল্প মুখে মুখে ফিরতে থাকবে পাকিস্তানের পক্ষের লোকদের মধ্যে। আচমকা লোকটি হা-হা করে হেসে ওঠে। তারপর দু'জন নারীর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, স্বপ্নটা আসলে খুব ভালো। চমৎকার স্বপ্ন। আপনারা শুনলে –

চলেন, খাতে চলেন। ভাত তরকারি জুড়্যায়ে গেলো। আপনার তো অনেক রাস্তা যাতি হবি।

লোকটি সুরুজির দিকে বোকার মতো তাকিয়ে মাথা নাড়ে। তাই তো ওর তো অনেক পথ যেতে হবে – ওর কি এতো কথা বলার সময় আছে। এই সপ্রতিভ মেয়েটি ওকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলো। ও ভাবতে পারেনি এমনটি ঘটবে – কথা বলার জন্য বাধাগ্রস্ত হতে হবে। ও তড়িঘড়ি বাইরে আসে। হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। বেশ বেলা হয়েছে। প্রসন্ন সকাল। চমৎকার রোদ। ফুরফুরে আনন্দের স্রোত বয়ে যায় লোকটির বুকের ভেতর। খেতে বসে ও দু'জন নারীকে সেই কন্থার গল্প শোনায়। গল্প শুনে মুখ টিপে হাসে সুরুজি, যেন এটা কোনো গল্প হলো? এ আর এমন কি গল্প। এ গল্প আমার জানা আছে। লোকটির মন খারাপ হয়ে যায়। সুরুজির হাসিটুকু যেন আর দেখতে না হয় সেজন্য মুখ তোলে না। দ্রুত খেতে থাকে। বুঝতে পারে, ভীষণ খিদে পেয়েছে। সুরুজির শাশুড়ি কন্থার গল্প শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। তার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করে। ভাবটা এমন যে, যে মা ছেলেকে যুদ্ধে পাঠায় তার আবার কন্থার গল্পে কি এসে যায়। জিজ্ঞেস করে, আমার সেকান্দারের সাতে তোমার দেখা হবি বাবা?

লোকটি মাথা নাড়ে। বৃদ্ধ রমণী বুঝতে পারে না যে লোকটি হাঁ বললো নাকি না বললো। সে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। সুরুজি ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি রেখেই বলে, ওর সাতে দেখা হলে কহাবেন হামি আর একটা নতুন কান্থা সেলাই করবো বাহে।

আচ্ছা। লোকটি মুখ না তুলেই মাথা নাড়ে। আসলে ওর ভীষণ লজ্জা করছে। ও টের পেয়েছে ওরা সর্বশেষ মুরগিটি জবাই দিয়ে ওর জন্য রান্না করেছে, সঙ্গে শেষ চালটুকু। ওরা কাল কোথা থেকে চাল জোগাড় করবে জানে না। হয়তো কলার থোড় সেদ্ধ করবে, নয়তো খুদের জোগাড়ে সারাটা দিন খেটে মরবে। এদের কাছে কি কন্থার গল্প সাজে। নাকি বিমান নিয়ে উড়ে যাওয়া কাউকে স্বপ্ন দেখার কথা মানায়? লজ্জায় কুঁকড়ে যায় ও। বুঝতে পারে ও যুদ্ধ এমনি। যুদ্ধ প্রাণের, সবাই লড়ছে। যারা লড়বে না, যারা শত্রুর পক্ষ নেবে সোনামিথি

বলেছে ও তাদের শেষ করবে। ও ঠিক করে এখান থেকে সোজা ও সোনামিথির ওখানে যাবে। বারুয়া মাঝির নৌকায় পার হয়ে চলে যাবে অন্য জায়গায়।

খান বাহে? সুরুজ্জির কণ্ঠ।

অনেক খেয়েছি। আর না। পেট ভরে গেছে।

ও বাসনেই পানি ঢেলে হাত ধোয়। সেকেন্দারের মা ওকে এক টুকরো সুপারি দেয়। লোকটি দাঁতের নিচে ফেলে কুটকুট করে ভাঙে। সুরুজি ঘর থেকে কাঁথাটা এনে ওকে দিয়ে বলে, লিয়ে যান। পথের মদ্যে নিদ প্যালে বিছায়ে নিদ পাড়বেন।

হামি ঘাসের উপর নিদ প্যাড়বার পারি। কান্থা বোঝা।

লিয়ে যান বাহে। আর কদিন পর জাড় পড়বি। হাঁটু কাঁপবি, দাঁত কিড়মিড় করবি।

সুরুজ্জির শাশুড়ি সায় দেয়, লও বাবা। লিয়ে যাও। কাজে লাগবি।

অগত্যা পুটলি করে বাঁধা কাঁথাটা নিতে হয় লোকটিকে। দিনমজুর সেকান্দার যুদ্ধে গেছে। স্বাধীনতার অপেক্ষায় আছে মা ও স্ত্রী। ওরা ওদের সর্বস্ব দিয়ে দিলো একজন মুক্তিযোদ্ধাকে, এখন অন্য কোনো যোদ্ধা ে আশ্রয় দেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। যে নতুন কাঁথাটি সেলাই শুরু হবে সেটি আবার কাউকে দিয়ে দেবে। বলবে, নিয়ে যাও বাবা, শীত লাগবে। গায়ে দিও। বলবে. নিয়ে যান ঘুম পেলে গাছের নিচে বিছিয়ে শুয়ে পড়বেন।

একটুখানি ঘুমিয়ে নিলে নতুন শক্তিতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আমরা পথের ধারে আপনাদের জন্য বসে আছি। আবার কি আসবেন? আর কি দেখা হবে? অকস্মাৎ লোকটির চোখে পানি আসে। সেকান্দারের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে, চাচী যাই। এবার সুরুজির চোখে চোখ রাখে। বলে, যাই। সুরুজি মাথা নাড়ে। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি নেই। ওর দৃষ্টি স্থির, দৃঢ়প্রত্যয়ী। ও জানে, যোদ্ধাকে এভাবে বিদায় দিতে হবে। যোদ্ধার জন্য চোখে জল আনতে নেই। দুর্বল করে দিতে নেই ওর মন। সুরুজি শক্ত মেয়ে। কেন নতুন বিয়ে করা বউ রেখে সেকান্দার যুদ্ধে যেতে পারে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় লোকটির কাছে। ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কাঁথার পুটলিটা কাঁধে ফেলে লম্বা পায়ে হেঁটে যায়। অনেক দূরে গিয়ে ও পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পায় দু'জন নারী তখনো দাঁড়িয়ে আছে – একজন শাশুড়ি, অন্যজন পুত্রবধূ।

লোকটি একই গতিতে হাঁটতে থাকে। বাঁক নিলে পেছনের দৃশ্যগুলো আপাত অদৃশ্য হয়ে যায়। সামনে নতুন দৃশ্য, মনে হয় একই রকম, কিন্তু একই রকম নয়। গাছের পাতা ভিন্ন আকারের, রঙটা হালকা কিংবা গাঢ়। শাখাগুলো কতো বিচিত্র ভঙ্গিতে ছড়িয়ে থাকে। গাছের দাঁড়িয়ে থাকারও হাজার ভঙ্গি। যারা দেখতে পায় না তাদের এক রকম লাগে – যারা দেখতে জানে তারা হাজার রকম করে দেখতে পায়। যেমন একজন কন্থার দুঃখ। কেউ পরাজিত মানুষ বলে তাকে ঘৃণা করে, কেউ তার বেদনায় সমব্যথী হয়। সুরুজি কিংবা সেকান্দারের মায়ের ধারণায় কোনো কন্থা নেই। ওরা কন্থা বোঝে না, বোঝে যোদ্ধা। সবাই যোদ্ধা চিনলে স্বাধীনতা কে ঠেকিয়ে রাখবে?

নদীর ঘাটে পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায় লোকটির। দূর থেকে সোনামিথির বাড়িতে আলো দেখা যায় না। লোকটির বুক ধক করে ওঠে। ওরা কি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? নাকি অন্যকিছু? ভাবতে ভাবতে ও আর এগুতে পারে না। ঘাটে পৌছানোর আগেই বাজারের চায়ের দোকানে ঢোকে। দোকানদার ওর পরিচিত, নীরিহ, গোবেচারা। সাতপাঁচে থাকে না। গা বাঁচিয়ে চলে। লোকটিকে এক কাপ চা দিয়ে বলে, সিঙ্গাড়া? ও মাথা নাড়ে। দুটো সিঙ্গাড়া আসে

পিরিচে। সঙ্গে এক গ্লাস পানি। দোকান ফাঁকা। আশেপাশেও কেউ নেই। লোকটি ওর মুখোমুখি বসে বলে, বারুয়া মাঝি শেষ।

শেষ?

হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শালগ্রাম যাচ্ছিলো। মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্রাশ ফায়ার – কেউ বাঁচেনি।

লোকটির গলায় সিঙ্গাড়া আটকে যায়। দোকানদার পানির গ্লাস ওর হাতে ধরিয়ে দেয়। এক চুমুকে সবটুকু পানি শেষ করে গ্লাসটা ঠক্ করে টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে, প্লাটুন কমাণ্ডার মানিক ওকে প্রথমে কিছু এক্সপ্লোসিভ দিয়ে বারুয়া মাঝির কাছে পাঠিয়েছিলো। তারপর অনেকবার মাঝির বাড়িতে এসেছে। সে রাতে ওকে আর কোথাও যেতে দেয়নি সোনামিথি। ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেতে দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঠিক করেছি যতোদিন যুদ্ধ চলবে ততোদিন আকাশ প্রদীপ জ্বালাবো। ওই মিলিটারি বানরগুলোকে দেখিয়ে দেবো যে আমাদের বাড়িতে অন্ধকার নামে না। লোকটি লাফিয়ে উঠেছিলো, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। কি গো পারবো না?

পারবো। বারুয়া মাঝি সায় দিয়েছিলো।

সে রাতে আকাশে মেঘ ছিলো। চালতা গাছের ডালে ভুতুম পাখির ডাক থেমে গেছে। বারুয়া অনবরত বিড়ি টানার মাঝে সোনামিথির মায়াময় কণ্ঠ, ঘুম পেয়েছে তোমার? চলো ঘুমুবে। একটা নতুন কাঁথা আছে, সেটা বিছিয়ে বিছানা করে দেবো। ভারী সুন্দর স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক ঘুমে রাত কাবার।

ও প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলো, আমি ঘুমুতে চাই না।

কেন?

তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার মন চায় না। তোমরা ঘুমুবে না?

বারুয়া হা-হা করে হেসে বলে, আমরা ঘুমুলে তো আমাদের ছেড়ে যেতে হবে তোমার।

কিন্তু তোমরা ভুতুমের ডাক শুনবে, আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর স্বপ্ন দেখবে আর আমি ঘুমুবো, তা হবে না।

তাহলে আমরা সারা রাত জেগে থাকি, সোনামিথির কণ্ঠ।

সে বড্ড লম্বা সময়। আমাকে আবার কাকভোরে উঠে খেয়া নৌকায় গিয়ে বসতে হবে।

বারুয়া মাঝি বিড়িতে সুখটান দেয়।

ঠিক আছে আমরা ততোক্ষণ জাগি, যতোক্ষণ না চাঁদটা ওই গাছের আড়ালে যায়।

হ্যাঁ ঠিক, লোকটির কথায় সায় দিয়ে সোনামিথি ঘরে যায়, চাক ভাঙা মধু নিয়ে আসে। লোকটির হাতের তালুতে দিয়ে বলে, খাও। নিজে সংগ্রহ করেছি। ঐ বড় জাম গাছটার গোঁড়ায় চাক বেঁধেছিলো মৌমাছি। খেয়ে দেখো, কি মজা।

বুঝলে, আমার বউটা কতোকিছু যে পারে! তুমি ভাবতেও পারবে না।

শুধু পারলাম না —

চুপ, খবরদার। ঐ কথা বললে তোমাকে নদীতে চুবিয়ে মেরে ফেলবো।

ওর সামনে যখন কথাটা উঠলো তখন ওকে তো জানতে হবে যে আমি কি পারিনি।

আমি জানি।

জানো? দু'জনে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

কথাটা ওদের বলে না। বলে নিজেকে, এটা খুব সহজ। নারীর ব্যর্থতার আর্তনাদ একই রকম হয়। এটা আমি আরো দু'এক জায়গায় শুনেছি। কিন্তু সন্তান না হলে নারী নিজে কেন তার উপর দায়িত্বটা নিয়ে নেয় তা আমি বুঝি না।

আমিও তো তাই বলি। বারুয়া জোর দিয়ে বলে। সন্তান না হওয়ার জন্য আমিও তো দায়ী হতে পারি।

হ্যাঁ পারো।

আমার ডাক্তার বন্ধু মবিনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে।

তোমার কোনো দোষ নেই দিদি। তোমরা তো কোনো পরীক্ষা করাওনি।

দোষ, নির্দোষের কথা নয়। কথা হলো যে আমি মা হতে পারিনি। আমি তো বুঝি আমার শরীরে কতো শক্তি। আমি দু'মণের চালের বস্তা পিঠে তুলে নিতে পারি। আমি নৌকা বাইতে পারি। ঘর ছাইতে পারি। আমি কি না পারি। কিন্তু গর্ভে সন্তান ধরতে পারলাম না কেন? কেন?

বারুয়া মাঝি খপ করে ওর হাত ধরে, চলো ঘুমুতে যাবে। দুঃখের ভাসান গাইতে হবে না।

ক্রুদ্ধ শোনায় বারুয়া মাঝির কণ্ঠ। লোকটি ভয় পায়। আজ রাতে কি দিদির ওপর ভীষণ অত্যাচার হবে? কিন্তু সোনামিথি অনায়াসে বারুয়ার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি যাও। আমি আসছি।

বারুয়া চলে যায়। সোনামিথি ওর দিকে ঘুরে বলে, কাঁথায় নকশা তুলতে আমি ভালোবাসি। পাড়া প্রতিবেশির জন্য অনেক কাঁথায় নকশা তুলেছি।

ভালো করেছো। আমি ঘুমুতে গেলাম।

শোনো, ঘুমুনোর আগে আমার জন্য প্রার্থনা করো। যেন একটি সন্তান পাই।

কি অসহায়, কি দীনতা সোনামিথির কণ্ঠে, মনেই হয় না মা কালীর মতো শরীর নিয়ে ও এমন ক্ষুদে বালিকা হয়ে যেতে পারে। সে রাতে ঘুমুতে পারেনি লোকটি! বারবার ঘুম ভেঙে গেছে।

বারুয়া নেই। এখন ও কি করে সোনামিথির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। চায়ে চুমুক দেয়া হয় না। সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দোকানদার বলে, আর এক কাপ চা দেবো?

না।

লোকটির চোখে পানি দেখে দোকানদারেরও চোখ ভিজে ওঠে। দু'হাতে পানি মুছে বলে, মিলিটারিরা বারুয়ার বৌটারও সর্বনাশ করেছে।

সর্বনাশ?

হ্যাঁ, চার পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করেছে। পুরো এলাকায় যেন কেয়ামত নেমে এসেছিলো সেদিন। ভাবলে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। তবে বাপের বেটি বারুয়ার বৌ। ওদের বলেছে, তোমরা আমাকে যা খুশি করো। কিন্তু আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না। বাজারে আগুন দিতে পারবে না। সে কি তেজ মাগো।

তারপর?

মিলিটারি ওর কথা শুনেছিলো। ওকে পেয়েই ওদের সে কি উল্লাস। আর কিছু করার হুঁশ ছিলো না।

ভালো আছে তো দিদি?

হ্যাঁ, ভালো আছে। খেয়া তো এখন ওই পারাপার করে।

ও। তাহলেই ভালো। হেরে তো যায়নি। কি বলো?

দোকানদার চুপ করে থাকে। লোকটির কথা ও বুঝতে পারে না। যুদ্ধের সময়ের হারজিতের যে নানা দিক থাকে এটা ও বুঝবে কি করে? ওর সে বোধ নেই।

দোকানদার প্রশ্ন করে, রাতে কোথায় থাকবেন?

দিদির কাছে। আমার কটা মাথা যে ঘাটে এসে দিদির বাড়িতে না থেকে অন্য কোথাও থাকবো।

তা ঠিক। আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?

কেমন আর, যুদ্ধের সময়ে কি ব্যবসা চলে! যাক। তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো।

লোকটা দোকানদারকে কষ্টার গল্প বলে। কিন্তু ওর মুখে তেমন কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না। বলে, এটা কোনো গল্প হলো নাকি? কতো শত মানুষের কতো রকম দুঃখই তো থাকে। কি হয়?

লোকটির রাগ হয়। বুঝতে পারে এই ছেলেটিকে ও কিছু বোঝাতে পারবে না। ও জানে মিলিটারিরা যদি এ দেশ দখল করেও রাখে তাহলেও সে এভাবেই চা বিক্রি করতে পারবে। ওদেরকে হুজুর, হুজুর বলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। বাঙালির জায়গায় পাঞ্জাবি চা খাবে তাতে ওর কি এসে যায়? দোকানদারের জন্য ওর করুণা হয়।

লোকটি বেরুবার সময় দোকানদার বলে, কবে এই গণ্ডগোল শেষ হবে বলেন তো?

গণ্ডগোল? লোকটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়।

গণ্ডগোলইতো। মানুষের কতো কষ্ট—

দেশে একটা যুদ্ধ চলছে বদমাশ।

লোকটি ওর কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দেয়। দোকানদার বেকুবের মতো ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনে রাগ করেন কেন? কেউ যুদ্ধ বলে, কেউ গণ্ডগোল বলে। তাতে হলোটা কি? তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আমি তো বাঁশের চোঙার মধ্যে পতাকাটা ঢুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। গণ্ডগোল থামলেই উড়িয়ে দিবো।

এতোক্ষণে লোকটি হেসে ফেলে। বোকা লোকটিকে বেশি কিছু বোঝাতে চাওয়াই বোকামি। ও এমনই সরল মানুষ। ও নিজেই ওকে ভুল বুঝেছে।

মুহূর্তে ও দোকানদারকে জড়িয়ে ধরে বলে, আসি ভাই। সতর্ক থেকো। ভালো থেকো।

দোকানদারের চোখ ছলছল করে। বলে, কখন আছি, কখন নাই কেউ বলতে পারে না। যেন বেঁচে থাকি সেই দোয়া করবেন। আর শোনেন, আপনিও এতো পথে পথে হাঁটবেন না। পথে কতো বিপদ।

ঘরেও তো বিপদ। বিপদ কি সোনামিথিকে ছেড়েছে? ওতো কোনো পথে যায়নি?

কে বলেছে যায়নি? ওতো সবচেয়ে বেশি পথে হাঁটে।

হাঁটে?

হ্যাঁ, আপনাদের সাথে সাথে হাঁটে। বোঝেন না?

এবার লোকটির বিস্ময়ের পালা। ভাবে, দোকানদার কি বোকা? কই নাতো? ওতো অনেক কিছুই বোঝে। কোনো কোনো ঘর যে পথ হয়ে গেছে এটা যে বুঝতে পারে সে কি করে

বোকা হয়? লোকটির মাথা সাফ হয়ে যায়। বুঝতে পারে ওর নিজেরই ভুল। ও কাউকে চিনতে পারে, কাউকে পারে না। জনপদের ঘাটে ঘাটে মানুষের হাজার রকম আড়াল-আবডাল – মানুষ নিজের মতো করে দেখে নিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে। মানুষ নিজের মতো করে অভিজ্ঞ হচ্ছে। প্রয়োজনে কাজে লাগাবে। ওর নিজের বোকামির জন্য ওর নিজেরই লজ্জা হয়। দোকানদারের হাত চেপে ধরে বলে, আমাকে মাফ করে দিও ভাই। দোকানদার মৃদু হাসে। হাসতে হাসতে দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করে। বলে, আমি তো এতোক্ষণ আপনার জন্যই বসে থাকলাম। নইলে কখন বাড়ি চলে যেতাম। বারুয়া মাঝির খবরটা না দিলে আপনি শক্ত মানুষ হয়ে সোনামিথির সামনে তো যেতে পারতেন না।

লোকটি আর দোকানদারের সামনে দাঁড়ায় না। দ্রুতপায়ে নেমে আসে। যে সোনামিথি অনেক কিছু পারে তার সামনে যেতে হলে প্রস্তুতি লাগে, এটা ঐ দোকানদার বোঝে। কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, এতোকিছু ভেবে দেখা তো ওর নিজেরই হয়নি। পদে পদে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। ও দূর থেকে দেখতে পায় সোনামিথি নৌকা ওপার থেকে এপারে নিয়ে এসেছে। দু'জন লোক ওকে পয়সা দিয়ে নেমে যায়। ও লগি পুঁতে নৌকা বেঁধে ফেলে, তারপর ঢালু বেয়ে উপরে উঠবে। ঘরে ফিরবে। আকাশ প্রদীপ জ্বালবে। তার আগে লোকটি ঢালু বেয়ে দৌড়ে নেমে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

তুমি? অনেকদিন আসোনি?

লোকটি দেখতে পায় সোনামিথির মা কালীর মতো ফুরফুরে চেহারায় ধস নেমেছে। বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু লোকটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারায় বুনো হিংস্রতা ফুটে ওঠে। বারুয়া মাঝির মতো খেঁকিয়ে বলে, কেন এসেছো? তোমার তো যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার কথা।

ও পাটাতনের নিচ থেকে দুটো বড়ো দা-বটি বের করে। লোকটি বুঝে যায় বারুয়া নেই বলে সোনামিথি ধসে যায় নি। আগে দু'জন ছিল। এখন একজনই দু'জন মিলে একশ' হয়েছে। বারুয়ার শক্তি বারুয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়নি। শক্তি ভিন্ন আকারে, ভিন্ন পাত্রে সঞ্চিত হয়ে আছে। বড়ই বিচিত্র এই জনপদ, একে এতো সহজে বোঝার সাধ্যি কার। লোকটি প্রবল আনন্দে আপ্লুত হয়।

সোনমিথি দা-বটি ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, চলো, ঘরে চলো। তোমার জন্য একটা খবর আছে।

আমি জানি।

তুমি জানো না। এটা তোমার জানার কথা নয়। কেবল বাহাদুরি নেবার চেষ্টা। আমি বারুয়ার শহীদ হবার কথা বলবো না।

সোনামিথি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। কণ্ঠস্বর একদম ভিন্ন, লোকটি ক্ষণিকের জন্যও আগে কখনো এ স্বর শোনেনি। ওর ভীষণ ভয় করতে থাকে। ঘরে ঢুকে সোনামিথি প্রথমে প্রদীপ জ্বালায়। ওকে মাদুর বিছিয়ে দেয়। লোকটি চারদিকে তাকায়। না, বাড়িতে কোনো বিপর্যয় ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। সব আগের মতোই পরিপাটি গোছানো। উঠোনে আকাশ প্রদীপও জ্বলছে। একটু পর সোনামিথি চাকভাঙা মধু ও চিতই পিঠা নিয়ে আসে।

খাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

না, আমার খিদে পায়নি।

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছো না?

তাতে কি?

শরীর আর মন এক রকম নয়। পেটের খিদে অন্যরকম।

যে খবরটা আমি জানি না সে খবরটা তুমি আমাকে বলো দিদি। আমার যেতে হবে।

সোনামিথি শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলে, পিঠেগুলো শেষ করো। ভালো করে না খেলে যুদ্ধ করা যায় না। সুরুজি তেমাকে মুরগি বেঁধে ভাত খেতে দিয়েছে সেটা আমি জানি। তুমি সবাইকে এক কম্বার গল্প শোনাচ্ছ সেটাও আমি জানি।

তুমি জানো?

তুমি তো দেখছি একটা ভীষণ বোকা ছেলে।

বোকা ছেলে?

এমন হাসির গল্প কি এদেশের মানুষকে শোনাতে হয়? তুমি কি জানো না যে এখানে কেউ কম্বা হবার কথা ভাবতেও পারে না। ততোক্ষণ লড়বে যতোক্ষণ একজনও জীবিত থাকবে। আর পাকিস্তানের জেলে যে বেটা বন্দী আছে তাকে হাজরবার মেরে ফেলে হাজারবার বাঁচিয়ে তুললেও সে এদেশের মানুষকে কম্বা বানানোর ষড়যন্ত্র করবে না। তার মেরুদণ্ড বাঁকা হয়না। ওটা ভিন্ন ধাতুতে তৈরি।

দিদি।

লোকটি রাগে-দুঃখে অপমানিত হয়ে ওঠে।

তুমি আমাকে এতো কিছু বলছো?

বলছি এজন্য যে তুমি ট্রেনিং নিয়ে এসেছো। আমরা যারা দেশেই রয়ে গেছি তারা ট্রেনিং না নিয়েও যুদ্ধ করতে শিখেছি।

লোকটি চিতোই পিঠার থালাটা উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে।

আমি খাবো না, কিছু খাবো না। তুমি খাও। খেয়ে মোটাতাজা হও।

সোনামিথি ওর চুল এলোমেলো করে দেয়। ঘাড়ে হাত রাখে। আদর করে বলে, সোনাভাই দু'দিন আগে ওই পিঠে কটা বানানো ছাড়া এর মাঝে আমি আর রান্না করার সময় পাইনি। একদল ছেলে এসেছিলো, দুজন আহত ছিলো। রাত জেগে ওদের শুশ্রূষা করতে হয়েছে। ভোর হবার আগে উজানে নৌকা বেয়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। রাগ করোনো না সোনাভাই।

লোকটি লজ্জায়, বেদনায় মাথা নিচু করে থাকে।

আমি তোমাকে এখানে থাকতে বলবোনা বলেই তো পিঠেকটা খেতে দিয়েছিলাম। নইলে ভাত বসিয়ে দিতে পারতাম। গল্প করতে করতে ভাত হয়ে যেতো।

লোকটি উঠে দাঁড়ায়। যাবার জন্য এক পা বাড়াতেই সোনামিথি ওর হাত ধরে ফেলে। লোকটা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে, আমাকে ছাড়ো। আমি যাই। সুরুজি আমাকে এ কাঁথাটা দিয়েছিলো। তুমি রাখো।

হ্যাঁ রাখবো। যে আসছে তার জন্য আমার কাঁথা লাগবে।

কি বলেছো দিদি? কে আসবে?

বলেছি না একটা খবর আছে।

কেবলই ধানাইপানাই করছো।

সোনামিথি খানিকক্ষণ সময় নিয়ে, উঠোনে পায়চারি করে এসে অনড় কণ্ঠে বলে, আমার গর্ভ হয়েছে।

গর্ভ? দিদি গর্ভ?

আমার স্বামীকে দিয়ে নয়।

আমি জানি। আমি দোকানদার জলিলের কাছে সব শুনেছি। ফেলে দাওনি কেন?

আমি চাই সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হোক।

না। ওই বেজন্মাদের সন্তান।

যুদ্ধ শিশুরা বেজন্মাই হয়। ও বেঁচে থাকলে আমি আমার মতো করে বড় করবো। আর যদি না পারি, যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে তুমি ওকে নিয়ে যাবে। কোথাও রেখে বড় করবে। ও হবে আমাদের এই যুদ্ধের সাক্ষী।

না, কখনোই না। ওকে মেরে ফেলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অকস্মাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে সোনামিথি। বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায় প্রদীপ। সোনামিথি তার দা আর বটি নিয়ে উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে বলে, মানব শিশুর জন্মের দোষ থাকে না। দোষ ধরা পাপ।

তুমি পাগল হয়ে গেছো।

লোকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে পায়ের নিচে চিতোই পিঠা পিষ্ট করে।

সোনামিথি আবারও অদ্ভুত স্বরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, এই যে বটি আর দা দেখছো, এগুলো আমি হারান কামারকে দিয়ে বানিয়েছি। ও আমাকে বিনে পয়সায় বানিয়ে দিয়েছে। কেন জানো? এই বটি দিয়ে আমি একটি পাকিস্তানি সৈন্যকে খুন করবো। আর যদি না পারি, সুযোগ না পাই, তাহলে এই দা দিয়ে সন্তানের নাড়ি কাটবো। নিজ হাতেই কাটবো। আমার কোনো দাই লাগবে না।

কি কঠিন, নির্মম স্বরে কথা বলে যাচ্ছে সোনামিথি। লোকটির গা ছমছম করে। ওকে সাক্ষাৎ মা কালীর মতোই লাগছে। বারুয়া মাঝি এ কোন মন্দির তৈরি করেছিলো এই নদীর পাড়ে? ও কি করে জানতো যে এই মন্দিরের সেবাদাসী এক ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে মানব সত্যের পক্ষে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করে ফেলবে?

লোকটি শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে বলে, বারুয়া মাঝি বলতো তুমি অনেক কিছু পারো সোনা দিদি। তুমি একটি অবাঞ্ছিত ভ্রূণও ফেলে দিতে পারো।

আমি অনেক কিছু পারি এটা সত্য, কিন্তু একটি মানব শিশুকে ফেলতে পারি না। তুমি দ্বিতীয়বার আমাকে একথা বলবে না।

লোকটির মনে হয় নারীর পক্ষেই কি সম্ভব এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ? ও নিজে তো ভাবতে পারছে না। সোনামিথি সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো বাঁশটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আমি জানি তুমি ওকে ভালোবাসবে। লোকটি ওর দিকে চমকে তাকালে মৃদু হেসে বলে, চলো, তোমাকে আমি নদীর ওপারে রেখে আসি।

আমি তোমাকে এখানে রেখে যাবো না। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাবো।

না।

ওরা যদি আবার আসে?

আমি তো চাই ওরা আবার আসুক। একটাকে যেন খতম করতে পারি। আমি তো সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সেদিন পারিনি। আমার হাতে দা-বটি ছিলো না। আর আমকে না পেলে ওর গ্রাম বাজার পুড়িয়ে দিতো। আমি নিজের শরীর দিয়ে অন্যদের বাঁচিয়েছি। এতে

কোনো অন্যায় নেই।

লোকটির মনে হয় সোনামিথি নয়। কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু। বলছেন, তোরা পালিয়ে যা। আমাকে ধরতে না পারলে ওরা ঢাকা শহর গুঁড়িয়ে দেবে।

কি ভাবছো? এসো। লোকটি আর কথা বলে না। এ নারীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সোনমিথি দা-বটি নিয়ে নদীর ঢালু বেয়ে নামতে থাকে। পাটাতনের নিচে সেগুলো লুকিয়ে রেখে বলে, কতোদূর যাবে?

ওপারে দিয়ে এসো। হেঁটেই যাবো।

এখনো দূরপাল্লার নৌকা বাইতে পারি। দুর্বল হইনি। তোমাকে আমি সুতানটির ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

লোকটি কথা বাড়ায় না। জানে লাভ নেই। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই বহাল থাকবে। নৌকা চলতে শুরু করে। লোকটি পাটাতনের ওপর বসে আছে। অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। ছপছপ শব্দ। ছিটকে আসে জল। সোনামিথি উদাস কণ্ঠে বলে, ওই দিকে তাকাও। ডানে। আলো দেখতে পাবে না। শুধু বুঝে নাও। ওখানে একটি ক্যাম্প আছে। ওই ক্যাম্পটার কাছাকাছি আমার বারুয়া মাঝির নৌকায় ব্রাশফায়ার–।

সোনামিথি কথা শেষ করে না। লোকটি বুঝতে পারে এতোক্ষণে সোনামিথির কণ্ঠস্বর ভিজে গেছে।

ও এবার একটু কাঁদুক। ওর বারুয়া মাঝির জন্য কাঁদুক। এতোক্ষণ ও বারুয়ার কথা একবারও বলেনি। লোকটির মনে হয় বারুয়ার কথা বলার জন্য ওর একটি নদীর দরকার ছিলো এবং একটি ক্যাম্পের অদৃশ্য অবস্থান। এ ছাড়া বারুয়া মাঝি এবং ব্রাশফায়ার বুঝি এক হয় না। এক না হলে সোনামিথি কাঁদবে কেন। সোনামিথি কাঁদুক। লোকটি দু'কান ভরে কান্না শোনে।

১১

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ।

কদিন টানা বৃষ্টি হলো। এ বছরে বর্ষা বেশ জোরেসোরে শুরু হয়েছে। লোকটি বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে যাচ্ছে। ও জানে আগামীকাল রাতে ১ম ইস্ট বেঙ্গল কামালপুরের বি.ও.পি আক্রমণ করবে।

বৃষ্টি মাথায় করে ক্যাম্পে পৌঁছতেই ক্যাপ্টেন আমিন মৃদু হেসে বললো, বেশ আনন্দে ভিজেছো মনে হয়?

আনন্দ তো বটেই। পাকিস্তান আর্মিতো বর্ষা কাকে বলে দেখেনি। এবার দেখবে।

আমিন ওকে তোয়ালে এগিয়ে দেয়। ও মাথা নেড়ে বলে, লাগবে না। জল শরীরই টেনে নেবে।

ঠাণ্ডা লাগবে তো?

ও জিনিস আমার কাছে আসে না। ভয় পায়।

বেশ মজবুত শরীর। ইস্পাত না লোহার?

অষ্টধাতুর, বলেই হা-হা করে হাসে লোকটি। আমিনও হাসতে থাকে। ও জানে লোকটি এমনই।

চা খাওয়াবে?

কয় কাপ?

বারো কাপ।

আমিন একজনকে ডেকে চা আনতে বলে। লোকটি চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে টান হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে, আমাদের ব্যাঘ্র কই?

ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের কথা বলছো?

তবে আর কে। বেটা এ মাসের প্রথমদিকে কোয়েটা থেকে পালিয়ে এলো। এসেই শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

লোকটি গভীর চোখে আমিনের দিকে তাকায়। আমিন বলে, আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে। পাকিস্তান আর্মি আমাদের আক্রমণ করতো। এখন ওরা কৌশল পাল্টেছে। ওরা ডিফেন্সে চলে গেছে। আমরা আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়েছি।

চা আসে। গুণে গুণে বারো কাপ চা খায় লোকটি। তারপর মৃদু হেসে বলে, আক্রমণকারীদের ব্যাঘ্র হতে হয়। ওদেরই সাহস বেশি থাকে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সবাই ব্যাঘ্র। তবে এর মধ্যে কেউ বড় বাঘ, কেউ ছোট বাঘ, কেউ বাচ্চা বাঘ।

হা-হা করে হাসে আমিন। বলে, ঠিকই বলেছো। ডিফেন্সে যারা থাকে তারাতো বাঙ্কারে থাকে। ফলে ওরা ডাইরেক্ট আর্টিলারি শেল থেকে রক্ষা পায়। ছোট অস্ত্রের আক্রমণ থেকে তো পায়ই। এজন্যই অনেক সময় দেখা যায় আর্টিলারি শেল, ট্যাংক, বিমান হামলা ইত্যাদি করে একটি ডিফেন্সকে ধ্বংস করে ফেলার পরও দু'একজন সাহসী সৈনিক বাঙ্কারের ভেতরে লুকিয়ে না থেকে আক্রমণকারীদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারে। এজন্য দরকার নিখুঁত পরিকল্পনা। এটা কখনোই সম্ভব হয়না, যদি কমাণ্ডার নিজে রেকি পেট্রোলিং না করতে পারে।

তখন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে ঢোকে।

লোকটিকে জড়িয়ে ধরে বলে, ব্রেভো তুমি এখানে?

এসেই তোমাকে খুঁজেছি। আমিনকে জিজ্ঞেস করো।

আমিন হাসতে হাসতে বলে, আসলে তুমি ওকে খোঁজনি, খুঁজেছো ওর ভেতরের বাঘকে। নাও, মুড়ি খাও।

সালাউদ্দিন খবর কাগজ বিছিয়ে মুড়িগুলো ঢেলে দেয়। মুড়ি খেতে খেতে সালাউদ্দিন বলে, সেদিন অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসার পর সাহস আরো বেড়ে গেছে, বুঝলে। বুঝে গেছি যে আমরা পারবো। কবে? শুধু এটুকুর অপেক্ষা।

শুনি, তোমার দুঃসাহসী অভিযানের গল্প।

লোকটি সালাউদ্দিনের চোখে চোখ রাখে। সালাউদ্দিন একগাল মুড়ি চিবিয়ে শেষ করে বলে, সেদিন পেট্রোলিং করতে গিয়ে আমি আর হাই যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি ভাবলে এখনো গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়।

দেখি তোমার পশম সোনালি কিনা?

লোকটি ওর বুকে হাত দেয়।

বাজে বোকো না। আমার পশম কালোই। যুদ্ধে জেতার পর ওই কালো রঙ সোনালি হবে।

সাবাস। লোকটি অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করলে আমিন চমকে লোকটির দিকে তাকায়। সালাউদ্দিন লোকটির কণ্ঠস্বর তেমন করে শুনতে পায় না। বলতে থাকে, কামালপুর বি.ও.পি. হলো শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। বুঝতেই পারো এটি হলো জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের প্রবেশদ্বার। ওরা বাঙ্কারগুলো খুব মজবুত করে তৈরি করেছে।

লোকটি হাসতে হাসতে বলে, বেহুলা-লখিন্দরের লোহার ঘরের চাইতেও মজবুত?

ওদের বাসর ঘরে তো সাপ ঢোকার জন্য একটা ফুটো ছিলো। এরা সেটাও রাখেনি। শোনো করেছে কি বাঙ্কারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল, এরপর ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বীম। এরপর এই একই রকম ব্যবধানে সিমেন্টের শক্ত ঢালাই। বাঙ্কারের ওভারহেড কাভারও এভাবেই তৈরি করা। প্রতিটি বাঙ্কারই ঘরের মতো উঁচু। সবচেয়ে অবাক হয়েছি এদের পুরো ডিফেন্সে টানেলের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া মাইন, বুবিট্র্যাপ আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দুর্গের মতো করে রাখা হয়েছে। সেদিন আমি তৃতীয়বারের মতো রেকি পেট্রোলিং-এ গিয়েছিলাম। বি.ও.পি.র কাছে অন্যদের ক্ষেতের আলের ওপর বসিয়ে রেখে আমি সুবেদার হাইকে নিয়ে বাঙ্কারগুলো রেকি করতে গেলাম। আগেই টের পেয়েছি যে পাকিস্তানি সৈনিকরা রাতের বেলা সবসময় সেকেণ্ড লাইন ডিফেন্সে চলে যায়। ওরা দিনের বেলায় বড় এলাকা জুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকে, রাতের বেলায় দূরের বাঙ্কারে থাকতে সাহস পায় না। সেগুলো ছেড়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে আসে। আমি আর হাই খালি বাঙ্কার পেয়ে বেশ ভেতরে ঢুকে পড়ি। হঠাৎ দেখি দুজন শত্রু পেট্রোলিং করে ফিরে আসছে। একদম মুখোমুখি হয়ে যাই। চিন্তা করার সময় ছিলো না। আমার মাঝারি শরীর নিয়ে ছয় ফুট লম্বা খানসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওর হাতে ছিলো ৩০৩ রাইফেল। ও প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। ভেবেছে ওর সঙ্গী বুঝি রসিকতা করছে। কিন্তু পরক্ষণেই ও বুঝতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশালদেহী শুয়োরটা আমাকে নিচে ফেলে দিয়ে গলা চেপে ধরে। আমি মরীয়া হয়ে চিৎকার করে মান্নানকে ডাকি। ওরা তো বাইরে অপেক্ষা করছিলো। মান্নান ছুটে এসে স্টেনগান ধরে জিজ্ঞেস করে, উপরে কে? আমার মুখ দিয়ে ঠিকমতো শব্দ বেরুচ্ছিলো না। তবু কোনোরকমে বলি, উপরে তো ঐ শালা। মান্নান তাড়াতাড়ি পজিশন নেয়। এদিকে অন্য খানসেনা হাইকে হ্যাণ্ডসআপ বলার সঙ্গে সঙ্গে মান্নান ওকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। হাই ওর জি-থ্রি রাইফেল কেড়ে নেয়। ও আর দাঁড়ায় না। মুহূর্তে পেছনের বাঙ্কারে ঢুকে পড়ে। ওকে পালাতে দেখে নায়েক শফি গুলি করে। গুলি কারো গায়ে লাগে না। হাই ও খানসেনার মাঝখানে দিয়ে চলে যায়। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর অন্য বাঙ্কার থেকে গুলি আসতে শুরু হয়। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বোধহয়। গুলি বাঁ পাশের দেয়ালে গিয়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাই সেই বাঙ্কার লক্ষ্য করে স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন গুলি ছোঁড়ে। ও গুলি ছুঁড়ে জি-থ্রি রাইফেল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। তারপর খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টারত খানসেনাকে স্টেনের ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিলে ও আমাকে ছেড়ে দৌড় দেয়। হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বেটা মরেছে কিনা জানতে পারিনি। আমরা ওদের রাইফেল দু'টি নিয়ে কেটে পড়ি।

কথা শেষ করে সালাউদ্দিন দু'আঙুলের ভি দেখিয়ে গান গায়, নাই, নাই ভয়—হবে, হবে

জয়।

আমিন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, দেখো ওর অবস্থা। রেকি করেই ভাবছে বিশ্বজয় করে ফেলেছে।

সালাউদ্দিন হা-হা করে হাসতে হাসতে বাইরে যায়। ওর এই এক অভ্যেস। অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে পায়চারি করে। বলে, অন্ধকারে আমার মাথা খোলে বেশি। আলোয় বসে আমি চিন্তা করতে পারিনা।

অন্ধকার ! লোকটি শব্দটি বলে উঠে দাঁড়ায়।

আমিন অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছো ?

আসছি।

আসছি বলে আবার উধাও হয়ে যেওনা। ত্রিশ তারিখ রাতে আমরা কামালপুর বি.ও.পি. আক্রমণ করবো।

লোকটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। আমিন ঘাবড়ে যায়। কেমন অদ্ভুত হাসি। বুকের ভেতর কাঁপন জাগিয়ে দেয়। ও মুখে কিছু বলে না। দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। দুটি লোক বেরিয়ে যাবার পরও ও নড়তে পারেনা। স্থানুর মতো বসে থাকে। বুঝতে পারে লোকটির সঙ্গে সালাউদ্দিনের কি যেন কথা হচ্ছে সেটা ওর কানে এস পৌঁছাচ্ছে না।

লোকটি তখন শত্রু শিবিরে। ডিফেন্স টানেলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সালাউদ্দিন আর হাইয়ের সাহস এবং উপস্থিতভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মানসিক ক্ষিপ্রতা ওকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু ডিফেন্সে অবস্থানরত সৈনিকদের কথায় বোঝে যে এই রেকি পেট্রোলিংয়ের ফলে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ হবে বলে ওরা আশঙ্কা করছে। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে। রাজাকারের বাহিনী ছাড়াও ৩১-বেলুচ ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা হয়েছে দুই কোম্পানি। ও যখন হেঁটে যায় হঠাৎ করে কেউ চিৎকার করে ওঠে, কোই হ্যায় ? সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অন্যরা। হুড়োহুড়ি পড়ে. কিন্তু কাউকে কোথাও দেখা যায় না। ওরা আশ্বস্ত হয়ে আবার রুটি, গোস্ত খেতে শুরু করে। কিন্তু পরক্ষণে আবার একটি হাঁক, কোই হ্যায় ? ওদের এই ভীত-সন্ত্রস্ত মনোভাব লোকটিকে আনন্দ দেয়। ও ডিফেন্স টানেল থেকে বেরিয়ে আসে।

সালাউদ্দিন তখনো অন্ধকারে একা বসে আছে। গায়ে সাদা শার্ট। দূর থেকে বোঝা যায়। অন্ধকারে সাদা শার্ট ফুটে থাকে। লোকটি ওর কাছে এসে বসে।

কি ভাবছো ক্যাপ্টেন ?

অপারেশনের কথা।

এই শার্ট পরে অপারেশনে যেওনা। শত্রু দূর থেকেই বুঝে ফেলবে।

পাগল। এই শার্ট পরে কেন যাবো। খুলে ফেলবো।

তুমি ভুলে যাবে খুলতে।

সালাউদ্দিন হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ ভুলে যেতেও পারি। শার্টটা আমার ভীষণ প্রিয়। রিলিফের শার্ট কিনা।

লোকটি চুপ করে থাকে।

সালাউদ্দিন আবার হাসতে হাসতে বলে, যুদ্ধের সময় রিলিফের শার্টই যথেষ্ট। খালি গায়ে যে থাকতে হচ্ছে না এই তো বেশি।

ও আবার হাসে। বুঝতে পারে না এতো হাসি কেন যে পায়। হেসেটেসে থেমে গেলে দেখতে পায় লোকটি নেই। ও অবাক হয় না। ও জানে লোকটি এমনই। এই আছে, এই নেই।

ত্রিশ তারিখে আক্রমণের সময় ছিলো রাত সাড়ে তিনটা। ওরা রাতের আঁধারে যাত্রায় প্রস্তুত। প্রথমে সালাউদ্দিনের ডেল্টা কোম্পানি, ওর পেছনে আছে ক্যাপ্টেন হাফিজের ব্রেভো কোম্পানি, ওর পেছনে মেজর মঈনের আর গ্রুপ আর ওর সাথে ছিলো কর্নেল জিয়াউর রহমান। নিজের বিগ্রেডের প্রথম আক্রমণ উপস্থিত থেকে দেখবে বলে সে এটাকিং গ্রুপের সঙ্গে রওনা করে। বর্ষা ঋতুর আকাশ। চাঁদ থাকলেও যখন তখন মেঘের আড়ালে চলে যায়। যাত্রা করার পর ওরা বুঝতে পারে যে ঠিকমতো গাইড করে কেউ নিয়ে যেতে পারছে না। ফলে ইস্ট বেঙ্গল এফ.ইউ.পি.-তে সময়মতো পৌছতে পারেনা। এদিকে টাইমপ্রোগ্রাম অনুযায়ী ঠিক রাত সাড়ে তিনটায় ফায়ারের সংকেত ধ্বনি 'হিস' শব্দ ওয়্যারলেসের ওপর ধ্বনিত হয়। কথা ছিলো এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারি ফায়ার শুরু করবে। কিন্তু সংকেত পাওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধারা এফ.ইউ.পি-তে পৌছানোর জন্য প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। অসংখ্য পায়ের চাপে কাদামাটিতে শব্দ হয়। একসঙ্গে দৌড়ে যাবার ফলে সেই শব্দ শত্রুদের বুঝিয়ে দেয় আক্রমণকারীর অবস্থান কোনদিকে। সেই শব্দ অনুযায়ী ওরা নিজেদের আক্রমণের দিক ঠিক করে ফেলে। এবং মুহূর্তে ওদের আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে থাকে।

লোকটি কারো সঙ্গে নেই। ও একা। দেখতে পায় ডানদিকে চরম বিশৃঙ্খলা। ও সালাউদ্দিনকে খোঁজে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ হওয়ার ফলে মুক্তিযোদ্ধারা আগেপিছে হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলায় কমাণ্ড কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এদিকে এসেম্বলি এরিয়া থেকে আগে নির্ধাবিত এফ ইউ.পি.-তে আসার মাঝপথে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্টিলারি ফায়ার শুরু হওয়াতে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল কোনো রকমে ফর্ম-আপ হতে থাকে। চারদিকে হট্টগোল। লোকটি এক একজনের হাত ধরে টেনে পজিশন ঠিক করে দেয়। এডভান্স করার সময় একে অন্যের ওপর পড়ে যায়। ওদের দোষ কি? লোকটি ওদের কানে কানে কথা বলে। কোনদিকে যেতে হবে। এদিকে কিছু ছেলে ক্রস ফায়ারিং-এ পড়ে আহত হয়। ওদের আর্ত চিৎকার লোকটিকে ব্যাকুল করে তোলে। লোকটি তখন বুঝতে পারে যে ওয়ারল্যাস সেট জ্যাম হয়ে গেছে। ফলে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হযে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা একদমই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় যোদ্ধারা পিছু হটে যেতে পারে। সে সময় জিয়াউর রহমান চিৎকার করতে থাকে, কাম অন, এ্যাট এনি কস্ট উই উইল লঞ্চ দ্য এ্যাটাক। মেজর মঈন ওয়্যারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। তখন সালাউদ্দিন আর হাফিজ একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টায় ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

লোকটির মনে হয় এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ যেন যুদ্ধের ভেতরে অন্য রকম যুদ্ধ। যাত্রা করার সময় সবার সামনে যে পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে সাজানো ছিলো, সেটা সময়ের সামান্য হেরফেরে একদম উল্টে গেছে। এখন সবার সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চিৎকার। উত্তেজনা। ক্রোধ। শৃঙ্খলাহীনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে সালাউদ্দিন আর হাফিজ। লোকটি কিছুক্ষণ আগে ক্রস ফায়ারিংয়ে যারা আহত হয়েছে তাদের কাছে এসে বসে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ওরা দাঁতে ঠোঁট চেপে কষ্ট দমন করছে। গোঙ্গানো চলবে না, চিৎকারও না। লোকটির স্পর্শ পেয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কে? লোকটি বলে, দেখো

তোমাদের মাথার ওপর আকাশ নেমে এসেছে। তোমরা হাত বাড়ালে নক্ষত্র ছিঁড়ে আনতে পারো। তোমাদের সামনে থেকে সব অন্ধকার মুছে যাবে।

একজন রাগত স্বরে বলে, আমাদের সামনে কোনো অন্ধকার নেই।

অন্যজন বলে, তুমি কে যে আমাদেরকে এমন বাজে কথা শোনাতে এসেছো?

আর একজন বলে, তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও। যুদ্ধ করো। তোমার অস্ত্র কোথায়?

কেউ একজন মৃদু স্বরে ফুঁপিয়ে বলে, হায় আল্লাহ্ আমি কেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হলাম। আমি শত্রু খতম করতে পারলাম না কেন?

লোকটি তখন সালাউদ্দিনের কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে।

সালাউদ্দিন মেগাফোনে বাংলা-ইংরেজি-উর্দু মিশিয়ে তার সৈন্যদলকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। কারো জামার কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে টারগেটমুখী করে দিচ্ছে। কাউকে থাপ্পড় দিয়ে সোজা করে দিচ্ছে। ক্যাপ্টেন হাফিজ কাউকে স্টেনের বাট দিয়ে মারছে, যেন পারলে ওর পিঠের ওপর বাটটা ভেঙে ফেলবে।

আহত ছেলেদের কেউ একজন বলে, তুমি কি আমাদের এখানে আছো?

লোকটি কথা বলে না। ওরা ক্রুদ্ধস্বরে গালি দেয়, শুয়োরের বাচ্চা তুমি যুদ্ধ করতে ভয় পাও? বানচোত।

লোকটি ওদের কণ্ঠে সালাউদ্দিনের কণ্ঠ শুনতে পায়। ও ওদের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে আসে। দেখে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন আর ক্যাপ্টেন হাফিজ নিজ নিজ সৈনিকদের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। কি প্রচণ্ড সাহস আর মনের জোরে দু'জনে সব বাধা অতিক্রম করেছে। সুচারুভাবে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য তৈরি হয়েছে ওরা।

লোকটি সালাউদ্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, সাবাস সালাউদ্দিন। কিন্তু কথা ছিলো তুমি এই সাদা শার্টটি পরে যুদ্ধক্ষেত্রে আসবে না।

আর কথা বলো না। শার্ট খোলার কথা আমার মনে ছিলো না। আমরা এখন সামনে এগুচ্ছি।

মাত্র এগিয়েছে অমনি পাকিস্তানি আর্টিলারির সেলভো ফায়ার এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ে যোদ্ধারা। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের মনে হয় শেলটা বুঝি ওর মাথার ওপরে পড়েছে, না তাও নয়। খুলিটা ফাঁক না করেই ওটা ঢুকে গেছে ভেতরে। নিমেষে ওর ভেতরটা টগবগ করে ফুটতে থাকে। শেষ মুহূর্তে কি আর আক্রমণ করা হবে না ভাবতেই ও হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, অসম্ভব, ব্যর্থতার গ্লানি বহন করা অসম্ভব। নিমেষে শরীর ঝাঁকিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাতের কাছে যে ছিলো তার কলার চেপে ধরে এবং ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে ঠেলে দেয়। একের পর এক, কেউ বাদ পড়ে না। সালাউদ্দিন এক ক্ষ্যাপা দুর্বাসা—হাত চলছে, পা চলছে, মুখ চলছে—স্রেফ চলাতো নয়, চলছে অকথ্য ভাষায় গালি—বেশরম, বেগায়রত, শালা নিমকহারামের দল—আগে বাড়ো। মুহূর্তে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়। সৈনিকদের ভেঙে-পড়া মনোবল চাঙ্গা করে তোলার জন্য আবার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। নিজেদের শক্ত অবস্থান জাহির করার জন্য মেগাফোন নিয়ে পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় বলতে থাকে, 'আভিতক ওয়াকত হায়, শালালোক সারেণ্ডার করো। নেহীতো জিন্দা নেহি ছোড়েংগা।'

শুরু হয়ে যায় সৈনিকদের প্রলয় হুংকার—ধাবমান মহাপ্রলয়, সঙ্গে প্রলয়সম রণধ্বনি 'জয় বাংলা'। প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যুদ্ধক্ষেত্র। প্রথম ইস্টবেঙ্গল প্রয়লকাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে পাকবাহিনীর

ডিফেন্সের প্রথম সারির বাঙ্কারগুলো ছত্রভঙ্গ করে ফেলে। তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া বিশ-পঁচিশজন যোদ্ধা কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় হাতাহাতি যুদ্ধ। একটু আগে যারা হতোদ্যম হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলো, ভেবেছিলো এখানেই বুঝি শেষ—তারা এখন আর নিজেদের মধ্যে নেই। সাতকোটি বাঙালির অযুত শক্তি প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে। ওরা কেউ আর একক নয়। শত্রু শিবিরে লন্ডকাণ্ড। বেশ কয়েকজন যোদ্ধা শহীদ হয়ে গেছে। ওদের লাশ সরিয়ে আনা শুরু হয়েছে। লোকটি একাই। দু'কাঁধে দুজন। কেউ প্রশ্ন করছে না যে ও কিভাবে পারছে। ভাবছে এটাই স্বাভাবিক। লোকটির মনে হয় এতো দ্রুত সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে কেন? ওতো অনন্তকাল যোদ্ধাদের লাশ বয়ে বেড়াতে পারে। ওর গায়ে কোনো রক্ত লাগছে না। ওর শরীর ভিজে যাচ্ছে না। শুধু যারা শহীদ হয়েছে তারাই রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

একজন আহতকে কাঁধে তুলে নিলে ও ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে। ওর দুই উরুতে গুলি লেগেছে। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রক্তের স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে। ও তখনো বলে যাচ্ছে, আপনি আমাকে আনলেন কেন? আর সামান্য বাকি—কি হতো আমি না হয় মরে যেতাম।

লোকটি ওর কানে কানে বলে, আমরা তো মরতে দিতে চাইনা। তোমাদের সুস্থ করে তুলবো। তোমরা আবার যুদ্ধ করবে।

সৈনিকটি আর কথা বলে না। লোকটি অনুভব করে ওর কাঁধের ওপর নেতিয়ে যাচ্ছে একজন যোদ্ধার শরীর। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে যেতে ও হয়তো মরেই যাবে। ওকে কাঁধ থেকে নামানোর সময় লোকটি অনুভব করে ও আর বেঁচে নেই। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল আকুতি নিয়ে ও মরে গেলো। এভাবে প্রত্যেকে, যারা আহত হয়েছে, তারা ফিরে আসতে চায়নি। ছটফট করেছে। বলেছে, আমাদের সরিয়ে নেবেন না। আরো কিছুক্ষণ থাকতে দিন। আমরা না হয় লড়েই মরবো। লোকটির মনে হয় এইসব কথা নিয়ে ছুটে যেতে হবে প্রতিটি রণাঙ্গনে। প্রত্যেক যোদ্ধার কাছে। শোনাতে হবে অমৃতের সন্তানদের যুদ্ধে লড়ে মরার আকাঙ্ক্ষার এক অলৌকিক গল্প। লোকটি দু'হাত প্রসারিত করে দিলে শহীদেরা ওর বুকের মধ্যে এসে জড়ো হয়। লোকটি দু'হাতে ওদের জড়িয়ে ধরে বলে, তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের সবার হৃদয়ে।

তখন জিয়াউর রহমান উদ্বিগ্ন। কঠিন কণ্ঠে মেজর মঈনকে বলে, আই উইল এ্যাকসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাজুয়ালটি, বাট কিক দেম আউট মঈন।'

এদিকে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মেগাফোনে হাইকে তার প্লাটুন নিয়ে ডানে সরে যেতে বলছে। ও বুঝতে পারছে যে মাইন-ফিল্ডে সুবেদার হাই খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে। পাকিস্তান আর্মি মাইন-ফিল্ডের পেছনের বাঙ্কারগুলো ছেড়ে দিয়ে আরো পেছনে সেকেণ্ড লাইনে সরে গেছে। ওখান থেকে ওরা কাউন্টার এ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাই তার প্লাটুন নিয়ে ডানে সরে না গেলে বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আক্রমণের শুরুতে হাইয়ের সঙ্গে ছিলো চল্লিশ জন। এখন সে সংখ্যা পনেরো কিংবা বিশ। অন্ধকারে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। সালাউদ্দিন মরীয়া হয়ে উঠেছে। ঘামে ভিজে গেছে সাদা শার্টটি। তখুনি মাইনের আঘাতে নায়েক শফির হাত উড়ে গেলে ও পড়ে যায়।

লোকটি শফিকে উঠিয়ে নেয়। আবার লোকটির কাঁধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার সময় শফি শুনতে পায় লোকটির কাঁধ বুঝি কথা বলছে। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ধুয়ে দিচ্ছে ওর যন্ত্রণা। সব কষ্ট ভুলে ও আবার সজীব হয়ে উঠছে। শফি ওর অন্য হাতটি দিয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরে।

তখন ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত হয়ে শত্রুদের ধাওয়া করে সালাউদ্দিন। লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে। হাঁক দিয়ে বলে, সালাউদ্দিন সাবধান। কিন্তু শুনতে পায় না সালাউদ্দিন। শোনার মতো মনের অবস্থা ওর নেই। এদিকে সৈনিকরা বারবার অনুরোধ করে, স্যার পজিশনে যান।

দু'দিক থেকে গোলাগুলি হচ্ছে। মাঝামাঝি জায়গায় ওরা। একজন সৈনিক আবার চেঁচিয়ে ওঠে, স্যার শুয়ে পড়ুন।

ধমকে ওঠে সালাউদ্দিন, বেটা স্যার, স্যার করে চিৎকার করিস না। শত্রুরা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। চিন্তা করিসনা তুই, বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া। গুলি লাগবে না। ইয়াহিয়া খান আজও আমার জন্য গুলি বানাতে পারে নি।

সালাউদ্দিনের কণ্ঠ লোকটির কানে পৌঁছলে ও অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে সালাউদ্দিনের দিকে তাকায়। গুলি বর্ষণের এমন প্রলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কথা বলা ওব পক্ষেই সম্ভব। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই সাতকোটি বাঙালি এখন ওর ভেতরে প্রবেশ করেছে। ও ভয়হীন, শঙ্কাহীন, দ্বিধাহীন এবং বেপরোয়া।

লোকটি দেখলো সালাউদ্দিন মেগাফোন উঠিয়ে 'হাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি বোমা এসে পড়ে ওর সামনে। ওর শরীরটা প্রথমে ডানে মোচড় দেয়, পরে আধা ডানে ও শেষে ধড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে যায়। আশেপাশের যোদ্ধারা ছুটে আসে ওর কাছে।

বলে,স্যার কলেমা পড়েন।

সালাউদ্দিন প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও চিৎকার করে ওঠে, আমার কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কসম যে পেছনে হটবি তাকে গুলি করবো।

লোকটি শুনতে পায় এরপরও সালাউদ্দিন বিড়বিড় করে বলছে, মরতে হয় তো এদেরকে মেরে মর। বাংলাদেশের মাটিতে মর। অনেকদূর থেকে কথাগুলো শুনে লোকটির মনে হয় ওর পা মাটিতে ডেবে গেছে। ও গাছ হয়ে গেছে। ওর আর নড়ার ক্ষমতা নেই। ও বুঝতে পারে এ মৃত্যু আনন্দের, গৌরবের। জয়ের সত্য ছাড়া ওর সামনে আর কোনো সত্য ছিলো না। স্বাধীনতার স্বপ্ন ছাড়া ওর সামনে আর কোনো স্বপ্ন ছিলো না। ওর নিজের কি সাধ্য যে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের পবিত্র দেহ স্পর্শ করে। ও নিজে কি এমন একটি মৃত্যুবরণ করতে পারবে?

উঁচু মাটির ঢিবির ওপর পড়ে আছে সালাউদ্দিন। ওটা শত্রুপক্ষের এলাকা। দু-তিনজন জোয়ান ছুটে যায় লাশটি টেনে আনার জন্য। গুলিবিদ্ধ হয় ওরা। এভাবে সতেরোজন যোদ্ধা যায় সালাউদ্দিনের লাশ আনতে। আহত হয়ে ফিরে আসে। শত্রুদের প্রবল গুলিবর্ষণ ধোঁয়াটে করে রেখেছে এলাকা। লোকটির মনে হয় সালাউদ্দিনকে ঘিরে আকাশ থেকে নেমে এসেছে কুয়াশা, অপূর্ব নীলাভ কুয়াশা। সালাউদ্দিনের শরীর নরম-পেলব করে রেখেছে। কোথাও বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়ার চিহ্ন নেই। লোকটি সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগুতে থাকে।

তখন ছুটে আসে বাবর।

লোকটি দু'হাতে ওকে ধরে ফেলে।

ছোড় দিজিয়ে মুঝে, ছোড় দিজিয়ে।

নেহি।

লোকটি ওর হাত চেপে ধরে। ছেলেটি বিহারি। কত বয়স হবে ওর? চৌদ্দ কিংবা পনেরো? কিন্তু ওকে ধরে রাখার সাধ্য লোকটির হয় না। ও সালাউদ্দিনের ভক্ত। ওর জন্য জীবন দিতে পারে। ও দৌড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়। গুলি খেয়েও সালাউদ্দিনের লাশটা টেনে আনার চেষ্টা করে। পারে না। পরপর আটটি গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে থাকে।

লোকটি টিবির ওপরে পৌঁছলে দেখতে পায়ে পাকসেনাদের তিনজন লাথি দিয়ে সালাউদ্দিনের লাশ গড়িয়ে ফেলে দিতে দিতে বলে, শালা গাদ্দার!

সালাউদ্দিন বাংলাদেশে পৌঁছে যায়। ও চেয়েছিলো বাংলাদেশের মাটিতে মরতে। সেটাই হয়েছে। ওর স্বপ্ন সত্য হয়েছে।

লোকটি সালাউদ্দিনের মুখ স্পর্শ করে। চুল ছুঁয়ে দেখে। ক্ষতবিক্ষত শরীরটায় হাত বুলোতে থাকে। রিলিফে পাওয়া সাদা শার্টটা লাল হয়ে গেছে। তখন কয়েকজন এসে সালাউদ্দিনের দু'পা ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। লোকটি বলতে থাকে, তোমরা ওকে নিয়ে যাও। বঙ্গোপসাগরের পাড় পর্যন্ত নিয়ে যাও। ওর শরীর ছুঁয়ে যাক এদেশের মাটি। ওর শরীর ধুয়ে দিক এদেশের সব নদী। এ দেশের সব গাছ থেকে ফুলে ঝরে পড়ুক ওর শরীরের ওপর। তখন ওরা চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করে, কৌই হ্যায়?

গুলিবর্ষণ থেমে গেছে। শুধু গোঙানির শব্দ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ও দেখতে পায় ওরা আতঙ্কিত হয়ে সালাউদ্দিনের লাশ নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। দেশের মাটিতে গড়াতে গড়াতে ও দেশের ভেতরে চলে যাচ্ছে। মাটি-ঘাস-লতাপাতা লেপ্টে যেতে থাকে ওর শরীরে। যেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায় মুড়ে যাচ্ছে ওর শরীর।

লোকটি আনন্দ চিত্তে ফিরে আসে। এই অসাধারণ মৃত্যু ওকে গভীর আনন্দে অশ্রুসিক্ত করে। ও ফেরার পথে কুড়িয়ে নেয় সালাউদ্দিনের ঘড়ি, স্টেনগান ও কাগজপত্র।

ক্যাপ্টেন আমিনের হাতে এগুলো দিলে আমিন ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ক্যাম্পে কান্নার রোল ওঠে।

১২

যেদিন সরস্বতী আর হেমন্ত চলে গেলো সে সন্ধ্যায় নিখিল আবদুর রহমানের সঙ্গে মগরেবের নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। দুপুরের আগে ও যমদূতদের সামনে কলেমা মুখস্থ বলতে পেরে জীবন বাঁচিয়েছে। এখন নামাজ পড়তে এসেছে। দু'টো ঘটনা একই সমান্তরালের, ঘটেও গেলো একই সমান্তরালে। নামাজের আগে আবদুর রহমান ওকে ওজু করতে শিখিয়েছে। বলেছে, *বিশ্বাসের কথা না নিখিল বাবু, শুধু নিয়ম জানা। কিভাবে করতে হবে শুধু এটুকু শিখলেই হবে।* ভুলে যদি যান তাহলে আমার দিকে তাকাবেন। আমি যা করবো তাই করবেন।

আবদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নামাজ পড়া হলো নিখিলের। বুকের ভেতর শুধু

একটাই কথা একই সমান্তরালে ঘটে যায় ঘটনা। এখন ধর্ম আর বিশ্বাস নেই, ওটা ঘটনা, আচরণ, নিয়মপালন। ও বুকের ভেতর থেকে এভাবে দুঃখ সরাতে চায়।

রাতে সরলা নিচে বিছানা পাতলো। নিখিল খুব আহত হয়ে বললো, তুমি আমাকে পর করে দিলে দেবেশের মা?

সরলা কথা বলে না। গায়ের ওপর কাঁথাটা টেনে দেয়। নিখিল আবার বলে, তুমি বিশ্বাস করো আমি মুসলমান হইনি দেবেশের মা।

এবারও সরলা কোনো কথা বলে না। নিখিল খাট থেকে নিচে নেমে সরলার পাশে বসে। গায়ে হাত রাখলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সরলা, খবরদার ছোঁবে না।

ছোঁবো না? তুমি আমার স্ত্রী।

যতোদিন যুদ্ধ চলবে ততোদিন ছোঁবে না।

তুমি না বলেছিলে বেঁচে থাকার জন্য সব পারো।

বলেছিলাম। এখন দেখছি মানা অনেক কঠিন।

মসজিদে গিয়ে আমি একা বাঁচতে চাইনি। তোমাদেরকেও বাঁচাতে চাই।

সরলা আকস্মিকভাবে চিৎকার করে কেঁদে বলে, বাঁচাও, বাঁচাও। সবাইকে বাঁচাও।

নিখিলের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। শূন্য মনে হয় সবকিছু। সরলার সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে খাটে উঠে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের মানসিক-শারীরিক ধকলে ও খুব পরিশ্রান্ত ছিলো। এতোকিছু তোলপাড় করা ঘটনার পরও ওর ঘুম আসে। নিজেকে বলে, আমার কাছে আমি ঠিক আছি। আমার ভেতরে কোনো ফাঁকি নেই। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলো সরলা তুলসীতলাটা সমান করে ফেলেছে। লক্ষ্মী ওর কাছে দাঁড়িয়ে বললো, মাকে অনেক নিষেধ করেছি। মা শোনেনি। মা কি রেগে আছে বাবা?

হ্যাঁ। নিখিল নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে।

কেন? লক্ষ্মী উৎসুক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিখিল জবাব দেয় না। সরলার কাছে গিয়ে বলে, ভাঙলে কেন?

বাঁচার জন্য। আমি একা বাঁচতে চাই না। সবাইকে বাঁচাতে চাই।

অবিকল নিখিলের ঢঙে কথা বলে। কথা না বাড়িয়ে নিখিল কুয়োতলার দিকে হেঁটে যায়।

আরো কিছুক্ষণ পর মিলিটারি আসে গাঁয়ে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা গাঁয়ে প্রবেশ করেছে। ওদের হা-হা উন্মত্ত, পৈশাচিক হাসিতে বাতাসে মাতম জেগেছে — সে ধাক্কায় ঝরে যায় হলুদ পত্ররাজি। গাঁয়ের পথগুলো ভরে ওঠে ঝরা পাতায়। একটি শান্ত, স্নিগ্ধ, শ্যামল গাঁয়ের নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীরা দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম আছে। সে প্রকৃতি ও তার মানুষকে যে কেউই নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ বাতাস দেখতে পায় না, বাতাস ছুঁতে পারে না, শুধু বাতাসের অনুভব মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। বাতাসের গর্জন মানুষ অনুভব করে এবং সে গর্জন শুনে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় করে। মানুষের প্রতিবাদ আছে, রুখে দাঁড়ানোর সাহস আছে, স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রের সামনে প্রাণ দেওয়ার প্রেরণা আছে। তাই ওদের আগমন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে দেখে। চোখের আগুন চোখের ভেতর লুকিয়ে রেখে মানুষ স্থির থাকে। ওরা লুটপাট করে। গরুর দড়ি খুলে হাতে নেয়, এক ডজন ছাগল একসঙ্গে বেঁধে ফেলে, বিশ-পঁচিশটা মুরগি-হাঁস জড়ো করে। মানুষের মাচার লাউ-কুমড়ো ছিঁড়ে ফেলে। লাল শাকের ক্ষেত উজাড় করে দেয়, যেন ওদের রাক্ষসী ক্ষুধা — একগ্রাসে খেয়ে ফেলবে পুরো গাঁ।

লক্ষ্মী আর সুষমাকে বাগানের গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় শুকনো মুখে বসে থাকে নিখিল আর সরলা। সদর দরজা খোলা রেখেছে, যেন ওদের দরজা ধাক্কা দিতে না হয়। অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে বাড়ির অন্দরে, নিতে পারে ওদের ইচ্ছে মাফিক যা কিছু। একটুপর সদম্ভে বাড়ি কাঁপিয়ে ওরা আসে। চিৎকার করে, মুক্তি কিধার?

নিখিল ও সরলা নড়ে না। ওরা ঘরে ঢুকে তছনছ করে জিনিসপত্র, বাক্সপ্যাটারা, বিছানা-বালিশ। রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি উড়ে উড়ে এসে পড়ে উঠোনে। লাথ্থি দিয়ে ফেলে দেয় কুয়োর বালতি, ঘটি, কাপড় কাঁচার তক্তা। আর কি আছে নিখিল আর সরলার সংসারে? ওরা ভাবতে চায় না। ভাবতে পারেও না। একটুপর দেখতে পায় ওদের বুকের সামনে একজোড়া বন্দুকের নল।

মুক্তি কিধার?

জানিনা। নিখিল আর সরলা সজোরে মাথা নাড়ে।

আওরাত কিধার?

আওরাত? দু'জনে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

জানতা নেহি আওরাত কেয়া?

আওরাত নেহি হায়।

নেহি।

ওরা প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকায়।

নেহি? দাঁতমুখ খিচিয়ে ওঠে একজন। আওরাত নেহি তো তুম কেয়া? হা-হা করে হেসে ওঠে সবাই। দাঁতমুখ খেঁচানো দৈত্যটা বুড়ির কোমরে লাথি দিয়ে বলে, ইয়ে সাচ বাত নেহি, আওরাত হায়, তব বুড্ডি আওরাত।

লাথি খেয়ে নিখিলের ওপর ছিটকে পড়ে সরলা। কঁকাতে থাকে। নিখিল ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সরলা নিখিলের বুকের মধ্যে মাথা কাত করে রাখে। উঠোন কাঁপিয়ে চলে যায় ওরা। নিখিল সরলার মুখখানি তুলে ধরে, খুব লেগেছে?

হ্যাঁ।

নিখিল ওকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলে, তোমাকে ছুঁতে তুমি নিষেধ করেছিলে সরলা। আমরা তো দূরে থাকতে পারবো না। এই বুকটা তোমারই জন্য। এটা আর কেউ ছোঁবে না।

সরলার বুকফাটা কান্নায় তোলপাড় করে দু'জনের ঘর-গেরস্থি। একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়।

পরদিন দুর্গা ওর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার বাড়িতে আসে। ও বিধবা হয়েছে। কান্নার রোল ওঠে বাড়িতে। সরলা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা। সরষের তেলে রসুন ছেঁচে দিয়ে গরম করে কোমরে মালিশ করে দিয়েছে সুষমা। খানিকটুকু আরাম হয়েছে, কিন্তু হাঁটতে পারছে না। এখন মেয়ের বৈধব্য দেখে সরলার ব্যথা শতগুণ হয়ে ওঠে। দুর্গা মায়ের পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছে। মাথা কুটছে আর বিলাপ করছে। বলছে, ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে মিলিটারি। লাশ নদীতে ভেসে গেছে। লাশটাও খুঁজে পায়নি ওরা। এখন বাড়িতে শাশুড়ি একা। দুই দেবর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। দূরসম্পর্কের এই দেবরকে অনেক অনুনয় করে তবেই বাবার বাড়িতে আসতে পেরেছে দুর্গা।

সরলা মেয়ের মুখ দেখতে পায় না, মাথাভরা চুল দেখে। শরীরের কাঁপুনি দেখে এবং কণ্ঠভরা বিলাপও দেখে। কারণ সরলা কিছু শুনতে পায় না। ওর সামনে ছবিগুলো স্পষ্ট থাকে। একদিন আগে যমদূতের মতো মানুষগুলোকে দেখেছে ও। ওরা না এলে ওর হয়তো দেখাই হতো না। সুষমা দুর্গাকে টেনে নিয়ে যায়। সরলার পায়ে মেয়ের চোখের জল লেগে থাকে।

নিখিলের সামনে বসে সুরেশ বলে, মনোজদা আমাদের বলতো ভয় পাস না। দেখিস লড়াইয়ে আমরাই জিতবো। মনোজদা গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে একটা দল করেছিলো। যুদ্ধে যাবার আগেই মনোজদাকে ধরিয়ে দিলো হাবিব। ওর বাবা মুসলিম লীগের নেতা। কাকাবাবু আমরা ছাড়বো না। দেখবেন ওদের তাড়িয়ে ছাড়বো।

কবে ঘটলো ঘটনা ?

এখন থেকে এক মাস ছাব্বিশ দিন আগে। দেশ স্বাধীন হলে আমরা মনোজের নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ করবো। মনোজদার জন্যই তো আমরা এমন সংঘটিত হতে পেরেছি। গাঁয়ের যুবক ছেলেরা সব যুদ্ধে গেছে। মনসুর বলে, মনোজদা আমাদের কমাণ্ডার । আমরা মনে করবো মনোজদা আমাদের সঙ্গেই আছে। যুদ্ধের সময় সবাই তো বাঁচে না। তবে মরে গিয়েও বেঁচে থাকলে আমাদের সঙ্গেই থাকা হয়। ও ঠিক কথাই বলেছে, না কাকাবাবু ?

হ্যাঁ। নিখিলের কণ্ঠ আশ্চর্য বেদনা-শূন্য। সে কণ্ঠ শুনে চমকে ওঠে সুরেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

সুরেশের মাথায় হাত রাখলে সে হাত থরথর করে কাঁপে। ভাবে, এজন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। ওদের আশীর্বাদ করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে। ওদের আশ্রয় দিতে হবে। ওদের স্ত্রী এবং সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। আমার কতো কাজ।

সেদিন শুক্রবার। নিখিল জুমার নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। নামাজ শেষে আবদুর রহমানের সঙ্গে ফেরার সময় নিখিল দুর্গার বিধবা হওয়ার খবর বলে, মনোজের কথা বলে। আবদুর রহমান গলা নামিয়ে বলে, এ গাঁয়ের অবস্থাও ভালো না। ওরা আমাদেরকে সন্দেহ করছে। যে কোনো দিন ধরেও নিয়ে যেতে পারে।

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, সে আর এমন কি। না হয় জীবনটাই নেবে।

না, এতো সোজা কথা এটা নয়। আবদুর রহমান ধমকের স্বরে কথা বলে। আপনার আমার জীবন গেলে আরো অনেক কিছু হবে। মেয়েদের সাবধানে রাখতে হবে। আমি চাই না ওদের অত্যাচারে আমাদের মেয়েরা গর্ভবতী হোক। এ দেশের মাটিতে ওদের সন্তান জন্মাক।

মাস্টার সাহেব ! নিখিল আবদুর রহমানের হাত চেপে ধরে।

ওই দিন গাঁ থেকে ফেরার সময় মিলিটারিরা চিৎকার করতে করতে ফিরেছে। বলেছে, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, সবজি সবই পাওয়া গেছে। পাওয়া যায়নি আওরাত। বুঝলেন ? ওইদিন আমি টের পেয়ে আগেভাগে মেয়েগুলোকে লুকানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। শুধু মুক্তিযোদ্ধা হলে হবে না। নিজেদেরকে নিজেদের গাঁ পাহারা দিতে হবে। বাড়ি যান নিখিল বাবু। মনে রাখবেন, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের বাড়িটা রক্ষা করতে পারি, সেটাও অনেক।

বাড়ি ফিরে নিখিল দুর্গাকে ডাকে। ও এ বাড়িতে আসার পর নিখিল ঠিকমতো ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি, কেমন করে মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবে তাও ভাবতে পারেনি। মাস্টারের কথা শোনার পর মনে হয়, ওর বাড়িটা একটা দুর্গ হয়েছে। সাত মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু

বলেছিলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তেমন দুর্গ। আমার তো গর্ব করা উচিত, আমি এই দুর্গের রক্ষক। আমার মেয়ের স্বামী দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, এখন তো মেয়েটাও এই দুর্গের রক্ষক।

দুর্গা কাছে এসে দাঁড়ায়, বাবা ডেকেছো?

হ্যাঁ মা, মনোজের কথা শোনার জন্য ডেকেছি। বোস আমার কাছে।

দুর্গা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

কাঁদিস না মা। কাঁদবি কেন?

আমি এখন কি করবো বাবা?

তুইও যুদ্ধ করবি। ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখবি।

বাবা?

ঠিকই বলছি মা। সবার ঘর সবাই যদি আগলাতে পারে সেটাই যুদ্ধ।

দুর্গা চুপ করে থেকে মাথা নাড়ে। বলে, তাহলে আমাকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে দিতে হবে। ওখানে অনেক কাজ আছে। গাঁয়ের ছেলেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে বাবা। ওদেরকে আমার সব রকম সাহায্য করতে হয়।

এখন শুধুই বাবার বাড়িতে বেড়ানো নয়। কাজ করতে হবে মাগো। তুই আমাকে মনোজের কথা বল। শুনি ওরা কেমন দুর্গ গড়ে তুলেছিলো।

দুর্গা ওদের গাঁয়ের প্রতিরোধের কথা বলে। বলতে বলতে বদলে যায় ওর কণ্ঠ, দৃষ্টি। নিখিল অপলক দেখে কিভাবে বদলে যাচ্ছে মেয়ের মুখের রঙ। চোখের ভাষা। এমন কি ওর দাঁতে শব্দ উঠছে, কিড়মিড় করছে দাঁতের সারি। নিখিল বুঝে যায়, ওর মেয়েটির বুকের ভেতর প্রত্যয় আছে, ও পারবে লড়াই করতে। পিছু হটবে না। নিখিলের অবয়বে হাসি ফুটে ওঠে। এই দুর্গে বসে ও আর একজন যোদ্ধা বানাতে পেরেছে। দুর্গার গল্প শেষ হলে বলে, বাবা আমার ইচ্ছে আমিও রাইফেল চালানো শিখি। যদি সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ পাই তাহলে ছেলেমেয়েগুলোকে শাশুড়ির কাছে রেখে আমি চলে যাবো যুদ্ধ করতে। তুমি কি বলো বাবা?

হ্যাঁ, যাবি। কখনোই সুযোগ ছাড়বি না।

মনোজের মৃত্যুর পর এই প্রথম দুর্গা চোখের জল মুছতে পারে। দিন পনেরো পর সুবেশ দেখা করতে এলে ও সুরেশের সঙ্গে ফিরে যায় শ্বশুর বাড়ি।

সরলার কোমরের ব্যথা কমেছে। ও এখন হাঁটতে পারে। সেদিনই বাজারে গেলে মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে নিখিল। আরো অনেককে ওরা লাইন করে দাঁড় করিয়েছে। স্টেনগান তাক করে রেখেছে ওদের দিকে। পাশে দাঁড়ানো ওদুদ মিয়া বলে, ওরা নাকি শুনতে পেয়েছে মুক্তিবাহিনী ওদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে। তাই গাঁয়ের লোকজনকে সকাল থেকে এমন দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আজই আপনি কেন মরতে বাজারে এলেন?

নিখিল কথা বলে না। মনে মনে কলেমা আওড়াতে থাকে। ও লাইনের এক মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। অপর মাথা থেকে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। কাউকে কাউকে লাইন থেকে আলাদা করে রাখছে। নিখিলের তিন-চার জন আগে দাঁড়িয়েছিলো অবনীশ। ওর সামনে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে একজন।

তুমহারা নাম কেয়া?

হাবিব।

তোম মোসলমান?

হ্যাঁ।

কাপড়া খোল না চাহিয়ে।

অবনীশ লুঙি তুলে দেখাতে পারে না যে ও মুসলমান কিনা। দু'হাতে লুঙি চেপে ধরে, যেন টান দিলেই ওটা খুলে না পড়ে। লোকটি চেঁচিয়ে বলে, বাহেনচোত বাত কিউ নেই শুনতা? শালা গাদ্দার। ও মুহূর্তে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেয় ওর পেটে। উল্টে পড়ে যায় অবনীশ। নিখিলের পা কাঁপে থরথর করে। ওকেও কি বলবে লুঙি খুলতে? দেখতে চাইবে মুসলমান কিনা? তাহলে কি কলেমাও ওকে এ যাত্রা রক্ষা করতে পারবে না। তবুও জোরে জোরে কলেমা পড়তে থাকে। ওদুদ মিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় একজন, তোম জয় বাংলা কি সাপোর্টার?

নেহি।

নেহি? শালা কাফের। কলেমা জানতা?

ওদুদ মিয়া জোরে জোরে কলেমা পড়তে থাকে। নিখিলও সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে। ওই অবস্থায় ওদুদের পেটে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায় ও। নিখিল বুঝতে পারে না। কোনটা দেখবে। ওই লোকটির চলে যাওয়া না ওদুদের লাশ? ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃশ্যগুলো ওর চোখের সামনে টাল খায়। ওই লোকটির চলে যাওয়া মানে ওর বেঁচে থাকা, গরম রক্ত ওর পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে ও দেখতে পায় ওদুদ মিয়ার গলার কাছটা কাঁপছে। ও নিচের দিকে তাকায়, রক্তের স্রোত আসছে, একটু পর ওর পায়ের পাতা ডুবে যাবে — একটু পর ওর মনে হবে রক্তের নদীতে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সামনে আর কোনো মিলিটারি নেই। বাজার লুটপাট করে ওরা চলে যাচ্ছে। অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে এখানে সেখানে। জায়গাটা বধ্যভূমি হয়ে গেলো। ওরা চলে যেতেই মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। চারদিকে খবর চলে যায়। প্রিয়জনের লাশ নেবার জন্য ছুটে আসে অন্যরা। নিখিল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, রক্তের অনুভব থেকে ও সরে যেতে চায় না। দেখতে পায় ওর পায়ের পাতাদুটো পুরো ডুবে গেলো। ওদুদের বারো বছরের ছেলেটি বাবা, বাবা বলে কাঁদছে। আবদুর রহমান এসে ওর হাত ধরে, নিখিল বাবু?

চুপ কথা বলবি না।

ইস, আপনার দেখছি গায়ে জ্বর।

আমার হাতে অস্ত্র নেই দেখে তুই বাহাদুরী দেখাচ্ছিস। শূয়োরের বাচ্চা।

নিখিল বাবু? চলেন, আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেই।

তোর হৃৎপিণ্ড না নিয়ে আমি বাড়ি যাবো না। তুই কি জানিস যে আমার বাড়ির নেড়ি কুত্তাটাও ওটা শুঁকে দেখবে না?

আবদুর রহমান ওর হাত ধরে টানে। ও খেঁকিয়ে ওঠে।

ধুস শালা ছাড় আমাকে। আমি এই রক্ত ছেড়ে কোথাও যাবো না।

আবদুর রহমান বুঝতে পারে নিখিল প্রকৃতিস্থ নয়। ওর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, জ্বর বেড়েছে। আবদুর রহমান অন্য লোকজন ডেকে নিখিলকে রক্তের মধ্য থেকে সরিয়ে আনে। মুহূর্তে ও জ্ঞান হারায়। চায়ের দোকানের বেঞ্চের ওপর ওকে লম্বা করে শুইয়ে দিয়ে মাথায় পানি ঢালে আবদুর রহমান। চারদিকে মানুষের আহাজারি। এতোক্ষণ মিলিটারির ভয়ে যারা কাঁদতে পারছিলো না তারা বুক উজাড় করে কাঁদছে, যেন বুকের অর্গল খুলে গেছে। সে কান্না

শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে যায় আবদুর রহমান। ভাবে, গাঁয়ের ছেলেপেলে জোগাড় করে মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেয়া যায় না?

জ্ঞান ফিরে আসার পরও মাস্টারের নির্দেশে আরো অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে হলো নিখিলকে। চোখ বুঁজে ও বাড়ির কথা ভাবলো। দেবেশের কথা মনে হলো — ও তো হারিয়ে যায়নি, ও শহীদ হয়েছে। মায়ের ভাষার জন্য লড়েছিলো। কেন মিছেমিছি দেবেশের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। আজকে এই বধ্যভূমিতে শুয়ে ওর মাথা সাফ হয়ে যায়। বুঝতে পারে নিজের গোপন অঙ্গটি কেটে মুসলমান হলেও ওরা ওকে রেহাই দেবে না। সমস্যাটা হিন্দু বা মুসলমানের নয়, সমস্যা জয় বাংলার, সমস্যা যুদ্ধের এবং স্বাধীনতার। নিখিল আস্তে আস্তে বেঞ্চের ওপর উঠে বসে। চারদিকে তাকায়, তখনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে, বাজারের ভিড় কমেছে। মাথার ওপর উড়ছে শকুন। দেবেশের জন্য ওর বুক ভেঙে যায়। ভাবে জোয়ান ছেলেরা পাশে থাকলে আজ ও ঠিকই মিলিটারি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতো।

পায়ে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, ফেটে ফেটে কেমন দাগ দাগ হয়ে আছে — যেন কেউ তুলি দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখা টেনেছে। লাল রঙ কালো হয় কখন? নিখিলের ঘোলাটে চোখ দীপ্র হয়ে ওঠে। ওদুদ মিয়ার রক্ত ওর সব আবরণ খুলে দেয়। বুঝতে পারে এখন থেকে ও আর হিন্দু নয়, এখন থেকে ওকে আর মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে না। ও বাঙালি এই পরিচয়ে ওকে হয় মরতে হবে নয় বাঁচতে হবে। জয় বাংলার সময়টা পেরিয়ে যেতে পারলেই ওর মনুষ্যত্ব খাঁটি হবে। নিখিল উঠে দাঁড়ায়। একজন ছুটে এসে ধরে ওকে, পারবেন যেতে?

পারবো।

মাথা ঘুরে উঠবে না তো?

না। মাথা এখন পরিষ্কার।

নিখিল হাঁটতে থাকে, না শারীরিকভাবেও ওর খারাপ লাগছে না। জ্বর কমেছে, কিন্তু ছাড়েনি। খানিকটুকু এগোতেই আবদুর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়। মাস্টার ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলে, এখন কেমন লাগছে?

ভালো।

যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। জ্বরটা খুব উঠেছিলো।

হ্যাঁ, মাথায় জল ঢালার পর মনে হচ্ছিলো খুব আরাম লাগছে।

দুজনে বাজারের রাস্তা পেরিয়ে মেঠোপথে নেমে আসে। বেলা ফুরিয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন কম। নিখিল একসময় থমকে দাঁড়িয়ে মাস্টারের হাত জড়িয়ে ধরে, মাস্টার সাহেব আপনার আমার বয়স কি খুব বেশি হয়েছে?

জানি কি বলবেন।

পারবো না ক্যাম্পটা উড়িয়ে দিতে?

কি দিয়ে করবো? অস্ত্র, গোলাবারুদ তো নেই। ছেলেরা কেউ এলে ওদের কাছ থেকে নিয়ে রাখবো।

তাহলে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। কি বলেন?

হ্যাঁ।

গাঁয়ের কোনো ছেলে নেই যাকে ভারতে পাঠিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনানো যাবে?

এভাবে কি আর অস্ত্র পাওয়া যাবে। মোস্তফা হয়তো আসতে পারে, দেখি না কয়েকটি

দিন অপেক্ষা করে।

আমার যে অপেক্ষা করার ইচ্ছে হয় না।

দুজনে আবার হাঁটতে থাকে। পথের বাঁকে আবদুর রহমান নিখিলকে বলে, আসুন স্লোগানটা দেই। আশেপাশে কেউ নেই। খানিকটা চেঁচালে শরীরে যোশ আসবে। দুজনে হাত উঁচু করে স্লোগানের ভঙ্গিতে খানিকটুকু জোরে চেঁচিয়ে বলে, জয় বাংলা।

গাঁয়ের মানুষ কেউ বাইরে নেই। দুপুরের ঘটনার পর যে যার বাড়িতে ঢুকে গেছে। দু'জনে দু'পথে চলে যায়, কিন্তু দু'জনের কারুরই মনে হয় না যে আশপাশে কেউ নেই, এমন কি যতোদূর চোখ যায় ততোদূরও কেউ নেই— আসলে সবাই আছে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে অস্ত্র হাতে লুকিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। আর যদি ওরা দু'জনে একসঙ্গে হাঁক দেয় তাহলে ওরা ছুটে আসবে ওই মিলিটারি ক্যাম্পটা আক্রমণ করার জন্য। নিখিলের মাথার মতো বুকের ভেতরটাও সাফ হয়ে যায়। ভাবে, ভয় কি — ডাক একটা ও দেবেই দেবে। হঠাৎ ওর পায়ের রক্তের কথা মনে হয়। তাকিয়ে দেখে এতোদূর হেঁটে আসার পরও ওর পায়ের রক্ত মুছে যায়নি। খানিকটা মাটিতে লেগেছে, খানিকটা ঘাসে লেগেছে — বাকিটা ওর সঙ্গে রয়ে গেছে। এ রক্ত নিয়ে ও বাড়িতে ঢোকে। ছুটে আসে তিনজন — লক্ষ্মী বাবা গো বলে কেঁদে ফেলে। সরলা ওর হাত চেপে ধরে। সুষমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, বাবা আপনার কি হয়েছিলো? বাজারে নাকি অনেক লোক মেরেছে?

সরলা চেঁচিয়ে বলে, ওগো তোমার পায়ে দেখছি রক্ত লেগে আছে?

রক্ত মুছিনি দেবেশের মা। তোমাদের দেখাতে বাড়ি বয়ে এনেছি।

বাবা তুমি রক্তের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে?

না মা, রক্ত এসে আমার পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিয়েছে।

কার রক্ত বাবা?

একজন মুসলমানের।

মুসলমানের শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলে নিখিল মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়। লক্ষ্মী বলে, বাবা টুপিটা তোমার পকেটে নেই?

আছে মা।

বাবা আজ কি আপনি মসজিদে যাবেন?

যাবো মা।

ওগো কলেমা তো ভুলে যাওনি?

না, যাইনি। ভুলে যাবো না বলে আমি রোজ পড়ি।

চলো, তোমার পা ধুয়ে ফেলবে।

সবাই মিলে কুয়োতলায় যায়। সুষমা বালতি ভরে জল ওঠায়। সরলা পায়ে জল ঢালে। লক্ষ্মী পায়ে সাবান মাখিয়ে দিতে দিতে বলে, রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে বাবা।

সুষমা আর এক বালতি জল ওঠাতে ওঠাতে বলে, না রে বোকা মেয়ে রক্ত জল হচ্ছে না, এর উল্টোটা হচ্ছে।

ঠিক বলেছো মা, জল রক্ত হচ্ছে। সব জল রক্ত বানানোর জন্য আমি এই রক্ত বাড়িতে এনেছি। তোমরা রক্ত দেখেছো, মনে রেখো রক্তের কথা।

সরলা চেঁচিয়ে বলে, কেন মনে রাখবো রক্তের কথা। আমার যে ছেলে হারিয়ে যায় তার

তো কোনো রক্তের রেখা নেই।

থাম করে সুষমার হাত থেকে বালতি পড়ে যায়। ও কাঁদতে থাকে। মসজিদ থেকে ভেসে আসে আযান। নিখিল পকেট থেকে টুপিটা বের করে মাথায় পরে বলে, যাই মসজিদ থেকে আসি।

কেউ কোনো কথা বলে না। নিখিল বেরিয়ে যায়, তখনো সুষমা কাঁদছিলো। লক্ষ্মী ওকে জড়িয়ে ধরেছে। সরলা গম্ভীর গলায় বলে, এই সন্ধ্যাবেলায় কেঁদো না বৌমা। অমঙ্গল হবে।

থেমে যায় সুষমার কান্না। ও শুধু মনে মনে বলে, অমঙ্গলের আর বাকি কি। আমার স্বামী নেই! আমি বেঁচে আছি কেন?

দু'দিন পর আবদুর রহমান আর নিখিলকে মিলিটারি ধরে নিয়ে যায়। ওদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ। বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। সরলা বিছানা নিয়েছে। সুষমা আর লক্ষ্মী যখন-তখন বাগানের গর্তে ঢুকে বসে থাকে — ওদের কেবলই মনে হয় এই বুঝি মিলিটারি আবার এলো। গর্তে বসে ও লক্ষ্মীকে বলে, মা আমাকে কাঁদতে নিষেধ করেছিলো, আমি তো কাঁদিনি। তবু অমঙ্গল এলো কেন? কেন বাবাকে ধরে নিয়ে গেলো?

ক্যাম্পে শুধু ওরা দু'জনই নয়, গাঁয়ের ষাটজন লোক ধরে এনেছে। মিলিটারির কথা থেকে আবদুর রহমান বুঝতে পারে যে ওরা শুনতে পেয়েছে মুক্তিবাহিনী এই ক্যাম্প আক্রমণ করবে, তাই ওদেরকে ধরে আনা হয়েছে। গাঁয়ের লোককে ক্যাম্প আক্রমণের মজা বুঝিয়ে ছাড়বে।

আবদুর রহমান ফিসফিসিয়ে নিখিলকে একথা বললে ও নিজেও গলা নামিয়ে বলে, ওরা কি করে জানলো? আবদুর রহমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি?

আমি তো এই ক্যাম্প উড়িয়ে দেবার কথা ভেবেছি।

আমিও তো, আবদুর রহমান ওর হাত চেপে ধরে। এখন বুঝতে পারছি আমরা চিন্তা করলেও ওরা সেটা সত্যিভাবে। আমাদের ভাবনা ওদের কাছে বাস্তব হয়ে যায়।

প্রবল আত্মবিশ্বাসে নিখিলের হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আবদুর রহমান ওর হাত চেপে ধরে। ও টের পায় নিখিলের শরীর থরথর করে কাঁপছে। ওটা একটা গ্রেনেডের মতো, ফাটার অপেক্ষায়।

একজন সেপাই এসে আবদুর রহমানের চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

শালা, গাদ্দার। তুম হামলোগ কো মারনে কে লিয়ে খোয়াব দেখতা হায়? চলো, তোমকো খোয়াব দেখায়েঙ্গা।

যাবার আগে মাস্টার সবার দিকে তাকিয়ে বলে, বিদায়। কিন্তু মাস্টারের চোখে ভাষা ছিলো, দুচোখ জ্বলে উঠেছিলো, সে ভাষা সবাই বুঝতে পারে। খানিকটা তফাতে মাস্টারকে উলঙ্গ করে ওরা। বেয়নেট দিয়ে আঁচড় কাটে বুক-পিঠ-নিতম্ব-উরুতে। তারপর সামনের তাল গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। একটু পর হাত দু'টো বাদ দিয়ে পুরো শরীর দড়ি দিয়ে পেঁচাতে থাকে। রক্তের ধারা নামছে ঝিরঝির করে, সেদিকে ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই। বাঁধা শেষ হলে হাতদুটো টানটান করে উপরের দিকে সোজা করে গজাল পুঁতে গাছের সঙ্গে গেঁথে দেয়।

সকলের বিস্ফারিত দৃষ্টি মাস্টারের ওপর — মাস্টারের কোনো দৃষ্টি নেই আর, সেটা বিদায় বলার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের কাছে রেখে গেছে। নিখিলের মনে হয় মাস্টারের আর দৃষ্টির দরকারও নেই। বাকি উনষাটজন যদি সেটা বুঝতে পারে তাহলেই হয়ে যায়। কাজ শেষে

পেটের ওপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে বলে, শালা কাফের। মাস্টারের মাথা কাত হয়ে যায় না, বেঁধে রাখার ফলে ওটা সোজা, চোখ দুটোও বোঁজা নয়। নিখিলের মনে হয় চোখে দৃষ্টি নেই তো কি হয়েছে, চোখ দু'টাতো খোলা। জ্ঞান নেই তো কি হয়েছে, মাথাটা তো সোজা। ছবিটা নিজের বুকের ভেতর গেঁথে রাখে নিখিল। ওরা প্রত্যেকের বুকের ওপর রাইফেলের নল ধরে আর চেঁচিয়ে বলে, হু ইজ নেক্সট? একজনের বুকের ওপর থেকে নল সরে আর একজনের বুকের ওপর যায়, প্রত্যেকে সোজা হয়ে বসে আছে, কেউ ওদের দিকে তাকায় না। নিখিল বুঝতে পারে পরবর্তী শাস্তি কাকে দেবে তা ওরা ঠিক করতে পারছে না। নিখিল চারপাশে তাকায়। না আশেপাশে আর কোনো তাল গাছ নেই। সামনেই বকুল গাছ একটা, প্রচুর ফুল ফুটে আছে। ওর সামনে এসে ওরা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, হু ইজ নেক্সট? নিখিল মাথা তোলে না, নিজের বুকের ভেতরের স্বপ্ন ওদের জানিয়ে দিতে চায় না। তবু নলটা ওকে খোঁচা মারে, শালা বুড্ডা, তুম মুকুত হায়?

নিখিল কথা বলে না। রাইফেলের নল আবার অন্যের কাছে যায়, আবার ঘুরে আসে ওর কাছে। নিখিলের মনে হয় ওরা এখন বুঝতে পারছে না যে ক্যাম্প আক্রমণের স্বপ্ন কার বুকে? আসলে ওটা এখন সবার বুকে, কাকে ওরা ধরবে? ওর হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। ও হাসতে গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দেয়, ছুটে আসে রাইফেলের নল, তোম কাফের, তোম মুকুত হায়? নিখিল জোরে জোরে কলমা পড়ে। বিভ্রান্ত সৈনিক তখন সিদ্ধান্ত নেয় একজন একজন করে নয় সবাইকে খতম করে দেবে।

ওদের লাইন করে স্টেশনের কাছে নিয়ে এসে জড়ো করা হয় একটা বড়ো গর্তের ধারে, যেন গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। উনষাটজন লোক নানারকম শব্দ করছে —সবার কান্নার ধ্বনি একরকম নয়, সবার দোয়া-দুরুদ-কলেমার উচ্চারণ এক রকম নয় —যার যার নিজস্ব ভঙ্গি আছে। নিখিল এখন আর নিজের কথা ভাবতে পারছে না —ওর শুধুই দেবেশের কথা মনে হয়। ওতো হারিয়ে যায়নি, ও লড়াই করে মরেছে। নিখিলও এখন ঠিক তেমন একটি সময়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ও নিজেও জানে না যে কখন এটা ফুরাবে, নাকি ও কাফের বুড্ডা হয়ে মুকুতের স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে যাবে? ও দূরের তালগাছটার দিকে তাকায়, অস্পষ্ট দেখা যায় রহমান মাস্টারকে — না ওটা রহমান মাস্টার নয়, ওটা দেবেশ— হারিয়ে যাওয়া দেবেশ। নিখিল চেঁচিয়ে ওঠে, দেবেশ। বাবারে তুই এতোদিন পর কোথা থেকে ফিরে এলি?

নিখিলের আর্ত-চিৎকারে অনেকেই ওর দিকে চমকে ফিরে তাকায়। এতোক্ষণ যে মেশিনগানটা ওদের দিকে তাক করে রাখা হয়েছিলো, সেটা মুহূর্তে গর্জে ওঠে। ব্রাশ ফায়ারে উল্টে পড়ার সময় অনেকের সঙ্গে পড়ে যায় নিখিল। আহত হয়েছে কিনা বুঝতে পারে না, শুধু অনুভব করে যে বেঁচে আছে। ও হামাগুড়ি দিয়ে এক কোণায় চলে যায়। তখনো টুপটাপ ঝরছে মানুষ। ওপর দিকে তাকালে মিলিটারির বুট দেখতে পায়। যারা গড়িয়ে পড়েনি তাদের ওরা লাথি দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। মানুষের আর্তনাদে নিখিলের শ্রবণেন্দ্রিয় অবশ হতে থাকে। ও কাউকে ধরে, কাউকে ঢলে পড়তে দেখে, কেউ পানি চাইছে — ও কিছুই করতে পারে না, স্থবির হয়ে বসে থেকে মৃত্যু দেখে। মৃত্যু কেমন এবং কতো রকম, এমন ভয়াবহ উপলব্ধির ভেতর একসময় উপরের কোলাহল থেমে যায়। বুটের শব্দ দূরে চলে যাওয়ার অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় প্রাণ ফিরে আসছে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, এখন ও কি করবে? বেরুতে পারবে

না, বেরুলে মেরে ফেলবে। এই গর্তটা এখন ওর সামনে এক মহাসত্য।

চারদিক থেকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। অনেক আগেই নিখিলের পায়ের পাতা ডুবে গেছে, ও খেয়াল করতে পারেনি। খেয়াল করার মতো অবস্থায় ছিলো না — মানুষের আর্তনাদ এবং মৃত্যু ওকে এক অনির্দিষ্ট শূন্যতায় ছুঁড়ে ফেলেছিলো বলে ইহজাগতিক চেতনা রহিত হয়েছিলো। এখন ও নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। ও সুস্থ আছে, কোথাও আঘাত লাগেনি। অনেকের সঙ্গে গাদাগাদি করে পড়ার কারণে হয়তো শরীরে ব্যথাও পায়নি। এই লাশের মাঝে ওর অক্ষত শরীরটা আশ্চর্য রকমের বেমানান। নিখিল লজ্জায় কুঁকড়ে থাকে।

গর্তের মধ্যে রক্ত বাড়ছে। বানের পানি কি? ওর হাঁটু সমান হয়ে গেছে। ওর ভয় হয়। ও কি এই রক্তে ডুবে যাবে? নিখিল চিৎকার করতে পারে না। কাঁদতে পারে না। ওদের গায়ে পা লাগলে ওর খারাপ লাগে, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। শহীদের লাশ তো পবিত্র। ও আকুল হয়ে ভগবানকে স্মরণ করে। এই গর্তের মধ্যে ওর সামনে কেউ নেই যে অদ্ভুত এক যান্ত্রিক নিয়মে ওর মুখ থেকে কলেমা বেরুবে।

রক্ত কোমর সমান হয়ে গেলে ও উঠে দাঁড়ায়। ও বুঝতে পারে রাত নামা পর্যন্ত ওকে এই গর্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে কিভাবে রক্ত ওর বুক সমান হয়ে যায়, তারপর গলার কাছাকাছি, শেষে ডুবে যাবে মাথা। আশ্চর্য এভাবে রক্তের মধ্যে ওকে কি ডুবে মরতে হবে? ওর চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কি এভাবে রক্তে ডুব মরেছে? নিখিল গর্তটার গায়ে মাথা হেলিয়ে দেয়। এ এক আশ্চর্য সময়। ওর বুকের ভেতরটা ফুটো হয়ে এক অদ্ভুত ধ্বনি হতে থাকে, তা আর গর্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না — বাতাসে মিশে গাঁয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। একটুপর ও বুঝতে পারে আসলে এটা ওর বুকের ধ্বনি নয়, লাশের স্তূপের নিচে এখনো কেউ বেঁচে আছে, সে গোঙাচ্ছে। ও রক্তের ভেতরে দু'হাত ডুবিয়ে জীবিত মানুষ খুঁজতে থাকে। একজন একজন করে ওঠায়, তার মুখটা দেখে, তারপর আবার নামিয়ে রাখে। কতোজনকে ওঠাবে? ও আর পারে না, শরীর চলে না, বুকটা প্রবল বাতাসের জন্য শুকিয়ে আছে, রক্তের ঘ্রাণ ওকে পাগল করে দিচ্ছে। নিখিল গর্তের গায়ে ঝুলে থাকা ঘাস-লতা ধরে দেয়ালে মাথা ঠোকে।

গোঙানির শব্দ কমে আসছে, একটুপর হয়তো শব্দটা থেমে যাবে, একটু পর এ গাঁয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে মহাকাল। গর্তটা একটা গণকবর হয়ে থাকবে। আবার মাথা সোজা করে ও, জোরে নিশ্বাস নিয়ে হাঁফ-ধরা বুকটা সচল করতে চায়, আবার শক্তি ফিরিয়ে আনে বুড়ো হাড্ডিতে — দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজতে থাকে একজন জীবিত মানুষ। রক্তের মধ্যে হাতড়াতে থাকে ও। ওপরের অনেকগুলো লাশ ঠেলে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়েছে। শব্দ নিচ থেকেই আসছে। আবার ওঠাতে থাকে একজন একজন করে, কিন্তু না কারো মুখে গোঙানির শব্দ নেই। তাহলে শব্দটা কি সমবেত? শব্দটা সকলের বুকের এবং এক? নিখিল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ও গর্তের গায়ে গড়িয়ে পড়লে মাথাটা সোজা করে রাখার জন্য ঘাসেরগুচ্ছ ধরে ফেলে।

দিন গড়িয়ে যায়। অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে ও। চারদিক স্তব্ধ, কোথাও কেউ নেই। তবু নিরাপত্তার জন্য ও হাঁটে না। গড়াতে থাকে। ও বুঝতে পারে ওর মাথাটা সাফ এবং তা ভীষণভাবে সক্রিয়। ও হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় — কতোটা পথ ও এসেছে জানে না, মনে হয় এখন ও নিরাপদ। স্টেশন এবং বাজার পেরিয়ে এসেছে। ঝোপঝাড়, বাজারের চালা,

গাছের আড়ালে আড়ালে এসে ও মেঠো পথে নামে। ওর আর ভয় নেই। ভাবে, বয়স থাকলে ও দৌড়ে বাড়ি চলে যেতো। এই বয়সে ও দৌড়াতে পারছে না। তবু এই হেঁটে যাওয়ার মধ্যে ও অনুভব করে ও নিখিল নয়, ও দেবেশ। ওকে সুষমার কাছে পৌঁছুতে হবে। একমাত্র সুষমাই সত্যিকার অর্থে দেবেশের জন্য অপেক্ষা করছে। ও দ্বিতীয় পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

বাড়ি ফিরে ও দেখতে পায় সুষমা সদর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা? আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আমার মন বলছিলো আপনি বেঁচে আছেন।

নিখিল ভেতরে ঢুকলে ও দরজা বন্ধ করে বলে, বাবা সুভাষ এসেছে।

সুভাষ?

সঙ্গে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা।

এতোক্ষণে উঠোনে নেমে এসেছে সবাই। হারিকেনের আলোয় নিখিলকে দেখে চমকে ওঠে মোস্তফা, কাকাবাবু?

চিনতে পারছো না?

ঠাকুরদা?

সুভাষ রক্ত, মাটি, ঘাস সব এই শরীরে বয়ে নিয়ে এসেছি। গড়াতে গড়াতে বেরিয়েছি রে।

আমার বাবা কি বেঁচে নেই কাকাবাবু?

মোস্তফার কঠিন কণ্ঠে নিখিলের মাথা বুকের ওপর নেমে আসে।

বুঝেছি। তাহলে বাবাকেই ওরা তালগাছে ঝুলিয়েছে।

ঠাকুরদা, আমরা শুনেছি গাঁয়ে ওরা খুব উৎপাত করছে। তাই আমরা এসেছি ওই ক্যাম্প আক্রমণ করতে। আমরা বারো জন ঠাকুরদা।

হা-হা করে হেসে ওঠে নিখিল। তারপর ডুকরে কাঁদে।

বাবা চলুন। সুষমা নিখিলের হাত ধরে।

আমার দেবেশের কথা খুব মনে হচ্ছে। আর তোমার কথাও মা।

তখন ওরা শুনতে পায় বারান্দায় বসে সরলা কাঁদছে। ওর কোমরের ব্যথা বেড়েছে। হাঁটতে পারছে না। নিখিলের হঠাৎ মনে হয় সরলা কেন কাঁদছে? আমি ফিরে এসেছি সেজন্য, নাকি দেবেশের কথা ভেবে? লক্ষ্মী এসে নিখিলের হাত ধরে, বাবা চলো চান করবে। তোমার শরীর থেকে রক্তের গন্ধ আসছে।

মাটির গন্ধ আসছে না।

আসছে।

ঘাসের?

তাও পাচ্ছি।

মোস্তফা কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বলে, কাকাবাবু আসুন আপনার স্নানের জল তুলে দিচ্ছি।

তোমরা খেয়েছো?

খেয়েছি।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে নিখিল লক্ষ্মীকে বলে, লক্ষ্মী তোর মাকে কাঁদতে বারণ কর।

কেন বারণ করবো? মা কাঁদুক।

কেন কাঁদছে?

সে তুমি বুঝবে না।

নিখিল বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। লক্ষ্মীও বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুষমা শ্বশুরকে দেখে। মুক্তিযোদ্ধারা গোল হয়ে কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে একজন চিত্রিত নিখিল। প্রথমে রক্তের প্রলেপ পড়েছে তার শরীরে, সেটা কালচে হয়ে ওঠার আগেই কোথাও কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে ঘন হয়ে গেছে। তার ওপর মাটির ছোপছোপ দাগ, আঁকাবাঁকা রেখা বা বৃত্ত হয়ে আছে, সেইসঙ্গে কুচিকুচি টুকরো, টুকরো ঘাস – কোনোটি শুকনো, কোনোটি এখনো তাজা।

লক্ষ্মী বাবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, কি হলো বাবা?

নিখিল সুষমার দিকে হাত বাড়ায়, মা জল দাও।

সুষমা ঘটিতে করে শ্বশুরের গায়ে জল ঢালে। মোস্তফা বালতি বালতি জল ওঠায় কুয়ো থেকে। সুভাষ দাদুর শরীরে সাবান মাখিয়ে দেয়। লক্ষ্মী গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুক্তিযোদ্ধারা হারিকেনের অল্প আলোয় দেখতে পায় নিখিলের শরীর বেয়ে জল নয়, রক্ত নামছে।

অনেক রাত জেগে ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করে ওরা। ওদের সঙ্গে বসে থাকে নিখিল। মোস্তফা কয়েকবার বলেছে, কাকাবাবু ঘুমুতে যান। নিখিল উঠতে অস্বীকার করে। বলে, কেন বারবার ঘুমুতে বলো? আমিও তোমাদের সঙ্গে ক্যাম্প আক্রমণ করতে যাবো।

ছেলেরা কথা বলে না। সুষমা হাত ধরে টানে, বাবা আসুন।

আমার যে ঘুম আসছে না মা। তুমি আমাকে যেতে বোলো না। আমি এদের সঙ্গে থাকি।

ঠিক আছে থাকুন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবেন না।

কেন চাইবো না? দুর্গের পাহারাদার কি যুদ্ধে অংশ নেয় না?

ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, দুর্গ!

নিখিল মৃদু হেসে বলে, আমার বাড়িটা আজ সত্যি সত্যি একটা দুর্গ হয়েছে।

তা ঠিক। আক্রমণের আগে পর্যন্ত এটা আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র।

নিখিল আবারও মৃদু হেসে বলে, কাল আক্রমণ কটার সময়?

মোস্তফা বলে, রাত একটায়।

রাত একটা? অস্ফুট উচ্চারণ করে নিখিল ওদের সবার মুখের দিকে তাকায়।

কারো চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না। ঘর অন্ধকার, হারিকেন নিভিয়ে রাখা হয়েছে। মোস্তফার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে নিখিল ওর দিকে তাকিয়ে বলে, যদি জিততে পারো তাহলে ওই তালগাছটাকে ঘিরে একটা স্মৃতিসৌধ বানাবো আমরা।

মুক্তিযোদ্ধারা সবাই দেখতে পায় নিখিলের প্রায় ছানিপড়া চোখে আলো। মনে হয় না ঘরটা অন্ধকার।

১৩

রাত বারোটা। এ্যাসেম্বলি এরিয়াতে জড়ো হয়েছে সবাই। একটু পরই নকশি বি. ও. পি আক্রমণ করা হবে। নেতৃত্ব ক্যাপ্টেন আমিনের। রওনা হওয়ার আগেই কর্নেল শাফায়াতে জিপ নিয়ে হাজির হয়। দু'দিন আগে সে বাহাদুরাবাদ ঘাটে একটি সফল অপারেশন করেছে। ক্যাপ্টেন আমিন ওকে অভিনন্দন জানায়। শাফায়াত বলে, আমিন, রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইওরসেলফ। অল দ্য বেস্ট।

কাজেই দাঁড়িয়ে ছিলো হানিফ। আমিনের ব্যক্তিগত প্রহরী। নিজে বিহারি, কিন্তু বিয়ে করেছে বাঙালি মেয়ে, বরিশালের, চমৎকার বাংলা বলে। খুব উত্তেজনার মুহূর্তে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলে না। বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ গ্রহণের পরও মুক্তিবাহিনী ওকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। গ্রেফতার করে আটকে রাখে। একদিন বন্দীশিবিরে ধরে বসে আমিনকে। দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট বাংলায় বলে, স্যার আমি বেঈমান না। একটা চান্স দিন। জান দিয়ে প্রমাণ করবো।

ক্যাপ্টেন আমিন ওর দৃষ্টি দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলো ছেলেটি খাঁটি। অন্যরা ওকে ভুল বুঝেছে। সেদিনে ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিলো, ঠিক আছে, আজ থেকে তুমি আমার পার্সোনাল গার্ড। পারবে?

ও একই দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, স্যার আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না।

এসো আমার সঙ্গে।

সেইদিন থেকে হানিফ ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

শাফায়াতের ইংরেজি বুঝতে না পেরেও আমিনের মুখের দিকে তাকায়। শাফায়াতের জিপ চলে যায়।

স্যার কি বললো?

বললো, যা করতে পারবো না তা যেন করতে না যাই।

আমরা করতে পারবো না এমন কথা আমার মনেই হয় না। সব সম্ভব।

সাবাস। আমিন হানিফের পিঠ চাপড়ে দেয়। চল এগোই।

এ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে সৈন্যরা বেশ স্বচ্ছন্দে, কোনো শব্দ না করে ফর্ম আপ প্লেসে পৌঁছে যায়। এমন কি মাঝপথে নালাটা পার হওয়ার সময়ও একদম শব্দ হয়নি, যেন সবার মিলিত একটি পদক্ষেপ বিড়ালের পদক্ষেপের মতো নিঃশব্দ। অবশ্য আমিন খুব সতর্ক। ও আগের দু'রাত পানির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটার প্র্যাকটিস করিয়েছে সৈন্যদের। নকশি বি. ও. পি. নিজে রেকি করেছে। প্রথম দিন উঁচু টিলা থেকে বাইনোকুলার দিয়ে। সুবেদার হাকিমের ওই বি. ও. পি-র সব জানা। বলা যায় একদম নখদর্পণে। সেই আমিনকে বলে দেয় কোথায় শত্রুদের বাংকার, বারবড অয়্যার, বাঁশের বেড়া, মাইনফিল্ড, রান্নাঘর, মসজিদ ও বি. ও. পি-র প্রবেশ পথ। কোথায় কতো জন সান্ত্রী থাকতে পারে সেটাও বলে দেয়। বাইনোকুলার দিয়ে যতোটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করে টিলা থেকে নেমে আসে আমিন। সে সময়ে লোকটির মুখোমুখি হয় ও।

তুমি?

লোকটি মৃদু হেসে বলে, চলো।

কোথায়?

সেই বাবুর্চির কাছে। যাকে শত্রুশিবিরে পাঠিয়েছিলে। ওকে বাড়িতে থাকতে বলে এসেছি।

দুজনে গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে গারো পাড়ায় চলে যায়। চুপেচুপে। ওদের দেখে মংশু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়ে নেয়।

বসেন স্যার। মংশু চেয়ার টেনে দেয়।

না বসবো না। খবর বলো।

ও দ্রুত কণ্ঠে বলে, আজ পঞ্চাশ জনের জন্য রান্না করেছি। আরো পয়ষট্টি জন আর্মির লোক আসবে। এছাড়া পঞ্চাশ-ষাট জন রাজাকার বিভিন্ন ডিউটিতে আছে।

ঠিক আছে যাই। তোমার আসতে হবে না। তুমি ঘরে থাকো।

দুজনে আবার গাছের আড়ালে আড়ালে চলে আসে। হঠাৎ লোকটি আমিনকে বলে, আমিন দেখো?

আমিন বুঝতে পারে ওদের দেখেই গারো মেয়েটি পাহাড়ের গাছের সাথে মিশে আছে।

ওরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে কি করছো?

তোমরা আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে।

ও, তুমি মংশুর মেয়ে? যাও, বাড়ি যাও।

আমি তো লুকিয়ে ছিলাম। তোমরা আমাকে দেখে এগিয়ে এলে কেনো? খুব অন্যায় করেছো।

ওরা দুজনে ওর কথা শুনে হতভম্ভ হয়ে যায়। কারো মুখ দিয়ে কথা সরে না।

মেয়েটি যাবার জন্য পা বাড়ায়। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বলে, দরকার হলে তোমরা আমাকে ডেকো। বাবার কাছে খবর দিলেই আমি যেতে পারবো। এ এলাকার সবকিছু আমার চেনা।

ও দৌড়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে যায়। লোকটি হাসতে হাসতে বলে, আমার মনে হয় ও ওর প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছিলো।

তাহলে চলে গেলো কেন?

মনে হয় ছেলেটি আসতে দেরি করেছে। এর মধ্যে আমাদের সামনে পড়ে গেছে।

এমনও তো হতে পারে যে ছেলেটি যুদ্ধে গেছে?

হতে পারে।

দুজনে হো-হো করে হাসে।

আমরা কতোকিছু ভাবছি।

এটা এজন্য যে আমাদের নার্ভ খুব টেনস হয়ে আছে। আমরা নিজেদের ফ্রি করতে চাইছি।

ঠিক বলেছো, কল্পনা করার কল্পিত সুখে মগ্ন হয়ে যাওয়া।

দু'জনে বেশ আনন্দ-চিত্তে ক্যাম্পে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় দিন ক্যাপ্টেন আমিন প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে রেকি করতে যায়। হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালাপথ রেকি করে কোথায় কোন অস্ত্র রাখবে, কোথায় ফর্ম আপ প্লেস হবে সব ঠিক করে। প্লাটুন কমান্ডার প্রতিটি বিষয় বুঝে নেয়। অন্ধকারে যেন ভুল না হয়

সেজন্য এই অতিরিক্ত সতর্কতা। সাপোর্টিং হাতিয়ারের জন্য বাঙ্কার বানানো দরকার। শালবনের ঘন আড়ালে কাজ করতে খুব সুবিধে হচ্ছে। বাঙ্কার বানানোর জন্য পঁচিশটি আড়াইমণী চটের বস্তা আনা হয়েছে। মেশিনগান, ১৫৬ মি: মি: ও ৭৫ মি: মি: আর–আর –এর জন্য বাঙ্কার দরকার। পাকিস্তানিরা অবশ্য জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলেছিলো। বি.ও. পি–র চারপাশে ছয়শ গজ এলাকা পরিষ্কার করে ফিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে ফাঁকা রেখেছিলো।

তৃতীয় দিন আবার রেকি করতে যায় আমিন। আমগাছের মাথায় কিছু একটা দেখে চমকে ওঠে ওরা। হাকিম অস্ফুট স্বরে বলে, স্যার ওটা কি?

তাই তো ? মনে হচ্ছে মানুষ। ওই রকমই তো লাগছে।

জলিল বলে, শত্রুপক্ষের কেউ হলে এতোক্ষণে আমাদের বুক ফুটো হয়ে যেতো।

বশির সাহস করে বলে, নিশ্চয় অন্যকিছু। আমি দেখছি। ও এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বলে, পাখি স্যার। স্নাইপার।

ওহ্ গড, আমিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সবাই হো–হো করে হেসে ওঠে। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। ঝুপ করে একটা শব্দ হলে সবাই আবার চমকে এদিক-ওদিক তাকায়। ওরা তখন হালছটি গ্রামের নালার পাশে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে নালা দিয়ে কেউ বুঝি পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেকশন কমান্ডাররা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পজিশনে গেলো। আমিন ভালো করে খেয়াল করে বললো, শব্দ হয়েছে নালার পাড় ভেঙে পানিতে মাটি পড়ার ফলে। কিন্তু সেক্টর কমান্ডারদের ওইভাবে বসে থাকতে দেখে রেগে যায় আমিন। ও চিৎকার করে উঠলে সবাই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ও বলে, এভাবে নয়, তোমাদের উচিত ছিলো আরো ছড়িয়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ করে বসা। এভাবে অল রাউন্ড ডিফেন্স নেবে। তোমরা যেভাবে গোল হয়ে বসেছিলে তাতে শত্রুপক্ষের তোমাদের খতম করে দিতে এক সেকেন্ডও লাগতো না। তোমাদের আরো ট্রেনিং দরকাব। যা হোক মনে রেখো এটাও তোমাদের জন্য একটা শিক্ষা। আর যেন ভুল না হয়।

ফর্ম আপ প্লেসে দাঁড়িয়ে লোকটি আমিনের কানে কানে বলে, সুবেদার হাকিম খুব ক্ষেপেছে।

ও কোথায়?

বাঙ্কারের পেছনে।

কেন ক্ষেপেছে?

ক্ষেপবে না? ও নিজে খাবার পায়নি। যেসব ছেলেরা সারারাত আড়াইমণী বস্তায় বালি ভরে বাঙ্কার বানিয়েছে তাদের কপালেও খাবার জোটেনি।

ইস মস্ত ভুল হয়েছে। চলো দেখি।

সুবেদার হাকিমের মুখ থমথম করছে। কথা বলতে পারেনা। আমিন মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বলে, আপনাদের কথা আমরা ভুলিনি। আপনাদের রুটি এ্যাসেম্বলি এরিয়াতে রয়ে গেছে। কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে আসুন। এক দৌড়ে যাবে আর আসবে।

ওরা খুব ক্লান্ত। হাকিমের কণ্ঠ।

যুদ্ধের সময়ে ওই শব্দটি কাউকে শোনানো উচিত নয়। প্রশ্রয় দেয়াও উচিত নয়।

আমিন কঠিন কণ্ঠে বলে। চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলে, এম-জি ও আর-আর এ্যামুনিশন বাঙ্কারে পাঠিয়ে দিয়েছি। পৌছেছে তো?

জ্বী স্যার।

আচ্ছা, বলে আমিন ফিরে আসতে থাকে। লোকটি ওকে কানে কানে বলে, যে দু'প্লাটুন কাট-আপ পার্টি রাঙ্গাটিয়াতে পাঠিয়েছো ওরাও পৌছে গেছে।

গুড। তুমি দেখো এদের খাবারটা ঠিকমতো আসে কিনা। কারণ যুদ্ধের ফলাফল এদের ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

ঠিক আছে আমি নিজে যাচ্ছি। ওদের খাবার আমি নিজেই বাঙ্কারে পৌছে দেবো।

লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফর্ম-আপ-প্লেসে পায়চারি করছে ক্যাপ্টেন আমিনের কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন। খানিকটা উদ্বিগ্ন। আমিন ফিরে এলে বলে, ভাবছি তোমাকে একা শত্রুর সামনে ঠেলে দেবো না। আমিও যাবো।

ক্যাপ্টেন আমিন ঠাণ্ডা মাথায় বলে, স্যার অর্থনৈতিক পয়েন্ট অব ভিউতে কাজটা ঠিক হবে না।

বুঝিয়ে বলো? তোমার কথা ধরতে পারিনি।

স্যার একসঙ্গে দুজন অফিসার হারালে মুক্তিবাহিনী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধের সময় এ ক্ষতি পোষাবার নয়।

মেজর আমিন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছো। অর্থনৈতিক ক্ষতিই। সেনাবাহিনীতে একজন অফিসার অনেক টাকার বিনিময়ে তৈরি হয়। ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক।

রাত তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। ফর্ম-আপ-প্লেসে পজিশন নেয় আমিন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রেভো ও ডেল্টা এই দুই কোম্পানি যোদ্ধা নিয়ে ও নকশি বি. ও. পি. আক্রমণ করতে এসেছে। এই মুহূর্তে ওর ডানে বারো নং প্লাটুন, বামে পাঁচ নম্বর প্লাটুন।

তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ও অয়ারলেসে নির্দেশ দেয় —জোরে মারো।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের আর্টিলারি গর্জে ওঠে। মিনিটখানেকের মধ্যে শত্রুপক্ষের আর্টিলারিও গর্জে ওঠে। আমিনের মনে হয় ও এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কারণ একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে আবার দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রচণ্ড সাহসের কাজ। এটাই হবে সবার জন্য অগ্নিপরীক্ষা। ও ভেবে দেখলো ওর দুই কোম্পানির দুশো জনের মধ্যে মাত্র দশ জন সামরিক বাহিনীর লোক। এর বাইরে ই-পি-আর আছে আটজন আর পুলিশ দু'তিন জন। বাকি সবাই সাধারণ মানুষ। অস্ত্রের সঙ্গে যাদের পরিচয়ই ছিলো না। ওরা মাত্র সাত দিনের ট্রেনিং পেয়েছে। এদের নিয়ে যুদ্ধ। আমিন নিজেকে শক্ত করে। প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ওর ডানে অবস্থিত মেশিনগান ও আর-আর প্রবল শব্দে গর্জে ওঠে। একই সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে ই-পি-আর-এর প্লাটুনটি শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে। শত্রুরা কিছুক্ষণের জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে থাকে। এই সুযোগে আমিন এক্সটেনডেড লাইন ফরমেশন করে এগিয়ে যায়। সময় ক্ষণিকের মাত্র। আবার শুরু হয় গুলিবর্ষণ। ওর ডান পাশের একটি ছেলে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, স্যার বাঁ

দিক থেকে গুলি আসছে যে? ও ধমকে ওঠে, বেটা গুলি আসবে না তো বৃষ্টিধারা আসবে?

ও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পাঁচশ গজ আগে নালার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে মর্টার নিয়ে যারা অবস্থান করছিলো তাদের বলে, তোমরা নালার পাড়কে আড়াল রেখ তিনশ গজ দূরে যে শত্রুশিবির ওখানে ফায়ার করো।

এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সাতদিনের ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধারা নালাকে আড়ালে নিয়ে নেয়।

আমিন মুহূর্তে বুঝে যায় যে এর ফলে কমান্ড ও কন্ট্রোল শিথিল হয়ে গেলো। কিন্তু এখন কিছু করার উপায় নেই। যে ভুল হবার হয়ে গেছে।

অন্যদিকে কথা ছিলো নায়েক সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে যে ৫ ও ৬ নং প্লাটুন, তারা বি. ও. পি-র গেটের ভেতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু সেটাও হলো না। ওরাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে গুলি ছুঁড়তে থাকে। নালার ভেতরে যোদ্ধাদের এই কাণ্ড থেকে আমিনের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। শত্রুশিবির বেশ কাছে, তবু ও চিৎকার করে গালাগাল করতে শুরু করে। কাউকে কাউকে লাথি মারে। কারো কলার চেপে ধরে সামনে ঠেলে দেয়। তখন হাবিলদার নাসির ক্ষিপ্র গতিতে সামনে এগিয়ে যায়। আমিন নিজে নায়েক সিরাজকে সঙ্গে করে ডান দিকের বাঙ্কারের দিকে এগুতে থাকে। ওদের এই সাহস থেকে শত্রুরা পিছু হটে।

আমিন সঙ্গে সঙ্গে এসল্ট লাইন ফর্ম করে ফেলে। নিজের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কৌশল নির্ধারণ করতে থাকে। মুহূর্ত ভুল মানে সমূহ বিপদ। একটু আগে যে ভুলটি ও করেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এসল্ট লাইন ফর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে ও চার্জ বলে হুঙ্কার দেয়। মুহূর্ত মাত্র, যোদ্ধারা 'ইয়া আলী' বলে সঙ্গীন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য, সাহস নিয়ে ছুটে যাওয়ার জন্য সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা 'আল্লাহু আকবর' বলে যুদ্ধক্ষেত্র কাঁপিয়ে তোলে।

প্রবল উত্তেজনা। বাংলাদেশের একটি শান্ত-শীতল গ্রামে গোলা-বারুদ-চিৎকারে যুদ্ধের ময়দান, উন্মাদনায় উন্মাতাল যোদ্ধারা। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে সক্রিয়। আমিনের সিগন্যালম্যান অয়ারলেস সেট ওর সামনে এনে ধরে, স্যার কিছু বলুন?

আমিন ওকে ধমক দেয়। বলে, তুমি নিজেই যা পারো তা বলো। আমার এ্যাটেনশন নষ্ট করো না।

তখন ও অয়ারলেসে জোরের সঙ্গে বলতে থাকে, আমাদের জয় নিশ্চিত ..হয়ে গেছে, আর একটু বাকি..বাঙ্কারে বাঙ্কারে যুদ্ধে হচ্ছে। আমরা এগিয়ে আছি। বাঙ্কার দখল হচ্ছে। জয় বাংলা।

ঠিক সে সময়ে শত্রুর আর্টিলারির শেলভো ফায়ার এসে পড়ে ওদের ওপরে। হাবিলদার নাসিরসহ কয়েকজন মাটিতে পড়ে যায়।

লোকটি মৃদু স্বরে ডাকে, আমিন!

আমিন বেদনার্ত স্বরে বলে, যারা শহীদ হয়েছে তুমি তাদের সরিয়ে নিয়ে যাও। শত্রুরা যেন ওদের লাশ ছুঁতে না পারে।

তুমিও তো আহত হয়েছো? যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

আহ্ আর কথা বোলো না। এখন তুমি যাও। যা বলেছি তা করো। কুইক।

আমিনের ডান পায়ে একটা শেল লেগেছে। আঘাতটা কতোটুকু তা বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যায়। সামনে শত্রুর বাঙ্কার। মাত্র পাঁচ গজ দূরে। সামনে মাত্র কয়েকটি ছেলে পলায়নরত শত্রুদের ধাওয়া করেছে। মারছে। সানু আছে ওদের সঙ্গে। আই. এ. ক্লাশের ছাত্র। আমিনের ভাগ্নে। আমিন জানে যুদ্ধক্ষেত্র আত্মীয়তার জায়গা নয়, এখানে সবাই যোদ্ধা। ভয়াবহ পরিস্থিতি। লোকটি আমিনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমিন?

বলো।

আহ্ দেখো শামসুল আলম মাইন বিস্ফোরনে উড়ে গেলো।

দেখেছি। ভালো ছেলে। অনার্স পড়তো।

অনেকে মাইন ফিল্ডে ফেঁসে গেছে। ওরা আর ফিরবে না।

জানি।

গুলি খেয়ে পড়ে গেছে কতোজন।

আহ্ তুমি আমাকে ডিস্টার্ব করছো কেন?

ঐ দেখো তোপের মুখে উড়ে গেলো নুরূল।

তুমি যাও এখন। যে কজন এখনো লড়ছে আমি তাদের কাছে যাই।

ওরা মাত্র বিশ-পঁচিশজন।

হানিফ আমার সাথে এসো।

দুজনে এগিয়ে যায়। আমিন ছেলেদের সাহস দেবার জন্য চিৎকার করে বলতে থাকে, বি.ও.পি. একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। তোমরা এগিয়ে যাও। ভয় নেই। যুদ্ধে আমরা জিতবোই।

যদিও আমিন জানে বি. ও. পি-র মাটির দেয়াল তখনো অক্ষত আছে। কিন্তু এসবই বলতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। এগুলোই তখন সত্য কথা। এমন সময়ে সালাম এসে ওকে ডাকে, স্যার?

ও কিশোর বালক। ক্লাস এইটের ছাত্র। সুবেদার বাবা রাজ্জকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে।

ও কেন ডেকেছে দেখতে গিয়েই আমিনের বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বেঁধে গেলে ও পড়ে যায়।

ওকে পড়ে যেতে দেখে একজন আহত পাকিস্তানি সৈনিক সঙ্গীন উঁচিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে সালাম ট্রিগার টেপে। খতম হয়ে যায় সেই সৈনিক।

আমিন পড়ে যাওয়া অবস্থায় থেকে বলে, সাবাস সালাম।

কথা বলতে না বলতে আমিন দেখতে পায় আরো দু'টি ছেলে আহত হয়ে পড়ে গেলো। ও অস্ফুট অর্তনাদ করে বলে, সেম সাইড। যারা নালার ভেতরে আড়ালে বসে আন্দাজে ফায়ার করছিলো ওদের গুলিতেই আহত হয় নিজেদের ছেলে দুটি। ওখান থেকে এডভান্স করার সময় আমিন নিজে ওই রকম গুলি করার জন্য একটি ছেলের রাইফেল কেড়ে নিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ওর ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই ও পালাতে থাকা দু'টি শত্রুকে গুলি করে। আর বাঙ্কারে অবস্থানরত শত্রুকে গুলি

করার জন্য হানিফকে নির্দেশ দিতে থাকে।

হানিফ গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ওকে অনুরোধ করে, স্যার, আব পিছে চলে যাইয়ে, ম্যায় কাভারিং দে রাহাহু।

না, তুমি গুলি করতে থাকো। আমি ঠিক আছি।

কিন্তু হানিফ কিছু করে ওঠার আগেই ও হিস শব্দ শুনতে পায়। ঢলে পড়ে হানিফ। ওর মাথায় স্টিল হেলমেট ছিলো না। আমিনের মনে হয় ওর মাথায় বুঝি গুলি লেগেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে যায়। হ্যাভারসেকে ধাক্কা দিয়ে আস্তে করে ডাকে, হানিফ।

কোনো সাড়া নেই।

আবার ধাক্কা দেয়, হানিফ।

ও মাথা তোলে না। আমিনের বুক ফেটে যায়। কাঁদতে পারে না। কান্নার সময় নয় এখন। শুধু মনে পড়ে ও বলেছিলো, স্যার আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না।

ও প্রবলভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরলে কান্নার দলা গলার কাছে চেপে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর গুলি এসে ওর মাঝে পড়লে ছিটকে ওঠে মাটি। আমিন বুঝতে পারে শত্রু ওকে দেখে ফেলেছে। সাইড রোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বাম দিক থেকে একটি গুলি এসে ওর ডান হাতের কনুইতে লাগে। এক সেকেন্ড না এক যুগ ওর মনে পড়ে না, শুধু বুঝতে পারে শরীরের ভেতরটায় দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠেছে। হাতে ধরে রাখা স্টেনটা ছিটকে পড়লে ও চট করে বাম হাত দিয়ে সেটা তুলে নেয়। ডান হাতের কব্জি বেঁকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

লোকটি এসে ওর পাশে বসে, আমিন?

ফিল্ড-ড্রেসিংটা বের করো হাতটা বেঁধে ফেলি।

এখন না। এখন এখান থেকে সরতে হবে। শত্রুর পাঁচ গজের মধ্যে আর থাকা যাবে না।

সেই মুহূর্তে একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইল উড়িয়ে দেয়। ছিটকে ওঠে মাটি। ওদের গায়ে এসে লাগে। লোকটি দু'হাতে আমিনকে জড়িয়ে ধরে।

এক্ষুণি সরতে হবে।

চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। যারা শত্রুর বাঙ্কারে ঢুকেছিলো ওদের খবর কি?

লোকটি নির্বিকার উত্তর দেয়, কেউ বেঁচে নেই।

নায়েক সিরাজ ও পুলিশের ল্যান্স নায়েক সুজা মিয়া?

নেই।

ওহ্ মাগো।

আমিন চুপ করো। এখন এসবের সময় না।

ওই দেখো একটি বাচ্চা ছেলের লাশ।

আমি ওকে আগেই দেখেছি। লোকটির কণ্ঠ কেমন নীরেট এবং নির্বিকার। আমি দেখেছি ও কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে বোকা হয়ে গিয়েছিলো। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। ও শত্রুর ডান বাঙ্কার এড়িয়ে কোনাকুনি আরো ডানে নিরাপদ জায়গা হালছটি গ্রামের দিকে যেতে চেয়েছিলো। পারেনি।

আমিন ভাবাবেগে বলে, তোমার কণ্ঠ এতো নির্বিকার কেন?

স্বাধীনতার জন্য এসব তো দিতেই হবে। জীবনকে তুচ্ছ না করলে হবে কেন? সামনে আরো বড় দিন রয়ে গেছে।

আমিনের মনে হয় লোকটি ওর কাছে আর নেই। ওর কণ্ঠস্বর যেন মেঘের ওপার থেকে ভেসে আসছে। ও আর দেরি করে না। ফিল্ড-ড্রেসিং বের করার কথা ভুলে গিয়ে সাইড রোল করতে শুরু করে। শত্রুশিবিরের পাঁচ গজের ভেতর থেকে বের হবার চিন্তায় ও দিক ভুলে যায়।

কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর ওর মনে হয় ও ডানে না গিয়ে কোনাকুনি শত্রু শিবিরের দিকে যাচ্ছে। হিম হয়ে যায় শরীর। মাথার ভেতর হাজার মৌমাছির গুঞ্জন এবং একই সঙ্গে মনে হয় শরীরের ভেতরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো সেটা নেভেনি। ও দম নেয়ার জন্য থামে। নিজেকেই বলে, মাথা ঠাণ্ডা করো অমিন আহমদ চৌধুরী। এখন ভুল করার সময় নয়। সময় তোমার অনুকূলে, শুধু তাকে কাজে লাগাও।

ও পেছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নেয়। চারদিকে লাশ। অন্ধকার যেন ওইসব লাশের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ও আবার নিজেকে ধমকায়, তুমি ওই দিকে তাকিয়ো না। অন্ধকার দেখো না। শরীর গরম থাকতে থাকতে তোমাকে হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। ভালো করে দেখে নাও। পথ ভুল করা চলবে না।

হামাগুড়ি শুরু করার মুহূর্তে দেখতে পায় সালামকে। ও চুপিচুপি বলে, স্যার?

তুই আবার কোথা থেকে এলি? তোকে না পঞ্চাশ গজ পেছনে হটে যেতে দেখলাম?

আমি পিছু হটবো না স্যার।

আহ্, সালাম পাগলামী করে না।

আপনি আমাকে যুদ্ধ করার জন্য নিতে চাননি।

তুই ছোট। তোর সংসারে আর তো কেউ বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই বলেই তো যুদ্ধ আমি করবো স্যার। সেজন্যতো পালিয়ে এসে আপনাদের সাথে এ্যাসেম্বলি এরিয়াতে চুপিচুপি যোগ দিয়েছিলাম। এখন আমি যাই।

সালাম, সালাম চলে আয়।

ও আমিনের কথা শোনে না। পড়ে থাকা একটি এল. এম. জি. নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে হুঙ্কার দিয়ে শত্রুর বেষ্টনির দিকে ছুটে যায়। অতোটুকু শরীর অথচ কি তার তেজ! আমিনের শরীরে শিহরণ জাগে। ওর সংসারের সবাইকে হত্যা করেছে পাকবাহিনী। ও একা। সবার তেজ ওর একার মধ্যে ঢুকেছে। সালামের চিৎকারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া শত্রুরা কাউন্টার এ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পেছনে সমবেত হয় এবং ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে থাকে। যেন যুদ্ধের রণদামামা আবার নতুন করে বেজে উঠেছে। কিন্তু আমিনের মনে হয় ওর সৈন্যদল বিধ্বস্ত। বিপর্যস্ত। শুধু একা সালাম চিৎকার করে ওঠে, তোরা আমার বাবা-মা সবাইকে মেরেছিস। আমি তোদের ছাড়বো না।

ও এসব কথা বলতে বলতে শত্রু বেষ্টনির মধ্যে ঢুকে যায়।

আমিন একবার ডাক দেয়, সালাম ফিরে আয়।

লোকটি ওর পাশে বসে বলে, ওকে আর ডেকোনা। ও আর নেই।

কিছুক্ষণ আগে ও আমার জীবন বাঁচিয়ে ছিলো। এখন—

আমিন হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে গিয়েও থমকে যায়। লোকটির হাত ধরে বলে, কোথায়

যাবো? দেখছো পুরো এলাকাটা গোরস্থানে পরিণত হয়েছে। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ।

লোকটির কণ্ঠে হিসহিস শব্দ। তুমি ছাড়া জীবিত মানুষ এখন কেউ নেই। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হচ্ছে দু'দিক থেকে।

আমিন ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, শালবনে যে মেশিনগান স্থাপন করেছিলাম সেটাই গর্জে যাচ্ছে।

লোকটি বলে, ওই মেশিনগান দিয়ে তোমার পিছুহটা সৈন্যদের কভারিং ফায়ার দিচ্ছে। তুমি এখন ওই দিকে যেতে পারবে না।

আমিন বলে, আমারও তাই মনে হচ্ছে। নিজেদের ফায়ার থেকে আমাকে এখন বাঁচতে হবে।

তুমি ডান দিকের নিচু ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগুতে শুরু করো।

লোকটির কণ্ঠ দূরে ভেসে গেলে ও ধানক্ষেতে নেমে যায়। খানিকটুকু এগিয়ে গেলে শুনতে পায় গোঙানি। কাঁদছে কেউ। বলছে, ওরে আঁই বাঁইচতে চাই। তোরা কেউ কি আঁর কথা শুনতে হাছ না। আঁরে লই যা। ওরে বাবারে।

আমিনের বুকের ভিতরটা যেন কেউ খামচে ধরে। বুঝতে পারে আহত হয়ে কেউ ওখানে পড়ে আছে। হয়তো নড়তেও পারছে না। কিন্তু ও বুঝতে পারে ওর নিজের কিছু করার নেই। গুলি-খাওয়া হাতটা টনটন করছে। তবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, বেটা চিৎকার করিস না।

সে মুহূর্তে ওদের খুব কাছে একটি আর্টিলারি শেল এসে পড়ে। আমিন মাথা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তবে বুঝতে পারে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে ওর চারপাশের মাটি উড়ে গেছে। ও বাম হাতে ভর করে নিজের আহত শরীর টানতে টানতে নালার কাছে চলে আসে। আর কোনো চিৎকার শোনা যাচ্ছে না।

লোকটি ওকে ডাকে, আমীন?

তুমি কোথায়?

আমার হাতটা ধরো। এবার ওঠো। উঠে দাঁড়াও।

আমি কি নালাটা পার হতে পারবো?

পারতেই হবে। বেঁচে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় আনন্দের। এসো।

আমিনের মনে হয় শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে ও নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। কিভাবে যে নালা পার হয়ে গেলো বুঝতে পারে না। কোথা থেকে অযুত শক্তি আহত শরীরটাকে চাঙ্গা করে দিয়েছে ও জানে না। তবু নালার অপর পাড়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় ও।

লোকটি ফিসফিসিয়ে বলে, তুমি এখন শত্রু থেকে অনেক দূরে চলে এসেছো। একটি ঢালু জায়গায় আছো। শত্রুর স্মল আর্ম ফায়ার থেকে বেঁচে গেছো।

ও লোকটিকে বলে, আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তুমি আমাকে ধরো আমি খুব জোরে একটা দৌড় দিতে চাই।

পারবে না।

বলতে বলতে একঝাঁক গুলি ওর পায়ের কাছে মাটি উড়িয়ে দেয়। ও আবার পড়ে যায়। অনেকক্ষণ আর কোনো গুলির শব্দ নেই। ও বড় করে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। সেটা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। দেখতে পায় কয়েকজন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে। নালার ওপারে একজন আহত যোদ্ধাকে দেখে গুলি করে। সঙ্গে ওদের সেকি আনন্দের হাসি। এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। ও মৃদু স্বরে লোকটিকে ডাকে, তুমি কি আছো? লোকটির সাড়া নেই। মাথা ঠাণ্ডা

রেখে ও ভাবে, এখন কি করা উচিত।

একটুপর একজন বাঙালির কণ্ঠ শুনতে পায়। রাজাকার। বলছে, মকবুল এদিকে আয়, পাওয়া গেছে।

কি পাওয়া গেছে? চমকে ওঠে আমিন। বুঝেছি, ঠেলে ঠেলে আসার কারণে কাদার মধ্য দিয়ে একটি পথ হয়ে গেছে। ওরা ওই পথকে চিহ্ন হিসেবে ধরেছে। ও ধানগাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। এবং আড়ালে আড়ালে তিনশ গজ এগিয়ে যায়। ও বুঝতে পারে শত্রুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু সামনে বিপদ। ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেছে। সামনে অনেকটা পতিত জমি। একদম খোলা। এদিকে কাদামাটিতে কোমর সমান ডুবিয়ে রাখার ফলে ভীষণ শীত করছে। শীতল হয়ে আসছে শরীর। হাতের ও পায়ের রক্ত এখনো ঝরছে। মৃত্যুচিন্তা ওকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। আর বুঝি বাঁচবো না। আর সম্ভব নয়। নিজের দিকের কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। মেশিনগানটি থেমে গেছে। মনে হয় এফ.ইউ.পি-র তত্ত্বাবধানে যারা ছিলো তারা বোধহয় চলে গেছে। ও ঘড়ির দিকে তাকায়। তখন সকাল আটটা দশ মিনিট।

এখন কি তোমার একটু ভালো লাগছে আমিন? লোকটির কণ্ঠ।

হ্যাঁ, গায়ে রোদ লাগছে। তবে ভীষণ পিপাসা। বুকের ছাতি বুঝি ফেটে যাবে।

আর একটু ধৈর্য ধরো।

কেমন করে? আমার জওয়ানরা কেউ কি নেই যে আমাকে কাভারিং ফায়ার দেবে? ওইটুকু পেলেই বোধহয় আমি বেঁচে যেতাম।

লোকটির কণ্ঠ, পঞ্চাশ গজ দূরে শত্রু তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সামনে একটি গর্ত আছে। আর্টিলারি শেল পড়ে গর্তটা তৈরি হয়েছে। কালো মাটির গর্ত। চলো তোমাকে ওখানে নিয়ে যাই।

গর্তের মধ্যে ঢুকে কালো মাটি দিয়ে গলা পর্যন্ত লেপে দেয় ও। তারপর স্টিল হেলমেট মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে থাকে। স্টেনগানটা বাম হাতে শক্ত করে ধরে রাখে। বন্দী হবো না কিছুতেই, ওদের মেরে তবে মরবো। চোখ বুঁজে আসছে। ক্লান্তি। তবু সেই জোরটুকু নিজের ভেতর ফুটতেই থাকে, মরতে হলে ওদের আগে মারবো, তারপর।

লোকটি ডাকে, আমিন?

আমিন চোখ বুঁজেই বলে, না, আমি মৃত্যুর কথা চিন্তা করবো না। কিছুতেই না।

না, একটুও চিন্তা করবে না। লোকটির কণ্ঠ। তোমার বয়স কতো অল্প। তোমার কতো কিছু করার আছে।

আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে। তুমি কি আমার কাছে বসে থাকবে?

হ্যাঁ, আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি শান্ত হও।

ঠিক সেই সময়ে ওর কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে শালবন থেকে। ও চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করে, কে কথা বলছে?

সাড়া নেই।

তুমি কি আছো?

লোকটির কণ্ঠ নয়। ও বুঝতে পারে কণ্ঠস্বর ওর কমান্ডিং অফিসারের। বলছেন, আমিন

আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করো।

ওর পুরো শরীর নড়ে ওঠে। যেন সঞ্জীবনী সুধা প্রবেশ করছে গুলিবিদ্ধ কনুইয়ের ফোকরের কাছ দিয়ে। আশ্চর্য! আহত হওয়ার তিন ঘণ্টা পর এই প্রথমবারের মতো সক্রিয় সাহায্যের আহবান এসেছে। লোকটি বলে, মেজর জিয়া তোমাকে খোঁজার নির্দেশ দিয়েছেন। খবরটা পৌঁছে গেছে যে তুমি নিহত বা নিখোঁজ হয়েছো। মেজর আমিন তাঁর কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে তোমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছেন।

ওহ্, কি শান্তি যে আমি মরিনি।

ওরা তোমাকে উদ্ধার করবে।

পারবে কি?

ওই দেখো মেজর আমিন ক্রল করে আসছে। পেছনে হাবিলদার তাহের।

তুমি আমার কাছে থাকো।

কিন্তু আমিন বুঝতে পারে কমান্ডিং অফিসার আর হাবিলদার ওর পা ধরে টানছে। যেন মরা লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কি আশ্চর্য, এবড়ো-খেবড়ো অসমতল মাটিতে পিঠের চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। যে পায়ে শেল লেগেছিলো সে পাটি ধরে টানার ফলে তীব্র ব্যথায় ডুকরে উঠতে গিয়েও দুই ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখে। শালবনের ভেতর থেকে চিৎকার করছে লেঃ মোদাসসের, তাড়াতাড়ি করেন স্যার। শত্রুরা মাত্র বিশ-পঁচিশ গজ পেছনে। একজন আহত যোদ্ধা মেরে ফেলে ওরা বীরদর্পে এগুচ্ছে।

তারা দুই এল. এম. জি.--ওয়ালা তখন দুই গাছের ওপর উঠেছে। ওরা কেঁদে কেঁদে বলছে, আপনাদের মেরে ফেলবে স্যার। তাড়াতাড়ি করুন।

কমান্ডিং অফিসার দাঁত খিঁচিয়ে ধমকে উঠলো, বেটা ফায়ার কর।

আসলে ওরা ভয় পাচ্ছে। ওদের উপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে বলে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু শত্রুরা ওদের ওপর চার্জ করার প্রস্তুতি নিতেই গর্জে ওঠে এল. এম. জি। ছয়-সাত জন খানসেনা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে। রাজাকার মকবুল আর তার সাথীদের হাতেনাতে ধরে ফেলে যোদ্ধারা। দু'জন খানসেনা পালিয়ে যায়। এ এমন একটা পরিস্থিতি যে এ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায় না। সময় পিছু টানে, এগিয়ে দেয়। যে ঘটনাটুকু ঘটলো সে ঘটনা কতোটুকু সময় নিয়েছে তা ওরা টেরই পায় না। কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুর আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে থাকে। শ্রাবণের বৃষ্টির মতো সে গুলির ধারা। এরই মাঝে মেজর আমিন ওকে কাঁধে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এগোতে পারে না। পরিশ্রান্ত মেজর আমিন ওকে নিয়েই নালায় পড়ে যায়। আমিন তখন কমান্ডিং অফিসারকে অনুনয় করে বলে, স্যার, প্লিজ আপনি চলে যান। তাহের আমাকে নিয়ে আসবে। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি যান। আমি তো আগেই বলেছি দু'জন অফিসার হারানো মুক্তিবাহিনীর জন্য ভীষণ বোকামি হবে।

তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে পারি না।

যেতে হবে। যান। আমিন জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাহেরের দিকে হাত বাড়ায়।

স্যার প্লিজ আপনি চলে যান।

আমিন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে। গুলির শব্দে ওর মনে হয় শরীর আরো খারাপ লাগছে। বমি হবে। মেজর আমিন ততোক্ষণে দৌড়াতে শুরু করেছে। সে ক্রল করে খালি হাতে

এসেছিলো। ফিরে যাচ্ছে খালি হাতে।

হাবিলদার তাহের আমিনকে কাঁধে তুলে নিয়ে এক ছুট দেয়। চারদিকে বৃষ্টির মতো আর্টিলারি ফায়ার। যতোটা সম্ভব তীব্রবেগে ছুটছে ও। হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, স্যার, চিন্তা করবেন না, মরলে দুজনে একসাথেই মরবো।

আর মৃত্যুর কথা নয়। তোমরা বিপদমুক্ত।

কে, কে কথা বলছে স্যার?

লোকটি আমিনের কানে ফিসফিস করে বলে, তুমি বেঁচে গেছো। আর ভয় নেই।

মাথার ওপর গাছের ছায়ার স্নিগ্ধতা। আমিনের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওরা শালবনে পৌঁছে গেছে। গাছের ঘন সারির আড়ালে ওদের আর কেউ দেখতে পাবে না। তাহের আবারো বলে, মনে হচ্ছে কেউ যেন কথা বলছে স্যার?

হ্যাঁ বলছেই তো।

কে স্যার?

আমাদের হৃদয়।

কি বলছেন স্যার?

কথা বলছে আমাদের সাহস।

স্যার, আপনার কি জ্বর এসেছে?

না তাহের। জ্বর আসেনি। আহত হয়েছি, কিন্তু সাহস হারাইনি। এবার বেঁচে গেছি। সামনে আবার যুদ্ধ। স্বাধীনতা আমাদের চাই তাহের।

চাই, জীবনের বিনিময়ে হলেও।

শালবনের ভেতর তাহের ওকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলে, স্যার এবার একটু রেস্ট নিন।

ঠিকই বলেছো। তুমি ফিল্ড ড্রেসিং বের করো।

তাহের ড্রেসিংয়ের কাজ করতে করতেই লোকটি ফ্লাক্সভর্তি চা নিয়ে আসে।

তুমি কোথা থেকে এলে? তাহেরের বিস্ময়!

আমি দূর দেখেই দেখতে পেয়েছি আপনাদের। এ্যাসেম্বলি এরিয়ায় চা তৈরি হয়েছিলো। ভাবলাম আপনাদের এখন চায়ের খুব দরকার। খান, ফ্রেস লাগবে।

চমৎকার। এমন লোকই তো চাই। তাহের উৎফুল্ল হয়ে চায়ে চুমুক দেয়।

লোকটি আমিনের চোখে চোখ রাখে। আমিনও ওকে দেখে। কেউ দৃষ্টি ফেরায় না।

১৪

মুজিবনগরে পৌঁছেই মঞ্জুর তাহেরকে জড়িয়ে ধরে বলে, তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত–তাহের ওকে কথা শেষ করতে দেয় না। বলে, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়াটা আমরা সফল করতে পারলাম। এখন লড়াই। দ্বিতীয়বারও আমরা নিশ্চয়ই সফল হবো।

তাহেরের প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠ আবেগে কেঁপে যায়। মঞ্জুর মৃদু হাসে। দু'জনেই দু'আঙুল তুলে বিজয়ের চিহ্ন ঘোষণা করে।

তাহের বুঝতে পারে এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার পরও ওরা ক্লান্ত নয়। কবে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারবে সেটাই প্রধান। একসময়ে ওর মনে হয়েছিলো পথের শারীরিক যাত্রার চেয়ে মানসিক পথের দৈর্ঘ্য ছিলো বেশি—কেননা আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তাকে তো গজ-ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। এর কোনো সীমানা নেই। এখন ওরা সবকিছুর উর্ধ্বে। মেজর তাহের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মুহূর্তের জন্য চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। এখন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির সামনে। অস্থির অপেক্ষা। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মুজিবনগরে এসেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হয়ে গেছে। প্রধান সেনাপতি তাঁকে মেঘালয় ও তার আশেপাশের এলাকায় যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখার জন্য যেতে বললেন।

ও খুশিমনে ঘরে ফেরে। আগামীকালই মেঘালয়ে রওনা হয় যাবে। কালক্ষেপণের সময় নেই। সামনে দুরূহ পথ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে স্পেশাল কমাণ্ডের মেজর ছিলো ও। সত্তরের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ও আমেরিকা থেকে ফিরে আসে। সঙ্গে লুৎফা ছিলো। সে সময়ে কমাণ্ডোবাহিনীর অনেককে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিলো। ওকে পাঠায়নি। ওর দিকে বিশেষ নজর ছিলো ওদের। ও বাঙালির অধিকারের ব্যাপারে খুব সোচ্চার ছিলো। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরই বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলো বাঙালির ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারটি অতো সহজ নয়। ওরা নিজেরা তখন বুঝেছিলো সামনে কঠিন সময়।

সেই কঠিন সময় মাথায় নিয়ে ও এখন মেঘালয়ে। বিএসএফ-এর ঘাঁটি তুরায়। সেখানে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সেখানকার ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রধান। ওখানে ওকে পেয়ে জড়ো হয় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ওরা বিএসএফ বাহিনীর নির্দেশে বিভিন্ন শত্রু ঘাঁটিতে সরাসরি আক্রমণ পরিচালনা করে আসছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাহেরের মনে হয় সবগুলো মুখ ওর নিজেরই। কি আশ্চর্য, কেমন করে এতো কিছু একাকার হয়ে গেলো! ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় রেডিওতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বক্তৃতা শোনার পর ওর ভেতরে যে বাতিটি জ্বলে উঠেছিলো সেটি এখানে আসার পরই নিভলো। এবার ওর অন্য যাত্রা শুরু।

সেদিন ইয়াহিয়া যে বক্তৃতা করেছিলো সেটুকুই ওর জন্য যথেষ্ট ছিলো। সে সন্ধ্যায় কোয়েটা শহর ওর কাছে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো মনে হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারি মাসেই লুৎফাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ও মা হবে। ভেবেছিলো তেমন দিন যদি আসে তাহলে মা ও শিশুকে নিয়ে পালানো কঠিন হবে। তারচেয়ে ও চলে যাক। এখন ভীষণ ফাঁকা লাগছে। লুৎফা থাকলে ওর হাত ধরে কঠিন শপথ নিতো। নিজের আবেগ ওর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতো। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু সম্ভব নয়। ভীষণ অস্থিরতা শরীর জুড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত কোয়েটার নির্জন রাস্তায় পায়চারি করে কাটানোর সময়ে কেবলই মনে হয়েছিলো চারদিক থেকে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে। ওর মাথার ভেতরে উন্মত্ত সমুদ্র পেরিয়ে চলে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বাতিঘরের আলোর মতো জ্বলে ওঠে। সে আলো আর নেভে না। একা ঘরে ফিরে আসে। নিজের অনাগত শিশুর চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ছেলে হবে না মেয়ে? যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহল লুৎফা কেমন করবে? পারবে তো শিশুটিকে নিয়ে নিজেকে

রক্ষা করতে? সে রাতে ঘুমুতে পারেনি ও। বারবার ঘুম ভেঙে যায়। এ্যাসট্রে ভরে ওঠে ছাই আর সিগারেটের টুকরোয়।

ব্রিগেডিয়ার সন্ত বলে, তোমাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছে মেজর তাহের? টায়ার্ড?

টায়ার্ড নই। নানা কিছু ভাবছি।

তোমাদের যুদ্ধ তোমাদেরই করতে হবে। আমরা সাহায্য করবো মাত্র।

আমার তো মনে হয় সাহায্য যতো কম নিতে পারি ততোই মঙ্গল। যুদ্ধটা আমরা নিজেরাই করতে চাই।

ব্রিগেডিয়ার সন্ত তাহেরের সঙ্গে হাত মেলায়। মৃদু হাসে। ভীষণ অমায়িক। তাহের মনে মনে প্রশংসা করে বলে, থরো জেন্টলমেন্ট।

ব্রিগ্রেডিয়ার চলে যাবার পর ছেলেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপেক্ষা করে। একজন বলে, স্যার চা খাবেন?

হ্যাঁ, তা খাবো।

চা খেতে খেতে আমাদেরকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার গল্প শোনাবেন।

অন্যজন বলে, গল্প নয়।

আর একজন, তবে কি?

অন্যজন, যুদ্ধযাত্রা। কোয়েটা থেকে শুরু।

ওদের কথা শুনে হো-হো করে হাসে তাহের। লুৎফাকে যখন ঢাকায় পাঠিয়ে দেয় তখন ওরা ছিলো আটকেফোর্টে। তারপর কতো জায়গা। শিয়ালকোট-জাফরওয়াল হয়ে ভারতীয় সীমান্ত দেবীগড়ে পৌঁছার পরও তাহেরের মনে হয়নি যে ওর বুকের ভেতরের বাতিটি নিভেছে। সেদিন টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিলো। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন। ভাবতেও এখন গা কেমন শিউরে ওঠে। পাকিস্তানি দুটি সীমান্ত ঘাঁটির মাঝামাঝি রাস্তা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার পথ বেছে নিয়েছিলো ওরা; প্রতি মুহূর্তে বিপদ, প্রতি মুহূর্তে ভয়—যদি সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। তাহলে কি ফেরত যেতে হবে শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টে? কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা ধুয়ে নিয়ে যায় বৃষ্টি। সেদিন তাহেরের মনে হয়েছিলো বৃষ্টি ভালোবাসার কুসুম ফোটার সময়ের মতো অপরূপ। যেন বুকের ভেতরে আড়াল করে রেখে বললো, যাও ভয় কি? ভয় তো তাহেরের ছিলো না। নিজেকে নিয়ে ওর কোনো ভয় নেই। সঙ্গে মঞ্জুরের স্ত্রী ও শিশুরা আছে। ওদের বিপদ সহ্য করা যায় না। শিশুদের স্লিপিং পিল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেদিন বৃষ্টির কারণে মিলিটারি পুলিশ আর চেকপোস্টের বাইরে বেরুলো না, ফলে গাড়ির চেকিং হলো না। নির্বিবাদে পার হয়ে যাওয়ার পরও নিশ্চিত হতে পারছিলো না ওরা। পেছনে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন একটি গাড়ি আসছে। ভেজা রাস্তার সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে হেডলাইটের আলো। ওরা বিন্দুমাত্র রিস্ক নিতে রাজি নয়। দ্রুত নেমে যায় মেঠো পথে। শিয়ালকোটের নিচু জমি বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে আছে। হাঁটতে কষ্ট হয়। তবুও বুকের ভেতরের বাতি নেভে না তাহেরের। হাতে কম্পাস আর রিভলভার নিয়ে সবার আগে আগে যাচ্ছে। মেঘলা আকাশের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাহেরের এখন মনে হয় ওই কম্পাস আর রিভলবার দিয়ে ও অন্ধকার কেটে গুহা তৈরি করেছিলো। একদল মানুষ সেই গুহার ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলো নির্বিবাদে।

ছেলেরা ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে মুড়ি-চানাচুর। ওরা হৈ-চৈ করে খাচ্ছে। ওদের

কলধ্বনি ওর কানে ঢোকে না। ও মেঘালয়ের দূর পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেন জানি স্বপ্নের মতো মনে হয় পালিয়ে আসার দিনগুলো। মনঞ্জুর বলতো, দুঃস্বপ্ন। তাহের দুঃস্বপ্ন ভাবতে রাজি ছিলো না। ওর সবটাই স্বপ্ন, ওর সবটাই আলো। আবারও পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দৃষ্টি আটকে যায়—মেঘ কিংবা কুয়াশা জমে আছে। একসময় তাহেরের সামনে থেকে মেঘালয়ের প্রকৃতি অদৃশ্য হয় যায়। ও বুঝতে পারে ও শুধু তাকিয়েই আছে, কিন্তু মাথার ভেতর অন্য চিন্তা, একটা নয় অসংখ্য। সেগুলো ছোট ছোট শিশির কণার মতো বিশাল মাঠের ধানের ডগায় জমে আছে। প্রতিটিই আলাদা, অথচ প্রতিটিই অখণ্ড। এক অস্ফুট ধ্বনিতে হুররে করে ওঠে। নিজেকে বলে, এই এলাকা আমার জন্য ভার্জিল সয়েল। যদিও আমার আগে জেড ফোর্স বেশ কিছু আক্রমণ পরিচালনা করেছে, তবুও বলবো এই একালায় আমার জন্য ভার্জিন সয়েলই। এখানে আমি নিজস্ব পরিকল্পনায় শত্রুর ঘাঁটি আক্রমন করতে পারি। এখন পর্যন্ত এই এলাকা কোনো সেক্টরের আওতায় নেই। এখানে একটি নতুন সেক্টর হবে। রংপুর জেলার রৌমারি থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চল এবং সিলেট সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল এলাকা। ভৌগোলিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ছেলেদের সঙ্গে গল্প শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আগে। ওরা ক্যাম্পে ফিরে গেছে। কোলাহল শূণ্য প্রাঙ্গণ। শুধু পাখির কিচিরমিচির শৈশবের পাখির ডিম খুঁজতে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গলফ স্টিকটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ও। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা গিয়ে আবার ঘরে ফিরতে থাকে। হাতের গলফ স্টিকটি উর্ধ্বমুখী নিম্নমুখী হয়। মাথার ওপর বাঁই বাঁই ঘোরে। পথের দু'পাশের বুনো ঝোপে আঘাত করে। ভেঙে পড়ে ফুল কিংবা শাখা বা পাতা। আসলে ও ততোক্ষণে বুঝে গেছে যে এই আচরণের অন্তরালে অন্যরকম আচরণ আছে। মাথার ভেতরে নতুন উদ্ভাবিত চিন্তারাজি ট্রেনের মতো ধাবমান। ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছে ঝমঝম শব্দে। দু'ধারে অপরূপ শস্যক্ষেত। কখনো সে ট্রেন ঢুকে যায় অন্ধকার গুহায়। ঘরে ফিরে তাহের এতোক্ষণের ভাবনা সংহত করে। তারপর লিখতে বসে। প্রধান সেনাপতির কাছে একটি আবেদন পত্র। খসখস করে একটানে লিখে ফেলে। আবেদনে বলা হয়, এই এলাকাকে যেন সেক্টরে পরিণত করা হয়।

আবেদন মঞ্জুর হয়ে চিঠি আসতে সময় লাগে না। নতুন সেক্টরটির নাম হলো ১১ নং সেক্টর। কমাণ্ডের দায়িত্ব তাকেই দেয়া হলো। সেক্টরের হেড কোয়ার্টার মহেন্দ্রগঞ্জ। গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চমৎকার নিসর্গের স্বর্গ। দৃষ্টি জুড়িয়ে দেয়। স্নিগ্ধ করে রাখে হৃদয়। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের আনন্দ। ভোলা যায় না যে এখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটারের মধ্যে সীমান্তের অপর পারে পাকিস্তানিদের দুর্ধর্ষ ঘাঁটি কামালপুর। সমানে সমান লড়াই। যে করেই হোক দূর্ভেদ্য শত্রু ব্যূহ চুরমার করে দিতে হবে। সারাক্ষণই মাথার মধ্যে নানান চিন্তা।

নিজের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নিতে সময় নেয় না তাহের। দ্রুত পুরো এলাকাকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে ভাগ করে ফেলে। মানকার চর থেকে ডালু পর্যন্ত নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বাকি এলাকা বিগ্রেডিয়ার সন্ত সিং-এর কমাণ্ডে থাকে। তুরাতে ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং ছেলেদের ট্রেনিং দেয়াচ্ছেন। নিজের এলাকাতেও একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলে তাহের। এর মধ্যে নিজের ছোট তিনভাই আনোয়ার, বেলাল ও বাহার এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ওর ট্রেনিং ক্যাম্পে আড়াইশ জন কৃষককে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। গ্রামের এইসব গরিব সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ওকে অভিভূত করে। কারুরই আগের কোনো প্রশিক্ষণ নেই, অথচ প্রত্যেকের কি

বিপুল আগ্রহ। কখন হাতে অস্ত্র পাবে, কখন একটি অপারেশনে অংশ নিতে পারবে, এই ব্যাকুলতায় অস্থির। তাহেরের মনে হয় এদের নিয়ে একটি গণবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি এরাই হবে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান সহায়ক।

এর মধ্যে খবর আসে মেঘালয় সীমান্তে পৌঁছেছে লুৎফা। সঙ্গে ডলি, জলি, তার ছোট্ট মেয়ে, সাঈদ, আর সাব্বির। ওয়্যারলেসে ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব ব্যগ্র ভাবে তাকে জিজ্ঞেস করে, ওরা কেমন আছে সন্ত? ভালোভাবে পৌঁছতে পেরেছে তো?

ঘাবড়িওনা। সবাই ভালো আছে। পাহাড়ি ধ্বসে তুরার রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। রঙরা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মুরারীকে বলেছি জিপ পাঠিয়ে ওদের নিয়ে আসার জন্য। ওরা কালাচাঁন মিয়ার বাড়িতে আছে। দারুণ লোক। অনেক শরণার্থী ওই বাড়িতে আছে।

তুমি দেখছি অনেক খবর নিয়েছো।

তোমার জন্য বন্ধু। নইলে তুমি টেনশনে থাকবে।

থ্যাঙ্কু, মাই ফ্রেণ্ড।

আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। শোনো ওরা রঙরায় একদিন থাকবে। তারপর আমি জিপ পাঠাবো ওদের তুরায় নিয়ে আসার জন্য। তুমিও কাল বিকেলে এখানে চলে আসো।

হোয়াট এ প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ!

ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং হা-হা করে হাসে। হাসির মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাহের ভারতীয় এই মানুষটির অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয় যায়। ওকে পরিবারের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কতো তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনে হয় সারা জীবনে এই ঋণ কখনো বুঝি শোধ হবে না। এটাও যুদ্ধের কৌশল। একজন কমাণ্ডারকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। কতোদিন পর স্ত্রী, ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হবে সেই ছোট্ট মানুষটিকে। এখন পর্যন্ত তাকে দেখাই হয়নি। ভাবতেই ও পুলকিত হয়।

সেদিন বিকেলে কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে তুরায় পৌঁছে যায় তাহের। যেন উড়ে চলে আসা —বিশেষ কতোগুলো মুহূর্তকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা। মুহূর্তগুলো হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ সময় অতিক্রম করার পর তারাভরা আকাশের নিচে দারুণ স্মৃতি হবে। ভুলিয়ে দেবে ক্লান্তি। শীতল করবে স্নায়ু। তুরায় পৌঁছে জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। হাতে গলফ স্টিক। ওদের দেখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ওর চোখ। লুৎফাকে বলে, দেখেছো আমি ঠিক পাকিস্তান থেকে চলে আসতে পেরেছি।

আমি জানতাম তুমি পারবে।

লুৎফা হাসতে হাসতে বলে। ভাইবোনেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে। তাহের মেয়েকে কোলে নেয়ার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি আমার সোনামণিকে? কি নাম রেখেছো ওর?

কেউ কিছু জবাব দেবার আগেই বলে, ওকে আমি জয়া ডাকবো। জয় আমাদের হবেই। ও আমরা স্বাধীনতা।

শিশুটি বাপের আদর বুঝতে পারে না। তারস্বরে চেঁচাতে থাকে।

ওর জন্মের সাতদিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে আমাকে।

হুঁ, পথের ধকলের পরও যে ও সুস্থ আছে তা আমি ভাবতেই পারছিনা। তুমি ওকে সামলাও লুৎফা। এতো কাঁদছে কেন?

তারপর ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে বলে, এই তোরা দেশের খবর বল। আব্বা, আম্মা কেমন আছে? দেশের খবরের জন্য ব্যাকুল তাহের নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে ওদের। লুৎফার মনে হয় সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পরও মানুষটা ঠিক আগের মতোই আছে। প্রাণচঞ্চল। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর।

চা খাবার পর ঠিক হয় বিএসএফ অধিনায়ক কর্নেল রঙরাজের গোয়ালঘর পরিষ্কার করে ওদের থাকতে দেয়া হবে। ওটা আপাতত খালি পড়ে আছে। পরিষ্কার করতে বেশি সময় লাগবে না।

তাহের হাসতে হাসতে লুৎফাকে বলে, যুদ্ধের সময় এর চেয়ে ভালো জায়গা কি তুমি আশা করো লুৎফা?

প্রশ্নই আসে না।

লুৎফার উত্তরে তাহের স্বস্তি বোধ করে। লুৎফা বলে, তোমার চার মাসের মেয়েকে নিয়ে যে এতো দূরে আসতে পেরেছি এই তো অনেক বেশি। নেত্রকোনার শনির হাওরের কথা কি তোমার মনে আছে?

হ্যাঁ, খুব। দেশের কোন জায়গাটা আমি চিনি না বলতো?

সেই শনির হাওর আমরা তিন দিনে পার হয়েছি। কি যে ভয় করছিলো। বর্ষায় হাওর সমুদ্রের মতো ফুলে উঠেছে। প্রচণ্ড স্রোত।

তাহের ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

তুমি হাসছো?

তোমার বর্ণনা শুনতে খুব ভালো লাগছিলো। আমি তো জানি তুমি আমার ভীষণ সাহসী বউ। মেয়েটিও এমনই হবে, আমি ঠিক জানি।

ডলির কোল থেকে মেয়েকে নিতে নিতে বলে, তাই না ডলি?

ডলি চুপ করে থাকে। জলিও। ওদের কাছে এই দলে আসার সময়টা কেমন তা ওরা বর্ণনা করতে পারবে না। দুবোনের মনে হয় ওরা ঘোরের ভেতর আছে। ওদের ঘোর এখনো কাটেনি।

এতো কিছুর ভেতরে ডলি আকস্মিকভাবে বলে, আমরা এখানে কাজ করতে চাই ভাইজান।

যুদ্ধ করবি?

হ্যাঁ, দু'বোনে আগ্রহের সঙ্গে বলে।

আমাদের অস্ত্র চালানো শেখাবেন?

শেখাবো। তাহের মাথা নাড়ে। নার্সিংও শিখতে হবে তোদের। দরকার হলে সেটাও করতে হবে।

আমরা পারবো।

দু'বোন আবারও মাথা নাড়ে। তাহের গলফ স্টিকটা ওদের মাথায় ছুঁইয়ে বলে, সব হবে।

তখন একজন এসে বলে, আপনাদের জন্য ঘর রেডি। বিশ্রাম নিন।

ওরা সবাই গোয়ালঘরে ঢোকে। পরিপাটি বিছানা পাতা হয়েছে। ওরা সে বিছানায় গড়িয়ে

পড়ে। প্রত্যেকে একই রকম করে ভাবে। রাতটুকু ঘুমুতে পারলে কাল সকালেই ওরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যেতে পারবে। ট্রেনিং নেয়াটা ভীষণ দরকার।

তাহের চলে গেলে লুৎফা ওদের দু'বোনের কাছে গল্প বলে। কতো কষ্ট করে তাহের কমাণ্ডো ট্রেনিং নিয়েছে। বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে হতো বন্ধুর পথ। কি ভীষণ কঠিন ট্রেনিং ছিলো সেটি। তারপরে ও স্পেশাল কমাণ্ডোর মেজর হয়। কমাণ্ডো ট্রেনিংয়ের গল্প শুনতে শুনতে ঘুম আসে ডলি-জলির। কিন্তু ঘুমুতে পারে না লুৎফা। গোয়ালঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালে যতোদূর দেখা যায় মনে হয় এক ভৌতিক প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে আছে। দিনের বেলায় তুরায় প্রকৃতি এমন মনে হয়নি। পথ শ্রমে ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ওদের ক্লান্তি হরণ করেছিলো। এখন কি ওকে একা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছে? লুৎফার গা ছমছম করে। মনে হয় ওর আশেপাশে কারা যেন ভিড় করেছে। কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু বলে না। ওর সামনে দিয়ে মুখ নিচু করে চলে যায়। লুৎফা স্তব্ধ হয়ে থাকে। মনে হয় ও বুঝি দরজার সঙ্গে সেঁটে গেছে। শত শত হাত ওর দিকে এগিয়ে এসেছে কিন্তু কেউ ওকে টেনে তুলতে পারছে না। ও অবসন্নের মতো দরজার কাছে বসে পড়ে।

একজন সেপাই এগিয়ে আসে, ম্যাডাম আপনার কি খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ।

জল দেবো?

হ্যাঁ

সেপাই জল আনতে গেলে ওর ভীষণ কান্না পায়। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সেপাই জলের গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এখানে আপনার কোনো ভয় নেই ম্যাডাম। আমরাতো আছি। আপনি ঘুমুতে যান।

লুৎফা আবার গোয়ালঘরে ঢোকে।

খোলা দরজা দিয়ে আবার পেছন ফিরে তাকায়। মনে হয় তুরার আকাশে চাঁদটা ভাঙা এবং বিষণ্ণ। ওর বুক ভার হয়ে যায়। তাহেরের সঙ্গে এমন উজ্জ্বল সময় কাটানোর পরও ও একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে বালিশে মুখ গোঁজে। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না যে কেন ওর এমন লাগছে।

রাতে ঘুম হয় না তাহেরের। কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা মাথার ভেতর। [illegible] হলে গলফ স্টিক আর সিগারেট ওর প্রধান অবলম্বন। একটার পর একটা সিগারেট শেষ হয়, ছাই ঝরে পড়ে। আর গলফ স্টিক চেয়ারে, টেবিলে, মেঝেতে, দেয়ালে [illegible] একটি যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্রকল্প তৈরি হয়। শেষ রাতে অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে খুব ভোরে আবার উঠে পড়ে ও। খবর দেয় অন্য অফিসারদের। ওরা এসে পৌঁছুনোর আগে হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে রেডি হয়ে নেয়।

সবাইকে অপারেশনের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলার পর একজন বলে, স্যার আপনি মাত্র এখানে এলেন এর মধ্যে—

তাহের ওকে থামিয়ে দেয়। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, এর মধ্যে। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই। এবং দেড়শ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে। আমি জানি এর চেয়ে বেশি সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এখানে নেই।

কখন স্যার?

আজই। সন্ধ্যায়।

এতো অল্প সংখ্যক ...

সংখ্যা বেশি হলেই তার গুণ বেড়ে যাবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই আনোয়ার। আমাদের এখন দরকার পাকিস্তান আর্মিকে ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত করে রাখা। মুক্তিযোদ্ধাদের আগ্রহ আর এতো অল্পদিনের ট্রেনিংয়ের দক্ষতা দেখে আমি বুঝে গেছি যে ওদের দিয়ে আমি একটা অপারেশন চালাতে পারবো।

এরপর আর কোনো কথা চলে না। মুহূর্তে প্রত্যেকে নিজেদের ভেতর চঞ্চলতা অনুভব করে। যেন প্রবল শক্তি হাওয়ায় উড়ে এসে ভর করেছে ওদের কাঁধে। ওরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

সেদিন সন্ধ্যা। অস্ত্র শুধু এল. এম. জি, রাইফেল আর স্টেনগান। তাহের নিজেই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয়। পরিকল্পনা মতো মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ নিজ অবস্থান বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

অন্ধকার গাঢ় হয়। দিনের বেলায় রেকি করে আসা হয়েছে। ওর মনে হয় শুধু পথঘাট নয়, ঝোপঝাড়ও চেনা হয়ে গেছে। আজ একটি সফল অপারেশন হবেই। অন্ধকারে এগোতে এগোতে ও অনুভব করে যুব শিবিরে যেসব ছেলেরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে কবে ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ডাক পড়বে এইসব ছেলেরাই তো আজ ওর সহযোদ্ধা। তবে এটাও ঠিক এখানে আসার পরই ও বুঝে গেছে যে কামালপুর পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত ঘাঁটি। এরা সীমান্ত এলাকায় শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সীমান্তের পথগুলোই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভেতরে ঢোকার প্রবেশ পথ। ঘাঁটিগুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য ওরা কাঁটাতারের বেড়া ও মাইন ব্যবহার করে। কামানের গোলা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মজবুত বাঙ্কার তৈরি করেছে। এসব রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে ও আরো জানতে পেরেছে যে আর্মি ছাড়াও রাজাকার--আলবদররা এসব ঘাঁটিতে থাকে। ও নিজে নিজে বলে, থাকুক, যতো খুশি থাকুক। আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারবে না। কারণ রাজাকাররা করছে গোলামী। আর মুক্তিযোদ্ধারা করছে স্বাধীনতার জন্য লড়াই। এছাড়া বেশিরভাগ গ্রামবাসী রয়েছে আমাদের পক্ষে। এরাই আমাদের নেপথ্য বড় শক্তি। গেরিলা যুদ্ধে জনগণ সহায়ক না হলে সে যুদ্ধ সফল হয় না। তাহের আপন বিশ্বাসে স্থির হয়ে যায়।

নির্ধারিত স্থান থেকে শুরু হয় আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যায়। ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে। ওরা ঢুকে পড়ার পরই পাকিস্তান আর্মি একশ কুড়ি মিলিমিটার মর্টারের গোলা বর্ষণ শুরু করে। কামালপুর থেকে বক্সিগঞ্জের দূরত্ব সাত মাইল। কামালপুর ঘাঁটির বেগতিক অবস্থা দেখে ওরা বক্সিগঞ্জ থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। নিজেদেরকে রক্ষা করার এটাই ওদের কৌশল। নিজ অবস্থানের ওপর নিজ মর্টার দিয়ে গোলাবর্ষণ। মজবুত বাঙ্কারের কারণে ওদের কোনো ক্ষতি হয় না। অবস্থা সুবিধের নয় দেখে তাহের মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটার নির্দেশ দেয়। এর মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়; অন্যরা আহতদের ঘাড়ে করে ফিরে আসে ক্যাম্পে।

ঘাঁটিতে ঢোকার পরও দখল করা গেলো না, এই ব্যর্থতায় মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলে তাহের ওদের সান্ত্বনা দেয়। উৎসাহিত করে। একই সঙ্গে বুঝতে পারে এটুকু করতে ওর খারাপ লাগছে, ব্যর্থতাটুকু ওকেও কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু ও শক্তভাবে নিজেকে সংযত রাখে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয় না। বরং সবাইকে আহতদের সেবা করার কাজে লাগিয়ে দেয়।

যারা বেশি আহত হয়েছে তারা কাৎরাচ্ছে। কেউ কেউ চুপচাপ। শান্ত হয়ে শুয়ে আছে। জরুরি সেবা কাজ চলছে। তাহের সবার সঙ্গে কথা বলে। হাঁটু গেড়ে বসে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, দুঃখ কোরো না। জয়ী আমরা হবোই।

পেছন থেকে অনেকে একসঙ্গে বলে, হ্যাঁ হবোই।

সবার সঙ্গে কথা বলে ও আনোয়ারকে বলে, ডলি–জলিকে এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এইসব আহতদের জন্য ওদের আমার দরকার। ওদের অস্ত্র চালানোও শেখাবো। আনোয়ার মাথা নাড়ে, কালই ব্যবস্থা করবো।

নিজের ঘরে ফিরে আসে তাহের। এখন সিগারেট চাই। একটার পর একটা। একটা থেকে অন্যটা জ্বলে। দিয়াশলাইর কাঠি ব্যবহার হয় না। মাঝে মাঝে গলফ স্টিকটা টেবিলের ওপর থেকে উঠিয়ে নেয়। আবার রাখে। পায়চারি করতে করতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথার ভেতর নানান ভাবনা। ও এখানে আসার আগে মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশল ছিল 'আক্রমণ করো আর পালাও।' কিন্তু না এটা আর চলবে না। অন্য উপায় বের করতে হবে।

তিন দিন পর তাহের সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে দু'একটি সামরিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। বক্তৃতা দেয়। তারপর বলে, এখন থেকে আমাদের নীতি হবে, 'শক্তিশালী ঘাঁটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকো। শত্রুকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তাকে শক্তিশালী ঘাঁটি থেকে নির্ধারিত স্থানে বের করে আনো এবং হত্যা করো।' পরে আবার বলে, তোমরা ভাবতে পারো হত্যা শব্দটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা? আমি মনে করি 'নিয়মিত যুদ্ধে এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার নেই। শত্রুকে পরাজিত করাই মূল উদ্দেশ্য। গেরিলা যুদ্ধে চিহ্নিত শত্রু মানবিক প্রশ্নে বড় অপরাধী। হত্যাই তার যোগ্য শাস্তি।' তবে তোমাদের আমি সবসময় একটি কথা বলি, আজও বলছি, সুযোগ পেলেই গ্রামবাসীর সঙ্গে মিশবে। ওদের আপন করে নেবে। বলবে, ওরাও এক একজন যোদ্ধা। ওদের ছাড়া গেরিলাযুদ্ধ সফল হবে না। তোমরা দেখেছো আমরা যেসব কৃষককে ট্রেনিং দিয়েছি তারা কতো নিবেদিত। কতো অল্প ট্রেনিং নিয়ে ওরা কতো সাহসী। কতো বিচক্ষণ। ভাবতেও আমি অবাক হই। ঠিকমতো নেতৃত্ব পেলে ওরা যে কোনো দুর্গম এলাকার অপারেশনও সফল করতে পারবে। আমি ভীষণ আশাবাদী।

ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। ক্যাম্পে ফিরে যাবার পথে ওদের প্রত্যেকের মনে হয় সেক্টর কমাণ্ডার কোনো নতুন জায়গা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। হয়তো দু'এক দিনের মধ্যেই ওরা তা জানতে পারবে।

পরদিন মেজর তাহের ভীষণ খুশি। তার বড়ভাই ইউসুফ ১১ নং নম্বর সেক্টরে এসে পৌঁছেছে। মুক্তিযোদ্ধারা উৎফুল্ল। ইউসুফ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির অনুমতি নিয়ে এই সেক্টরে যোগদান করেছে। ব্যক্তিগতভাবে তাহের উৎফুল্ল সবচেয়ে বেশি এ কারণে যে ওরা সব ভাই একই সেক্টরে জড়ো হতে পেরেছে। বেলাল বলে, ভাইজান একটা দারুণ ঘটনা ঘটিয়েছে।

সৌদি রাজতন্ত্র তো পাকিস্তানিদের পক্ষে।

বাহার সায় দেয়। তারপর অন্যদের বলে, আমার ভাইজান যুদ্ধের আগে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ছিলেন। ওখান থেকেই পঁচিশে মার্চের আগে সৌদি বিমান বাহিনীর দাহরান সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেষণে নিযুক্ত ছিলেন। ওখান থেকে

যে কিভাবে ছাড়া পেলেন সেটা শোনার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।

আমরাও।

অনেকের কণ্ঠ। সবাই চা-মুড়ি খাচ্ছে আর চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। ইউসুফ অল্পক্ষণের জন্য ঘুমুতে গেছে। একটু পরই হয়তো উঠে আসবে।

ওদের একদফা চা-মুড়ি খাওয়া শেষ হলে হাতমুখ ধুয়ে হাজির হয় ইউসুফ। পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, জয় ইউসুফ ভাইয়ের। ইউসুফ কিছু বলার আগেই চারদিক থেকে স্লোগান ওঠে, জয় বাংলা।

ইউসুফ ভাই মনে হচ্ছে নাকি এখুনি কোথাও এ্যামবুশ পাততে বেরিয়ে পড়ি।

আমিও তাই ভাবছি।

আনোয়ার এক কাপ চাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, আগে এটা শেষ করুন।

শুধু চা? মুড়ি কৈ?

মুড়ি আসে। খেতে খেতে গল্প জমে ওঠে, বুঝলে ঢাকায় যখন নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ হয়েছে তখন আমি ঢাকা থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে। বিবিসি, ভোয়া ধরে আগে থেকেই ঢাকার খবর শুনতাম। কিন্তু ওরা যখন গণহত্যা শুরু করলো তখন থেকেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু সৌদি রাজতন্ত্র পাকিস্তানিদের পক্ষে থাকায় হঠাৎ করে কিছু করতে পারলাম না। আমাকে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। সে সময়টাই ছিলো আমার বাৎসরিক ছুটির সময়। যাহোক জুন মাসে ছুটি মঞ্জুর হলো। আমাকে আর পায় কে। আমি কি আর পাকিস্তানে ফিরি। দাহরান থেকে সোজা জেদ্দা চলে গেলাম। তারপর লন্ডন, লুক্সেমবার্গ, মস্কো, দিল্লী, কলকাতা, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি, গৌহাটি, তুরা হয়ে পৌঁছে গেলাম এই মহেন্দ্রগঞ্জে।

বাহ্, আপনি দেখছি এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেললেন?

ইউসুফ হাসতে হাসতে বলে, নটে গাছটি মুড়ালো, আমার কথা ফুরালো।

না, ইউসুফ ভাই আরো বিস্তারিত বলুন।

এখন মোটেই সময় নেই। আমাকে সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে বসতে হবে। কমান্ডার আমাকে বলেছে জরুরি আলাপ আছে। ছেলেরা আর কথা বাড়াতে পারে না। তাহের উঠে নিজের ঘরে গেলে ইউসুফও সঙ্গে যায়। বড় একটা টেবিলের ওপর সেক্টরের ম্যাপ বিছানো আছে। দু'ভাই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে। তাহের গলফ স্টিকটা ম্যাপের ওপর টেনে টেনে ইউসুফকে দেখায় আর বলে, আপনি খুব ভালো সময়ে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন ভাইজান। আমরা আমাদের এই অবস্থান থেকে কামালপুর, বক্সিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, মধুপুর, টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, কালিয়াকৈর, কোনাবাড়ি, জয়দেবপুর হয়ে দ্রুত ঢাকা পোঁছে যেতে পারবো। এটা অন্য কোনো সেক্টরের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ওদের প্রত্যেকের পথে নদী পড়বে। আমাদের পথে পড়বে শুধু পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদী। বুঝতেই পারেন ওটা তো শীতকালে শুকিয়ে একটুখানি হয়ে যায়। ওটার ওপর বেলি ব্রিজ তৈরি করে পার হয়ে যাওয়া একটুও কঠিন হবে না। কি বলেন?

কি বলবো, পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস আমরা জয়ী হতে পারবো। আর আমরাই হবো ঢাকার পথের অগ্রগামী দল।

ইউসুফ তাহেরের হাত জড়িয়ে ধরে।

ভাইজান চলুন সেক্টরের অস্ত্রাগার থেকে আপনাকে অস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা করি।

আমি একটা চাইনিজ সাবমেশিনগান নেবো। আছে?

হ্যাঁ। তাহের আগে আগে হেঁটে যায়।

অস্ত্রটি নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে ইউসুফ দেখে লেঃ মাহফুজ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। তাহেরের কাছে শুনেছে ও ভীষণ সাহসী ছেলে। কিছুক্ষণ আগে ও ধানুয়া-কামালপুর থেকে ফিরে এসেছে। তাহেরের নানা রকম পরিকল্পনা আছে। সবটা ইউসুফের এখনো বুঝে ওঠা সম্ভব হয় নি। একটুপর সুবেদার আফতাব এসে হাজির। মাহফুজ ওকে দেখে হৈ-চৈ করে ওঠে, কি খবর আফতাব ভাই? আপনি কখন এলেন?

এই তো কিছুক্ষণ আগে। স্যারের কাছে শুনলাম ইউসুফ ভাই এসেছেন। স্যার বললেন, সবাইকে নিয়ে তাঁর ওখানে যেতে। জরুরি আলাপ আছে।

ইউসুফ সোজা হয়ে বসে, তাই নাকি? কি হয়েছে?

আপনি তো জানেন রৌমারি থানা হলো ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ের মুক্ত এলাকা।

আমি শুনেছি তাহেরের কাছে। পাকবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ের চিলমারি বন্দরে অবস্থান করছে।

হ্যাঁ, ওখানে পাকবাহিনীর দুই কোম্পানি নিয়মিত সৈন্য এবং দুই কোম্পানি মিলিশিয়া অবস্থান করছে। ওদের সঙ্গে আছে বড় আকারের রাজাকার বাহিনী। ওয়ালী মাহমুদ আর পাঁচু মিয়া নেতৃত্ব দিচ্ছে।

আফতাব তার চওড়া কাঁধ আর লম্বা কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, এতোদিন মেজর জিয়ার ব্রিগেডের দু'টো বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু মেজর জিয়া দুদিন আগে তাঁর ব্রিগেড নিয়ে সিলেট চলে যান। এদিকে পাকবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ের কোদালকাঠি চরে ঢুকে পড়েছে। ওই চরটি ছাড়া আর সব এলাকা এখন পর্যন্ত মুক্ত। কিন্তু ওরা গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার করছে। আশেপাশের গ্রামগুলোতেও ঢুকে নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের তো বসে থাকা চলে না।

মাহফুজ উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলেন স্যারের ওখানে যাই। দেখি স্যার কি বলেন।

তাহের নিজের ঘরে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে। হাতে গলফ স্টিক। ঠোঁটে সিগারেট। কোনো কিছু ভাবার আগে এটাই তার পরিচিত ভঙ্গি। ওদের দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আমাদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সবাই চুপচাপ বসে আছে। কেউ আগ বাড়িয়ে কিছু বলে না। জানে তাহেরই সব বলবে। পায়চারি করতে করতে আবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায় ও। বলে, মেজর জিয়া তার ব্রিগেড নিয়ে ১১ নং সেক্টর ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমি খুব বিষণ্ন বোধ করছি। আমি তো জামালপুর এবং টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার পথে এগিয়ে যাবার কথা ভাবছিলাম। এখন আমাদের রণনীতি পাল্টাতে হবে তা নয়, রৌমারির বিরাট মুক্তাঞ্চল রক্ষার দায়িত্বও আমাকে বিচলিত করে তুলছে। আমার সেক্টরে কোনো নিয়মিত বাহিনী নেই। আমাকে রৌমারিতে পনেরো দিনের ট্রেনিং নেয়া ছেলেদের ওপর নির্ভর করতে হবে। এদের মধ্যে শতকরা বিশ জনের হাতে অস্ত্র আছে। রৌমারির প্রতিরক্ষার কাজে ভারতীয় বাহিনী পাঠাবার প্রস্তাব করেছেন ভারতীয় কমান্ডার। আমি তাঁতে সবিনয়ে বলেছি বাংলার মাটি রক্ষা করবে বাংলার বীর ছেলেরাই। তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজী হই নি। রৌমারির প্রতিরক্ষা ব্যূহ আমাকে ঢেলে

সাজাতে হবে।

এটুকু বলা শেষ করে তাহের চেয়ার টেনে ওদের সামনে বসে। তখনো ওরা সবাই চুপ। কারণ ওরা জানে পরবর্তী কথা তাহেরই বলবে। ও সময় নিচ্ছে। সিগারেট শেষ করে সেটা পায়ের নিচে পিষে ফেলে। তারপর দু'হাঁটুর মাঝখানে গলফ স্টিক চেপে রাখে। একসময় আফতাবের ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, আফতাবের মতো এমন নির্ভীক, সাহসী ছেলে আমি কমই দেখেছি। ওর দিকে তাকালেই মনে হয় ও বীরত্ব আর দৃঢ়তার প্রতীক।

আফতাব উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বলে, আমি রেডি স্যার।

তাহের মৃদু হেসে বলে, আমি জানি তুমি বুঝতে পেরেছো আমার কথা। রৌমারি রক্ষার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

আফতাবের চওড়া কাঁধ শক্ত হয়ে যায়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, স্যার, 'পাকিস্তানিরা মাত্র সুবেদার আফতাবের মৃতদেহের উপর দিয়েই রৌমারিতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখবেন সুবেদার আফতাব মরবে না।'

ব্রেভো।

ইউসুফ আর মাহফুজ ওর সঙ্গে করমর্দন করে। তাহের ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি জানি। আমি বিশ্বাস করি। এটাও বিশ্বাস করি মাত্র পনেরো দিনের ট্রেনিং নেয়া সাধারণ মানুষ আমাদের বাহিনী হলেও আমরাই জিতবো। আমি ভারতীয় কমাণ্ডারকে বলেছি আগে আমাদের চেষ্টা করতে দিন। আমাদের মুক্ত অঞ্চল আমরাই রক্ষা করবো।

দোয়া করবেন স্যার।

মাহফুজ বলে, স্যার কোদালকাঠির পর চিলমারি।

ইয়েস মাই বয়, কোদালকাঠির পর চিলমারি।

মহেন্দ্রগঞ্জের নীল উজ্জ্বল আকাশের মতো সবার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে শরতের মেঘ। প্রত্যেকেই ভাবে, এখন একটা দারুণ শরৎ ঋতু আমাদের জীবনে।

মুহূর্ত মাত্র। সবাই চমকে উঠে চারদিকে তাকায়। কে যেন গান গাইছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

নিজেদের অজান্তে ওরাও গাইতে থাকে। যেন শরত ঋতুতে গান গাইতে হয়। দেশের গান। গান গাইতে গাইতে লোকটি ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সবাই খুশি হয়ে বলে, তুমি কোথা থেকে এলে?

কথা না বলে লোকটি গান গাইতেই থাকে। ইউসুফ বলে, তুমি থামো। এখন যুদ্ধের সময়। এখন গান নয়।

এখন গানেরও সময়। তোমরা থামলে কেন? গাও।

সবাই আবার গাইতে শুরু করে। গানতো গাওয়া নয়, যেন বুক ভরে ওঠা। তৃপ্তিতে–আনন্দে। লোকটি চলে যেতে শুরু করলে মাহফুজ জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সুন্দরবনের কাছে।

সেতো অনেকদূর।

তাতে কি? ও মৃদু হেসে হেঁটে যায়। পিছু ফেরেনা।

১৫

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে স্টেনগান হাতে ঘুরে বেড়ায় তারামন। নদীর একুল-ওকুল দেখা যায় না। আশেপাশে গ্রাম। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে ও বাজার পেরিয়ে, স্কুল পেরিয়ে অনেকদূরে চলে যায়। এখনো এখানে পাকবাহিনী ঢুকতে পারে নি। যুদ্ধের কতো ধরনের খবর শোনা যায়। কিন্তু ওদের অঞ্চল এখনো মুক্ত। তাই এলাকার মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাজারে কিংবা স্কুলের মাঠে পতাকার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায় ও। বাবা বলেছে, এই পতাকাটা পাহারা দিতে হবে। শত্রুসেনা যেন পতাকা ছিঁড়ে ফেলতে না পারে।

ও তখন নিজেকেই বলে, এই তারামনের জীবন থাকতে কেউ পতাকা ছিঁড়তে পারবে না। দেবো গুলি চালিয়ে। ওই ব্রহ্মপুত্রের মতো রক্তের নদী বানাবো একটা। খেয়া পারাপার করবো আমি নিজে।

ভাবতেই শিউরে ওঠে ও। তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকে। বটতলার বাজারের কাছে আসতেই কেউ একজন ডাকে ওকে। ও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চিনতে পারে না লোকটিকে। কিন্তু গাঁয়ের সব মানুষ তারামনকে চেনে। তারামনের নাম জানে। ওইতো এই এলাকার একমাত্র মেয়ে যে রাইফেল চালাতে পারে। লোকটি মধ্যবয়সী। উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে বলে, তোরা কি শুনেছিস যে কোদালকাঠিতে পাক সেনারা ঢুকেছে। খুব জ্বালাচ্ছে গ্রামের লোকদের।

কোদালকাঠিতে?

আঁতকে ওঠে তারামন।

হ্যাঁ, আমি তো ওদিক থেকেই এলাম।

ওহ্ মাগো বেণুর কি হবে?

বেণু? বেণু কে?

মধ্যবয়সী বিস্মিত হয়।

আমার বন্ধু।

সবার যা হবে ওরও তা হবে। এতো ভেবে লাভ কি? তোর বাবা কোথায় বল?

বাবাতো সকালে সাজাই গেছে।

তোর বাবা এলে খবরটা দিস।

খবর আমাকে দিতে হবে না। বাবা এতোক্ষণে সব জেনে গেছে।

মধ্যবয়সী মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, তা হতে পারে।

তারামন উদ্বিগ্ন মন নিয়ে পেরিয়ে আসে বাজার। বেণু ওর পুতুল খেলার সময় থেকে বন্ধু। কেমন যে আছে? ও যাকে ভালোবাসে সে মাখন। মাখন যুদ্ধ করতে গেছে। ওইবা কোথায় আছে কে জানে? তারামন ক্যাম্পের সামনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় ছোট বাঁশের মাথায় পতাকা উড়ছে। ও স্টেনগান হাতে পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। যেদিন ওর ৩০৩ রাইফেল আর স্টেনগান চালানো শেখা শেষ হলো সেদিন বিকেলেই মুহিব হাবিলদার বাজার থেকে ছোট্ট একটা পতাকা এনে ওকে দিয়ে বলেছিলো, মনে রাখবি এটা শুধু এক টুকরো কাপড় না। আমরা এটার জন্য লড়াই করছি।

এটার জন্য? তারামনের দু'চোখে বিস্ময়। কেউ ওকে শেখায়নি যে পতাকা দিয়ে কি হয়।

পতাকা কেন পতপত করে ওড়ে।

মুহিব হাবিলদার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, হ্যাঁ, এই পতাকাইতো দেশের স্বাধীনতা। যে দেশের পতাকা নেই সে দেশ স্বাধীন না।

তারামন যত্ন করে পতাকাটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। বাবার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলেছিলো, বাবা যেদিন দেশ স্বাধীন হবে সেদিন এই পতাকাটা আমি নিজের হাতে উড়িয়ে দেবো।

মুহিব হাবিলদার মেয়েকে বলতে পারে নি, আমরা কে যে পতাকা ওড়ানোর জন্য বেঁচে থাকবো আমরা জানি না মা'রে।

কথাটা হয়তো ইচ্ছে করলে বলা যেতো কিন্তু একথা বলা সম্ভব হয় নি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। মুহিব হাবিলদারের মনে হয়েছিলো মেয়ের দু'চোখে অদ্ভুত আলো, এমন আলো কখন দেখা যায় সেটা ওর অভিজ্ঞতায় নেই। ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে এক কিশোরীর দিকে, যে ওর জীবনের গল্প বলার সময় বলেছিলো, বাবা আমি স্বাধীনতার মানে বুঝি।

কেমন? মুহিব হাবিলদারের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

স্বাধীন হওয়া মানে মৃগী রোগী স্বামীর বাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়া।

ও রে পাজী মেয়ে—বলেই থমকে গিয়েছিলো মুহিব হাবিলদার। দেখেছিলো ওর চোখে অদ্ভুত আলো। বুঝেছিলো মেয়েটি নিজের জীবন দিয়ে স্বাধীনতার মানে বুঝেছে। ওর বোঝা অন্যরকম। তখন ও মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, স্বাধীনতা মানে তুই বুঝবি না তো বুঝবো কি আমি? হাবিলদার হয়ে অস্ত্র চালাতে জানলেই স্বাধীনতার মানে বোঝা যায় না।

তারামন বাবার আদরটুকু বুঝতে পারে। বুঝতে পারে না কথাগুলো। ও পতাকা পাওয়ার আনন্দে নিজের মনে মগ্ন। এরপর থেকে রান্নাবান্নার ফাঁকে যখনই সময় পায় স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শত্রু খুঁজে ফেরে। কেউ যেন ওই পতাকার দিকে শকুনের মতো না তাকিয়ে থাকে।

এই ক্যাম্পে আসার পর থেকেই ও বাবার পেছনে লেগে ছিলো, বাবা আমাকে রাইফেল চালানো শেখাতে হবে। আমি যুদ্ধ করবো আপনার সঙ্গে।

দুলাল সায় দিয়ে বলেছিলো, হ্যাঁ ওকে রাইফেল চালানো শেখানো যেতে পারে। কারণ ও একটা পরীক্ষায় পাশ করেছে।

তারামন নিজেই জিজ্ঞেস করেছিলো, কি পরীক্ষায়?

পরীক্ষাতো একটাই। রান্নার পরীক্ষা। তুই খুব ভালো রাঁধিস তারামন। আমরা তোর ওপর খুব খুশি।

তারামনকে আর পায় কে। খুশিতে বাগবাগ। শুধু অপেক্ষায় দিন গোনে। কবে বাবা ওকে বলবে, আয় আজ থেকে তোর ট্রেনিং শুরু।

রাঁধতে ওর ভালোই লাগে। কিন্তু মন পড়ে থাকে আরো বেশি কিছুর জন্য। শুধু মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের রাঁধুনি হতে চায় না। মনোযোগ দিয়ে রান্নাবান্না করে। রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন ঝকঝকে, তকতকে করে রাখে। ছিমছাম পরিবেশ। হাসিখুশি মেয়েটি সবার মন জয় করেছে। কে কখন খেতে আসে ঠিক নেই, কিন্তু তারামনের হিসেব পাকা। কয়জনের জন্য রাঁধতে হবে, কাকে কি দিতে হবে—সব গুছিয়ে করে। কেউ বলতে পারবে না যে ওই

কাজে তারামনকে ডেকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ ওর ভীষণ মন খারাপ হয়।

রান্নাঘরের সামনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ওর বন্ধু বেণুর বাবা-মাতো ওদের নিয়ে কোদালকাঠি গেছে। কেমন আছে বেণু? ও বুঝতে পারে হঠাৎ করে বেণুর কথা মনে হয় না ওর। কোদালকাঠির খবর শোনার পর থেকে বেণু ওর ভেতরে থেকেই যায়। সারাক্ষণ মন ছটফট করে। কারো সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগছে না। কতো স্মৃতি মনে পড়ছে। শুধু একবারও ওর মনে পড়ে না যে ও এতো ব্যাকুল হয়ে ভাবছে কেন? বেণুর তো কিছু নাও হতে পারে। ও ভালো আছে। হয়তো রাত জেগে কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে ভাত রেঁধে দিচ্ছে। মাখনের সঙ্গে কি বেণুর দেখা হয়? কি করে হবে। ও তো যুদ্ধ করার জন্য ভারতে চলে গেছে। নিশ্চয়ই আসতে পারে নি। তারামন নিজেকে প্রশ্ন করে। নিজেই উত্তর দেয়। এসবের মাঝে একসময় নিজেকে খুব বোকা মনে হয়। এমনতো হতে পারে যে বেণুর বাবা-মা কোদালকাঠি যায় নি। ভারতে চলে গেছে। সেখানকার শরণার্থী ক্যাম্পে ভালো আছে বেণু।

মুক্তিযোদ্ধারা আসা যাওয়া করছে। কে একজন জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তারামন?

ও উত্তর দেয় না। মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

চোখে পানি কেন?

দুপুরে ভাত কম হয়েছিলো? পেট ভরেনি?

মায়ের কথা মনে পড়ছে?

কাল তোকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবো। মা আর ভাইবোনদের দেখে আবার আমাদের সঙ্গে চলে আসবি। যা, আমাদের জন্য এক পাতিল চায়ের পানি বসিয়ে দে। আমরা গুড়-মুড়ি নিয়ে আসছি।

তারামন নড়ে না। স্টেনগানটা কোলের ওপর উঠিয়ে নেয়। নাড়াচাড়া করে। গাল বেয়ে চোখের পানি গড়ায়। ওরা ভাবে এমন শক্ত মেয়েটার কি হলো? আর একবার চায়ের কথা বলতেই বলে, বাবা আসুক।

এই প্রথম তারামন অবাধ্য হয়। ওরা কিছু বলতে পারে না। ও তো শুধু কাজের মেয়ে নয়। ট্রেনিং নিয়েছে। দরকার হলে যুদ্ধ করবে। ও মুক্তিযোদ্ধা।

দুলাল অন্যদের বলে, চল বাজারে যাই। চা খাবো, আড্ডাও দেবো। দেখি যুদ্ধের কোনো নতুন খবর পাওয়া যায় কিনা।

ছেলেরা হৈ-হৈ করতে করতে চলে যায়। ক্যাম্প ফাঁকা হয়ে যায়। চারদিক সুনসান। বাতাসেও কোনো শব্দ নেই। তারামন বেড়ায় গায়ে ঠেস দিলে দেখতে পায় অনেক দূর থেকে মুহিব হাবিলদার আসছে। বাবার হাঁটার ভঙ্গিটা ওর খুব চেনা। শত মানুষের ভিড়ে পেছন থেকে, দূর থেকে, মাথা দেখে বুঝে ফেলতেই পারে কোনটা ওর বাবা। একথা শুনলে মুহিব হাবিলদার আদর করে বলবে, আর জনমে তুই আমার মা ছিলি। এই জনমে মেয়ে হয়ে বুকের ভেতর ঢুকেছিস।

কেউ কাবো নয়। অথচ কেমন করে যে এমন গভীর ভালোবাসা হলো। একদম নাড়ির টান। তারামনের একবার মনে হয় স্টেনগানটা নিয়ে দৌড়ে যায়। গিয়ে খবরটা দেয়। পরক্ষণে মনে হয় বাবা খবরটা জানে। কোদালকাঠিতে আর্মি ঢুকেছে আর বাবা জানে না এটা হতেই পারে না। যুদ্ধের সব খবর বাবার জানা আছে। বাবার ফিরে আসার পথের দিকে তাকিয়ে তারামন মন খারাপ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কাটিয়ে উঠতে পারেও। তবু ওর মুখের ওপর

থেকে দুশ্চিন্তার ছায়াটা পুরোপুরি মুছে যায় না।

মুহিব হাবিলদার এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই বলে, তোর কি হয়েছে মা?

বেণু ভালো আছে তো বাবা? কোদালকাঠিতে পাকবাহিনী নাকি গ্রামের মানুষকে খুব নির্যাতন করছে?

মুহিব চুপ করে থাকে। মেয়ের কাছে ওর বন্ধু বেণুর গল্প ও অনেক শুনেছে। বেণুর খবর ও কি করে জানবে। ভালো তো নাও থাকতে পারে? কে জানে কেউ ওকে তুলে নিয়ে গেছে কিনা?

তারামন আবার বলে, বাবা কিছু বলছেন না যে? বাবা বেণু না খুব শক্ত মেয়ে। যা কিছু হোক ও নিজে নিজে সামলাতে পারবে। একবার—

তারামন কথা শেষ করতে পারে না। মুহিব বলে, বেণু তোর মতো শক্ত মেয়ে না রে মা।

তারামন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মুহূর্তে বলে, বাবা আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবো। না করতে পারবেন না?

মুহিব মৃদু হাসে। যে মেয়েকে ও নিজের হাতে ৩০৩ রাইফেল আর স্টেনগান চালানো শিখিয়েছে তাকে ও কেমন করে বলবে যে না যুদ্ধে যেতে পারবি না? মেয়েটির কি প্রবল আগ্রহ ছিলো অস্ত্র চালানো শেখার। কতো গভীর নিষ্ঠা ছিলো। এখন বেশ ভালো চালায়। খুব কমই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। এই ক্যাম্পের অনেক ছেলেই ওর মতো নয়। মুহিব হাবিলদার নিজে একজন দক্ষ সুটার। নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস ওর। এখন সেই অহঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তারামন। লোকে বলে, মেয়েটার একটা বাবা হয়েছে, যুদ্ধের বাবা। বাপ কা বেটি।

কখনো একথা শুনে হো-হো করে হাসে মুহিব। আনন্দের হাসি। এই মুহূর্তে ওর ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখে ভড়কে যায় তারামন। তাহলে কি ওর যুদ্ধে যাওয়া হবে না? শুধু স্টেনগান হাতে নিয়ে শত্রু খুঁজে বেড়াবে? অসম্ভব, তা হবে না।

চেঁচিয়ে বলে, বাবা? ও বাবা? হাসছেন কেন?

তুই যুদ্ধ করবি ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

হ্যাঁরে সত্যি, সত্যি।

যদি কোনো মিলিটারি বেণুর গায়ে হাত দেয় তাকে আমি নিজের হাতে মারবো বাবা।

বেণু তোকে বড্ড ভাবাচ্ছে মা।

হ্যাঁ বাবা, শুধু ওর কথা মনে হচ্ছে।

মুহিব হাবিলদার বাঁশের মাচার ওপর বসে গায়ের জামাটা খোলে। গরম লাগছে।

বাবা চা বানাবো আপনার জন্য?

না মা। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দে।

মাটির কলসিতে রাখা পানি নিয়ে আসে তারামন। ভেবে পায় না যে ও আর কি করবে। দুপুরে রাতের জন্য তরকারি রেঁধে রেখেছে। এখন শুধু ভাত রাঁধলেই হবে। ঘর থেকে হারিকেনগুলো বের করে পরিষ্কার করতে বসে।

পরদিন দুপুরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তারামন। তপসে মাছ কিনে এনেছে খোকন। বলেছে, শুধু কাঁচা মরিচ, একগাদা পেঁয়াজ আর বেশি করে তেল দিয়ে রাঁধতে।

তারামন ভেবে পায়নি যে কেন এমন রান্নার কথা খোকনের মনে এলো? হলুদ-মরিচ ছাড়া

কেমন রান্না হবে? বাবার কি ভালো লাগবে খেতে?

খোকন আরো বলে, এমন রান্না রাঁধবি যেন মরার আগে কোনো ভালো স্মৃতি মনে করার সময় তোর হাতের খাওয়া তপসে মাছের তরকারির কথা মনে হয় আমার।

যাহ্ কি যে বলেন খোকন ভাই।

জানিস, শুনতে পাই যুদ্ধ এলাকার মুক্তিবাহিনীর ঠিকমতো খাওয়া হয় না। বুটের ডালের মধ্যে পোকা পাওয়া যায়। চাল কি যে খারাপ—মোটা আর গন্ধ। ভাত নাকি গলা দিয়ে নামতে চায় না।

সত্যি! তারামন বিস্মিত হয়।

হ্যাঁ রে, সত্যি। তবে কি জানিস স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের সময় তো, তাই এসব কেউ গায়ে মাখে না। সামনে যা আসে গপগপ খেয়ে ফেলে। এতোকিছু দেখার কি সময় আছে।

তাছাড়া খিদের মুখে জিভ কি এতো বাছ-বিচার করতে পারে।

ঠিক বলেছিস। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে তুই।

খোকন ভাই তাহলে আপনি এমন করে রাঁধতে বলছেন যে? আমাদেরও তো উচিত সব মুক্তিযোদ্ধার মতো একরকম খাবার খাওয়া।

আমরা যে খুব ভালো খাই তা তো নয়। তবে মুক্ত এলাকায় আছি বলে এমন শখ। যদি মিলিটারি আমাদের আক্রমণ করে, যদি সে লড়াইয়ে একটা গুলি আমরা বুক ফুটো করে দেয়, যদি আমি মরে গিয়েও খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, যদি—

ওহ্ না, এমন করে বলবেন না খোকন ভাই।

তারামন কেঁদে ফেলে। ফুঁপিয়ে কাঁদে। কান্না সামলাতে পারে না।

বোকা মেয়ে। কাঁদিস না। যুদ্ধের সময় এটাই বড় সত্য। দেখিস না এজন্য আমি বেঁচে থাকতে আকাশের তারা গুণি। রাতের আকাশ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে রে তারামন। এমনকি মেঘে যদি চাঁদ ঢাকা থাকে তবুও সে আকাশ আমি দেখতে চাই।

খোকন ভাই আজ আমি তপসে মাছ রাঁধতে পারবো না।

কেন? মন খারাপ হয়ে গেলো।

হো-হো করে হেসে ওঠে খোকন। তারামন ওড়না দিয়ে চোখ মোছে। ওর চোখের জল থামতে চায় না।

আহ্ তারামন চোখ মোছ। তোর বাবা দেখলে আমাকে বকে শেষ করবে। আমি কিন্তু বকুনি খেতে পারবো না।

তারামনের যে কি হয় ও বুঝতে পারে না। ওর ভীষণ কান্না পায়। ও নিজেকে সামলাতে পারে না।

ভারী মুশকিল হলো তো। তুই একটা শক্ত মেয়ে। অস্ত্র চালাতে শিখেছিস। তুই না আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবি। এমন করছিস কেন? বাপের আহ্লাদ পেয়ে তুই একটা ছিচকাঁদুনে মেয়ে হয়ে যাচ্ছিস।

তারামন তবু মুখ তোলেনা। ওড়নার কোণা ভিজে যায়।

ঠিক আছে তপসে মাছগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসি।

তখন ও দু'হাতে গামলায় ঢেলে রাখা মাছগুলো আঁকড়ে ধরে। ওর মনে হয় মাছগুলো পলকহীন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খোলা চোখে কালো মণি বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওর মুখটা

কি আকাশ হয়ে গেছে? লক্ষ তারা ঝলমল করছে ওখানে? নাকি মৃত মানুষের মতো মাছের চোখ ফ্যাকাসে, নিভে গেছে আলো। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না দু'চোখ মেলে দেখার শক্তি।

কি হলো মাছগুলো অমন করে ধরে আছিস কেন? দেখ কতো আনাজ কিনেছি। তুই পটলের দোলমা রাঁধতে পারিস তারামন? আমি পটলের দোলমা খেতে খুব ভালোবাসি। আমার মা খুব ভালো দোলমা রাঁধে। এখন মা জানেই না আমি কোথায় আছি, কেমন আছি। মাকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি যুদ্ধ করবো বলে।

একথা শুনে তারামন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

হাঁ করে দেখছিস কি? সত্যি বলছি। পালিয়ে তো এলাম। তারপর আর ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাই না। যুব শিবিরে অপেক্ষা করে বসে থাকি। ডাক আসে না। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরলাম। বললাম তিন দিনের মধ্যে যদি আমাকে ট্রেনিংয়ের জন্য না ডাকে তাহলে আমি সুইসাইড করবো।

তারপর?

তারামন বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে বলে।

তারপর আর কি, পরদিনই ডাক পড়লো। আমার মনে হলো আমার পিঠে দু'টো ডানা গজিয়েছে। আমি উড়ে চলে গেলাম ট্রেনিং ক্যাম্পে।

আশ্চর্য, ঠিক আমারও এমন হয়েছিলো। কেবলই মনে হতো বাবা কবে আমাকে রাইফেলটা চালাতে শেখাবে।

তাহলে বল কেন আমার তপসে মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হবে না।

ওমা এর সঙ্গে তপসে মাছের সম্পর্ক কি?

আছে, তুই বুঝবিনা। নে, ঝটপট মাছগুলো কেটে ফেল।

না, বলেন। আমাকে বলতে হবে।

খোকন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, খাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অনেক সম্পর্ক থাকে তারামন। আর যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক হলো মৃত্যুর। ধর যদি এটা আমার শেষ খাওয়া হয়।

শেষ খাওয়া হবে কেন? আমাদের এদিকে তো মিলিটারি নেই।

এমনও তো হতে পারে যে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারে। তখন কি আমার আর তপসে মাছ খাওয়া হবে?

কাল আপনি আবার তপসে মাছ কিনে আনবেন। আমি রেঁধে দেবো।

মাথা খারাপ, রোজ রোজ তপসে মাছ কেনার পয়সা কোথায় আমার।

তারামন চুপ করে থাকে। মুখ নিচু করে মাছ কাটতে শুরু করলে ও বুঝতে পারে ওর চোখ আবার জলে ভরে উঠেছে। খোকনের কাছ থেকে চোখের পানি লুকোতে গেলে ওর সামনে মাছ-বটি একাকার হয়ে যায়। চোখের জলের আড়ালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেলে ওর সামনে বটি আর মাছের ছোট্ট একটি ঝাপসা দৃশ্য পুরো মুক্তাঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো বিশাল হয়ে উঠতে থাকে।

তখন খোকন ওর সামনে থেকে উঠে যায়। ও দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে সামলায়। তেমন কোনো গভীর দুঃখের ঘটনা নয়. অথচ শুধু ভাবনাই মুচড়ে দিয়ে গেলো অনুভবের

সবটুকু। তখন মৃত বাবার কথা মনে হয় তারামনের। ভাবে, মৃত্যুই পারে এমন করে কাঁদাতে।

দুপুরে সবাই যখন খেতে এলো তখন তারামন রান্না শেষ করে গোসল সেরেছে। এটা ওর বাবার নির্দেশ। সবার সঙ্গে খেতে হবে। কাজের অজুহাতে পরে খাওয়া চলবে না। সেজন্য ও দ্রুত রান্না সারে। খাবার দেবার আগে তৈরি হয়ে যায়। ভেজা চুল থেকে পানি পড়ে টপটপ করে। ভালো করে মোছা হয় না। চুলের যত্ন ও বিকেলে করে। যখন সবাই এদিক ওদিক চলে যায়। আজও খেজুরের পাটি বিছিয়ে বাসনগুলো সারি করে সাজিয়ে ফেলে। বড় বড় দু'গামলায় ভাত বাড়া হয়েছে। জগ ভর্তি পানি। নুনের বাটি, গ্লাস। দু'বাটিতে তপসে মাছ। এক বাটিতে পটল ভাজি। খেসারির ডাল থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে। এক পিরিচ বোঝাই কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ কাটা আছে। তরকারির দিকে তাকিয়ে মুহিব হাবিলদার খুশি হয়ে বলে, আজ তারামন দারুণ রেঁধেছে। গন্ধেই টের পাচ্ছি।

আজ তপসে মাছ, হুররে।

অনেকেই চেঁচিয়ে ওঠে, বাজার করেছে কে? ওহ্ খোকন। খোকন ছাড়া তপসে মাছ আর কে কিনবে। আমি হলফ করে বলতে পারি আর জনমে ও তপসে মাছ হয়ে জন্মাবে।

মোটেই না। মাছ হয়ে জন্মালে কি মাছ খেতে পারবো।

তাহলে জেলে হয়ে জন্মাবি। তপসে মাছ ধরবি আর খাবি।

কখখনো না। আমি একটা লাট-বাহাদুর হবো। তপসে মাছ খাওয়ার জন্য স্পেশাল জেলেবাহিনী পুষবো।

হাসির রোল ওঠে। শুরু হয় ভাত খাওয়া। প্রথম দফায় পটল ভাজি। শেষ হলে মুহিব হাবিলদার মাছের বাটিটা টেনে নেয়। মাছ ও নিজে সবাইকে ভাগ করে দেয়। ও সবসময় প্রথমে তারামনকে দেয়। ভাতও তাই। নিজের বাসনে নেবার আগে ওর বাসনে দেয়। তারামনের আপত্তি শোনে না। তপসে মাছ চামচে ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে তারামন বাসন টেনে নিয়ে বলে, আজ আমি মাছ খাবো না বাবা।

কেন?

তপসে মাছ আমার ভালো লাগে না।

মিথ্যে কথা। খোকন চেঁচিয়ে বলে।

মুহিব অবাক হয়। ভুরু কুঁচকে বলে, কি হয়েছে মা?

কিছু হয়নি বাবা। আমার ভাগের মাছ আজ খোকন ভাইকে দিন।

উঁহু তা হবে না। অন্যের ভাগ আমি খাই না। আমার ভাগ আমি খাবো।

তোরা কি ঝগড়া করবি?

না বাবা, ঝগড়া না। খোকন ভাই যদি আমার ভাগ খায় আমি খুব খুশি হবো।

একজন চেঁচিয়ে বলে, এর পেছনে কোনো রহস্য আছে। ওদের দুজনের কারো খেতে হবে না তপসে মাছ। ওদের ভাগ আমাদের দিয়ে দিন মুহিব ভাই। ভাত সামনে নিয়ে বসে থাকা যায় না।

না, কিছুতেই না। খোকন ভাইকে ছাড়া কেউ তপসে মাছ খেতে পাবে না।
চেঁচামেচি করে তারামন।
তাহলে ওই সব খাক।
একজন মুহিবের হাত থেকে বাটিটা টান দিয়ে নিয়ে খোকনের পাতে সব মাছ ঢেলে দেয়। সবটা বাসনে না পড়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। খোকন হাত গুটিয়ে নেয়।
মুহিব রেগে বলে, দিলি তো ওর খাওয়াটা নষ্ট করে।
তখন ক্যাম্পের বাইরে হট্টগোল ওঠে, গানবোট, গানবোট। বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজও শোনা যায়। আর কি কারো খাওয়া মুখে ওঠে। হাত ধোওয়াও হয় না। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ অস্ত্র হাতে ছুটে বেরিয়ে আসে। পজিশন নেয়। নদীতে পাক সেনাদের গানবোট গুলি করতে করতে এগুচ্ছে। তারও আগে গ্রামের ঘাটে ভিড়ে হাঁস-মুরগি, ছাগল ধরে নিয়ে এসেছে। ওগুলো তড়পাতে শুরু করলে একজন লাথি দিয়ে বসিয়ে দেয়। ওরা ভেবেছিলো নির্বিবাদে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। তারামনের এই প্রথম লড়াই, তাও আবার সামনাসামনি লড়াই। বাবার পাশে থেকে রাইফেল চালাচ্ছে ও। দু' তরফরে অস্ত্র থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুটছে। গানবোটের মধ্যে দুজনকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ওরা। লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বেগতিক দেখে পাক সেনারা গানবোট নিয়ে পালিয়ে যায়।
ওদের পালিয়ে যেতে দেখে চিৎকার করে ওঠে ছেলেরা, জয় বাংলা। তারামন নিজের রাইফেলটা দু'হাতে উপরে তুলে নদীর পাড় বরাবর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে, জয় বাংলা। ওর গায়ে-মুখে কাদা লেগে আছে, ঘাসের কুচি লেপ্টে আছে পায়ে। ওর কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।
কিন্তু এতো সব আনন্দ অল্পক্ষণের জন্য মাত্র। অন্যপাশ থেকে কান্নার রোল ওঠে। খোকনের কপাল ফুটো করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটি বুলেট। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ও। রাইফেলের বাঁটের ওপর ওর মাথা। যেন ও উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। শুধু ওর ঘাড়ের চারপাশে গড়াচ্ছে রক্তের ধারা। সেটা তখনো বন্ধ হয়নি। ওকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয় ক্যাম্পে। ওর চোখ খোলা। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তারামন চিৎকার করে ওঠে, কেন ওর চোখের পাতা কেউ বুজিয়ে দিচ্ছে না।
ওর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর প্রত্যেকের কানে ব্রাশফায়ারের এক ঝাঁক গুলির মতো এসে আছড়ে পড়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি খোকনের স্থির চোখের মণির ওপর গিয়ে থির হয়ে যায়। ওই মণিতে স্পন্দন নেই।
ও তাকিয়ে থাকলেও সেটা আকাশ দেখা নয়।

অনেক রাতে খোকনের কবরের পাশে বসে থাকে তারামন।
ক্যাম্প থেকে কয়েকগজ দূরে নদীর পাড়ে ওকে কবর দেয়া হয়েছে। তারামন চিৎকার করেছে, কিন্তু কাঁদেনি। ওর একদমই কান্না পায়নি। বারবার তপসে মাছের তরকারির কথা মনে হচ্ছিলো, কিন্তু ও অনায়াসে সেগুলো মন থেকে দূর করে দিয়েছে। কাছেই ঘেঁষতে

দেয়নি। ভেবেছিলো সবাই ঘুমিয়ে গেলে মধ্য রাতে কবরের ধারে আসতে বুঝি ওর ভয় করবে, কিন্তু এখন ওর একটুও ভয় করছে না। একটি বিশাল নদী, একটি নতুন কবর, একগুচ্ছ পাতাভরা হিজল গাছ। নদীর দিকে ঝুঁকে আছে সে গাছের ডাল। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। তারামনের মনে হয় রোদ উঠলে এইসব গাছের ছায়া ঢেকে রাখবে খোকনের কবর। নদীর ভেতরে ঢেউয়ের শব্দ আছে, গাছের ডালে বাতাসের মর্মর ধ্বনি আছে আর কবরের ভেতর খোকনের কপালের ফুটোতে যুদ্ধের চিহ্ন আছে। তারামনের খুব অস্থির লাগে। কতো অল্পদিনের চেনা একজন মানুষ — কতো কাছের একজন মানুষ হয়ে গেছে। কোনোদিন কি ভুলতে পারবে এই মুখটি। তার কথাগুলো? খোকনের পায়ের ধাক্কায় উল্টে যাওয়া তপসে মাছগুলো একটা একটা করে ও বাটিতে উঠিয়ে রেখেছিলো। বাটিটা ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কেন? ও নিজেকে প্রশ্ন করে। মাছগুলো খোকনের খাওয়া হয়নি ভাবতেই বুকটা মুচড়ে ওঠে। ওর কেমন জানি লাগে। এতোকিছুর পর এই মধ্যরাতে ওর কি এখন কান্না পাচ্ছে? ও মাছের বাটিটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারে না। নষ্ট হয়ে গেছে মাছগুলো। গন্ধ আসছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় বাতাস পচা গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওটা খোকনের নাকে লাগবে না। খোকনের নাক? ভাবতেই তারামন নিজের ভেতর ব্যাকুলতা বোধ করে। কে জানে বেঁচে থাকলে ও খোকন কে ভালোবাসার কথা বলতো কি না? যখন ওর দাফনের আয়োজন হচ্ছিলো তখন ও বরই পাতা দিয়ে পানি গরম করে দিয়েছিলো। বাবা-মা ওকে দোয়া-দরুদ পড়া শিখিয়েছিলেন। ওর আব্বার মৃত্যুর পর কোরান শরীফ খতম করেছিলো, কিন্তু এখন ওর কিছুই মনে আসছে না। খোকনের জন্য ও দোয়া পড়তে পারেনি। এই না পড়তে পারার অক্ষমতায় ও দু'হাতে নিজের চুল টেনে ধরে। ইচ্ছে করে একটা জ্বলন্ত কয়লা হাতের মধ্যে চেপে ধরে নিজেকে শাস্তি দেয়। কেন ভুলে গেলো? এমন জিনিস ভুলে যাওয়া উচিত নয় যা দিয়ে মৃতের আত্মার প্রার্থনা হয়—যা খুব পবিত্র।

তখন তারামনের ভেতরে জেগে ওঠে ভিন্ন তারামন। কবরের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, আমি দরুদ পড়তে পারিনি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ আমার বুকের ভেতর ব্রহ্মপুত্রের বন্যার মতো ভেসে গিয়েছিলো দু'কূল। শুধু বলতে চেয়েছিলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি খোকন। আমি তোমাকে—ও মুঠি মুঠি হিজলের পাতা ছেঁড়ে। ভালোবাসি — হিজলের পাতা ও বিছাতে থাকে কবরের ওপর। ভালোবাসি খোকন—ভালোবাসার সবুজ পাতায় ভরে যায় খোকনের কবর। এভাবেই ও খোকনের জন্য প্রার্থনা করে।

শেষ রাতে মুহিব হাবিলদার ওর পাশে এসে দাঁড়ায়।

মা।

চমকে ওঠে তারামন। দু'হাতে মুখ ঢাকে।

দূর থেকেই মনে হচ্ছিলো কবরের কাছে কেউ একজন। আমার মন বলছিলো তুই হবি। উঠে আয় মা।

বাবা।

আমি বুঝেছি কেন তুই এখানে এসেছিস।

বাবা, আপনি কি ওর মায়ের ঠিকানা জানেন।

জানি।

খবরটা নিয়ে আমি ওর মায়ের কাছে যাবো।

নিশ্চয়ই যাবি। যুদ্ধ শেষ হোক।

না, বাবা, তা হবে না। কবে যুদ্ধ শেষ হবে আমরা তো জানি না। আমি তার আগেই যাবো।

আচ্ছা ভেবে দেখি। তুই তো বুঝিস পথঘাটের অবস্থা ভালো না।

কিন্তু বাবা, একজন মায়ের ছেলে মরে গেলে সেই মাকে খবরটা জানানো খুব দরকার।

আয়, ঘরে যাই। কিভাবে যাবি ঘরে বসে ঠিক করবো।

আর একটি কাজ বাকি আছে বাবা।

তারামন তপসে মাছের বাটিটা হাতে নেয়।

তারামন! মুহিব হাবিলদারের কণ্ঠে অপার বিস্ময়। কবরে কেউ কি মাছের বাটি আনে মা?

সে যে বলেছিলো এটা তার শেষ—

ও কথা শেষ করতে পারে না। দৌড়ে নদীর ধারে যায়। প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারে নদীতে। ঝপ্ শব্দ উঠলে ফিরে দাঁড়ায়। মুহিব ওর কাঁধে হাত রেখে কাছে টেনে নেয়। তারামন ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে। একসময় মুহিবের হাতটা ঘাড়ের ওপর থেকে নামিয়ে বলে, বাবা আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে নিশিতে পায়নি।

মুহিব অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ভালোবাসার নিশি।

তখন তারামনের মনে হয় নদীর ভেতর থেকে উঠে আসছে খোকনের কণ্ঠ, আমি তোমাকে ভালোবাসি তারামন।

দূর কি যে বাজে ভাবনা। এমন কথা কখনো বলেনি খোকন।

এরপরও মনে হয় কানের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া বাতাসে খোকনের কণ্ঠ—হিজলের ডালগুলো নড়ে উঠলো—সেটাও খোকনের কণ্ঠ, আমি তোমাকে ভালোবাসি তারামন।

ঝাঁকিয়ে ওঠে তারামনের শরীর।

বাবা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কে যেন কথা বলছে।

হ্যাঁ।

সত্যি শুনতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ মা পাচ্ছি। খোকন কথা বলছে। এখানে খোকন ছাড়া আর তো কেউ নেই।

ওহ্ বাবা, বাবাগো।

তারামন মুহিব হাবিলদারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মুহিব ওর মুখটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। এই আর্তনাদ মুহিবের বুকের মধ্যে থাকুক। সংসারের সব মানুষের জানার দরকার নেই। এই আর্তনাদ তারামনের জীবনে অত্যন্ত পবিত্র, একান্ত আপন। এর মধ্যে ভালোবাসার সত্য আছে কি নেই এটা বড় কথা নয়।

পরদিন তারামনের জ্বর আসে। প্রবল জ্বর। দুলাল দুটো নোভালজিন কিনে এনে খাইয়ে দিয়েছে। মুহিব ওর মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে শুনতে পায় প্রলাপ বকছে তারমান। খোকনকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ওর মুখে। মুহিবের খুব কষ্ট হয় মেয়ের জন্য। ভালোলাগার এই

সরল সত্য নিয়ে মেয়েটি ওর স্মৃতির পাতা ভরিয়ে রাখবে। কেমন অদ্ভুত মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। কতো বিচিত্র ঘটনা পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। তাকে মানতে হয়।

মানাটা সত্যি।

এই সত্যিটুকু নিয়তি।

বাইরে ছেলেদের গলা শোনা যাচ্ছে। ছেলেরা সতর্ক পাহারা দিচ্ছে ক্যাম্পের চারপাশে। ওদের ধারণা পাক-বাহিনী বড় রকমের হামলা করার জন্য আবার আসতে পারে।

ওরা নদীর দিকে একটি মেশিনগান স্থাপন করেছে।

তারামনের মাথায় জলপট্টি দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে মুহিব ভাত আর এক হাঁড়ি বুটের ডাল রান্না করে ফেলে। ছেলেরা পালা করে খেয়ে যায়। অন্যদিনের মতো সবার এক সঙ্গে বসা হয় না।

বিকেলে জ্বর ছাড়ে তারামনের।

চোখ খুলেই বাবার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা কবরের ওপর পাতাগুলো আছে তো?

আছে।

ও আবার চোখ বোঁজে। মুহিব ওর মুদ্রিত নয়নের ওপর তর্জনী ছুঁইয়ে বলে, জানিস সকালে ছেলেরাতো এই পাতা দেখে অবাক। আমার কাছে এসে বলে, স্যার দেখে যান এক অবাক কাণ্ড।

ওরা আমার হাত ধরে টেনে কবরের কাছে নিয়ে যায়। আমি ওদেরকে বলেছি, শহীদ খোকনের কবরের ওপর এটা হিজল গাছের উপহার। ওরা সারারাত পাতা ঝরিয়েছে।

তাই বলে এতো সুন্দর করে?

আমি বললাম, সুন্দরইতো হবে। শহীদের জন্য সবার মমতা থাকে।

তারামন ঝট করে উঠে বসে। যেন ওর কোনো অসুস্থতা নেই। তীব্র চোখে তাকিয়ে বলে, আপনি তো ঠিক বলেননি বাবা। মিথ্যে বলেছেন।

মিথ্যে! মুহিব আহত হয়।

আমি তো পাতাগুলো গাছ থেকে ছিঁড়ে বিছিয়ে দিয়েছি বাবা। ওদেরকে বলবেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা খোকনের কবরের ওপর এটা তারামনের উপহার। বলবেন তো?

না।

না, কেন?

আমি বললে তো তোর মতো করে বলা হবে না। তোর কথা তুই বলবি। তুই বললে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনবে। সবাই ভাববে শহীদ হলে ওদের কবরের ওপরও হিজল গাছের পাতা বিছিয়ে থাকবে।

ওহ্, বাবা। তারামন দু'হাতে মুখ ঢাকে।

মুহিবের মনে হয় মেয়েটিকে কি ও নিষ্ঠুরের মতো কথাটি বললো?

যদি এমন একটি যুদ্ধে ওদের অংশ নিতে হয় যে যুদ্ধে কেউ বাঁচলো না? তাহলে কে কার কবরের ওপর সবুজ পাতা বিছিয়ে দেবে? ভালোই হবে। কারো জন্য কারো কোনো শোক থাকবে না। কেউ কারো মায়ের কাছে গিয়ে ছেলের মৃত্যুর খবর পৌঁছে দিতে চাইবে না।

হঠাৎ করে তারামন আবার উঠে বসে, আমার জ্বর ভালো হয়ে গেছে বাবা। আমি বাইরে যাবো।

বাইরে যাবি? কোথায়?

নদীর ধারে।

না। বাইরে যেতে হবে না। মাত্র জ্বর ছেড়েছে। হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে গেলে নিউমোনিয়া হবে।

হোক, তবু আমি যাবো।

মুহিব ওকে ধমক দিয়ে বলে, বাড়াবাড়ি করতে হয় না তারামন। সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে। যদি পাকবাহিনী আরো পাঁচটা গানবোট নিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করে। যদি কাল আবার যুদ্ধে যাবার ডাক আসে?

যুদ্ধ? বলতে বলতে ও আবার শুয়ে পড়ে। বালিশে মুখ গোঁজে। কে জানে ওর হয়তো চোখে পানি এসেছে। বালিশটা ভিজে যাবে। মুহিব উঠে বাইরে আসে। ছেলেরা তখন পাহারায় রত। নদীর দিকেই লক্ষ রাখছে বেশি। ভীষণ সতর্ক। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহিবের মনে হয় মাত্র অল্প কয় মাসের ট্রেনিং পাওয়া ছেলেগুলো নিয়মিত বাহিনীর মতো অতন্ত্র প্রহরী হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পরই সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে খবর আসে রেকি পেট্রোলিং করার জন্য। মুহিব সবাইকে বলে, এতোদিন আমরা ডিফেন্সে ছিলাম। ওরা আক্রমণ করতো, আমরা প্রতিরক্ষা করতাম। আর ডিফেন্সে নয়। এবার আক্রমণের পালা। কোদালকাঠি থেকে পাকবাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীরে আমাদের নিরঙ্কুশ বিজয় সূচিত করতে হবে। আমাদের সঙ্গে আরো দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা যোগদান করবে।

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় দুলাল আর তারামন যাবে রেকি করতে। দু'জন দু'পথে। একদম ভিন্ন ভাবে। ওদের যাবার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেলে মুহিব হাবিলদার ছোট্ট বক্তৃতা করে। কি করতে হবে বলে দেয়। শেষে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর তাহেরের কথাগুলো ওদের আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সব সময় বলেন, 'আক্রমণের আগে লক্ষ্যস্থলের বিস্তারিত তথ্যের জন্য এলাকার জনগণের ওপর নির্ভর করো। তাদের কাছে যুদ্ধ পরিকল্পনার ব্যাপারে সাহায্য নাও এবং এলাকা মুক্ত হলে সেখানে জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করো।' মনে আছে তো তোমাদের?

হ্যাঁ। ওরা সমস্বরে বলে।

দুলাল আর তারামনকে বলছি। তোমরা কোদালকাঠিতে ঢুকে গ্রামের লোকের কাছ থেকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানবে। কিভাবে, কোন পথে এগুলো গন্তব্যস্থল ভুল হবে না, কোথায় এ্যামবুশ করা যাবে, কোথায় পজিশন নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা যাবে। গ্রামে রাজাকারের সংখ্যা কেমন, বাড়িঘর কোথায় এবং আমাদের পক্ষে কারা কাজ করবে। তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গ্রামবাসীর সহযোগিতা ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ সফল হয় না। আমি জানি তারামনের বান্ধবীর মামার বাড়ি কোদালকাঠি চরে।

হ্যাঁ, আমার বান্ধবী বেণু। বেণুর সঙ্গে আমি কোদালকাঠিতে গিয়েছি। ওই বাড়ি আমি জানি। ওর মামার নাম মেহের আলী।

পরদিন দুলাল আর তারামন রওনা হয়। কোদালকাঠি চরে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যায়। তারামন মেহের আলীর বাড়িতে গেলে দুলাল বাইরে অপেক্ষা করে।

মেহের আলী বাড়িতে ছিলো না। বেণুর মামী মেহেরুণ ওকে দেখে অবাক হয়। এমন একটা

সময়ে ও একা কোথা থেকে এলো? তারামন পা ছুঁয়ে সালাম করে বলে, কেমন আছেন মামী?

তুই কোথা থেকে এলি মা?

সে মেলা কথা। বেণু কই? আমি বেণুর খোঁজে এসেছি।

তুই খবর জানিস না? আমাদের বাড়িতে আসার পথে বেণুকে মিলিটারিরা নিয়ে গেছে। ও আর এ গাঁয়ে ফিরে আসে নি।

ওর বাবা-মা?

ওরা দু'মাস এ গাঁয়ে থেকে নিজেদের ভিটেয় ফিরে গেছে।

বেণু নেই! তারামন কাঁদতে শুরু করে।

আহ্ কাঁদিসনা। চুপ কর। আয় চারটে ভাত খাবি।

মামা কই?

মসজিদে। আসরের নামায পড়তে গেছে। এখনই এসে যাবে। চল, হাতমুখ ধুয়ে নিবি।

তারামনের খিদে পেয়েছে। ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দুলাল তো বাইরে আছে। ওরও খিদে পেয়েছে। ওকে ছেড়ে খাওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু মেহেরুণকে কিভাবে বলবে দুলালের কথা? এটা ভাবতে ভাবতে ও মেহেরুণের সঙ্গে কুয়োর ধারে যায়।

তখন মেহের আলী বাড়ির সামনে দুলালকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, তুমি কে বাবা?

রাজীবপুর থেকে এসেছি।

এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে?

দারোগা বাড়িতে যাবো। পথটা কোনদিকে হবে সেটাই ভাবছি।

সে তো এখান থেকে অনেকটা পথ। যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।

রাত হলে আর কি হবে।

মাথা খারাপ। যদি মিলিটারির সামনে পড়ো তো মেরেই ফেলবে।

শুনেছি ওরা খুব উৎপাত করছে।

হ্যাঁ।

এই রকম কথাই হয় তারামনের সঙ্গে মেহেরুণের। তারামন মেহেরুণের হাত চেপে ধরে বলে, মামী এ গাঁয়ে কি মিলিটারি থাকা উচিত?

না, মোটেই না। ওদের ভয়েই তো ছেলেমেয়েগুলোকে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছি। শরণার্থী শিবিরে কি যে কষ্ট করছে ওরা। তোর মামা আর আমার দিন যেন কাটে না রে।

মুক্তিযোদ্ধারা যদি ওদের তাড়াতে আসে মামী?

আমরাও ওদের সঙ্গে থাকবো।

সত্যি?

হ্যাঁ রে, সত্যি। তোর মামাও খুব খাপ্পা। নামাজ পড়ে আর বলে, আল্লা জালিমদের ধ্বংস করো।

তখন মেহের আলীও বুঝে যায় যে দুলাল কেন কোদালকাঠি চরে এসেছে। ওকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে আসে। তারামনকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, তুই কে রে মা?

আমি বেণুর বান্ধবী। আমাকে ভুলে গেছেন মামা? সেই যে—

বুঝেছি, বুঝেছি। তুই বেণুর সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলি।

তারামন মেহের আলীর পা ছুঁয়ে সালাম করে।

কিন্তু মা বলতো তুই আর কি?

মেহের আলী ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। তারামন সপ্রতিভ থাকার চেষ্টা করে বলে, আমি আর কি মানে? মামা আপনি কি আমাকে বান্দর বলবেন?

মেহের আলী হা-হা করে হেসে বলে, একে চিনিস তো?

মেহেরুণ আগ বাড়িয়ে বলে, ও কি করে চিনবে। তুমি কাকে ধরে নিয়ে এলে?

দুটোই বান্দর পলাশের মা। তুমি ওদের খেতে দাও। আমি ঘুরে আসছি। যারা আমাদের লোক তাদেরকে বলতে হবে যে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা গাঁয়ে ঢুকেছে। কোদালকাঠি চরের মানুষের জড়ো হতে হবে।

ওমা কি বলছো তুমি? আজ আমার ঘুম হবে তো? গাঁয়ে তোরা যুদ্ধ করবি। কয়শ ছেলের ভাত রাঁধতে হবে আমাকে জানাস। আমি একাই সব করব।

মেহেরুণের কাণ্ড দেখে দুলাল আর তারামন হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসি থামলে মেহের আলীকে দুলাল বলে, মামা কাল আমরা পুরো গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে দেখবো পাকবাহিনীর অবস্থান এবং আমরা কিভাবে এগুবো। একটা ম্যাপের মতো বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে কমাণ্ডারকে দেখানোর জন্য।

এসব তোদের ভাবতে হবে না! সব আমি ঠিক করে দেবো। তোরা বেশি ঘোরাঘুরি করলে লোকের সন্দেহ হবে। বরং খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নে। আমি আসছি।

সন্ধ্যার পর পরই দু'জন বয়স্ক লোককে নিয়ে ফিরে আসে মেহের আলী। দুলাল ঘুমাচ্ছিলো। তারামন শুতেই পারে না। উত্তেজনায় ওর শরীর টানটান। ও রান্নাঘরে বসে মেহেরুণের কাছে খোকনের গল্প করছিলো। সামনে আর একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ওর যদি কিছু হয় মেহেরুণ যেন তারামনের মাকে খবর পাঠায়। মায়ের ঠিকানা ও মেহেরুণকে দেয়। আরো বলে, বেণু যদি বেঁচে থাকে তাহলে মেহেরুণ যেন বেণুকে বলে তারামন প্রতিশোধ নিয়েছে। বেণুকে নির্যাতনের প্রতিশোধ।

মেহের আলী রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, অল্পক্ষণের মধ্যে অনেকই এসে পড়বে। তুই আমার ঘরে আসিস মা।

তারামন অনুভব করে মেহের আলীর কণ্ঠে এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা। পায়েও ক্ষিপ্রতা। মুহূর্তে চলে যায় শোবার ঘরে। এমন ক্ষিপ্রতা ও মুহিব হাবিলদারের মধ্যেও দেখেছে। কখনো কখনো মানুষ নিজের অতিরিক্ত অন্যকিছু হয়ে যায়। সে নিজেও বুঝতে পারে না যে সে কিভাবে নিজেকে অতিক্রম করলো। তারামন অভিভূত হয়। যুদ্ধ ওর কাছে প্রার্থনার মতো মগ্নতা হয়ে দাঁড়ায়। মেহের আলী মসজিদ থেকে ফিরে মাথা থেকে টুপিটা এখনো খোলেনি। ও বুঝে যায় যে মসজিদে নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে মেহের আলী কি প্রার্থনা করে। কি চায় আল্লার কাছে। ওর নিজস্ব ভাবনার মাঝে শুনতে পায় মেহের আলী দুলালকে ডাকছে, ওঠো বাবা। দেখো কারা এসেছে।

একটুপর একে দুয়ে লোক আসতে শুরু করে। বৃদ্ধ-যুবা। এক একজন এক এক পথে। যেন রাজাকাররা বুঝতে না পারে যে এই বাড়িতে দশ-পনের জন মানুষ একত্র হয়েছে। আলোচনার বসেছে। রান্না শেষ হয়েছে মেহেরুনের। তারামনকে সঙ্গে নিয়ে শোবার ঘরে আসে। তরুণদের মুড়ি আর পাটালি গুড় দেয়। বয়স্কদের পানের বাটা এগিয়ে দেয়। মাঝখানে

হারিকেন জ্বলছে। অর্ধেক চিমনি কালো হয়ে গেছে। ফিসফিস করে কথা বলে ওরা। মেহের আলী সবার সামনে এক টুকরো কাগজ মেলে ধরে বলে, আমি একটা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছি। এই যে আপনারা সবাই দেখেন। পাকবাহিনী যেখানে ক্যাম্প করেছে তার সামনের দিকে বিরাট খোলা মাঠ। তারপর ঝাউবন। মুক্তিযোদ্ধারা ঝাউবনে অবস্থান নিলে পাকবাহিনীর নজরে পড়বে। ওরা মাঠের মাঝখানে দিয়ে ছুটে আসতে থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করবে। কি বলেন আপনারা?

হ্যাঁ, এটাতো আমাদের অনেকদিনের পরিকল্পনা। এখন আর ডিফেন্স নয়, সরাসরি আক্রমণ।

তরুণরা হৈ-চৈ করে ওঠে। তবে গলার স্বরের মাত্রা আছে। ওরা জানে কতোটা ওঠাতে হবে। রাত বাড়ে। ঠিক হয় এই ম্যাপ নিয়ে দুলাল চলে যাবে। তারামনের ফেরার দরকার নেই। মুক্তিযোদ্ধারা কোদালকাঠিতে ঢুকলে তারামন ওদের সঙ্গে যুক্ত হবে।

মেহেরুণ বলে, ওরা কবে ঢুকবে তারিখটা ঠিক করেন। ভাত রেঁধে রাখতে হবে না। আমার সোনার কি না খেয়ে যুদ্ধ করবে।

হ্যাঁ, তারিখটা ঠিক করেন। সব বাড়িতে রান্না করা হবে।

মেহের আলী চিন্তিত স্বরে বলে, তারিখ কি আর ঠিক করা যাবে। দুলাল গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলেই না ঠিক করবে। ধরো আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে।

সবাই নিশ্চিন্ত হয়। যুদ্ধের উত্তেজনা নিয়ে ওরা একে-দুয়ে ঘরে ফেরে।

রাতে মেহেরুণের বুকের মধ্যে শুয়ে তারামন কেঁদে বুক ভাসায়। মেহেরুণ শক্ত কণ্ঠে বলে, কাঁদিস কেন? যুদ্ধের জন্য ভয় করছে?

না, আমিতো যুদ্ধই চাই মামী।

তাহলে?

এমনি কান্না পাচ্ছে।

খোকনের কথা মনে পড়ছে?

তারামন দু'হাতে মেহেরুণকে জড়িয়ে ধরে। একসময় বলে, যুদ্ধে যদি মরে না যাই, যদি দেশ স্বাধীন হয়, যতোদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন খোকন ভাইকে ভুলবো না।

ভুলে যাবি রে মেয়ে।

ভুলে যাবো? কখনোই না।

মেহেরুণ অন্ধকারে মৃদু হাসে। অস্ফুট হাসির শব্দ তারামনের কানে লাগে। মেহেরুণ তারামনের কপালে চুমু দিয়ে বলে, ঘুমো।

কিন্তু ঘুম আসে না তারামনের। মেহেরুণ ঘুমিয়ে গেলে নিঃশব্দে বাইরে আসে। উঠোন জুড়ে ফকফকে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না দেখে ও বুঝে যায় যে আজ ভরা পূর্ণিমা। এরপর শুরু হবে অমাবস্যা। যুদ্ধের সময়ে অমাবস্যাই ভালো। ও শুনেছে পাক-বাহিনী অমাবস্যার রাতকে ভীষণ ভয় পায়। রাতে ওরা ঘর থেকে বের হয় না। তারামনের ইচ্ছে হয় খিলখিল করে হেসে উঠতে। আর কি সে ওদের ভয়? ভয়ের কথা মনে হতেই বেণুর মুখটা ভেসে ওঠে। ওদের ওই ভয়ের মধ্যে বেণুর দিন কাটছে। ওরা কি অমাবস্যার রাতে বেণুর শরীর আছড়ে-পিছড়ে নিজের ভয় তাড়ায়? কিন্তু বেণু কি বেঁচে আছে? সুস্থ? নাকি ওরা ওকে কঙ্কাল বানিয়েছে? খুবলে খেয়েছে ওর সবটুকু? ভাবতেই নিজের মৃগী রোগি স্বামীর কথা মনে পড়ে। কি বীভৎস

ছিলো সেই রাতগুলো। ভালোবাসার সঙ্গম কি তা ও জানতেই পারেনি। বেণুও কি এখন তেমন দোজখে বাস করছে? তারামনের গা শিউরে ওঠে। নিজের জীবনের সেই বীভৎস রাতগুলোর কথা মনে করে ও নিজেকেই বলে, এই ভরা পূর্ণিমা অমাবস্যার রাত হয়ে যাক। আমি এই পূর্ণিমা দেখতে চাই না। ওর মনে হয় এ বাড়ির যে খুঁটিটায় ও হেলান দিয়ে বসে আছে সেটার সঙ্গে ওকে কেউ শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। এমন কি মুখটাও গামছা দিয়ে বাঁধা। ও গোঙ্গাচ্ছে। গোঙানির শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষামান মেহের আলী আর মেহেরুণের বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের জন্য ওদের বুকের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ভারতের শরণার্থী শিবিরে বসে ওরা দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছে। ওদের জন্য স্বাধীনতা চাই। মুহূর্তে তারামনের মনে হয় গোঙানি নয় ওর কণ্ঠে গান। কোথাও গোঙানির শব্দ নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের শব্দ সঙ্গীতের মতো বাজছে কোদালকাঠি চরে। কার সাধ্যি আছে ওকে বেঁধে রাখার। ও মুক্ত। ছুটে যাচ্ছে ওই শরণার্থী শিবিরে। মেহেরুণের খালি বুকে সন্তানদের ফিরিয়ে আনার জন্য।

তখন মেহেরুণ এসে ওর মাথায় হাত রাখে। শক্ত কণ্ঠে বলে, কেন ঘুম আসছে না তোর? আয় আমি ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

ঘুম পাড়ানি গান গাইবেন?

হ্যাঁ।

ওহ্ কি মজা, কি মজা!

মুহূর্তে ও শিশু হয়ে মেহেরুণের পিছে পিছে ঘরে ঢোকে। অল্পেই ঘুম আসে ওর। মেহেরুণের কণ্ঠ ওর মায়ের মতো। মা এভাবেই ওদের ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে শোনাতেন। এখন হয়তো রবি-নবিকে বুকের কাছে নিয়ে গুণগুণ করেন। ঘুমিয়ে পড়ে ও। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে জানতে পারে যুদ্ধের সময়ে মায়েদের কণ্ঠগুলো কোনো বিশেষণে পড়ে না। ঐ সব কণ্ঠে সঙ্গীত, অস্ত্র, মৃত্যু, কান্না, শোক, হিংস্রতা, নির্যাতন সব থাকে। থাকে শত্রুকে পরাজিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য সন্তানদের কাছে গভীর নিবেদন। মায়েদের কোনো বিশেষ বাড়ি নেই, গ্রাম নেই , শহর নেই। মাঠঘাট নদী প্রান্তর কিছুই নেই। আছে যুদ্ধক্ষেত্র এবং সেখানে যাওয়ার জন্য অলৌকিক আহ্বান।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা গভীর রাতে গোপনে কোদালকাঠি চরে প্রবেশ করে। তৈরি ছিলো গ্রামের অনেকে। রাতারাতি ঝাউবনের কাছে পরিখা খনন করা হয়ে যায়। অবস্থান নেয় মুক্তিযোদ্ধারা। পরিখাগুলোর সামনে বিস্তৃত পতিত জমি। খোলা। বড় গাছও নেই। ওপাশে পাক-বাহিনীর ক্যাম্প। নিঃশব্দে বসে আছে ওরা।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দু'প্রান্তে দুটো মেশিনগান স্থাপন করা হয়েছে।

নিঃশব্দে বসে আছে ওরা। সুবেদার আফতাব কোদালকাঠি চরে প্রবেশের আগে সেক্টর কমাণ্ডারের রণকৌশল সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে। পরিখায় অপেক্ষা করতে থাকবে ওরা। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে শত্রুসৈন্য ওদের শেষ করার জন্য যখন আক্রমণ চালাবে তখন খোলা জায়গায় ওদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। একটি মেশিনগানের দায়িত্বে থাকবে মুহিব হাবিলদার। অন্যটির আফতাব নিজে।

রাত ফুরিয়ে যায়। আলো ফুটতে শুরু করেছে। উৎকণ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধারা। গ্রামের যুবকরা

ওদের রুটি-গুড় পরিবেশন করেছে। মেহেরুণের রান্নাঘরে কতজন মহিলা রুটি বানাচ্ছে কেউ জানে না। টুকরি বোঝাই রুটি চলে যাচ্ছে বিভিন্ন পরিখায়। সঙ্গে এলুমিনিয়ামের জগভর্তি পানি।

মুহিব হাবিলদারের পাশে বসে আছে তারামন। দু'টো রুটি খেয়েছে, সঙ্গে একমুঠি গুড়।

বাবা আপনি খাবেন না?

দে।

ও মুহিবের মুখে রুটি ছিঁড়ে দেয়। খানিকটা অস্থির। কখনো হাত কাঁপে। কখনো মনে হয়, বাবাকেও কি ও শেষ খাওয়া খাইয়ে দিচ্ছে? আকস্মিক এই চিন্তায় ওয় হাত থেকে রুটি পড়ে যায়। মুহিব অবাক হয়ে তাকায়, কি হলো তোর? ভয় করছে?

না বাবা।

তাহলে—

কথা শেষ করার আগেই তারামন চেঁচিয়ে ওঠে, দেখেন, দেখেন ওই যে ওরা এগিয়ে আসছে। ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। তারামনের হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। রাতেই মুহিব হাবিলদার ওকে ওটা দিয়েছে।

বাবা গুলি ছুঁড়বো?

না, আরো সামনে আসুক।

যদি আমাদের কারো গায়ে গুলি লাগে?

আহ্ চুপ কর।

মুহূর্তে আফতাবের ইঙ্গিতে গর্জে ওঠে দুজনের মেশিনগান। যে কজন সৈন্য এগিয়ে এসেছিলো লুটিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। ওদের মনে হয় একজনও বেঁচে নেই। সবাই নীথর। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চাপা আনন্দ। কিন্তু কেউ পরিখা থেকে বের হয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খানসেনারা আবার আক্রমণের জন্য বেরিয়ে আসে। এবার সংখ্যায় বেশি। এবার মেশিনগানের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেলগুলোও একসঙ্গে গর্জে ওঠে। পড়ে যায় সৈনিকেরা। মাঠের ফাঁকা জায়গা নিহতদের লাশে ভরে উঠতে থাকে। খানিকক্ষণ নীরবতা। দু'পক্ষই চুপ।

পরিষ্কার আকাশ। কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়ার আকারে টুকরো টুকরো মেঘ। পরিচ্ছন্ন দিন। খোলা মাঠে যেন চকচক করছে রোদের আভা। শরত ঋতু। আশেপাশের বুনো ফুল থেকে মৃদু গন্ধ আসছে। কে বলবে এমন শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির মাঝে পাথরের মতো ভারী হয় আছে মানব হৃদয়। ওপাশ থেকে আফতাব বলে, আমাদের জানা মতে সংখ্যায় ওরা আর বেশি নেই। ওদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তবু আমরা অপেক্ষায় থাকবো। দেখি ওরা তৃতীয় আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে কিনা।

টানটান উত্তেজনায় মুক্তিযোদ্ধারা স্থির। কেউ নিজের অবস্থান থেকে নড়ে না। এখন পর্যন্ত ওদের কারোই কিছু হয়নি। প্রত্যেকে পরিখার ভেতরে নিরাপদ অবস্থানে আছে। রাইফেল চালাতে পেরে তারামন খুব খুশি। ওর গুলিতে নিশ্চয় কেউ না কেউ নিহত হয়েছে, এই আনন্দের মাঝে ওর বেণুর কথা মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনীর তৃতীয় আক্রমণ শুরু হয়।

মেশিনগান দুটির আড়াআড়ি গুলিবর্ষণ খুব কাজ করে। মেশিনগানের ব্রাশফায়ারে

বেশিরভাগ শত্রুসৈন্য ঘায়েল হয়। অল্প কয়েকজন মাত্র পরিখার কাছাকাছি আসতে পারে। ওদের নাজুক পরিস্থিতির কথা বুঝতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পরিখা থেকে বেরিয়ে পড়ে। যে কয়েকজন শত্রুসৈন্য পরিখার কাছকাছি আসতে পেরেছিলো মুক্তিযোদ্ধরা ওদের বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। যে কয়জন ক্যাম্পে ছিলো তারা গানবোটে করে পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় কোদালকাঠি চর। মুক্ত হয় ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পাড়ের সম্পূর্ণ এলাকা।

চিৎকার করতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা, কোদালকাঠি মুক্ত, কোদালকাঠি মুক্ত।

তারামন রাইফেল উপরে তুলে খোলা মাঠে দৌড়াতে থাকে—যতোক্ষণ ওর ইচ্ছে, যতোক্ষণ ওর আনন্দ। কোদালকাঠি মুক্ত। জয়—বাংলা।

গ্রামের অনেক বাড়ি থেকে ভাত-তরকারি, ফিরনি-পায়েস আসতে থাকে। মানুষের ঢল চারদিকে। ছেলে-বুড়ো-নারী-পুরুষ, শিশুরা পর্যন্ত কেউ ঘরে নেই। একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে।

তারামনের মনে হয় ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য দেখছে ও। অসাধারণ দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ওর চোখ ছলছল করে ওঠে। এতো আনন্দের মাঝে খোকনের জন্য, বেণুর জন্য দুঃখ।

এই মুহূর্তে দুঃখই আনন্দ।

১৬

ওরা তিনজন এখন বগাজুরিতে।

অমল, নঈম ও যমুনাপ্রসাদ। এখন পর্যন্ত ওরা তিনজন একসঙ্গে আছে। কেউ কাউকে ছেড়ে যায় নি। বিহারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওরা সৈয়দপুরের একটি ক্যাম্পে থাকা শুরু করেছিলো। কতোদিন ছিলো তা ওদের মনে নেই। মনে আছে ওদেরকে সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিহারিরা একটি ট্রেন ঠিক করেছিলো। এখন ওদের কাছে ওটি একটি ভৌতিক ট্রেন। যে ট্রেন কোনো শব্দ করে না, ছুটে চলে না। কিংবা চললে অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে যায়। সেখান থেকে আর কোনোদিন বের হয় না।

নির্ধারিত দিনে বিহারিরা ওদের ট্রেনে উঠবার জন্য ডাক দিয়েছিলো। ওরা ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি করে ট্রেনে উঠে গেলো। আর ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো ট্রেনটি একটি খোলা প্রান্তরে এসে মানুষের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করলো। যন্ত্রের তো বিশ্বাসঘাতক হওয়ার কথা ছিলো না। ট্রেনের জানালা এবং দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো। পরিষ্কার দিনের বেলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এলো প্রতিটি কামরায়। তারপর? তারপর বিভীষিকা। নারকীয় বিভীষিকা। মনে হয়েছিলো এর শুরুও নেই, শেষও নেই। অনবরত দরজা ফাঁক হয়। টেনে নামানো হয় একজনকে, ধারালো তরবারির আঘাতে নিধন করা হয় তাকে। তারপর আর একজন।

জানালা ভেঙে মাত্র কয়েকজন পালাতে পেরেছিলো। তাদের মধ্যে ওরা তিনজন।

তিনজনই ওই ট্রেনের কামরায় রেখে এসেছিলো প্রিয়জন—মা, স্ত্রী, ভাইবোন। ওরা আর ওদের খবর পায়নি। পাওয়ার জন্য ওরা অপেক্ষা করেনি। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিজেদের জীবন নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলো। একসময় যাদেরকে ওদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে হতো সংকটের মুহূর্তে তারা নেই হয়ে গেলো। অবশিষ্ট রইলো শুধু নিজেরটুকু। শুধুই নিজের।

এখন ওরা বগাজুরি গ্রামের ঘন জঙ্গলে। বগাজুরি ভারত-ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন একটি গ্রাম। ১১ নং সেক্টরের অধীনে। যুদ্ধ করবে বলে এই জঙ্গলে ওরা ট্রেনিং নিয়েছে। এক মাস চৌদ্দ দিনে ওদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ক্যাপ্টেন চৌহান ওদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আগামীকাল ওরা এখান থেকে চলে যাবে।

গভীর রাত। নিঃশব্দে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসে অমল। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। দুই হাত মাথার নিচে। উপরে তাকালে দেখতে পায় গাছের পাতার ফাঁকে কুচি কুচি হয়ে লেগে আছে জ্যোৎস্না। প্রতিটি কণায় ফুটে আছে সুনন্দার মুখ। অমল চোখ বোঁজে। চোখ খোলে। নিজেকেই প্রশ্ন করে উত্তর পায় না যে সেদিন ওই বধ্যভূমিতে সুনন্দাকে রেখে কি করে পালিয়ে এলো ও? কি হতো এক-সঙ্গে মরে গেলে? হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে অমল। সর্বস্ব হারানোর বেদনায় কন্টকিত হয়ে যায় ওর কণ্ঠ।

তখন লোকটি ওর পাশে এসে বসে। ডাকে, অমল?

ওহ্ তুমি? তুমি কেন এসেছো আমার কাছে?

আমি তোমার বন্ধু।

তোমার হাতটা দাও। আমি ধরি।

তুমি সুনন্দাকে ফেলে চলে এলে?

আমি আর কি করতে পারতাম। কিভাবে বাঁচতাম?

তুমি সুনন্দাকে ভীষণ ভালোবাসতে?

বাসতাম। ভীষণ।

অমল কাঁদতে থাকে।

কেঁদো না।

মানুষের কণ্ঠস্বর কি কারো কান্না থামিয়ে দিতে পারে?

পেছন থেকে নঈম কথা বলে।

লোকটি বলে, আমি জানি ওই ট্রেনে তুমি তোমার মাকে রেখে এসেছিলে। পাকিস্তান আর্মি তোমার বাবা আর ভাইকে মেরে ফেলার পর মা ছাড়া তোমার আর কেউ ছিলো না।

নঈমের কণ্ঠে আর্তনাদ, তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ো না।

আমি নিষ্ঠুর নই।

তাহলে তুমি আমাদের এসব কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো কেন? তুমি কি ভেবেছো আমরা ভুলে গেছি?

তোমরা তো ভুলতে পারো না। প্রিয়জনের মৃত্যু কেউ ভোলে না। তবে তোমরা কি এটা জানো যে ওরা স্বাধীনতার জন্যই জীবন দিয়েছে।

তুমি একটা স্টুপিড।

হা-হা করে হেসে ওঠে লোকটি। সে হাসি ভারত সীমান্ত পেরিয়ে ভুটান সীমান্তের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে আবার ফিরে আসে অমলের কাছে। ওর মনে হয় হাসি নয় কান্না।

বুকের ভেতর কান্না ছাড়া আর কোনো ধ্বনি নেই।

এর মধ্যে যমুনাপ্রসাদ বেরিয়ে এসেছে ক্যাম্প থেকে। ও লোকটির পেছনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি থামলে লোকটি বলে, যমুনাপ্রসাদ আমি জানি তুমি তোমার সবচেয়ে ছোট বোনটিকে খুব ভালোবাসতে। ওর একটি কালো বেড়াল ছিলো।

হ্যাঁ, বেড়ালটি ম্যাও করে ডাকলে আমার মনে হতো বোনটির সঙ্গে ও বুঝি কথা বলছে। অন্ধকারে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকলে বোনটি বলতো, দাদা দেখো বেড়ালটার গায়ে ফুল ফুটেছে।

অমলের তিক্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, তুমি কি বলবে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নই এমন।

হ্যাঁ, বলবো। আবার সেই হা-হা হাসি।

এই মধ্যরাতে তুমি এমন করে হেসো না। নঈম রেগে যায়।

কেনো হাসবো না? তোমাদের ভয় করছে?

ভয় নয়। তোমার হাসি শুনে আমার সুনন্দার কথা মনে হচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে।

তখন লোকটি অমলের হাত ধরে বলে, চলো আমরা এই জঙ্গলে খানিকক্ষণ হেঁটে আসি। কালতো সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমাদের সামনে এখন শুধুই আগামীকাল। আমরা আগামীকালের মানুষ।

বলতে বলতে লোকটি হেঁটে চলে যায়। ওরা তিনজন নড়ে না। যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। ওরা পাখির কূজন শোনার জন্য গাছের দিকে তাকায়। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। ওরা তাঁবুতে ফিরে আসে।

সাংমা কম্বলের নিচ থেকে মাথা বের করে বলে, কি ব্যাপার তোমরা কোথায় ছিলে?

বাইরে। তুমি ঘুমোও।

তিনজনে যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ে। তিনজনের বুকের ভেতর একরকমের অনুভব। তিনজনই বেঁচে থাকার জন্য একটি বধ্যভূমি থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে। ফেলে আসা প্রিয়জনের কথা মনে করে তিনজনই কম্বলের নিচে কাঁদতে থাকে। সে রাতে কেউ ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না। বারবারই ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় কারা যেন ডাকছে। কিন্তু পিছে তাকাবার সময় নেই। তিনজনই বিড়বিড় করে বলে, আমাদের সামনে এখন শুধুই আগামীকাল। আমাদের স্মৃতিও আগামীকালের।

পরদিন সকাল। বেশ রোদ উঠেছে। প্যারেড গ্রাউন্ডে ওরা আক্রমণের মহড়া করলে ক্যাপ্টেন চৌহান খুশি হয়। ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে দিতে বলে, উইশ ইউ বেস্ট লাক মাই বয়। সারাদিন ঘোরাফেরা করো। মানসিক প্রস্তুতি নাও। রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়বে বাংলাদেশে।

ক্যাপ্টেন চৌহান চলে গেলে সাংমা বলে, কতো সহজে ক্যাপ্টেন কথাগুলো বললেন। আমরা জানি কাজটা কতো কঠিন। নিজের দেশে ঢুকতে হবে চোরের মতো। তবু ভালো যে এলাকাটা আমার চেনা। তোমারতো এ এলাকায় কখনোই আসোনি। এসেছো?

তিনজনে মাথা নেড়ে বলে, না। আমরা ভাগ্যবান যে তোমার মতো বন্ধু পেয়েছি। বন্ধুর বাড়িটিকে আমরা শত্রুমুক্ত করবো।

অজেয় সাংমা খুশিতে ওদের জড়িয়ে ধরে বলে, মাত্র কয়েক মাস আগে বিয়ে করেছি। বউকে রেখে এসেছি রংরায়। প্রথম অপারেশন সাকসেসফুল হলে তোমাদেরকে আমার

কুঁড়েঘরে নিয়ে যাবো। যা খেতে চাইবে আমার বউ তোমাদের তাই রান্না করে খাওয়াবে।

বাহ্ চমৎকার। তিনজনে সাংমার উচ্ছ্বাসে খুশি হয়।

সাংমা একটুখানি দ্বিধা করে বলে, খ্রিস্টানের বাড়িতে খেতে তোমাদের আপত্তি হবে নাতো?

কি যে বলো, যুদ্ধের সময় আবার হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান মাড়োয়ারি কি!

তাইতো, তাইতো। যুদ্ধ মানে তো জীবন আর মরণ।

থাক এসব কথা। তোমার বউয়ের নাম কি সাংমা?

অপালিকা। ও নানারকম পিঠা বানায়। ক্রিস্টমাসের সময় তোমাদের নিয়ে যাবো। যতো রকমের পিঠা খেতে চাইবে ও বানিয়ে দেবে। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

বাবা, তুমি দেখছি প্রেমে একেবারে গদগদ।

হা-হা করে সবাই হেসে উঠলে সাংমা লজ্জায় মুখ নিচু করে।

অমল বলে, পিঠা আমি ভীষণ পছন্দ করি।

আমিও। নঈমের কণ্ঠ। তোমার বউ চন্দ্রপুলি পিঠা বানাতে পারে তো?

অজেয় সাংমা ঘাড় নাড়ে। যমুনাপ্রসাদ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমাদের বেঁচে থাকাতে খানিকটুকু স্বস্তি দিয়েছো বন্ধু। সেই ট্রেন থেকে পালিয়ে আসার পর আমরা যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না। সেই অতলের মধ্যে তুমি আমাদের কাছে খড়কুটো। তোমাকে ধরে আমরা কুলে উঠতে চাই।

সাংমা অবাক হয়ে বলে, কি বলছো তুমি এসব?

থাক, এসব কথা। চলো আমরা এলাকাটা ঘুরে দেখি। নঈম সাংমার হাত নিজের মুঠিতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ঘন বনের ভেতরে ওরা অনেকখানি চলে যায়। ঝোপঝাড়, বুনোলতা, বুনো ফুলের গন্ধ, পাখির কিচির মিচির ওদের যুদ্ধের চেতনার বাইরে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে ওদের মনে হয় ঘন সবুজের ভেতর থেকে উঠে আসছে সঞ্জীবনী গন্ধ, ওঠে আসছে পিঠে-পুলির চিত্রিত নকশা এবং বিশাল ক্যানভাসে জীবনের উঠোন, সেখানে খেলছে একদল খুকি। পাতার ফাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসি ছড়িয়ে রেখেছে মায়েরা।

অমল লুকিয়ে চোখ মোছে। নঈম খানিকটুকু পেছনে দাঁড়িয়ে গাছের কাণ্ডে নিজের কপালটা ঠুকে নেয়। যমুনাপ্রসাদ সাংমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ওই পাখিটা কি তুমি আমার জন্য ধরে আনতে পারো বন্ধু?

অজেয় অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকায়। বলে, তোমরা তিনজনেই যেন কেমন করো আমি বুঝি না।

সন্ধ্যার পরেই নিজেদের যা কিছু তা গুছিয়ে নেয় ওরা। রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করে বাংলাদেশের ভেতরে। আগেই ঠিক করা ছিলো। লেংগুরা ইউনিয়নের মধ্যে বেংকোচুয়া গ্রামে ক্যাম্প বানায়। এই গ্রাম থেকে মাইল খানেকের মধ্যে নাজিপুর। ওখানে পাকবাহিনীর বেশ বড় একটা দল ক্যাম্প করেছে। এদের লক্ষ্য ওই ক্যাম্প আক্রমণ। কোম্পানি কমাণ্ডার এনায়েত। ও সবাইকে বলে, 'হাতিয়ার ছাড়ে যারা বাংলার শত্রু তারা।' একই সঙ্গে ও বলে, সাহসের সঙ্গে অস্ত্র চালাবে, যেন একজন শত্রুও রেহাই না পায়।

অমল বলে, এনায়েত ভাই ট্রেনিং নিয়ে আমরা কেউই অস্ত্র ছাড়বো না।

নঈম বিরক্ত হয়ে বলে, আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখবেন। আমরা কেউই পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করবো না।

না, আমি তোমাদের সেটা বলিনি।

আমি জানি আপনি আমাদের এভাবে উৎসাহিত করেন। তবে এটাও ঠিক আমাদের যতোক্ষণ জীবন আছে আমরা ততোক্ষণ লড়বো।

যমুনাপ্রসাদ একথা বললে এনায়েত ওর দিকে তাকিয়ে বলে, যুদ্ধের কৌশলই এই। সহযোদ্ধাদের উদ্দীপিত রাখা। যেহেতু আমাদের সামনাসামনি যুদ্ধ করার মতো শক্তি এখনো তেমন নেই, তাই আমরা শুরুতে লুকিয়ে থেকে ওদের আক্রমণ করবো। আমাদের এখানকার পরিকল্পনা এই যে আমরা প্রতি রাতে নাজিপুরের দিকে যাবো। রাস্তার পাশে সুবিধামতো জায়গায় অবস্থান নেবো। পাকিস্তান আর্মির টহলদার বাহিনী এগিয়ে এলে আমরা অতর্কিতে ওদের আক্রমণ করে হত্যা করবো। এজন্য আমাদের ধৈর্যের প্রয়োজন। অধৈর্য হলে চলবে না। সবসময় আমরা টহলদার বাহিনীকে পাবো কিংবা আক্রমণ করতে পারবো এমনটি নাও ঘটতে পারে। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছো?

ওরা সমস্বরে বলে, হ্যাঁ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হলো লাগাতার এ্যামবুশ। বেশ কয়েকদিন সফল অপারেশন হলো। শত্রুদের বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হলো। কিন্তু সেটা কয়েকটি রাত মাত্র। এরপর শত্রু সাবধান হয়ে গেলো। তখন টহল দিতে দু'চার জন আর বের হয় না। দল বেঁধে আসে। পনেরো থেকে কুড়ি জন। সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা বড় দল আক্রমণ করতে পারে না। দু'চার রাত বসে বসেই কাটাতে হলো। ওদিকে এরা দুর্গাপুর আর কমলাকান্দার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে পাক-আর্মি ওদিকেও আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

ক্যাম্পে ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। নঈম বলে, এনায়েত ভাই এভাবে ঘাপটি মেরে তো অকারণে বসে থাকা যায় না।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আমাদের কৌশল বদলাতে হবে।

অমল জোরের সঙ্গে বলে, আমরা সরাসরি পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করি না কেন?

ঠিক, ঠিক। এটা আমাদেরও সিদ্ধান্ত।

ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

তাই হবে। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

এনায়েত দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করে।

ছেলেরা পরদিন মহা উৎসাহে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করে নেয়। যার ভাগে যা গোলাবারুদ পড়েছে তা গুণে ব্যাগে ভরে। রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে ওরা নাজিপুর রেঞ্জের মধ্যে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করে। তিন দিক থেকে ওরা পাকবাহিনীর ক্যাম্প ঘিরে রাখে। রাত আটটায় শুরু হয় আক্রমণ। আকাশে হাওয়াই বাজির ফুলকির সঙ্গে ঘরে ফেরা পাখিদের চিৎকার। দুচার মিনিটের মধ্যে শত্রু শিবির থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। প্রথমে এলোমেলো, এলোপাতাড়ি গোলাগুলি। কারণ ওরা অনুমান নির্ভর করে ছুঁড়ছে। আর মুক্তিবাহিনী লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে গুলি চালাচ্ছে।

অজেয়র কান ঝি ঝি করছে। ওর মনে হয় এই প্রবল শব্দের মধ্যে ও বুঝি বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। ওর মাথাটা অবশ লাগে। পাশেই অমল। ওর হাত চেপে ধরে বলে, অমল

আমার খুব খারাপ লাগছে।

অমল ধমকে ওঠে, চুপ করো। সাহস রাখো।

সারা রাত গোলাগুলি চললো। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাক-বাহিনীর আক্রমণের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। ওদের ছোট অস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলো ভারি অস্ত্র। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তেড়ে আসছে। এদের কাছে ভারি অস্ত্র নেই। নিরুপায় হয়ে যে যেভাবে পারছে আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সাংমা একটি বড় গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে অবস্থান নেয়। ওর পেছনে আরো কয়েকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ওরা ঠিকমতো অবস্থানও নিতে পারেনি। উড়ে আসে সিক্স ইঞ্চ মর্টার, থ্রি ইঞ্চ মর্টারের গুলির তোড়। হঠাৎ ওরা তাকিয়ে দেখে কান্ড থেকে গাছের উপরের অংশ নেই। একদম উড়ে গেছে। এভাবে চারদিক থেকে গাছ ভাঙার ফলে ডাল ও পাতায় ভরে যায় এলাকা। বেলা বাড়ছে। দশটা হয়ে গেছে। এনায়েত ওয়ারলেসে রিট্রিট করার জন্য বারবার বলছে। সাংমার মনে হয়, এসেছি একসাথে, এখন যে যার মতো করে জীবন বাঁচাতে সরে পড়ছে। ওরা তিনজন কোথায় ও তা জানে না। ওর সঙ্গে যারা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ছিলো তারা কেউ কেউ গুলি খেয়েছে। এবং একই সঙ্গে গাছের মোটা ডালের নিচে চাপা পড়েছে। ওই ডাল সরিয়ে ওদের বের করা সম্ভব নয়। সাংমা দ্রুত সরতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে একটি ডোবায় নেমে পড়ে। ভাবে, নাক ভাসিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ ডুবে থাকা সম্ভব হলো না। ডোবার নোংরা পানিতে গা চুলকাতে শুরু করেছে। উরুতে জোঁক কামড়ে ধরেছে। সবচেয়ে বড় কথা এখানে বেশিক্ষণ থাকাও নিরাপদ নয়। পাক-বাহিনী আহত এবং নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে বেরুবে। ফাঁকা মাঠে ওদের ছুটোছুটি এবং গালাগালের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাংমা পানি থেকে উঠে ক্রল করে এগুতে থাকে। খানিকটা এগুনোর পরই শুনতে পায় একজনের ডাক, অজেয় আমরা জন্য দাঁড়াও। প্রথমে চমকে উঠে পরে স্থির হয়ে তাকাতেই দেখে সুরেশ স্কু পড়ে আছে। হ্যান্ড গ্রেনেডের আঘাতে পা ক্ষত-বিক্ষত। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। সুরেশ স্কু ব্যাপটিস্ট ইউনিয়নের শিক্ষক। করুণ কণ্ঠে বললো, আমাকে নিয়ে চলো ভাই।

ও দ্রুত সুরশ স্কুকে কাঁধে তুলে নেয়। পাকবাহিনীর কেউ এদিকে আসার আগেই পালাতে হবে। এক ফাঁকে ও সুরেশকে জিজ্ঞেস করে, সুরেশদা অমল, নঈম, যমুনাপ্রসাদকে দেখেছেন?

সুরেশ কাঁতরানির ফাঁকে বলে, মনে হলো ওদের একজন আহত হয়েছে। কে বলতে পারবো না। মুখটা দেখতে পাইনি।

সাংমা আশেপাশে তাকাতে পারে না। ঘাড়ে একজন মানুষ নিয়ে আশেপাশে তাকানো যায় না। এক সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলো ও ঘণ্টা দেড়েক পথ হেঁটে মাইল পাঁচেক চলে এসেছে। সামনেই মইষখানা গ্রাম। জায়গাটা ওর চেনা। দু'একবার এসেছিলো। আওয়ামী লীগের অফিস দেখে ওখানে ঢুকে পড়ে। কর্মীরা ধরাধরি করে সুরেশকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়। সাংমার ক্লান্ত কণ্ঠ, আমরা সারারাত নাজিপুরে যুদ্ধ করেছি। সকালে টিকতে না পেরে পিছু হটে এসেছি। আমরা রাত থেকে কিছু খাইনি। আগে আমাদের কিছু খেতে দিন।

আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছুটোছুটি করে রুটি আর গরম দুধ জোগাড় করে আনে। খেয়ে ওদের মনে হয় ধড়ে প্রাণ ফিরে এসেছে। সুরেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়। ওর জামাকাপড় রক্তে মাখামাখি। কোথাও জমাট বেঁধে গেছে। নড়াচড়া করলে সেই জমাট রক্তে রেখা ফুটে ওঠে।

সাংমা কর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলে, সুরেশদাকে তো আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে হবে। আমার তো ওকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ নেই। কি করি বলুন তো?

আপনার কিছু করতে হবে না। আপানি বিশ্রাম নিন। আমরা সব করবো।

ওরা নতুন জামা-লুঙ্গি কিনে নিয়ে এলো। কম্বল আর তোষক জোগাড় করে আনলো। সুরেশের রক্তমাখা জামা খুলে নতুন জামা-লুঙ্গি পরিয়ে দিলো। ডেটলে ভিজিয়ে তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে দিলো। এর বেশি কিছু ওদের আর করার নেই। এরপর কাঠ দিয়ে স্ট্রেচারের মতো একটা কিছু তৈরি করে সেটার ওপর তোষক বিছিয়ে সুরেশকে শুইয়ে দিলো। অক্টোবরের হালকা শীত। কম্বল দিয়ে শরীরটা ঢেকে দিলে ও একজনের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, ভাই তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারবো না।

আঁতকে ওঠে একজন, ঋণ? কার ঋণ? পুরো দেশ আপনাদের কাছে ঋণী।

সুরেশের চোখ জলে ভরে যায়।

আমার জন্য প্রার্থনা করো ভাই।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দোয়া চাই আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।

কর্মীদের চোখেও পানি।

দেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে আমার এই হারানো পায়ের জন্য কোনো দুঃখ থাকবে না। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন ভাই।

অনেকে বিদায় দেয়। অনেকে চোখের পানি মোছে। কর্মীরা সুরেশের খাটিয়া নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে ওকে বেংচাকুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পৌছে দেয়। ক্যাম্পে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন চৌহান সুরেশ স্কুকে খুঁটিয়ে দেখে। মুখ থমথম করে তার। মেডিক্যাল অফিসার ওর সাধ্যমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বলে, স্যার ওকে জরুরি ভিত্তিতে তুরায় পাঠিয়ে দিন।

ক্যাপ্টেন চৌহান সুরেশকে তুরায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে অন্যদের সামনে রাগে ফেটে পড়ে গালাগাল করতে থাকে।

কেন তোমরা আহত বা নিহতদের ফ্রন্টে রেখে পালিয়ে এসেছো? কেন? বাস্টার্ড। তোমরা এই পঁচিশ জন এক্ষুণি ফ্রন্টে ফিরে যাও। তন্নতন্ন করে খুঁজে নিয়ে এসো আহত এবং নিহতদের। একজনও যেন খোলা আকাশের নিচে অযত্ন অবহেলায় পড়ে না থাকে। তোমাদের অবহেলা আমি একটুও সহ্য করবো না। যাও।

মাঝারী ধরনের দলটি চলে গেলো। সাংমা কম্বলের নিচে শুয়ে আছে। ওর শরীরে অসহ্য ব্যথা। বমি বমি ভাব। কিছু খেতে পারে না। কেবলই ছিন্নভিন্ন রক্তে-মাংসে মাখামাখি সুরেশের পা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুরেশ তুরায় যাবার সময় ওকে বলেছিলো, তোমার কথা আমি জীবনেও ভুলবো না অজেয় সাংমা।

এসব কথা থাক। আপনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন।

সুরেশ ক্লান্ত দুর্বল কণ্ঠে বলে, যদি বেঁচে থাকি দেখা হবে।

সাংমা মাথা নাড়ে। কিন্তু বুক মোচড়ায়। ভয় হয়। সুরেশ কী ফিরে আসতে পারবে? আমিই বা কি বেঁচে থাকতে পারবো? ও কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলায়। ফ্রন্টের ভয়াবহতা কিছুতেই চোখ থেকে সরাতে পারে না। এবং পারে না বলেই চোখ বুজতেও পারে না। কষ্ট যে কোথায় সেটা বুঝতে পারে না সাংমা। কেবলই মনে হয়

সুরেশ স্কু বেঁচে থাকলেও গারো ব্যাপটিস্ট ইউনিয়নে গেলে শুনতে হবে ওর ক্র্যাচের ঠকঠক শব্দ। সুরেশ আর স্বাভাবিক পা ফিরে পাবে না। ও নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

পরদিন যারা আহত ও নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে গিয়েছিলো তারা ফিরে এলো খালি হাতে। একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ সাত জন মুক্তিযোদ্ধা নিখোঁজ। সাংমা খোঁজ করে জেনেছে নিখোঁজের দলে অমল, নঈম এবং যমুনাপ্রসাদও আছে। ক্যাম্পে সবার মুখ থমথম করছে। সবাই বুঝে গেছে যে ওরা পাক-বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে। নইলে ওদের লাশ তো পাওয়া যেতো।

এর মধ্যে আর একটি দিন পার হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন চৌহান বেশ কয়েকজন ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে দেন ক্যাম্পে। সেই সঙ্গে কোম্পানিকে দেয়া হয় ভারি অস্ত্রশস্ত্র। ক্যাপ্টেন চৌহান বন্দী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, বন্দী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। আজ রাতেই আক্রমণ করা হবে। শেষ শত্রু নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালাবে। মনে রাখবে কিছুতেই পিছু হটা চলবে না।

পরে কোম্পানি কমান্ডার সবাইকে নিয়ে বসে। রণকৌশল ঠিক করা হবে। কমান্ডার বলে, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে ওদের গানারদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা। এটা করতে পারলে ওদের ভারি অস্ত্রগুলো তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে যাবে। তোমরা মনে রাখবে আমরা প্রথমেই আমাদের ভারি অস্ত্রের উপস্থিতি ওদের জানতে দেবো না। বিচ্ছিন্নভাবে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন যোদ্ধা পূর্বদিকে এগিয়ে যাবে এবং চেষ্টা করবে ওদের ভারি অস্ত্রগুলোর উপর হামলা চালিয়ে ওদের বিব্রত করে তুলতে।

আর একটি কৌশল হলো এ সময়ে যতো বেশি সংখ্যক পারা যায় হ্যান্ড গ্রেনেড খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে ওদের ক্যাম্পে ছুঁড়তে হবে। এর ফলে ছোট-বড় গর্ত তৈরি হবে। ফলে ওদের চলাচলের অসুবিধা হবে এবং খুব সহজে ভারি অস্ত্রগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে পারবে না। তোমরা মনে রাখবে পুরো ব্যাপারটা ঘটাতে হবে মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে। তারপর তোমরা ঠিক দশ মিনিট সময় পাবে নিজেদের অবস্থান বদল করে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার জন্য।

আমাদের প্রথম আক্রমণ হবার ঠিক দশ মিনিট পর দ্বিতীয় আক্রমণ আসবে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এই দলটিকে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। যতো আঘাত আসুক না কেন মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। এ সময়ে যদি শত্রুপক্ষ আমাদের ভারি অস্ত্রগুলোর খবর জেনে যায় তো ক্ষতি নেই। আমরা লাভবানও হতে পারি। ওদের মনোবল ধ্বসে যেতে পারে।

তোমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম আক্রমণকারী দলকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। শত্রুরা যেন তোমাদের পরিকল্পনা টের না পায় কিংবা তোমাদের ঠেকিয়ে না দেয়।

সবসময়ের মতো আমরা রাতেই আক্রমণ করবো। রাতের বেলা আমাদের জন্য সুবিধা। কারণ এ সময়ে আমরা যুদ্ধ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি। আর পাকবাহিনী রাতের বেলা হতচকিত থাকে। আমরা টার্গেট লক্ষ্য করে গোলবর্ষণ করতে পারি। ওরা ছোঁড়ে এলোমেলো। অন্ধকারে ওরা কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে না।

কমান্ডারের ব্রিফিংয়ের পর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ওরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে।

প্রথম দলটি সন্ধ্যা নাগাদ বেরিয়ে যায়। ওদের প্রস্তুতির জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন। কেননা নিশ্চিত হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সরে যাওয়ার পথ খোলা রেখে ওদের হামলা চালাতে হবে।

অজেয় সাংমা দ্বিতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দল আক্রমণ করার পর শুরু হবে ওদের দায়িত্ব পালন। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। ওদের প্রথম কাজ স্পটে গিয়ে নিজেদের খানিকক্ষণের জন্য লুকিয়ে রাখা। এ সময়ে দলের অন্যরা ভারি অস্ত্রগুলোর খণ্ডিত অংশ জোড়া লাগাবে। তারপর অপেক্ষা করবে। ভয়াবহ অপেক্ষা। যেন প্রতিটি মুহূর্ত পাষাণের মতো ভারি। সময় স্তব্ধ করে রাখে।

নির্দেশ দেওয়া আছে প্রথম দল রাত বারোটার আগে আক্রমণ করবে না। কারণ এ সময়টাই সুবিধাজনক। কেননা এসময় পাকবাহিনীর সৈনিকরা বিশ্রাম করবে। একদম ঘুমিয়ে না পড়লেও ওরা তেমনভাবে সতর্ক থাকবে না। খানিকটা শিথিলতা বিরাজ করবে ক্যাম্পজুড়ে।

রাত এগারোটা। সবাই পজিশন নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে মেঘ। তাই চাঁদের আলো স্পষ্ট নয়। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। তাই মাটি ভেজা। মনে হয় বাতাসে জলের কণা লেগে আছে। বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হালকা পরশ। সাংমার শীত শীত লাগছে। অন্যদেরও। সবাই অপেক্ষার সময়টা গুটিয়ে বসে আছে। গায়ে গা লাগিয়ে। ঘন হয়ে। ওরা যেখানে বসে আছে তার আধা-মাইলের মধ্যে পাকবাহিনীর ক্যাম্প। ক্যাম্পের সামনে দু'টো হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। মাঝেমধ্যে কেউ বাতি দু'টোর সামনে দিয়ে হাঁটলে একটু আড়াল পড়ে। জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যায়। সরে গেলে আলো ফুটে ওঠে। ওরা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সাংমা ভাবে কি নিঃশব্দ প্রতীক্ষা ওদের। এতোগুলো ছেলে কেউ টুঁ শব্দটি করে না। কি আশ্চর্য শৃঙ্খলা।

সুঁচালো টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখে কেউ কেউ। ফিসফিস করে বলে, বারোটা বেজে গেছে। ওরা এতোক্ষণ গুটিয়ে বসেছিলো। এবার সোজা হয়ে যায়। স্নায়ু টানটান হয়ে গেছে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় ওরা নিশ্বাস নিতে ভুলে যায়। সাংমার মনে হয় ও দেখতে পাচ্ছে যে প্রথম দলটি ক্রল করে ক্যাম্পের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছে। এই বুঝি ফাটলো হ্যান্ড গ্রেনেড। কিন্তু না কোনো শব্দ নেই। একটি বিকট শব্দের জন্য কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সময় স্তব্ধ হয়ে আছে। সাংমা ধরেই নেয় সময়ের সামনে ওদের অনন্ত প্রতীক্ষার দেয়াল।

একসময় দেয়াল সরে। তখন রাত প্রায় তিনটে। বুম! বুম! ...। কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড ফাটলো। একই সঙ্গে গর্জে ওঠে রাইফেল আর মেশিনগান। ক্যাম্পের ভেতর চেঁচামেচি, ছুটোছুটি। আর্তনাদ। হ্যাজাক লাইট দু'টো উল্টে পড়ে গেছে। একটি তাঁবুতে আগুন ধরে গেছে। জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে।

আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম দলটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের অপারেশন শেষ করে। ওরা কভারিং ফায়ার দিয়ে সরে যাচ্ছে। ততোক্ষণে পাকবাহিনী ফায়ার শুরু করেছে। প্রথম দলটিকে অনুসরণ করে ছুটছে ওদের গোলাগুলি। দ্বিতীয় দলের মনে হয় দশ মিনিট অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। পাক আর্মি মরীয়া হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় দলটি আট মিনিটের মাথায় ফায়ার ওপেন করে। কারণ প্রথম দলটিকে রক্ষা করতে হলে আর দেরি করা উচিত নয়।

শত্রুপক্ষ মুহূর্তের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ওদের গুলিবর্ষণ থেমে যায়। অন্যদিক থেকে আর

একটি আক্রমণ আসতে পারে এটা হয়তো ওরা ভাবতেও পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুপক্ষের এই হতবুদ্ধি অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনবরত গুলি করতে থাকে এবং ক্রল করে এগিয়ে যায়। যদিও ওরা জানে শত্রুপক্ষের এই চুপ করে থাকা সাময়িক। হয়তো ওরা কোনো নতুন পরিকল্পনা করছে। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সাংমার বুক খাঁ খাঁ করে। ভয় হয় ওর। যদি শত্রুশিবিরে গিয়ে দেখতে পায় অমল, নঈম ও যমুনাপ্রসাদ ...। না ও ভাবতে চায় না। নিজের অস্ত্র আঁকড়ে ধরে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ও বুঝতে পারে প্রথম দলটি দূরে সরে যাচ্ছে। খানিকটা ঘুর পথে এসে ওরা দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হবে।

দীর্ঘ দু'ঘন্টা গোলা বর্ষণের পর পাকবাহিনীর আক্রমণের জোর কমে এলো। সাংমা স্বস্তিবোধ করতে থাকে। ফ্রন্টে বসে ও কুমারী উষার অনাবৃত আবির্ভাব অবলোকন করে। তখুনি শত্রুপক্ষ কভারিং ফায়ার দিতে শুরু করলে খোলা চরাচরে দিনের প্রথম আলো ওর চোখে অপরূপ মায়াবী হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে, ঈশ্বর এই আলো স্তব্ধ করে রাখো। থেমে থাকুক সময়ের ঘড়ি। ওর পাশে উপুড় হয়ে থাকা সমর বলে, শুনছো কভারিং ফায়ার দিচ্ছে। মনে হয় ওর পালাবে।

সাংমা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমারও তাই মনে হয়। ওরা ভাগার তালে আছে। সেটাই ওদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অন্যপাশ থেকে দীপক বলে, আমিও বলি হয় মরো, নয় তো তোমাদের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিক খোলা আছে। জীবন বাঁচাতে চাইলে কেটে পড়ো।

আস্তে আস্তে ওদের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ থেমে আসতে থাকে। ছয়টার দিকে পুরোপুরি থেমে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করে। কেন ওরা চুপ করে আছে? অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তো? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কমান্ডার তিন-চার জনকে শত্রুর ক্যাম্পের দিকে পাঠায়। বলে, তোমরা যতোটা সম্ভব কাছে গিয়ে দেখো এসো যে সত্যি ওরা চলে গেছে কিনা।

ছেলেরা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়।

সাংমা একটা কলাগাছের নিচে শুয়ে থাকে। সারারাতের উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে। এখন ক্লান্ত। সারা রাত খোলা আকাশের নিচে থাকার ফলে মনে হয় ঘাসের ওপরে নয়, শিশির জমে আছে ওর শরীরে। শীতল অনুভব ওর ক্লান্তিকে প্রগাঢ় করে। হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখে ডান দিকে থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে একজন রাজাকার। ওর হাতে স্টেনগান। কোনো কিছু ভাবার অবকাশ নেই। রাইফেলের ট্রিগারে টান দেয় ও। তার আগেই রাজাকারটির স্টেনগানের নল ওকে তাক করে। সেই মুহূর্তে রাইফেলের বুলেট ফুটো করে দেয় ওর কপাল। খুলি ফেটে যাওয়ার শব্দ হয়। সাংমার মনে হয় ঢলে পড়ার আগে পেশীতে টান ধরার ফলেই ওর আঙুল বসে যায় স্টেনগানের ট্রিগারে। গুলি সাংমার গায়ে লাগে না। সেটা কলাগাছের গোড়ার দিক কেটে বেরিয়ে গেলে গাছটি ভেঙে পড়ে ওর পিঠের ওপর। কঁকিয়ে উঠে দ্রুতহাতে গাছটা সরিয়ে ফেলে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় রাজকারটির কাছে। ঘিলু আর রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে ঘাসের ওপর। মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে আছে। চেহারা বোঝার উপায় নেই। সাংমার মাথা ঘুরে ওঠে। এতো কাছ থেকে একজনকে হত্যা করার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম।

তখন আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করে মুক্তিযোদ্ধারা, ভেগেছে, ওরা ভেগেছে—জয়

বাংলা—।

শত্রুপক্ষের শিবির থেকে ছেলেদের গগনবিদারী চিৎকার শুনে দূরে অপেক্ষমান বাকিরা লাফিয়ে উঠে ছুটে যায়। সাংমা খানিকটুকু গিয়ে ফিরে এসে রাজাকারটাকে একটা লাথি দিয়ে আবার দৌড়াতে থাকে। অমল, নঈম আর যমুনাপ্রসাদের কথা খুব মনে পড়ছে। কিভাবে ওরা ধরা পড়েছে সেটা ওর জানার বাইরে থেকেই গেলো।

ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে ওরা দেখতে পায় আগুন তখনো নেভেনি। জায়গায় জায়গায় জ্বলছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে পাকসেনা ও রাজকারদের লাশ। পড়ে থাকা লাশ ডিঙিয়ে ওরা নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও ওদের পাওয়া যায় না— জীবিত অথবা মৃত। ওদের ভীষণ মন খারাপ। সাতটার মতো বাজে। সাংমার মনে হয় সহযোদ্ধাদের ছাড়াই কি ফিরে যেতে হবে? এমন জয়ের মুহূর্তে এমন অসম্ভব কাজটি কিভাবে সম্ভব? ক্যাম্পের ধ্বংসস্তূপের মাঝে ওরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে একজন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, পাওয়া গেছে, ওদের পাওয়া গেছে।

কোথায়? বলো কোথায়?

এসো আমার সঙ্গে।

ওর পিছে পিছে ওরা ছুটতে থাকে। ক্যাম্প থেকে আধা মাইল দক্ষিণে। জায়গাটা নিরিবিলি। ছোট-বড় গাছে পরিপূর্ণ। ছায়াছন্ন, স্নিগ্ধ। কিন্তু ছুটে আসার পর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় কেউ কেউ। এলাকা জুড়ে নারকীয় বীভৎসতা।

সাংমা প্রথমে দেখতে পায় অমলকে। মাটি থেকে হাতখানেক উঁচুতে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। নগ্ন। চুলের ওপর একগুচ্ছ পাতা লুটিয়ে আছে। গাছটি ছোট। অমলের শরীর ক্ষত-বিক্ষত।

সাতটি লাশ পড়ে আছে এলাকায়। সাতজনই নিখোঁজ ছিলো। নঈমের লাশ চিৎ করা। বেয়নেটের সুতীক্ষ্ম খোঁচায় উঠিয়ে নেয়া হয়েছে চোখ। ওর পাশে যমুনাপ্রসাদ। ওরও চোখ উপড়ানো। নাক কাটা। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফালাফালা করে কেটে লবণ ঠেসে দেয়া হয়েছে দুজনেরই।

বাকিদের কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কারো মুখ থ্যাঁতলানো। নগ্ন শরীরে অমানুষিক নির্যাতনের চিহ্ন। মাছি ছেঁকে ধরেছে ওদের। ভনভন শব্দে গুলিয়ে ওঠে সাংমার শরীর। ও পিছিয়ে এসে একটি বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে না এখনই কি পড়ে যাওয়ার মুহূর্ত কিনা!

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে ক্যাপ্টেন চৌহান। এই নারকীয় বীভৎসতা দেখে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত। গলা চড়িয়ে বলছেন, তোমরা দেখো বর্বরদের নির্মমতা। শেখো মানুষ কতোটা নিচে নামলে তাকে পশু বলা যায়। মনে রাখবে তোমাদের সবাইকে এমন নির্মমতার স্বীকার হতে হবে, যদি ধরা পড়ো, যদি ওদের সমুচিত শিক্ষা দিতে না পারো। তোমরা কঠিন হাতে অস্ত্র তুলে নাও। আমরা আমাদের ভাইদের হত্যার সমুচিত জবাব দেবো। যদি আমাদের একজন মারা যায় তবে ওদের পঁচিশ জনকে আমরা মারবো।...

ক্যাপ্টেন চৌহান আরো কতো কিছু বলে যায়। সাংমার মনে হয় ও আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। শোনার মতো আর কোনো অবস্থা ওর নেই। ও দু'হাতে গাছের কান্ড জড়িয়ে ধরে।

লোকটি এসে দাঁড়ায় ওর পাশে।

অজেয়?

তুমি যাও এখন। আমি কথা বলবো না ।

তুমি কাঁদছো কেন?

আমি কাঁদছি না।

তাহলে আমার দিকে তাকাও।

সাংমা এক ঝটকায় ওর দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, কে বলেছে আমি কাঁদছি? আমি কাঁদছি না।

এটা যুদ্ধের সময় অজেয়। শক্ত হও।

উপদেশ দিও না।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে সাংমা এক টুকরো ইট কুড়িয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারতে গেলে দেখে লোকটি নেই।

ওর সামনে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভিত একটি বধ্যভূমি। বাতাসে পচা মাংসের ঘ্রাণ। কালো কিংবা নীল বড় বড় মাছির ভনভন শব্দ। ক্যাপ্টেন চৌহান তখনো অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন যোদ্ধাদের।

সাংমা স্তব্ধ হয়ে থাকে। কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো ও জানে না। কোম্পানি কমান্ডার এনায়েত এসে ওর হাত ধরে, এসো অজেয়। আমাদের যেতে হবে।

সাংমা বোকার মতো বলে, অমল, নঈম, যমুনাপ্রসাদ যাবে না?

যুদ্ধের সময়ে এমন অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। অপরিচিত জন আপন হয়ে যায়। সবাই ঘরে ফেরে না অজেয়। নাও, তোমার রাইফেল নাও।

রাইফেল? মুহূর্তে ওর চেতনা ফিরে আসে। ও দু'হাতে রাইফেলটা বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর মাথায় ঠেকায়।

বিড়বিড় করে বলে যুদ্ধ, যুদ্ধ।

১৭

মেনাজ মাঠে যায়। দিনমজুরি খাটে।

সকিনা ঘরে থাকে। একবেলা ভাত রান্না করে তিন বেলা খায়।

ছেলেমেয়েগুলো আদাড়ে-বাদাড়ে ঘোরে।

মেহেরুণ বলে, এমন করে টোনাটুনির মতো সংসার করলে চলবে?

সকিনা করুণ চোখে তাকায়, হামার বেণু? বেণু কনে? হামার বেণুক আনা দ্যান?

মেহেরুণ ওর শুকনো চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দেয়। বলে, মাথা ঠাণ্ডা করো।

সকিনা কথা বলে না। ওর কথা ফুরিয়ে গেছে। সারাদিন কাজ শেষে ক্লান্ত মেনাজ বাড়ি ফেরে। সকিনার করুণ চোখের দিকে তাকালে বুঝতে পারে ও কি প্রশ্ন করতে চায়। তখন

খেঁকিয়ে বলে, তুমার বেণু মরছে বাহে। মরছে। আর আসবি না। হামাক ভাত দেও।

সকিনা পুতুলের মতো রান্নাঘরে গিয়ে সানকি বোঝাই ভাত বাড়ে।

এভাবে মাসদুয়েক কোদালকাঠিতে কাটিয়ে ওরা পোড়া-ভিটায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। পোড়াঘর আর বেণু ওদের রাতদিন তাড়া করে ফেরে। পরের ভিটেয় দিন কাটাতে ওদের আর ভালোলাগে না। মেহেরুণের ঢেঁকিঘরে শুয়ে অনেকরাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করে। ভোলা হয় না। বুঝতে পারে দুজনের হাত দুঃখের বোঝায় ক্লান্ত। মেনাজ পরিবার অবর্ণনীয় দুঃখের দিনরাত কাটায়—আর নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে জয়বাংলার দেশ হতে আর কতোদিন বাকি? ওরা ভিটে দিয়েছে, মেয়ে দিয়েছে, আর কি দিতে হবে ওদের? এইসব দুঃখের দিনরাত কি যুদ্ধের জন্য দেওয়া নয়? এ গাঁয়ের কাছেই মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। রাজাকারের উৎপাত বেড়েছে। ওরা কাছের লোক, ওরা চেনে বেশি। ঘরে ঢুকে যায়, হাঁড়িরখবর টেনে বের করে, কথায় কথায় ক্যাম্পে বেঁধে নিয়ে যায়। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যেতে ওদের একটুও খারাপ লাগে না। এই লোকগুলোকে মেনাজের ভয় বেশি। ওর মনে হয় যুদ্ধে চলে যেতে, নইলে কিছু অস্ত্র পেলে শুধু এই রাজাকারদের বিরুদ্ধে ও গাঁয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু ও কিছু পারে না। ওকে পরিবারের কথা ভাবতে হয়। এ গাঁয়ের স্থানীয় লোকজন দূরে সরে যাবার চিন্তা করছে। মেনাজ পরিবার কোথায় যাবে? যুদ্ধ কোথায় নেই। যুদ্ধ চারদিকে। যুদ্ধকে এড়াতে হলে ভারতে চলে যাওয়াই একমাত্র ভরসা। কিন্তু ওরা ভারতে যেতে পারবে না— বেণুকে রেখে দূরে কোথাও যাওয়া কি সম্ভব? তাই ওরা চারদিকের যুদ্ধের মধ্যেই থেকে যেতে চায়। সকিনা একদিন চুপচুপ করে বলে, কোনদিন হামাগরে ভিট্যায় যাবেন বাহে?

ভিটায়? হামাগরে পোড়া ভিটায়?

মেনাজ অন্ধকারে কিছু দেখতে পায় না। ওর পোড়া-ভিটা চোখের সামনে জমাট অন্ধকার হয়ে থাকে। পোড়াভিটায় কি মানুষ থাকতে পারে? ওখানে হয় শেয়াল থাকবে নয়তো ওটা সাপখোপের আস্তানা হবে। সকিনা আবার তাগাদা দেয়, এ্যাতো ভ্যাবা কি হবে বাহে? বেণুতো ঐখানে ফিরা আসতে পারে? হামাগরে না প্যালে মায়াডা চারদিগ আন্ধার দেখবে না?

মেনাজের হো-হো করে হাসতে ইচ্ছে করে। মেয়েটার জীবনে অন্ধকারের আর বাকি রইলো কি? কিন্তু ও হাসতে পারে না—ও নিজের দুঃখ হাসির মধ্যে প্রকাশ করতে চায় না। ও ভাবে, হাসির মধ্যে দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বোকা লোকেরা। দুঃখকে দুঃখের ভেতর রাখলেই সেটা উপলব্ধির বিষয় হয়, নইলে সেটা গভীর বোধের ভেতর থেকে ছিটকে পড়ে, মিইয়ে যায়। মেনাজ আরো ভাবলো, আসলে ওর দুঃখ এতো বড় যে ওটা প্রকাশের কোনো ভাষাই নেই—হাসিও না, কান্নাও না।

সকিনা ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে আবার তাগাদা দেয়, কিছু কহ না ক্যানহে? কি ঠিক করলা?

হ য্যামো, কালই হামাগরে পোড়া ভিটায় ফিরা য্যামো। আর থ্যাকবার ভালো লাগিচ্ছে না।

ওহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ রে, সকিনা দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে শোকরগোজারি করে।

মেনাজ দেখতে পায় অনেকদিন পর সকিনার চেহারায় আবার স্বস্তির আনন্দ ফুটে ওঠে, না কোনো গভীর আনন্দ নয়, আনন্দের সূক্ষ্মমাত্রা মাত্র। কাঁদতে কাঁদতে যে চোখের নিচে কালি পড়ে গিয়েছে সে চোখজোড়া আবার জ্বলে উঠতে চায়। ঘরে ফেরার আনন্দ সকিনার মুখে ছড়িয়ে গেলে ওর চেহারায় দীপ্তি ফুটে ওঠে এবং তা এক ধরনের সৌন্দর্য হয়ে ওকে

মোহনীয় করে তোলে। মেনাজের মনে হয় সকিনাকে দেখতে আজ খুব ভালো লাগছে। এতো কাছে থেকেও দু'জনে যে দু'জনকে কাতোদিন দেখে না।

দু'দিন পর মেনাজ পরিবার তাদের পোড়াভিটার সামনে এসে দাঁড়ায়। পথে লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ও বলেছিলো, আপনাদেরকে কি শঙ্কর মাধবপুর পৌঁছে দিয়ে আসবো?

সকিনা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলেছিলো, না, বাহে।

কেন? লোকটি অবাক হয়ে সকিনাকে দেখে।

আসেন বাহে, বলে মেনাজ ওর হাত ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে বলে, হাপনার হাত ধল্যে শরীলে বল প্যাই।

লোকটি মৃদু হাসে। নিজেকে ছেড়ে দেয় মেনাজের কাছে। অনেকদূর আসার পর মেনাজ দেখতে পায় ওর হাতের মুঠোর কারো হাত নেই। মেহেরুণ ওকে একটা বেতের ছড়ি দিয়েছিলো সেটাকেই ও শক্ত করে ধরে রেখেছে। সামনে শত্রু পেলে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। সেই ছড়ি মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে আকস্মিকভাবে থেমে গিয়ে দেখতে পায় আধখান পুড়ে যাওয়া একটি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বেণু বসে আছে। মেনাজ পরিবারের ঠোঁট থেকে অনবরত খসতে থাকে একটি শব্দ, বেণু! ওমা বেণু! হামাগরে বেণু! বেণু রে! বেণু সোনা! বেণু বুবু! বেণু বুবু! বেণু–বে–ণু, –বে–।

সকিনা প্রথমে বেণুর কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে চাইলে ও মাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সকিনা বাধা পেয়ে বাধার মানে বুঝতে পারে না। পরক্ষণে, ওরে বেণু, তুই কোনহানে ছিলি, বলে কান্না জুড়ে দিলে ও বিরক্ত হয়ে বলে, এমন করো ক্যান মা? চুপ করো। মেয়ের এমন আকস্মিক কঠিন আচরণে সকিনা প্রথমে বাধাগ্রস্ত হয়, তারপর বিমূঢ়। নিজের বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই ভাবতে চেষ্টা করে আসলে এ অবস্থায় বেণুরই তো মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটি ঘটছে উল্টো। বেণু নির্বিকার। ভাবলেশহীন। একটা প্রস্তর! এমন আরো অনেক কিছু ভাবতে চায় সকিনা। পারে না। মেয়ের পাশেই ঘাড় গুঁজে বসে থাকে, শাড়ির আঁচল টেনে চোখ মোছে।

মেনাজ মেয়ের সামনে কুঁকড়ে থাকে। বাপ হয়ে তো ওর বিপদে রক্ষা করতে পারে নি। তাহলে ও কেমন বাপ? ও কি পুরুষ না? নাকি যুদ্ধের সময় নারী–পুরুষ সমান হয়ে যায়? যুদ্ধের সময় নারী-পুরুষ সমান হয়ে যায় এই ধারণা ওকে ভীষণ কষ্ট দেয়। মেনাজ মেয়ের দিকে তাকাতে পারে না। ও নিঃশব্দে ওর সামনে থেকে সরে যায়। দেখতে পায় বেঁচে যাওয়া চালার নিচে বেণু বেশ সুন্দর করে ঘরগেরস্থি গুছিয়ে ফেলেছে। ঝকঝকে হাঁড়িকুড়ি-লেপাপোছা ঘর–রান্নাঘরের চুলোয় আগুন, ও কি রেঁধেছে জানতে ইচ্ছে করে। বাপ হয়ে ও যদি পুরুষমানুষ না হয়ে থাকে তাহলেও তো খিদে আছে। তৃষ্ণা আছে, পেট যেমন খিদের জ্বালায় চিমসে গেছে, বুকও তেমন টলটলে পানির তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এই একমাস কোথাও ভালো করে খেতে পারে নি। কার দায় কে বহন করে? মেয়ের হাতের রান্না খাওয়ার আনন্দ দপ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়। ও বাড়ির পেছন দিকে চলে আসে। ঘাড় উঁচু করে পুড়ে যাওয়া ঘরের চাল দেখে।

ছড়িটি তখনো হাতে। কোথাও রাখার কথা মনে হয়নি। সেই লাঠি আকাশের দিকে তুলে ও বিড়বিড় করে, কুত্তারবাচ্চা। মেয়েটির সর্বনাশ দেখার জন্য বেঁচে থাকতে হবে। আমি একটা কাক–বাপ।

ভাইবোনগুলো তখনো হাঁ করে বেণুকে দেখছে। ওদের সামনে থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হালকা-পাতলা গড়নের বেণুকে দুহাতের ওপর উঠিয়ে দোলাতে দোলাতে গাড়িতে তুলেছিলো। ওরা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কিসব বলেছিলো তা ছোটরা বুঝতে পারে নি। কিন্তু ঐ লোকগুলোর হাসি ওদের ভালো লাগেনি। ওরা ওদের বেণু বু'কে দেখে—বেণু'বু কি ভালো আছে না খারাপ? বেণু ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, খিদে ল্যাগছে? ভাত খাবি? তোদের কথা হামার মনে আছলো না, তবু হামি একহাঁড়ি ভাত রাঁধলু যে ক্যান? আয়।

ছোটরা এতোক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। ওর আহ্বানে প্রাণ পেয়ে ওঠে। রেণু এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে, ক্যাংকা কেমন আছো বেণু 'বু?

ভালো।

তোমাক ওরা কোনহানে নিছিলো?

বেশি দূরে না, কাছে। দেখলু না হ্যামি বাড়িত চল্যা আসছি।

জাকু হি-হি করে হাসে, কেমুন কর‍্যা আসলা, জিপে চইড়ে? হামাক জিপে চড়াবা বেণু'বু।

বেণু অকস্মাৎ জাকুর গালে ঠাস করে চড় মারে। ও ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলে ওর হাত ধরে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে যায়। পেছনে অন্যরাও যেতে থাকে। ওদের ভাত খেতে বসার নির্দেশ দেয়, কথা বলে নয়, আঙুলের ইশারা দিয়ে। সবাই সুড়সুড় করে মাটিতে বসে পড়ে। ভাত বাড়তে বাড়তে ওর চোখ ছাপিয়ে কেবল পানি আসতে চায়— ও কিছুতেই কান্না থামাতে পারে না। ছোটরা ভাতের সানকিতে হাত রেখে ড্যাবডেবে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা ভাত মুখে ওঠাতে পারে না।

সামনে বসে কেউ কাঁদলে কি ভাত খাওয়া যায়?

রেণু মুখ নিচু করেই ডাকে, বুবু?

বেণুও মুখ নিচু করেই বলে, ভাত খ্যা।

তুমহি কি জ্যানতা হামরা যে কোনোদিন অ্যাস্যা পড়বো?

বেণু ভিজা কণ্ঠে বলে, না।

তাইলে এ্যাতো ভাত কার জন্যি র‍্যানছো?

কাক, কাকের জন্যি। কাকের খিদে প্যায়না?

এতোক্ষণে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বেণু। ছোটরাও কাঁদে। মধ্য দুপুরে বাড়িটা কান্নার বাড়ি হয়ে যায়।

ছোটরা ঘুমিয়ে গেলে বেশ রাতে বেণু বাবা ও মাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসে। ও বুঝতে পারছে যে, দু'জনের কেউই ওকে প্রশ্ন করতে পারছে না—অথচ জানার ব্যাকুলতা ওদের চোখেমুখে। ওরা কেন ওকে ভয় পাচ্ছে? ওতো ভয়ের কোনো কাজ করেনি? তাহলে একজন মানুষ এক জীবন থেকে অন্য জীবনে প্রবেশ করলে ভীতিকর হয়ে ওঠে? হায় আল্লাহ্ বাবা-মাও ওকে চিনতে পারছে না। অন্য মানুষের মতো দূরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। দেখুক। ওর কোনো ভয় নেই। ওতো শক্ত হয়ে গেছে। ও আকাশের দিকে তাকায়। বর্ষা ফুরিয়েছে, আকাশে গোল চাঁদ। এমন চাঁদনি রাতে পুঁথিপাঠের আসর বসে, নয়তো গান। আজ বেণু বাবা-মাকে নিজের জীবনের পুঁথিটা পড়ে শোনাতে শুরু করে। প্রথমেই বলে নেয়, মাগো এর শুরুও নেই, শেষও নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখি রাস্তার ধারে পড়ে আছি। চারদিকে তুমুল বৃষ্টি।

ভেসে যায় পাকা সড়ক, মাঠ, ধানক্ষেত। উঠে বসি। বৃষ্টির তোড়ে তাকাতে পারি না। সব ধোঁয়াটে হয়ে আছে। মনে হয় আমার চারদিকে সাদা পর্দা। বৃষ্টি আমাকে ধুয়ে দিচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়াই। দেখি খানিকদূরে আমার কাপড়চোপড় পড়ে আছে। আমি সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পরে ফেলি। তারপর হাঁটা শুরু করি। কোনদিকে হাঁটি বুঝতে পারি না। পড়ে যাই একসময়। জ্ঞান ফিরলে দেখি এক বাড়িতে। ওরা আমাকে ওষুধ দেয়, ভাত দেয়। বলে, বুঝিছি কি হয়েছে। সবই কপাল মা। যুদ্ধের সময় মেয়েদের এভাবেই মরণ হয়। বাড়ির বুড়ো দাদী আমাকে এসব কথা বললে আমার জ্ঞান ভালোভাবে ফিরে। আমি সব বুঝতে পারি। বোঝার কিছু বাকি থাকে না। আমার ঘোর কেটে যায়। আমি চারদিকে নতুন করে তাকাতে শিখি। বুঝে যাই আমি আর আগের বেণু নাই। আমার তোমাদের কথা মনে পড়ে। বলি, দাদী আমি বাড়ি যাবো। আমার গাঁয়ের নাম শঙ্কর মাধবপুর। ওরা আমাকে আমার গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়—ওরা তিন-চার জন বুড়ো মানুষ। তারপর একজন লোকের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে বলে, এক বাড়ি পৌঁছে দ্যান বাহে।

লোকটি বলে, ওর বাড়িতো পুড়ে গেছে। পোড়া ভিটায় ও থাকবে কি করে?

দাদী বলে, ওর তো সব পুড়ছে। বাকী আছে কি? এখন যুদ্ধ। যাও লোকটি আমার হাত ধরে বলে, আসো। আমি চলতে শুরু করি। ও আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বলে, যাও ভেতরে যাও।

আমি লোকটির দিকে তাকাই। দেখি কেউ নাই। চারদিক খাঁ খাঁ করে। আমি এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাই। দেখি তোমরা নাই। কি করি? মনে মনে ঠিক করি এখানেই থাকবো। একটা ঘর তো বেঁচে গেছে, রান্নাঘরও আছে। অসুবিধে কি? খুঁজে দেখলাম চালের গোলাটা ঠিক আছে, মটকি ভরা খেসারির ডাল আছে, তুষের হাঁড়িতে হাঁসের ডিম আছে। যদি সব ফুরিয়ে যায়, তাও আমি এখানে থাকবো, কচুঘেচু-শাকপাতা, খুদকুঁড়ো যা পাই তাই খেয়ে থাকবো। মনে মনে আশা ছিলো তোমরা যদি ফিরে আসো। আমি তো জানি তোমাদের বুকের ভেতর একটাই ডাক থাকবে, ওরে আমার বেণুরে। তোমরাতো ভিটেমাটি ছেড়ে দূরে থাকার মানুষ না। আরো একটি কারণে আমি এখানেই থাকতে চেয়েছি।

এইটুকু বলে চুপ করে থাকে বেণু।

সকিনা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আর কি কারণ মা?

বেণু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, মাখন আমাকে এখানেই থাকতে বলেছে। বলেছে, যে কোনো সময় ও আসতে পারে। মাখনের কথা মনে নাই তোমাদের? মুক্তিযোদ্ধা মাখন, গগন গাজীর ছেলে। যুদ্ধ করতে গেছে শুরুর দিকেই। ও যদি আসে। যদি লুকিয়ে থাকার দরকার হয়। যদি আহত হয়, তাহলে তো সেবা করে সারিয়ে তুলতে হবে। যুদ্ধ কদিন চলবে কে জানে?

মেনাজ চমকে তাকায় মেয়ের দিকে। বলে, তুই কি যুদ্ধ করছিস মা?

হ্যাঁ, এটাও যুদ্ধ।

এই বাস্তব ঘটনাটুকু বলে বেণু এরপর স্বপ্নের কথা বলতে থাকে। কতো বিচিত্র সে স্বপ্নের রঙ, কতো বিচিত্র তার আকার – মেনাজ আর সকিনা অবাক বিস্ময়ে শোনে। বারবারই মনে হয় এ বেণুতো ওদের বেণু নয়। বেণুর গল্প ফুরোয় না, রাত বাড়ে। একসময় বেণু নিজের থেকেই বলে, মাগো, যাও গুমাও গিয়া। বাবা যাও, নিদ পাড়ো।

এতোক্ষণে যেন ওদের বেণু কথা বললো। তাহলে এর আগে কে কথা বললো? কোন বেণুর গল্প শুনলো ওরা? ওরা যেন এক গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকেছে, বেণু একাই সে ধাঁধাটি তৈরি করেছে। সকিনা খুব সাবধানে বলে, তুই নিদ পাড়বি না মা?

পাড়বো মা, নিদ লাগলেই পাড়বো। তুমহারা যাও।

তাহলে বেণুর কি এখন ঘুম পায় না? ও কার জন্যে জেগে থাকে? ওকে প্রশ্ন করতে ওদের ভয় লাগে। ওরা বাবা-মা হয়েও মেয়ের সামনে কুঁকড়ে থাকে। ওকে প্রশ্ন করলে বেণু যদি এমন কোনো ঘটনার বর্ণনা করতে শুরু করে যেটা শুনলে ওদের আকাশ-পাতাল চড়চড়িয়ে ফেটে যাবে? তার চেয়ে থাক – নিজেদের কুঁকড়ে যাওয়া বুকটা নিজেদের মধ্যেই থাক। দু'জনে ঘুমুতে যায়। ঘুমুনোর আগে দু'জনের মনে একটি উত্তর খুব সহজে মিলে যায়। বুঝতে পাবে, বেণু মাখনের অপেক্ষা করবে। মাখন ওকে ভালোবাসার কথা বলেছে। দুজনের প্রেম হয়েছে। নইলে মাখন কেন ওকে এখানে অপেক্ষা করতে বলবে? ভালোনাবাসলে কেউ কি কারো জন্য অপেক্ষা করে? বেণু যে স্বপ্নের কথা বলেছে, তা এই ভালোবাসার স্বপ্ন। বেণুর স্বপ্ন। দেশের স্বাধীনতা এবং নীড় বাঁধার স্বপ্ন। দু'জনে ভীষণ খুশি হয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রথম মাসে আশংকা হলেও, পরের মাসের জন্য অপেক্ষা করে, তারপরের মাসও। তৃতীয় মাসে ও বুঝে যায় যে ওর আশংকা সত্যি। একদিন ভর সন্ধ্যাবেলা মাকে পুকুরপাড়ে ডেকে নিয়ে বলে, দুতিনমাস ধইরে মাসিক বন্ধ।

বন্ধ? তাহলে কি তোর গর্ভ হয়েছে?

হতি পারে।

বেণু কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখে। সতেরো বছর বয়স হবার আগেই ও বুঝে গিয়েছিলো যে কি করে গর্ভ হয়। গর্ভ হতে পারে এমন কর্মকাণ্ড ওর জীবনে ঘটে গেছে, তাহলে এখন তো বিস্মিত হবার কিছু নেই। বেণুর স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে চেঁচিয়ে ওঠে ওর মা, কি কহালি হারামজাদী?

বেণু দ্রুত মার মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে, চিল্লাও ক্যানহে? চিল্লাবানা।

সকিনা মেয়ের আচরণে থমকে যায়। ও এতো স্বাভাবিক কেন? কেন তড়পায় না? কেন অস্থির হয় না? কেন ভেঙে পড়ে না। কেন ভয়ে জড়সড় হয়ে যাচ্ছে না?

সকিনা নিজেই ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, অহন কি হবি?

বেণু আবারো স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, অঙ্গ জখম হলি তার তো চিকিৎসা থাকে। থাকে না?

অঙ্গ জখম?

হামার জরায়ু জখম হয়েছে। চিকিৎসা নাই?

চিকিৎসা?

বেণু ওর বোকা-সরল মায়ের ওপর রেগে ওঠে, হ চিকিৎসা। বুঝলা না? ফালানের ব্যবস্থা করা লাগবি। তুমি দাই বুড়ির কাছে যাও।

অহনই?

হ অহনই।

আচ্ছা য্যাই।

সকিনা অন্ধকারে পুকুরের পাড় দিয়ে চলে যায়। দাই বুড়ি গাছের শেকড়, লতাপাতা

আরো কিসব খাইয়ে গর্ভ ফেলার ব্যবস্থা জানে। তিনমাস মাত্র, এখনই সময়। সকিনা পারলে দৌড়ায়। দু'বার হোঁচট খায়। সকিনার বুক ফেটে যায়। শুধু বেণুর ভবিষ্যৎ নয়, বেণুর গর্ভ মেনাজ পরিবারের ভবিষ্যৎ। বুকটা মুচড়ে ওঠে, ভবিষ্যতের আর বাকি আছে কিছু? সকিনা অবুঝ হয়ে যায়। যে মেয়ে মিলিটারির হাত থেকে ফিরে আসে তার কি ভবিষ্যতের চিন্তা করা যায় কিনা এ ভাবনাই ওর মাথায় থাকে না। ও যুদ্ধের অতীত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দাই বুড়ির সামনে রুদ্ধশ্বাসে গর্ভ ফেলার ওষুধ চাইছে — এ ওষুধ বেণুর ভবিষ্যতের জন্য ভীষণ প্রয়োজন।

দিন যায়। দাই বুড়ির ওষুধে কোনো কাজ হয় না। বেণুর গর্ভ পড়ে না, বরং বাড়তে থাকে। বেণু একদিন আচমকা শিশুর নড়া টের পায়। ওর কেমন অস্থির লাগে। ও মা হতে যাচ্ছে। না, এক বিশাল চিৎকার ওর শরীরজুড়ে আর্তনাদ হয়ে ফেরে। একে মা হওয়া বলে না, এটা মা হওয়া নয়। ওটা পড়েনি তো কি হয়েছে? জন্মালে তো মেরে ফেলা যাবে? ওটা আর এমন কি কঠিন কাজ। ও সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষের কোনো কোনো অঙ্গ চিকিৎসায় ভালো না হলে কেটে ফেলতে হয়, ওটাকে ধরে রেখে পুরো শরীর তো পচিয়ে ফেলা যায় না। ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা গর্ভের দিকে তাকিয়ে ও নিজেকে বলে, আমিও মুক্তিযোদ্ধা। মাখন একা যোদ্ধা হবে কেন? এটাও যুদ্ধ। অবশ্যই যুদ্ধ।

রেণু শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বলে, এটা ক্যাংকা যুদ্ধ বুবু?

তোক বুঝাবার প্যারবোনা। চুপ কর‍্যা থাকে।

রেণু চুপ করে থাকে।

কিন্তু অন্য ভাইবোনগুলো ওর পেটের দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর অস্বস্তি হয়। ওর খারাপ লাগে। শুধু তখনই ওর কাঁদতে ইচ্ছে করে।

মাখনের কথা মনে পড়ে। যুদ্ধে যাবার আগের দিন মাখন ওকে পুকুরপাড়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, তুমার গলায় এই স্বর্ণলতার মালা দেলাম। ফির‍্যা আস্যা য্যান দেখবার প্যাই তুমি হামারই আছো।

ছটফটিয়ে ওঠে ও। মনে মনে বলে, হামি তুমহারই আছি। যুদ্ধে হামার অঙ্গ জখম হয়্যাছে। হামি ভালো হয়্যা য্যাবো।

মৃদুস্বরে রেণু ডাকে, বুবু?

ও চমকে তাকায় ওর দিকে। তারপর ওকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বলে, মাখনের কথা মনে পড়তিছে। তুই ভাত খা।

রেণু গপগপিয়ে দু'গ্রাস খেয়ে এক গ্রাস বেণুর মুখের সামনে ধরে, খাও।

রেণুর হাত থেকে মুখের ভেতর ভাত নেবার পর বেণুর মনে হয় ভাত আর নিচে নামাতে পারছে না। গলার কাছে কান্নার তৈরি বিশাল ভেড়িবাঁধ সবকিছু আটকে দিচ্ছে।

একদিন জাকু জিজ্ঞেস করলো, বুবু তুমহার প্যাটটা এ্যাতো ফুলা ক্যানহে। প্যাটের মধ্যে কি?

ও বললো, যুদ্ধ।

যুদ্ধ ক্যাংকা? বলের লাকান গোল?

না।

তালে কি জিপ গাড়ির লাকান? তুমি যেই জিপ গাড়িত চড়ছিলা?

ওর কথায় বেণুর রাগ হয় না। ও জাকুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কাঁদতে থাকে। ওর সঙ্গে কাঁদে মেনাজ পরিবার। কান্না থামলে জাকু জিজ্ঞেস করে, হামরা কাঁদলাম ক্যানহে? হামাকেরে কেউ তো যুদ্ধে মরে নাই।

মেনাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, মরছে।

সবার সমস্বর জিজ্ঞাসা, মরছে? কে মরছে?

হামাকেরে সুখ।

বেণু শক্ত কণ্ঠে বলে, না, হামাকেরে সুখ মরেনি। দ্যাশ স্বাধীন না হলেই হামাকেরে সুখ মরবি।

আর সুখ! মেনাজ উঠে চলে যায়।

জাকুকে জড়িয়ে ধরে বেণু বলে, হামি আর কঁ্যাদবো না। হামি কাঁদি অঙ্গ জখমের কষ্টে। দুঃখে কান্দি না।

সকিনা মেয়ের হাত চেপে ধরে রূঢ় কণ্ঠে বলে, হারামজাদী।

বেণু মায়ের মুখের ওপর কঠিন দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। সে দৃষ্টির সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকা খুব কঠিন। সকিনা উঠে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় পুকুরপাড়ে বসে থাকার সময় লোকটি ওকে ডাকে, বেণু?

তুমি?

তোকে দেখতে এসেছি। ভালো আছিস তো?

হ্যাঁ। দেখো ওই জোনাকিগুলো কি সুন্দর।

তোর কাছে বসি?

বসো। কিছু বলবে?

তোর মাখন ভালো আছে।

তুমি কি করে জানলে?

আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

আমাকে নিয়ে যাবে মাখনের কাছে?

উহুঁ, এখন তো তুই যেতে পারবি না।

পারবো, দেখো পারবো। আমি মাখনের কাছে যেতে চাই।

বোকা মেয়ে, তোর তো শরীর খারাপ।

হ্যাঁ, আমার অঙ্গ জখম হয়েছে। ওটাকে ফেলে দিয়ে আমার অঙ্গ সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। হলো না।

আমি জানি। তোর কোনো ভয় নেই। ওই শিশুটিকে আমি নিয়ে যাবো।

কি করবে?

বিদেশে কোনো বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তুই তো জানিস অনেক মানুষ আছে যারা বাচ্চা দত্তক নিতে চায়।

কিভাবে পাঠাবে?

দেশ স্বাধীন হলে নানা সংস্থা থাকবে। ওরাই ব্যবস্থা করবে। এসব নিয়ে তুই ভাবিস না। প্রসবের পরদিন আমি নিজেই হাজির হয়ে যাবো।

আমি চেয়েছিলাম প্রসবের পর এটাকে মেরে ফেলতে।

না, আমরা এগুলোকে মারবো না। যুদ্ধ শিশুরাই তো আমাদের যুদ্ধের সাক্ষী। রাজনীতি খুব খারাপ জিনিস রে বেণু। ধর এমন দিন এলো তখন হয়তো পাকিস্তানিরা বলবে আমরা কোনো যুদ্ধ করিনি। তখন এই ছেলেমেয়েরাই বলবে আমাদের দিকে তাকাও। বলো, আমরা কে?

সত্যি, এমন দিন কি হবে?

বেণু আতঙ্কে লোকটির হাত আঁকড়ে ধরে। লোকটি হা-হা করে হাসে। ওর মনে হয় পুকুরের পানিতে তরঙ্গ উঠেছে। কোলের ওপর উড়ে এসে বসে অনেকগুলো জোনাকি।

লোকটি বলে, তোকে খুব সুন্দর লাগছে বেণু।

তুমি আমার মাখনকে এনে দাও।

দেবো।

দেবে? কবে?

দেখবি মাখনকে তোর সামনে এনে দিয়ে তোকে চমকে দেবো।

উহ্, কি যে খুশি লাগছে।

বেণু তুই জোনাকির আলো দিয়ে মালা গেঁথে রাখ। মাখন এলে ওর গলায় পরিয়ে দিবি।

ঠিক বলছো। আমি তাই করবো।

বেণু খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। ও কোলের ওপর থেকে মুঠি ভরে জোনাকি তুলে আকাশে উড়িয়ে দেয়। ওগুলো জ্বলে আর নেভে। মাখন বলতো, তুমি একটা জোনাকি মেয়ে। তোমার খুশির মধ্যে আমি জোনাকির আলো দেখতে পাই।

যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে তুমি কি এখনো জোনাকির আলো দেখো মাখন? মনে পড়ে কি আমার কথা? তুমি এখন কোথায়? কোন পাহাড়ের কোলে? নাকি রাইফেলটা বুকের ওপর রেখে শুয়ে আছো গাছের নিচে? দেখছো অন্ধকার কিংবা মেঘ? আমি ভালো আছি। তুমি আসার আগেই আমার অঙ্গের ক্ষত শুকিয়ে যাবে। কিছু ভেবো না সোনার মানিক।

বেণু? মা? মেনাজের কণ্ঠ।

বাবা।

ঘরে চল। জাড় পড়িছে। ঠাণ্ডা লাগবি, আয়।

বেণু বাবার হাত ধরে ঘরে ফেরে। মা কুপিটা নিয়ে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে বেণু যেন হোঁচট খেয়ে না পড়ে।

ও তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা আর কতো দিন লাগবি দেশ স্বাধীন হতি?

মেনাজের বুক শুকিয়ে আছে। গলা ঘড়ঘড় করে। ওর কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বের হয় না।

বেণু দেখতে পায় মা উঁচু করে ধরে রেখেছে কুপিটা। কুপির শিখার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের মুখ অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। মায়ের মুখের চামড়া কুঁচকে যায় নি, রেশমের মতো মসৃণ। চোখ কোটরগত না, নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল জ্বলছে, চোয়াল ভাঙা নয়, সমান হয়ে গেছে। মায়ের মুখে কোনো ক্লান্তি নেই। রগ জেগে থাকা রোগা হাত দু'টোও শক্ত, পেশীবহুল। বেণুর মনে হয় বাবা উত্তর না দিলে কি হবে, স্বাধীনতা ওদের দোরগোড়ায়।

১৮

সেক্টর হেডকোয়ার্টার। মহেন্দ্রগঞ্জ। অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি। পাহাড় এবং সমতলের মাঝে সবুজের নদী, যে কাউকেই যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে পারে। স্রোতের বিপরীতে কিংবা অনুকূলে। যেদিকেই তাকানো যায় সবটাই দৃষ্টি নন্দন।

সেক্টর কমাণ্ডার মেজর তাহের অস্থির। উদ্বিগ্ন। অক্টোবর মাস। শীত পড়েছে। মনে হয় হাফ হাতার সোয়েটারটা যথেষ্ট নয়। আরো গরম কিছু চাই। নাকি মন খারাপ বলে শীত বেশি লাগছে। অনুভবে ওম থাকলে সেটা শারীরিক শীতলতাকে চাঙ্গা করে দিতে পারে। তাহেরের মনে হয় এখন ওর অনুভবে ওম নেই। এক ধরনের গ্লানি ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এখন দুপুর। অফিসে স্টাফদের মধ্যে শুধু আনোয়ার আছে। অন্যরা খেতে গেছে। তাহের গলফ স্টিকটা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আনোয়ার ওর ছোট ভাই। কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে ভাইজান?

তাহের একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। লাঠিটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকায়। তারপর আনোয়ারের মুখোমুখি হয়ে বলে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

মানে? কি বলছেন? এতো তাড়াতাড়ি?

ভারতীয় বাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে।

আপনি না বলেন গেরিলা যুদ্ধেই দেশ স্বাধীন করা সম্ভব। তবে একটু বেশি সময় লাগবে। ১১ নং সেক্টর দিয়েই ঢাকায় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সময়ে পৌঁছানো যাবে।

আমি এখনও তাই মনে করি। আমার এখনো ইচ্ছা ভারতীয় বাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া দেশ স্বাধীন করবো। এই কারণে আমি টাঙ্গাইলে যুদ্ধরত কাদের সিদ্দিকী, আবদুল বাতেন এবং ভালুকায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক আফসারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। তবে এটাও সত্যি ভারতের মাটিতে থেকে........ ওরাই বা কতোদিন এ বোঝা বহন করবে.....লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। যাবে কোথায়......কি দুঃসহ দুরবস্থা ওদের...... ।

থেমে থেমে অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে কথা বলে তাহের। কপাল কুঁচকে থাকে। আনোয়ার খুব মন খারাপ করে। তাহেরের অনেক স্বপ্ন। ও জানে স্বপ্ন এবং বাস্তবের অনেক তফাৎ। তবু কিছু কিছু স্বাপ্নিক মানুষ থাকে যারা নিজের মতো করে স্বপ্ন না দেখে পারে না। স্বপ্নটা ভালো কি মন্দ, কতোটা বাস্তব সম্মত, কতোটা যুক্তিযুক্ত এসব বিচার আনোয়ার করতে চায় না। ওর মনে হয় ভাইয়ের কথাগুলো বড় হয়ে থাক। একজন স্বাপ্নিক মানুষ তার জীবনদর্শনের মধ্যে এমন কতোগুলো বিষয় বিশ্লেষণ করছে যেগুলো অনেক সুদূরপ্রসারী, অনেক কন্টকময়, তবুও সেটি তার নিজস্ব। সেটা সে ভাববেই। পায়চারি থামিয়ে তাহের ওকে বলে, সন্ধ্যায় সবাইকে নিয়ে বসবো। প্রত্যেককে খবর পাঠা।

আমাদের রণকৌশল কি বদলাবে?

হ্যাঁ। তাহের ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলে।

আপনার খারাপ লাগছে ভাইজান?

আমি নতুন করে অন্যকিছু ভাবছি।

আমি যাচ্ছি।

আনোয়ার চলে যায়। তাহের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর বিছানো ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে। যে চিন্তাগুলো মাথার ভেতর পথঘাটের মতো ছড়িয়ে আছে সেগুলোকে ও ম্যাপের পথঘাটের ওপর নিয়ে আসে। পথের ওপর বিছাতে থাকে। শব্দটা ওকে পেয়ে বসে। ও বেশ আমোদ পায়। সরু পেন্সিল দিয়ে দাগাতে থাকে পথের রেখা। নিজের ভেতর সাফল্যের পথঘাট আবিষ্কারের উত্তেজনা। বুঝতে পারে এ পথে এগুলেই সেটা সম্ভব। আপন মনে শিস বাজায়। গতকাল তুরায় গিয়েছিলো, লুৎফার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। মেয়েটি বেশ বড় হয়েছে। খলখল করে হাসে। এই যুদ্ধের সময়ে বুকের কাছে শিশুর হাসি, মনে হয় এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। শব্দ করলে মেয়েটি সাড়া দেয়। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বাবা বলে ডাকলে, ঠোঁট ফুলে ওঠে। বুঝি ও নিজেও বাবা বলতে চায়। তাহের লুৎফাকে বলেছিলো, ও একদম আমার মতো হয়েছে। ওকে আমি সেনাবাহিনীতে ঢোকাবো। আমার মেয়ে হবে বাংলাদেশের প্রথম মেয়ে সৈনিক।

লুৎফা হাসতে থাকে, উঁহু তা হবে না, আমি চাই ও টিচার হবে।

না, তা হবে না। ওকে আমি মেজর জেনারেল বানাবো। ও হবে আমার গণবাহিনীর কমাণ্ডার। তাই না মামণি?

মেয়েটিকে উপরে ছুঁড়ে বুকের ভেতর লুফে নিলে ও আবার খলখল করে হাসে, যেন ভীষণ মজা। এতো আনন্দ বুঝি জীবনে আর কিছু হয় না।

ওর কয় মাস হলো লুৎফা?

সাত মাস।

সাতের মাসী হাসিখুশি।

লুৎফা তাহেরের কাণ্ড দেখে হাসতে থাকে। তাহের ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়। কি চমৎকার স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে লুৎফাকে, যেন তুরার প্রকৃতি লুটিয়ে আছে ওর চোখের তারায়, নাকের ডগায়, ঠোঁটে, চিবুকে। আশ্চর্য বিশেষ মুহূর্ত কেমন অপরূপ করে দেয় মানুষকে।

কি দেখছো?

তোমাকে।

কি আশ্চর্য, আমিও তোমাকেই দেখছি। যুদ্ধের বোঝা মাথায় রেখেও তুমি যে জলি মুডে আছো তা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে।

তাহলে কাছে এসো।

লুৎফা মনে মনে বলে, আমি তো কাছেই আছি। দূরে কোথাও যাইনি। আমাদের দিনগুলো যেন এভাবেই শেষ হয়।

তুমি কি আর এক কাপ চা খাবে?

হ্যাঁ, দাও। চা খেয়ে বিদায় হই।

আবার কবে আসবে?

তারিখ তো দিতে পারবো না। সময় পেলেই হুট করে চলে আসবো। তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?

একটুও না। সবসময় তো ব্যস্তই থাকি। মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে আসে। কতো আবদার ওদের।

জানি কিসের আবদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এইসব ভাবালুতা আমার একটুও পছন্দ না।

কি? কিসের ভাবালুতা?

ওই যে মায়ের হাতের রান্নার মতো একটুখানি রান্না চাই। বাড়ির কথা মনে হলে চোখ ছলছল করবে।

এভাবে বোল না। ওরা কি যে কষ্ট করছে। দিনের পর দিন যুব শিবিরে খেতে হচ্ছে পোকায় খাওয়া বুটের ডাল আর রুটি।

তাতে হয়েছেটা কি?

তুমি কি রেগে যাচ্ছো?

লুৎফা তুমি তো আমাকে চেনো। যারা তোমাকে এসব বলে তাদের বলে দিও স্বাধীনতা এতো সহজ নয়। তারজন্য প্রবল ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমিও তো এসবই খাই। আমার তো কোনো অভিযোগ নেই।

ওদেরও কোনো অভিযোগ নেই। ওরা এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। আমিও জানতে চাই। ওরা কখনো অভিযোগ করে কিছু বলেনি।

না, বললেই ভালো।

লুৎফা হাসতে হাসতে বলে, যেভাবে কথা বললে মনে হলো তুমি বুঝি আমারও সেক্টর কমাণ্ডার। আমি তোমার অফিসের স্টাফ।

তাহের হো-হো করে হাসে, ভাগ্যিস হওনি। আমি আবার এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট।

জানি। যাই চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

লুৎফা চলে গেলে তাহের মেয়ের দিকে তাকায়। ও বিছানায়। কখন যে ঘুমিয়ে গেছে ওরা টেরই পায়নি।

চা খেয়ে লুৎফার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ছলছল করছিলো ওর চোখ। তারপর দ্রুত হাতে চোখ মুছে বলে, যুদ্ধের সময়ে এসব ভাবালুতা একদম মানায় না।

তাহের ওকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি কণ্ঠে বলেছিলো, মানায় গো মানায়। তোমাকে শুধু মানায়।

তারপর দীর্ঘ চুমুর ভেতরে দুজনে মগ্ন হয়ে গেলে ওর মনে হয়েছিলো প্রবল এক দীর্ঘশ্বাস বয়ে গিয়েছিলো ওর কানের পাশ দিয়ে। কোথা থেকে এ দীর্ঘশ্বাস এলো ও বুঝতে পারে নি। বুঝতে চায়ওনি। একবার ভেবেছিলো, লুৎফার বুকের ওপর কান পেতে জিজ্ঞেস করে, তোমার কিসের এতো ভয়? পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়। ভাবালুতার সময় এখন নয়। দীর্ঘশ্বাস যুদ্ধের নিয়তি। ওটা পরাজিত মানুষের জন্য। ওতো পরাজিত মানুষ হবে না। ওর সামনে জয়ের দুয়ার খোলা। তবু এখন লুৎফার সজল চোখের বিষন্ন চাউনি ওকে বারবার আনমনা করে দিচ্ছে। জীবনের কিছু ক্ষুদ্র মুহূর্ত বুঝি এমন। সব বড় কিছুকে আড়াল করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ওর মন খারাপ হয়। সন্ধ্যা নামে। ফিকে হয়ে আসা দিনের আলো গাছ-গাছালির আড়ালে বিলীন। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে প্রকৃতির রূপান্তরের দৃশ্য।

সন্ধ্যায় সবাই এসে উপস্থিত হলে তাহের কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি বলে, ভারতীয় বাহিনীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আমরা স্বাধীন হয়ে যাবো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমাদের রণকৌশল সম্পর্কে কিছু নতুন পরিকল্পনা করেছি। আপনারা জানেন চিলমারি বন্দর আক্রমণ আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসে এই সেক্টরের একটি উজ্জ্বল ঘটনা। রৌমারির মুক্ত অঞ্চলে যারা যুদ্ধ করেছে সেইসব ছেলেদের মাত্র

পনেরা দিনের অনুশীলন ছিলো। এদের নিয়মিত খাবারের সরবরাহ ছিলোনা, হাত খরচের ব্যবস্থা ছিলো না। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসা অস্ত্রের উপর এদের নির্ভর করতে হতো। আপনারা এও জানেন কোনো অনুমোদিত ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে এইসব যোদ্ধারা সেক্টর কমাণ্ডারের প্রাইভেট আর্মি হিসেবে পরিচিত ছিলো। এরা যেভাবে চিলমারি বন্দর আক্রমণে দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের অতুলনীয় সাহস আমাকে বিস্মিত করেছে এবং যে নৈপুণ্যের সঙ্গে নিজেদের প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন করেছে তা যুদ্ধবিদ্যার ছেলেদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়।

এই পর্যন্ত বলে তাহের টেবিলের উপর রাখা গ্লাস থেকে পানি খায়। গলফ স্টিকটা নাড়াচাড়া করে। এটা ওর মুদ্রাদোষ। কোনো গভীর চিন্তার সময় লাঠিটা সঙ্গীর মতো কাজ করে যেন। ঘরের মধ্যে দশ–বারো জন যারা আছে তারা সবাই চুপ।

তাহের আবার বলতে শুরু করে, আমি ঠিক করেছি যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটগুলোকে পাঠাতে শুরু করবো। ওদের ওপর আমার ভীষণ আস্থা আছে। ঠিক করেছি ডিসেম্বরের আগেই পাকিস্তানি সেনা অবস্থানগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঢাকার দিকে ওদের এগোনো যাতে সম্ভব করতে পারে সে নির্দেশ সবাইকে দেবো। আর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় ছত্রী বাহিনীর সঙ্গে প্যারাড্রপের মাধ্যমে আমি টাঙ্গাইলে অবতরণ করবো। ওখানে তো কাদের সিদ্দিকী এবং অন্যরা আছে! আমার পরিকল্পনাটা এমন কামালপুর–জামালপুর হয়ে ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে থাকবে, ভারতীয় ১০১ কমিউনিকেশন জোন ও ৯৫ মাউন্ট ব্রিগেড এবং কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একসঙ্গে ঢাকায় প্রবেশ করবো আমরা। এরপর চোখমুখ উজ্জ্বল করে তাহের বলে, আমার ভাবতে ভীষণ ভালোলাগে যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগেই ঢাকার চারদিক থেকে এগিয়ে আসা সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে এমন অবস্থা তৈরি করবো যে পাকিস্তান বাহিনী যেন মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। কি বলেন আপনারা?

আমরা প্রস্তুত।

সমবেত কণ্ঠের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। তাহের ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে অন্যদের দেখিয়ে বলে, এই যে দেখুন কামালপুর থেকে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে বক্সিগঞ্জ–জামালপুর–টাঙ্গাইল সড়ক। এই সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা দখলের জন্য এর বাইরে অন্য কোনো বিকল্প সড়ক নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রণকৌশলের দিক থেকে এই সড়কের গুরুত্ব প্রথম থেকেই বুঝেছে। তাই এই সড়কের বিভিন্ন জায়গায় মজবুত ঘাঁটি তৈরি করেছে। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে কামালপুরের পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটিকে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

ঠিক। ইউসুফ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সম্ভাব্য আক্রমণের পরিকল্পনায় প্রত্যেকে উত্তেজিত। ম্যাপের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না। যেন দৃষ্টি সরালে ব্যাহত হবে নিমগ্নতা। বাইরে রাত বাড়ে। কুয়াশা গাঢ় হয়ে নামতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ টুকটাক কথা বলে যে যার তাঁবুতে ফিরে যায়। তাহের লেঃ মান্নানকে অপেক্ষা করতে বলে। ওর অভিজ্ঞতা বেশি। তাহের আসার আগে এই এলাকায় ও যুদ্ধ করেছে। জুলাই মাসে যুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে ছিলো।

ফিরে এসে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে জয়েন করেছে। তাহের খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, এখন কেমন আছেন? কখনো কোনো অসুবিধা হয় না তো?

না। ভালোই আছি। আহত হওয়ার পরতো পুনা নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে। তারপর গৌহাটির ১৫১ বেইস হাসপাতালে নিয়ে আসে। এক মাস ছিলাম। সুস্থ হয়ে গেছি। যুদ্ধ করতে পারবো স্যার।

থ্যাঙ্ক য়ু। আমি জানি আপনি এভাবেই বলবেন।

তবে স্যার কামালপুরের পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটিগুলো সিমেন্টের আর.সি.সি. বাঙ্কার। কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ দিয়ে ওগুলোর সংযোগ রাখা হয়েছে। তবে আমিও বরাবরই বলেছি কামালপুর ঘাঁটির পতন হলে ঢাকারও পতন হবে। জুলাই মাসে আমি অনেকগুলো অপারেশন করেছি।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি আপনার কথা।

মান্নান উৎসাহের সঙ্গে বলে, একটি ঘটনার কথা বলি স্যার। তারিখটা ঠিক মনে করতে পারছিনা। মনে আছে আমরা ষাট-সত্তর জনকে সঙ্গে করে আখক্ষেতের ভেতরে ডিফেন্স নিয়েছি। পাকিস্তান আর্মি বেরিয়ে এলে ওদের সঙ্গে খুব গোলাগুলি হয়। ওদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার সঙ্গের দু'জন ছেলে ট্রেঞ্চের পেছনে বসে ছিলো। সেখানে বসেই ওরা পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলো। এক সময় ওদের বুলেট শেষ হয়ে যায়। ওরা শহীদ হয়। তবে স্যার স্বীকার করতেই হবে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানিদের মতো শেষ বুলেটটি খরচ না হওয়া পর্যন্ত ওরা লড়েছিলো। ওদের লাশ নিয়ে এসে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি। স্মৃতিফলক আছে।

শেষের দিকে লেঃ মান্নানের গলা ধরে যায়। চোখ মোছে। তাহের কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, ঘটনাটি স্যাড। তবে সোলজারের জন্য তা স্বাভাবিক। সোলজারের চোখ জলে ভিজবেনা।

লেঃ মান্নান বিষাদের হাসি হাসে। হেসে বলে, একবার কামালপুর এবং বক্সিগঞ্জের মাঝখানে এ্যামবুশ লাগিয়ে বসেছিলাম। বক্সিগঞ্জ থেকেই কামালপুর ঘাঁটিতে খাবার সরবরাহ করা হতো। সে সময়ে সন্দেহজনক এক লোক এপথে যাবার সময় তাকে ধরে ফেলি। তার কাছে এক অফিসারের জন্য পাঠানো কিছু খাবার ছিলো। আর উর্দু-ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি চিঠি ছিলো। তাছাড়া এই পথে মাইন পুঁতে ছয়-সাতটি পাকিস্তান আর্মির গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছি। বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দূরত্ব ছিলো সাত মাইল। পরে ওরা মাইনের ভয়ে এ পথে গাড়ি নিয়ে আসতোনা। যদি আসতে চাইতো তার আগে গরু বা মহিষের গাড়ি পাঠিয়ে পথ পরীক্ষা করে নিতো। এই রকম অনেক ঘটনা আছে স্যার।

তবে মনে রাখবেন সোলজারের জন্য এসব ঘটনা মেমোরি নয়, এক্সপেরিয়েন্স। রণকৌশল নির্ধারণের সময় কাজে লাগে।

ইয়েস স্যার।

তাহের সিগারেট জ্বালায়। একটা টান দিয়ে বলে, আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। নাকি, আমারই শীত বেশি লাগছে?

না স্যার, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আমি যাই।

মাথায় রুমালটা বেঁধে নিন। কুয়াশায় ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

লেঃ মান্নান মাথায় রুমাল বেঁধে নেমে যায়। তার ভালোই লাগে হঠাৎ করে ছুটে আসা

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। ওর কেন জানি ধানুয়ার কথা মনে হয়। এই গ্রামটি কামালপুরের পরের গ্রাম। গ্রামটি দু'ভাগে ভাগ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারত মিলিয়ে এর অবস্থান। কতো অল্প অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়তে হয়েছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। এতো কম অস্ত্র নিয়ে ওদের মোকাবেলা করা যাবে না বলেই তো ধানুয়া-কামালপুর থেকে এ্যামবুশ করার চেষ্টা করতো ডিফেন্স নিয়ে। এই ধানুয়া-কামালপুরের একটি কন্টিনিউয়েশন ছিল ফিরোজপুর হয়ে বক্সিগঞ্জের দিকে। এখন মনে হয়ে কোনোদিন স্বপ্নেওতো ভাবতে পারেনি দেশের এমন অসংখ্য গ্রাম এতো গভীরভাবে চেনা হবে। মেঠোপথ, সরুরাস্তা, জলাভূমি, বন, ধানক্ষেত সব ছবির মতো ভেসে ওঠে। কোথাও ভুল পা পড়েনি। কোনো জায়গা দেখে মনে হয়নি যে এ আমার চেনা নয়। মাথার ওপর কুয়াশা ঝরছে। দ্রুত পা চালিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসেও আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ও। এই যুদ্ধে ও আহত হয়েছিলো। সে ক্ষত ভালো হয়ে গেছে। সামনে আবার যুদ্ধ। ভয় নয়, উত্তেজনাই ওকে প্রাণিত করে। টেবিলে রুটি আর মাংস ঢাকা ছিলো। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নে ধানক্ষেতের কাদায় ক্রলিং করে এগিয়ে যেতে দেখতে পায় নিজেকে। রাতে গোঙানির মতো শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। মনে পড়ে ধানুয়া-কামালপুরে একবার ডিফেন্স নিলে পাকিস্তানি আর্মি আক্রমণ করে। শুরু হয় প্রচণ্ড সংঘর্ষ। শত্রুপক্ষের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মারা যায়। ব্যাপক ক্ষতিও হয়। একজন সৈনিকের কপালে গুলি লেগেছিলো। সেই মৃতদেহটি ওরা নিয়ে এসেছিলো। মৃতদেহ দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সেকি উল্লাস। ওদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিলো। সেই কপালে গুলি লাগা সৈনিকটিকে ওরা কবর দিয়েছিলো। মান্নান বিছানায় উঠে বসে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে গ্লাস থেকে পানি খায়। জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা বুঝি একেই বলে। ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘুমুতে পারে না তাহের। একমাত্র সঙ্গী সিগারেট একটার পর একটা জ্বলে আর নিভে। মাথার ভেতর হাজার রকম চিন্তার ফলে স্নায়ু টানটান হয়ে গেছে। সেজন্যই বুঝি ঘুম আসছে না। কেবলই মনে পড়ছে কয়েক দিন আগের যুদ্ধের কথা। ওই দিনটি ছিলো শত্রুদের কৌশলে প্রলুব্ধ করে বের করে এনে হত্যা করার উদাহরণের দিন। তাহেরের মনে হয় গেরিলা যুদ্ধের ছাত্রদের জন্য এটি একটি মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে। ধানুয়া-কামালপুর, ঘাসীর গ্রাম, উঠোনের পাড়া গ্রামগুলোর মাঝখানে ছিলো বিস্তীর্ণ জলাভূমি। শত্রুদের যদি এখানে বের করে আনা যায় তবে সেটাই হবে তাদের মরণফাঁদ। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেঃ মাহফুজকে ধানুয়া-কামালপুর আর ঘাসীর গ্রামে একটি নকল রক্ষাব্যূহ তৈরি করার ভার দেয়।

সাহসী মাহফুজ সেদিন এই পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছিলো, ইয়েস স্যার, আমরা মনে হয় এটি একটি দারুণ আইডিয়া।

তাহের মাথা নেড়ে বলেছিলো, আমরা সাকসেসফুল হলে পাকিস্তান বাহিনীর বড় ধরণের বিপর্যয় ঘটবে।

মাহফুজ গ্রামবাসীর সাহায্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ তৈরি করে ওই গ্রামে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা কামালপুর-বক্সিগঞ্জ রাস্তায় এ্যান্টি ট্যাঙ্ক ও এন্টি পারসোনাল মাইন পুঁতে রাখে। যারা এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছিলো তারা এ ব্যাপারে ছিলো খুব তৎপর। ব্যাপকভাবে মাইন স্থাপন করা হয়। এছাড়া ছোট ছোট দল সড়কটির পাশে পেট্রোলিং শুরু করে। কামালপুর ঘাঁটির পুব দিকে এক কোম্পানি চলমান

মুক্তিবাহিনী নিয়োজিত করা হয়। তাদের ওপর নির্দেশ ছিলো বক্সিগঞ্জ থেকে পাকিস্তান আর্মির কোনো সাহায্যকারী দল আসলে তাদের বাধা দেয়া। আর কামালপুর ঘাঁটি থেকে কোনো শত্রুসৈন্য বের হলে তাদের হত্যা করা। বিছানায় শুয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে তাহের। মানুষের ইগো যে কখনো কখনো তাকে কতো বিপজ্জনক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামাতে পারে পাকিস্তান আর্মি তা প্রমাণ করেছে। তাহের লক্ষ করেছে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তানি সৈন্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠতো। দেশের ভেতরে মুক্তিবাহিনী ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারে এমন ধারণা ওরা গ্রামবাসীদের দিতে চাইতো না। কারণ ওদের প্রচার যন্ত্রগুলো সারাক্ষণ বলতো পাকিস্তান সেনাবাহিনী অসীম শক্তির অধিকারী। ওদের গায়ে আঁচড় দেয়ার সাহস কারো নাই, তেমনিভাবে সেনাবাহিনীও আচরণ করতো। নিজেদের ক্ষতি আড়াল করে রাখতে চাইতো স্থানীয় মানুষের সামনে থেকে। ভাবটা এমন ওরাই পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা। পাকিস্তানের গায়ে হাত দেয়, এমন সাধ্যি কার ! এই মানসিকতার কারণেই তাহের নিশ্চিত ছিলো যে ধানুয়া-কামালপুর ও ঘাসীর গ্রামের অবস্থানগুলোর ওপর পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করবে। এ কারণেই তাহের ঠিক করে কামালপুর-বক্সিগঞ্জ সড়কটি ওরা ওদেরকে অবাধে ব্যবহার করতে দেবে। পরিকল্পনা মাফিকই সবকিছু হয়েছিলো। সেই জলাভূমিতে ছিলো এক ফুট থেকে তিনফুট পানি । আর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের সামনেই ছিলো জলাভূমি। ভুল যেটি হয়েছিলো সেটি ছিলো শত্রুরা নির্ধারিত স্থানে আসার আগেই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানিটি গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তান আর্মি এই গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে যতো ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ছিলো সব সহকারে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে সামনে এগোতে থাকে। রেজিমেন্টের একজন সুবেদার ও একজন জোয়ান আহত হওয়ার পর কোম্পানিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনেকে নিজেদের অবস্থান ছেড়ে চলে যায়। একটি সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। সেকথা ভাবতে গিয়ে রাগ এবং কষ্ট—দু'ধরণের পীড়ন ওকে অস্থির করে তোলে। ও আর শুয়ে থাকতে পারে না। দু'তিন গ্লাস পানি খেয়ে সিগোরেট জ্বালায়। বাইরে এসে দাঁড়ালে সহস্র নক্ষত্রের রাত বুকের ভেতর ঢুকে গেলে স্বপ্নের বৃত্ত তৈরি হয়। অজস্র স্বপ্নের নক্ষত্র জ্বলে আর নেভে, যেন আকাশের অঙিনায় তারার হাউই বাতি। ওই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সেই মুক্তিযোদ্ধার মুখটি মনে পড়ে যে ধানুয়া-কামালপুরের দক্ষিণে স্থাপিত এল.এম.জি-টি কন্ট্রোল করছিলো। ওই এল.এম.জি-র কোনাকুনি গোলাবর্ষণে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য আহত-নিহত হয়। এবং এক পর্যায়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যে মুক্তিযোদ্ধা এল.এম.জি-টা চালাচ্ছিলো উত্তেজনার বশে খেয়াল করতে পারেনি যে বাম হাতে এল.এম.জি-র ব্যারেলটা চেপে ধরে আছে। কখন যে হাতের তালুটি পুড়ে গেছে সেটাও খেয়াল ছিলো না। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া তালুটি তাহেরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ও নিজেকে বলে, কি সাহস, কি ধৈর্য! মূলত সেদিন ওর জন্যই পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। ওর মুখটা তাহেরের সামনে অজস্র নক্ষত্র হয়। তখন ওর ঘুম পায়। পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য বিশ্রামের ঘুম। ও ঘরে ঢুকলে মনে হয় পিছু পিছু নক্ষত্ররা সারি বেঁধে ঘরে ঢুকছে। ওর বিছানায় চারপাশে অপূর্ব আলো। চোখ বোঁজার মুহূর্তিক আগে ওর বুক ভরে যায় সুগন্ধীতে। মনে হয় লুৎফা বিছানায়। এতো বুকভরা সুগন্ধী ওর শরীর থেকেই আসছে। ও ঘুমের ঘোরে হাত বাড়ায়। শূন্য। গুটিয়ে যায় হাত। শূন্যতাকে তো মুঠি ভরে ধরা যায় না। সেই শূন্যতার অতলে ডুবতে ডুবতে ওর আর কিছুই মনে থাকে না।

নানারকম পরিকল্পনার পর ঠিক হয় হালুয়াঘাট আক্রমণ করা হবে। সীমান্তের এপারে ডালু। ওপারে হালুয়াঘাটের দক্ষিণে পাক সেনাদের একটি ঘাঁটি আছে। মুক্তিবাহিনীর তিনটি কোম্পানির সঙ্গে থাকবে ভারতীয় আর্টিলারির দুটি বাহিনী। এরা রাজপুত। এদের দিকে তাকালে ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়া রাজপুতদের যুদ্ধের গল্পের কথা মনে হয় তাহেরের। বিশেষ করে রাজপুত রমণীদের কথা। যুদ্ধে রাজপুতরা পরাজিত হলে রমণীরা সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতো। শত্রুর হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যুকেই ওরা শ্রেয় মনে করতো।

লেঃ হাশেম খুব মৃদু স্বরে ডাকে, স্যার?

তাহেরের চমক ভাঙে, কিছু বলবেন?

স্যার রেকি পেট্রোলিং করে জানতে পেরেছি ওই ঘাঁটিতে পাকিস্তানিদের একটি কোম্পানি পূর্ণ সামরিক সম্ভারে প্রস্তুত।

তাহের ওকে সাহস দিয়ে বলে, আমরাও যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি খুব আশাবাদী! জয় আমাদের হবেই।

হাশেম চুপ করে থাকে। লেঃ কামালও কোনো কথা বলে না। তাহের ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, মনে রাখবেন কালই।

পরদিন আক্রমণ শুরু হয়। দুপুর পর্যন্ত লড়াই করার পর পাক-ঘাঁটি দখলে সফল হয় মুক্তিবাহিনী। কিন্তু জয়ের উল্লাস বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। সুস্থির হওয়ার আগেই পেছন দিক থেকে পাক-বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ন তীব্রভাবে আক্রমণ চালালে মুক্তিবাহিনী পকেট ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়।

তাহেরের মনে হয়েছিলো ওদের অবসন্ন, ক্লান্ত মুহূর্তগুলো প্রত্যেক যোদ্ধার মুখের ওপরে স্বেদবিন্দু হয়ে মহেন্দ্রগঞ্জের সবুজ শ্যামলিমার ওপর দিয়ে একটি স্রোতস্বিনী বানিয়েছিলো। সেই নদীর নাম স্টিক্স। ওটিকে শুধু গ্রিক মিথেই খুঁজে পাওয়া যায়। ওই নদীর খেয়া নৌকার মাঝি ছিলো ক্যারন। অন্ধকারের দেবতা এরিবাসের পুত্র। ক্যারনের কাজ ছিলো মৃতের আত্মাকে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাওয়া। জীবিত কাউকে পারাপার করার কোনো অনুমতি ছিলো না ক্যারনের। তবে বীর হারকিউলিস গায়ের জোরে ক্যারনকে বেঁধে রেখে স্টিক্স নদী পার হয়। তাহের দ্রুত নিজের কপাল থেকে ঘাম মোছে। যেন পুরো এলাকা ওর কপালের স্বেদবিন্দু, স্টিক্স নদী হয়ে গেছে। তবে ও কি ক্যারন? অন্ধকারের দেবতা এরিবাসের পুত্র? না, ওর সেক্টরে কোনো অন্ধকার নেই। ও বীর হারকিউলিস। ক্যারনকে বেঁধে রেখে পার হয়ে যাবে স্টিক্স নদী। তারপর নিজেকেই বলে, আর যদি আমি ক্যারন হই, তাহলে ক্যারন হবো বাংলাদেশের মিথের—গ্রিক মিথের নয়। ১১নং সেক্টরকে স্টিক্স নদী বানিয়ে সব জীবিত লোককে স্বাধীনতার জীবনপুরীতে পার করে দেবো। কোনো মৃত্যুপুরীতে নয়।

স্যার কি কিছু ভাবছেন?

হ্যাঁ।

আপনার কি মন খারাপ?

ছিলো, এখন নেই। আমি একটি স্বপ্নের ওপর আমার কনুই রেখে যুদ্ধক্ষেত্র দেখছি।

স্যার, খুব কঠিন কথা।

আমাদের সামনে আরো বড় যুদ্ধ আছে।

আছে স্যার। আমরা লড়বো।

তাহলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে একটি নদী ভাবুন। মনে করুন নদীর জলের ওপর নুয়ে আছে গাছ, দ্রুত চলে যাচ্ছে পানসি নৌকা। এবং আমরা, যোদ্ধারা নদীর তলদেশ থেকে তুলে আনছি আমাদের পিতৃপুরুষের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের পাথরখণ্ড। নদীর ওপর তৈরি করেছি পথ। মার্চ পাস্ট করে যাচ্ছি। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমরা হারবো না।

জয় বাংলা।

অকস্মাৎ প্রবল শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ে, উপত্যকায়। আবার জয়—বাংলা—। আবার । কোনো স্লোগান নয়, যোদ্ধাদের রণধ্বনি।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়া হয়। আবার এ্যামবুশ। মাইন বিস্ফোরণ। আক্রমণ। অক্টোবরের শেষের দিকে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের বিস্তীর্ণ হাওর এলাকা ১১ নং সেক্টরের নিয়ন্ত্রণে আসে। নদী নয় কিন্তু হাওর, প্রবল বর্ষায় গর্জে ওঠে যার স্রোত। মুক্ত। কিন্তু মুক্ত হাওর বন্দী হয়ে যায় তাহেরের করোটিতে। তাহের কান পেতে থাকে। গর্জন শুনলে প্রবাহিত হতে থাকে সাহস — এ সাহস কখনো নদী, কখনো রাজপথ — ওকে নিয়ে যাবে লক্ষ্যে। দু'মাস ধরে ভারতীয় বাহিনীর ৯২ মাউন্টেন ব্রিগেড এই সেক্টরকে সাহায্য করছে। ব্রিগেডের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। এই ব্রিগেডে আছে তিনটি ইনফ্যান্ট্রি আর দু'টি আর্টিলারি রেজিমেন্ট। একটি ব্যাটালিয়ান কমাণ্ড করছে কর্ণেল শোডি। এদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, অমায়িক ব্যবহার তাহেরকেই শুধু মুগ্ধ করে না। অন্যদেরও সাহস যোগায়। সবাই বেশ হাসিখুশি। কয়েকদিন আগে তাহের কোম্পানি কমাণ্ডার হেলালকে বক্সিগঞ্জ আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলো। ও একটা সফল অপারেশন করে। তাহেরের মনে হয় এভাবে আর নয়। এবার ঢাকা যাত্রার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

নভেম্বরের তেরো তারিখ। তাহের মুক্তিবাহিনীর কোম্পানি কমাণ্ডারদের নিয়ে বসে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আজ রাতেই মরণ আঘাত হানতে হবে কামালপুর ঘাঁটিতে। তোমরা সবাই কামালপুরের আশেপাশে এ্যামবুশ নিয়ে থাকবে। কোনোরকম সাড়াশব্দ যেন না হয়। একদম নিঃশব্দ অবস্থান। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো রকম গুলিবর্ষণ করবে না। আর যদি খানসেনা পালাতে চেষ্টা করে তাহলে ওদেরকে ধরবে।

লেঃ মান্নানকে বলে, তুমি আখক্ষেতের ভেতর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকবে, যেন পাকিস্তানিরা এই পথে পালিয়ে যেতে না পারে।

আক্রমণ শুরু হয়। রাত তখন সাড়ে তিনটা। মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছে ভারতীয় একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট ও একটি মর্টার বাহিনী। ওরা কামালপুরের ওপর শেলিং করছিলো। তাহের বিগ্রেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে থেকে এই অপারেশন সমন্বয় করছে। সকালের দিকে যোগাযোগের জন্য কোম্পানি কমাণ্ডারদেরকে অয়ারলেস সেট দেয়া হয়। তাহের অয়ারলেসের মাধ্যমে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে। ও এক সময় লেঃ মান্নানকে জিজ্ঞেস করে, লেঃ মিজানের সঙ্গে কি তোমার যোগাযোগ আছে? মান্নানের জবাব ভেসে আসে, এখন নেই। তাহের বলে, তাকে কল দাও, আমিও খোঁজ নিচ্ছি। তাহের পাঁচ-ছয়জনকে সঙ্গে করে লেঃ মিজানের পজিশনের দিকে এগিয়ে যায়। চারদিকে ঝকঝকে রোদ। বারুদের গন্ধ। আহতদের আর্তনাদ। এতোকিছুর মাঝে গোলাগুলির শব্দ নেই। মনে হয় চারদিক কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেন তুমুল সংঘর্ষ

আকস্মিকভাবে থেমে গেছে। সবার মনে প্রশ্ন তাহলে কি পাকিস্তান আর্মির সব খতম হয়ে গেছে? কেউ বেঁচে নেই? এ সময় লেঃ মিজান এসে খবর দেয়, কামালপুর ক্যাম্প এখনই চার্জ করতে হবে।

তাহের একমুহূর্ত ভাবে।

মিজানের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, স্যার এখনই।

ভাবছি কোন দিক থেকে কামালপুর ক্যাম্প চার্জ করা হবে।

কাছ থেকে কেউ কিছু একটা বলতে চাইলে কথা শেষ হয় না। মুহূর্ত সময় মাত্র। মিজানের পজিশনের কাছে তাহেরকে দেখতে পেয়ে শত্রুপক্ষ ৬০-এম-এম মর্টার থেকে শেলিং করে। একটি গোলা এসে পড়ে তাহেরের বাম পায়ের উরুর ওপর। চারদিকে আর্ত-চিৎকার ওঠে। মুক্তিযোদ্ধারা দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসে। লেঃ মান্নান তাঁর ওয়ারলেস সেটে শুনতে পায় বেলালের কান্না জড়িত কণ্ঠ, তাহের ভাইয়ের পা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কাঁদছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাহের আকস্মিক আঘাতে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করার পর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নেয়। হাত থেকে গলফ স্টিক আর অয়্যাবলেস সেটটা পড়ে গেলে সেটা নিয়ে নেয় মিজানুর। অন্যরা এসে ধরেছে তাকে। চামড়াব সঙ্গে সামান্য লেগে আছে পায়ের বাকি অংশ। জ্ঞান হারায় না তাহের। সেই অবস্থায় ও বলতে থাকে, যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কামালপুর দখল করতে হবে। আমি ফিরে আসবো। এসে যেন দেখতে পাই কামালপুর থেকে ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার।

কথা বলার ফাঁকেই মুক্তিযোদ্ধারা ওকে কাঁধে উঠিয়ে নেয়। ও বুঝতে পারছে ওর একটি পা আর কিছুক্ষণ পর একদম আলাদা হয়ে যাবে ওর শরীর থেকে। অথচ দু'টি পা নিয়েই তো ও কতো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে স্বাধীনতার জন্য লড়বে বলে। ওর ইচ্ছে হয় যে বিগ্রেডিয়ার ক্লেয়ারকে বলে, আমি জানি দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ আমার একটি পা রেখে গেলাম তোমাদের মাটিতে। দেখবে একদিন এই পায়ের ওপর গজাবে একটি চিরহরিৎ গাছ। কোনোদিন ঝরবে না সে গাছের পাতা। কিন্তু বলা হয় না। শুনতে পায় ছেলেরা কাঁদছে। ও ওদের বলে, তোমরা কাঁদছো কেন? তোমরা চুপ করো।

ওরা চুপ করতে পাবে না। শব্দ না হলেও ওদের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাহেরের বড় অদ্ভুত লাগে মুক্তিযোদ্ধাদের গালের ওপর গড়িয়ে আসা চোখেব জল। ও মুহূর্তের জন্য নিজের চোখ বন্ধ করে। ক্লান্তি নয়, অবসাদ নয়। হতাশাও নয়। ও চোখ বন্ধ করে একটি স্বপ্ন দেখতে থাকে – আসলে ওটা ওদের চোখের জল নয়। একটা স্টিক্স নদী প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বীর যোদ্ধারা খেয়ার মাঝি ক্যারনকে বেঁধে ফেলেছে, কারণ সবাই মিলে সশরীবে ওই নদীর ওপারে যাবে। জয় করবে মৃত্যুপুরী। পেছনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে অন্ধকারেব দেবতা এরিবাসের পুত্র। ওর কিছুই করার নেই। যোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। ও দেখতে পাচ্ছে সব অন্ধকাব আড়াল হয়ে গেছে স্বাধীনতা প্রিয় একজন যোদ্ধার খণ্ডিত বাম পায়ের বিশাল দেয়ালের ওপারে। ওই অন্ধকার থেকে আর কোনোদিন শত্রুরা ছুটে আসতে পারবে না। ওর মনে হয় স্বাধীনতা ওর কৈশোরে ফেলে আসা টিলাগাঁও স্টেশন। বাবা ব্যস্ত। একটুপর শায়েস্তাগঞ্জ জংশন থেকে ছুটে আসবে ট্রেন। মা স্টেশন কোয়ার্টারের লাল দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। রেলের সমান্তরাল লাইনের মাঝখান দিয়ে সবুজ রঙের ওপর লাল সুতোর কাজ কবা ফ্রক পরে ছুটে আসছে জয়া। ওর মেয়ে।

তাহের তখন অস্ফুট স্বরে বলে, জয়া, আমার জয়া।

স্যার, কিছু বলছেন?

আমার মেয়ে—

ও ভালো আছে স্যার। ভাবীও ভালো আছে।

ও তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে। ওরা গারাডোবা পর্যন্ত চলে এসেছে। এখানে হেলিকপ্টার আসবে তাহেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

তাহের তখনো সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। তাকায় নিজের পায়ের দিকে। প্রথমে পায়ের নখ, আঙুল, পাতা — শেয়ালকোটের জলাভূমি দিয়ে হেঁটে আসার সময় ওই পায়ের পাতা কাদায় ডুবে গিয়েছিলো। গোড়ালি পর্যন্ত কাদা-পানিতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিলো পা'দুটো ছিলো বলেই তো পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিলো। এই কিছুক্ষণ আগেও অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় রণাঙ্গনে ছুটোছুটি করে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলো। মনে পড়ে কমাণ্ডো ট্রেনিং নেয়ার সময় হাঁটুর ওপর কি অত্যাচারই না হয়েছিলো। বুকে হেঁটে পার হতে হয়েছে জঙ্গল, উঁচু-নিচু পথ। পাথুরে রাস্তা। [illegible]রে মাটি। আহ্, কতো যন্ত্রণা সয়েছে ওর পা। তাই কি অভিমানে চলে গেলো একটি? ও এখন আর চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে না। বুকের ভেতরের বিচ্ছুরিত আলো চোখ হয়েছে। সেই চোখ দিয়ে আবার নিজের পায়ের দিকে তাকায়। কই না তো, ও তো দেখতে পাচ্ছে না নখ কিংবা পায়ের পাতা। সবইতো জুতোর ভেতরে ঢাকা। তাহলে শুধু কি ওর এখন সত্য দেখার দিব্যদৃষ্টি! ওতো জানে না আর কতোক্ষণ পর এই বিচ্ছিন্ন পা'টি চলে যাবে ভারতের মাটির নিচে।

অল্পক্ষণের মধ্যে গারাডোবার আকাশে উড়ে আসে ভারতীয় হেলিকপ্টার। প্রথমে ওকে তুরা নিয়ে যাবে। ও ছেলেদের দিকে তাকায়। ওদের জামাগুলো ওরই রক্তে ভেজা। ও ওদের বলে, আমি অবশ্যই ফিরে আসবো। শুধু তো একটি পা। জীবন তো যায়নি। আমি জ্ঞানও হারাইনি। তোমরা জেনে রাখো প্রিয় স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একটি পা কিছুই না।

ওদের কেউ কেউ দু'হাতে মুখ ঢাকে। কেউ কাঁদবে না বলে শক্ত হয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে। তাহের কারো চোখের দিকে তাকায় না। ইউসুফ হাতটা ধরলে বলে, ভাইজান মনে রাখবেন এই সেক্টরই সবার আগে ঢাকায় ঢুকবে। আপনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যাবেন।

ইউসুফ বিব্রত হয়। ও চেয়েছিলো তাহের নিজের কথা বলুক। প্রিয়জনের কথা—বাবা, মা, স্ত্রী, মেয়ে........। কিন্তু ও সারাক্ষণই স্বাধীনতার কথা বলছে। ঢাকা পৌঁছার কথা বলছে। কেউ যেন সাহস না হারায়—অনুপ্রাণিত হয়, এজন্যই ওর ব্যাকুলতা।

হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করেছে। ওকে তোলা হচ্ছে হেলিকপ্টারে। আবারো কান্নার ধ্বনি চারদিকে। এবার ও বধির হয়ে যায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। ভীষণ শুকনো লাগছে ঠোঁটজোড়া। কিংবা বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তখন ও মনেপ্রাণে অনুভব করে যে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দটি গুলির শব্দের মতো। ওর সমস্ত অনুভবে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। সেই গোলাগুলির ভেতর দিয়ে ও একটা নদী সাঁতরে এসেছে। ওর শরীরে ঘাম এবং জলের মাখামাখি। ও কিছুই আর দু'চোখ দিয়ে দেখবে না বলে দু'চোখ বন্ধ রেখে নিজের ভেতরের আলো উজ্জ্বল করে তোলে।

হেলিকপ্টারের পিছু পিছু ধাওয়া করে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অসংখ্য চোখ।

হেলিকপ্টার অনেক দূরে চলে গেলে ওদের মনে হয় আকাশ তাহেরকে মেঘের ভেতরে টেনে নিয়েছে। বৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে জমাট হয়ে থাকা রক্ত।

হয়তো কোনো নক্ষত্রের কাছ থেকে নতুন একটি পা নিয়ে মেঘের প্যারাড্রপের মাধ্যমে নেমে যাবে টাঙ্গাইলে। ওখান থেকে ঢাকা। মুক্ত স্বদেশ। মুক্তিবাহিনীর সামনে সারেণ্ডার করছে পাকবাহিনী। এতো কিছু ভেবে দু'হাতে চোখ ঢাকে আনোয়ার। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টের ট্রেনিং নিয়েও রণক্ষেত্রে যায়নি ও। ছিলো অফিস স্টাফ। ওর কি এমন আবেগ সাজে। তাহের জানতে পারলে ওকে একটা কড়া ধমক দেবে।

১৯

কোদালকাঠিতে মেজর তাহেরের আহত হওয়ার খবরটা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করতে থাকে। ওদের মধ্যে অনেকেই সেক্টর কমান্ডারকে দেখেনি। অন্যদের কাছে তার সাহেসের গল্প শুনেছে। প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে আছে। যারা খুব কাছ থেকে তাহেরকে দেখেছে তারা কাঁদতে শুরু করে। কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলে, এখন কি হবে আমাদের?

কি আবার হবে? আমরা যুদ্ধ করবো।

তারামন চেঁচিয়ে বলে।

মুহিব হাবিলদারের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। বাবাকে কাঁদতে দেখে নিজের থ্রি নট থ্রি রাইফেলটা উপরে উঠিয়ে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে তারামন বলে, বাবা সেক্টর কমান্ডারকে তো আমি দেখিনি। তার একটা পা গেছে তো কি হয়েছে? আমাদেরগুলো তো এখনো আছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। বাবা আপনি দেখেন আমি কতো জোরে দৌড়াতে পারি।

তারামন রাইফেলটা উপরে ধরে তীব্র বেগে দৌড়ে যায়। ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিস্ময়ে তারামনের ছুটে যাওয়া দেখে। ওর ওড়নাটা এমনভাবে বাতাসে উড়ছে যেন মনে হয় রাইফেলের মাথায় বাঁধা রয়েছে একটি পতাকা।

নদীর পাড় ধরে ও অনেক দূরে চলে গেছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। থামছে না। প্রত্যেকে অনুভব করে তারামনের দু'পায়ে তাহেরের খণ্ডিত পায়ের তীব্রগতি। ওরা বোঝে যুদ্ধে কারো পা বিধ্বস্ত হলে সেটা হারায় না। গতি সঞ্চারিত হয় অন্যখানে। তারামন সেই গতি নিয়ে সমগ্র দেশটায় ছুটে আসতে পারবে।

খ. গতি সঞ্চারিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে। তারা ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ। প্রতিনিয়ত কামালপুরের পাকিস্তান ঘাঁটি আক্রমণ করতে থাকে। মেজর তাহেরের অবর্তমানে সেক্টরের

যুদ্ধ পরিচালনার অস্থায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্যাপ্টেন আজিজ। সে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে রণকৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আক্রমণাত্মক অভিযান বাদ দিয়ে অবরোধমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ পাঠায়। পূর্বাঞ্চলীয় কম্যুনিকেশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল ভগৎ সিং এই পরামর্শ গ্রহণ করে। সমগ্র সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অবরোধ অভিযান শুরু হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। লোকটির মনে হয় প্রতিটি যোদ্ধার পায়ে ভর করেছে অযুত শক্তি। ওদের সামনে কোনো দীর্ঘ সময় নেই। ওরা অণু-পরমাণুতে বিভক্ত করে ফেলেছে সময়ের ব্যাপ্তিকে। কোম্পানি কমান্ডার হেলাল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। মেজর তাহেরের নির্দেশে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন করেছিলো। তাহের আহত হলে আরো মরিয়া হয়ে ওঠে। সেদিন লোকটি ওকে বলে, মনে আছে তোমার যে সেক্টর কমাণ্ডারের কাছ থেকে মেলান্দহ থানার পাটের গুদাম আক্রমণের নির্দেশ পেয়েছিলে।

তুমি আমাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো না। তুমি ভবিষ্যতের কথা বলো। আমি যা করেছি তার চেয়েও বড় কিছু করতে চাই।

তুমি সেদিন পাকবাহিনীর দালালদের বারোশমনী পাটের নৌকা ধ্বংস করেছিলে। পাকবাহিনী তোমার কোম্পানিকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো।

ওরা আমার সামনে টিকতে পারেনি। তরুণ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেলালের কণ্ঠ।

তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং সাহসী। ওদের আক্রমণ প্রতিহত করে তেরো জন শত্রুসেনাকে প্রতিহত করেছিলে।

পরে আমার বাহিনী মেলান্দহ যাবার পথে দুরমুরির পুল উড়িয়ে দেয়। হেলালের কণ্ঠ।

আমি জানি পুলরক্ষী বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে তোমার বাহিনীর ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। তুমি জিতেছিলে। সতেরো জন রাজাকারকে খতম করে ছয়টি রাইফেল উদ্ধার করেছিলে। রাইফেলগুলো মেজর তাহেরের কাছে জমা দিয়েছিলে।

ওহ্ মেজর তাহের। এতো বড় আঘাতের পরও জ্ঞান হারাননি। কি অসাধারণ মনোবল।

তোমাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তুমিও তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে।

এই তো গত মাসে তিনি আমাকে গেদ্দা ও উঠানের পাড়ায় তিন দিন এ্যামবুশে থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আমি জানি সেসব মাইন বিস্ফোরণে ওই এলাকার পাকবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন খানসেনা আহত হয়।

তুমি এবার থামো। আমি আর এসব কথা বলতে চাই না।

কেন চাও না? মেজর তাহের এই সেক্টরে আসার আগেই তো তোমার কোম্পানি টাইগার উপাধি পেয়েছিলো।

আহ্ বন্ধু তুমি আমাকে ভবিষ্যতের কথা বলো। হেলালের কণ্ঠ।

ভবিষ্যত তো তুমি নিজেই দেখতে পাও। লোকটির কণ্ঠ দূরে মিলিয়ে যায়।

হেলাল দেখতে পায় ও ওয়্যারলেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণে খানসেনাদের মেজর রিয়াজ আহত হয়েছে। নিহত হয়েছে বারো জন।

চারদিকে আনন্দের উল্লাস। মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা আনন্দধ্বনি ঢুকে যাচ্ছে ওর ভেতরে। ওর কণ্ঠে গান উঠে আসছে। গাইতে না জানলেও দুটো লাইন ও না গেয়ে

পারে না—প্রভু আমার, প্রিয় আমার। শুনতে পায় লোকটির দূরাগত কণ্ঠ, হেলাল?

তুমি আমাকে আর ডেকোনা। আমি যাচ্ছি। কয়েকদিন আগে কর্নঝোরাতে পাক আর্মির সঙ্গে যে লড়াই করেছিলাম সে লড়াইয়ে ওদের চারজন নিহত হয়েছিলো। বাকিরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। আমি ওদের পিছু ধাওয়া করছি এখন। ওদের বাঁচতে দেবো না। এই মাটিতে ওরা বাঁচতে পারবে না।

উইশ ইউ বেস্ট লাক বন্ধু।

লোকটি শুভেচ্ছা জানালে হেলাল শুনতে পায় না। ওর সময় নেই পেছন ফিরে তাকাবার। ও তীব্র বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।

কামালপুর ঘাঁটি অবরোধ করে রেখেছে মুক্তিবাহিনী। ওদের মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওরা। রসদও বন্ধ। অবরোধের পরদিনই পাকবাহিনী রিইনফোর্সমেন্ট করার সময় আশি জন পাকসেনা নিহত হয়। আরো কয়েকবার বের হওয়ার চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সামনে পড়ে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে ওদের। পুরোপুরি বিধ্বস্ত অবস্থা। শেষে এগারো দিন অবরুদ্ধ থেকে ডিসেম্বরের চার তারিখ বেলা তিনটায় পাকিস্তান আর্মি মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সঞ্জুকে চিঠি ও পতাকা নিয়ে পাকবাহিনীর শিবিরে পাঠানো হয়।

তারপর দেশের মাটিতে সঞ্জুই বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায়। ফেরার সময় ঘুরে ঘুরে ওই পতাকা দেখে ও। বুক ভরে ওঠে গর্বে। চোখ ভরে যায় জলে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। কষ্ট হয়। সঞ্জুর জীবনে আনন্দ-বেদনা অনুভবের মাহেন্দ্রক্ষণ জীবনের সবচেয়ে আলোকিত অংশ। ও অংশটুকু বুকের ভেতরে উজ্জ্বল করে তুলে দৌড়াতে থাকে।

গ. আমার মনটা খুব খারাপ। কামালপুরে পাকিস্তান আর্মি সারেন্ডার করেছে, কিন্তু তাহের নেই। ও এখন গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিছানায় শুয়ে যুদ্ধের খবরের জন্য উদগ্রীব থাকে। প্রচণ্ড মনোবল। ওকে খবর জানিয়েছি যে পাকবাহিনী ময়মনসিংহের মেঘালয় সীমান্তের সবগুলো ঘাঁটিতে ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। ওদের মনোবল ভেঙে গেছে। পিছু হটতে শুরু করছে। শোনা যাচ্ছে ওরা জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণায় মুক্তিবাহিনীর অভিযান প্রতিহত করার জন্য সমবেত হচ্ছে। ওকে আরো জানিয়েছি যে ও আহত হওয়ার তিন দিন পরই ভারতীয় ৯৫তম মাউন্ট ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার, ভারতীয় এবজা সেক্টরের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার সাম সিং, ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কম্যুনিকেশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল জগৎ সিং এবং ১১ নম্বর সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে ক্যাপ্টেন আজিজ জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণার বিভিন্ন জায়গায় সম্ভাব্য আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। এখন সময়ের অপেক্ষা। তাহের মৃদু হেসে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, ভাইজান মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আপনিও প্রথম ঢাকায় ঢুকবেন।

আমি ওকে বলেছি, তাহের আমি তোর স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন, আমাদের স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় ঢুকবো।

এতোসব চিন্তার মাঝে তাঁবুর ভেতর আমার খুব অস্বস্তি লাগে। আমি তাঁবুর বাইরে এসে

দাঁড়াই। মনে হয় দূর থেকে হেলিকপ্টার উড়ে আসার শব্দ পাচ্ছি। তখন লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ইউসুফ?

কি ব্যাপার তুমি এখানে?

তুমি তো জানো আমি সবখানেই থাকি।

সেতো জানি। পুরো দেশটায় তুমি আছো। তুমি আছো বলেইতো আমাদের বুকের ভেতর এতো শক্তি, সাহস।

হা-হা করে হেসে ওঠে লোকটি। বলে, গোটা দেশের যোদ্ধা মানুষের সাহস আমি দেখেছি ইউসুফ। সেটুকুই তো আমার সম্বল।

চা খাবে?

না। আমি যাই। তোমাকেও এখনই যেতে হবে।

কি ব্যাপার বলতো?

তুমি ভালো থেকো ইউসুফ।

আমি ভালো আছি।

একথা বলার পর আমি আর ওকে দেখতে পাই না। ও এমনই। এই আছে, এই নেই। আসলে ও নেই হয় না। ও সর্বত্র বিরাজমান। হেলিকপ্টারের শব্দে আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি এই শব্দের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ও। উপরের দিকে তাকাই। একটি এম আই-৮ হেলিকপ্টার সেক্টর হেড কোয়ার্টারের উপর দিয়ে উড়ে বি.এস. এফ. হেডকোয়ার্টারের হেলিপ্যাডে নামে।

আমি তাঁবুর সামনে পায়চারী করতে থাকি। অস্থির লাগছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ক্যাপ্টেন রংরাজের পরিচিত জিপটি আমার তাঁবুর সামনে এসে থামে। আমি অবাক হই। মনে হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি প্রস্তুত। যে কোনো চ্যালেঞ্জ আমার কাছে এখন কোনো কঠিন কাজ নয়। টানটান স্নায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ড্রাইভার আমাকে একটি চিরকুট দেয়। গুটি গুটি হাতের লেখা। কিন্তু স্পষ্ট। ক্যাপ্টেন রংরাজ লিখেছে, এই জিপে করে ক্যাপ্টেন আজিজকে নিয়ে যেন তাব হেডকোয়ার্টারে যাই। আমি অল্পক্ষণ চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে থাকি। ওটাকে আমার ম্যাপের মতো লাগে, যেন আঁকাবাঁকা রেখায় কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গা ফুটে উঠেছে—সেখানে সবুজ প্রকৃতির মাঝে ফুটে উঠেছে ছোট ছোট যুদ্ধক্ষেত্র। কি আনন্দ। আমি ক্যাপ্টেন আজিজকে খবর দেয়ার জন্য একজনকে পাঠাই। আর দ্রুত ভাবতে থাকি কেন ডেকেছে রংরাজ? নিশ্চয় গুরুতর কোনো সিদ্ধান্ত হবে। এই মুহূর্তে সেক্টর কমাণ্ডার হাসপাতালে। অল্প সংখ্যক অফিসারদের মধ্যে লেঃ মান্নান যুদ্ধে আহত হয়েছেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ আমাদের এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটি সাবসেক্টরের অধিনায়ক। যারা নতুন ট্রেনিং নিয়েছে তারা বিভিন্ন সীমান্তে অবস্থান করছে। কারো সঙ্গে পরামর্শ করার কোনো সুযোগ নেই।

ক্যাপ্টেন আজিজ এসে বললো. কি ব্যাপার ইউসুফ ভাই?

আমি ওকে চিরকুটটা দেখাই। ও এক নিশ্বাসে পড়ে বলে, এক্ষুণি আমাদের যেতে হবে।

আমারও তাই মনে হয়। কারো সঙ্গে পরামর্শ করার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। আজিজ বলে, অসম্ভব। সেটা করার সময়ও নেই।

আমরা দুজনে সেই জিপে করে বি. এস. এফ. ক্যাম্পে আসি।

পরিস্থিতি থমথমে। সবাই গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। সেখানে বসে আছেন ১০১ কমিউনিকেশন জোনের ভারতীয় কমান্ডার জেনারেল গিল, ৯৫ মাউন্ট ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার এবং স্টাফ অফিসাররা। আমাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়। কথা শুরু হলে অফিস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমাদের উৎকণ্ঠিত ভাবটা কমে আসে। আমি আর আজিজ খানিকটা সহজ হয়ে যাই।

একসময় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার সোজাসুজি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আজ সন্ধ্যায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

ক্লেয়ার এক মুহূর্ত থামে। আমরা উদগ্রীব হয়ে উঠি। ক্লেয়ার আবার বলে, তবে মনে রাখবেন ভাষণ শোনার আগে পর্যন্ত আমরা এখানে যা কিছু বলবো তা আপনাদের টুপির মধ্যেই রাখতে হবে। ভীষণ গোপনীয়। আজ মধ্যরাতে আমরা পাকিস্তানী আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে পাকিস্তানে প্রবেশ করবো। আমরা আর আপনারা একটি যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে যুদ্ধ করবো। যেহেতু আমি জ্যেষ্ঠ আপনারা আমার নির্দেশে যুদ্ধ করে যাবেন।

আমরা চুপচাপ ক্লেয়ারের কথা শুনে যাই। সে কথা শেষ করলে আমি আজিজের হাতে চাপ দিয়ে বলি, আমরা যুদ্ধের শেষ পর্বে চলে এসেছি।

আজিজও মৃদু স্বরে বলে, হ্যাঁ, এখন শুধু ঢাকা প্রবেশ।

সবাইকে চা-বিস্কিট দেয়া হলো। বারবারই তাহেরের মুখ মনে পড়ছে। নিজেকে শক্ত রাখছি। কতো হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো বলে। এখন যুদ্ধ জয়ের মুহূর্ত সামনে। পারবো কি শেষটুকু দেখে নিতে?

কি ভাবছো ইউসুফ? ক্লেয়ারের কণ্ঠ। আমি কিছু বলার আগেই ক্লেয়ার আবার বলে, আমি ঠিক করেছি তুমি মুক্তিবাহিনী কোম্পানিসহ আমার ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এখন থেকে তুমি সার্বক্ষণিকভাবে হেডকোয়ার্টারে অবস্থান করবে। ঠিক আছে?

আমি মাথা নেড়ে বলি, ইয়েস। দায়িত্ব পেয়ে আমার খুবই ভালোলাগছিলো। উৎফুল্ল হয়ে উঠি। ক্লেয়ারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি।

ক্লেয়ার তখন আজিজকে বলে, ক্যাপ্টেন আজিজ তুমি ময়মনসিংহ দখলসহ পাকিস্তানি আর্মির চলার পথে এ্যামবুশ করবে। ওরা যেন ঢাকার দিকে এগোতে না পারে। ওদের গতি রোধ করতে হবে। রাইট?

ইয়েস স্যার।

তখন ঘরের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে আমার নিজের বুকের শব্দ : আমাদের উদ্দেশ্য পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলো পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঢাকা আক্রমণ ও দখল করা। আমরা খবর পেয়েছি ঢাকায় পাকিস্তানি মজুত সৈন্য তেমন নেই। সবই সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা চাইনা ওরা ঢাকায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যূহ গঠন করুক। বাইপাস এ্যাটাক এ্যান্ড এডভান্স রণকৌশলটি তাহেরের পরিকল্পিত। ও বলতো এই পদ্ধতিতে শত্রুপক্ষ মনোবল হারিয়ে ফেলে। হয় তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায় নয়তো আত্মসমর্পণ করে। আমি যুদ্ধের পুরো চিত্রটি নিজের ভেতর দেখতে পাই। আমার সামনে পুরো দেশ। আমি আর আমার ভেতর নেই। আমি এক অসীম যাত্রাপথে আছি। সেই লোকটির মতো যে যুদ্ধের সাহসী চেতনা অনবরত পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে।

সেদিন মধ্যরাতে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা এবং ভারতীয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমানা কর্নঝোরা নামক জায়গাটি পার হয়। আমি আবু ইউসুফ খান এই যাত্রার সঙ্গী।

মাথার ওপরে মহাকাশ। চারদিকে মধ্যরাতের অন্ধকার। আর আমার বুকে আলো। আমরা এগুচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে কর্নঝোরার প্রকৃতিতে ঝিঁঝির শব্দ নেই। সর্বত্র কেবল স্বাগতম ধ্বনি।

ঘ. মধ্যরাত পেরিয়ে যায়। ভোর পাঁচটা। দিনের প্রথম আলো ফুটিফুটি। মিত্রবাহিনী বক্সিগঞ্জ থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থান নিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ১০৫ মি. মি. কামান দিয়ে বক্সিগঞ্জের পাকিস্তানি ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ শুরু করা হয়। মুক্তিবাহিনীর অগ্রগামী দল বক্সিগঞ্জের কাছে পৌঁছে গেছে। মিত্রবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে পারে না শত্রুপক্ষ। ওরা পিছু হটতে শুরু করে। সকাল নয়টায় পাকিস্তান বাহিনী বক্সিগঞ্জ ছেড়ে শেরপুরের দিকে চলে যায়। এগারোটার মধ্যে মিত্রবাহিনী বক্সিগঞ্জের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

আশেপাশের গ্রামবাসী ছুটে আসছে। মানুষের উল্লাসে দিগন্তে বয়ে যায় উৎসবের নদী। এই অপরূপ দৃশ্যের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে স্লোগান : জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বিজয়ের খবরের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জিপ ও সামরিক ট্রাক নিয়ে বক্সিগঞ্জের দিকে রওনা হয় মিত্রবাহিনীর অফিসাররা। ওরা কিছুক্ষণ আগে কামালপুরে বেলুচ রেজিমেন্টের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেছে। সামনে বক্সিগঞ্জ। বিজয়ের উল্লাসে প্রথম জিপটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার এবং জেনারেল গিল যাত্রা করে। কিন্তু খানিকটা পথ এগুনোর পর, কতোক্ষণ? কয় মাইল তা ইউসুফ মনে করতে পারে না। শুধু দেখে সামনের জিপটি একটি এ্যান্টিট্যাঙ্ক মাইনে পড়ে যায়। ওহ্ সে এক ভয়াবহ ঘটনা। জেনারেল গিলের পায়ের গোঁড়ালির নিচের অংশ সম্পূর্ণ থেঁতলে যায়। যেন পিষে সমান হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার হাঁটুতে ব্যথা পায়।

আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ। কামালপুর আর বক্সিগঞ্জের মাঝামাঝি জায়গা। গ্রামের নাম জানা নেই ইউসুফের। উপরে তাকালে দেখতে পায় এম আই–৮ হেলিকপ্টার ল্যান্ড করছে। ভারতীয় অফিসাররা জেনারেল গিলকে ঘিরে আছে। প্রাথমিক শুশ্রূষা দিচ্ছে। হেলিকপ্টার থেকে স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ে আসছে জওয়ানরা। ইউসুফ গিলের পায়ের দিকে তাকিয়ে খুব বিষণ্ন বোধ করে। হেলিকপ্টারে ওঠানোর পর গিল ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলে, হাসপাতালে শুয়ে থেকে তোমাদের ঢাকা প্রবেশের খবরের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে থাকবো। তোমাদের জয় হোক। তোমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়াও ঢাকার ওপর। আমার শুভেচ্ছা রইলো তোমাদের জন্য।

ইউসুফের চোখ ছলছল করে। বলতে চায়, আমাদের স্বাধীনতার জন্য তুমি রক্ত ঝরিয়েছো গিল। আমরা তোমার কথা কোনোদিন ভুলবো না।

কিন্তু বলা হয় না। লজ্জা করে। এমন কথা শুনে গিল যদি হেসে ওঠে? যদি বলে, ইউসুফ তুমি এখনো বালক রয়ে গেছো?

ততোক্ষণে হেলিকপ্টারের প্রপেলার ঘুরতে শুরু করেছে। শব্দ এবং বাতাসের ধাক্কা এসে এলোমেলো করে দেয় ভাবনা। মনে পড়ে যেদিন তাহেরকে নেবার জন্য হেলিকপ্টার এসেছিলো সেদিন ও নিজেও উঠেছিলো হেলিকপ্টারে। আকাশের অসীমে জীবন এবং জগৎ সংসারের সবটুকু ভরে গিয়েছিলো। আজ ভীষণ খালি লাগছে বুক। কিছুক্ষণ আগেও কতো উৎফুল্ল ছিলো গিল। জিপের মাথায় উড়িয়েছিলো বাংলাদেশের পতাকা।

হেলিকপ্টার উড়ে যায় শূন্যে। ক্রমাগত সেটা ছোট পাখির মতো হয়ে যায়। চড়ুই কিংবা টুনটুনি। রাতে বক্সিগঞ্জের ডাকবাংলোয় এসে ইউসুফের বারবারই টুনটুনি আর নাককাটা রাজার গল্পটি মনে পড়ে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে মায়ের মুখ। যে তাকে শৈশবে এই গল্পটি অনেকবার শুনিয়েছে। মা এখন গৌহাটিতে। বাবা-মা দুজনই তাহেরের আহত হওয়ার খবর পেয়ে এসেছে।

ঙ. পরদিন আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনী শেরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আমরা বক্সিগঞ্জ ডাকবাংলো থেকে বেরুবার আগেই গ্রামবাসী কয়েকজন আহত পাকসেনাকে ধরে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। তখন সকাল নয়টাও বাজেনি। পাকসেনারা পালিয়ে যাচ্ছিলো।

একজন গ্রামবাসী বলে, কোথায় পালাবে ওরা? ওরা কি আমাদের দেশের পথঘাট চেনে।

কয়েকজন একসঙ্গে গলা উঁচিয়ে বলে, একবার ভেবেছিলাম আমরা ওদেরকে পিটিয়ে মেরে ফেলি। কিন্তু পরে ভাবলাম আপনাদের হাতে উঠিয়ে দেই। আপনারাই বিচার করেন।

ঠিক আছে ওদেরকে আমাদের কাছে রেখে যাও।

ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের নির্দেশ। গ্রামবাসী আনন্দে উত্তেজনায় ফিরে যায়। আহত পাকসেনাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরমধ্যে বিকেল গড়িয়ে যায়। ওয়্যারলেসে খবর আসে যে অগ্রবর্তী বাহিনী শেরপুর দখল করেছে। পাকবাহিনী শেরপুর থেকে পালিয়ে জামালপুরে চলে যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর অপর পাড়ে জামালপুরে ওদের শক্ত ঘাঁটি আছে। মুক্তিবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ওখানে ওরা অবস্থান নিয়েছে। নদী পার হয়ে ওরা ফেরি নৌকাগুলো সব ডুবিয়ে দেয়। ওদের কাণ্ড দেখে আমার বেশ মজাই লাগে। শেষ তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে ওরা এখনো মরিয়া হয়ে আছে। থাকুক। থাকো বাবারা, নিজের চাইনিজ স্টেনগানে মুখ ঘঁষে আমার স্বস্তি ফিরে আসে।

পরদিন জামালপুরে অবস্থানরত পাকিস্তান আর্মিকে পরাজিত করে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া ছিলো আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা জামালপুর-ময়মনসিংহ রেলপথ ও সড়ক পথ অবরোধ করে রেখেছে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের উজানে ঝগড়ার চরের পাশ দিয়ে কর্নেল ব্রারের নেতৃত্বে মারাঠা রেজিমেন্ট এবং একই পরিমাণের মুক্তিযোদ্ধা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে পেছন থেকে জামালপুর মধুপুর সড়কে অবস্থান নিয়েছে। জামালপুর থেকে বের হওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায় পাকবাহিনীর। আমি ভেবেছিলাম এই পরিস্থিতিতে ওরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উল্টো। পরদিন ভোরবেলা দু'পক্ষ গুলি বিনিময় শুরু করে। বেলা দশটা। ক্লেয়ার বললো, পাকবাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য একটা চিঠি পাঠাতে চাই।

আমরা সায় দিলাম।

কাকে পাঠাবো? ক্লেয়ার জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সি এগিয়ে আসে, আমি যাবো স্যার।

গুড। ভেরি গুড। ক্লেয়ার খুশি হয়ে বলে, জামালপুর পিটি স্কুলে ওরা ক্যাম্প করেছে। ওখানেই পাকবাহিনীর কমান্ডার আছে।

জহুরুল হক তো রেডি। ওর হাতে একটা সাদা পতাকা আর আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো চিঠি দেয়া হলো। চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'তোমাদের আমরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছি, তোমরা আত্মসমর্পণ করো।'

চিঠির উত্তরে পাকিস্তানি কমান্ডার ৭.৬২ চাইনিজ সাবমেশিনগানের একটি বুলেট কাগজে মুড়ে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে একটি চিঠিতে লেখে 'তোমরা আত্মসমর্পণের কথা বলছো, যুদ্ধতো এখনও শুরু হয়নি। পাকিস্তানি বাহিনী কলম দিয়ে যুদ্ধ করতে জানে না। আমরা বুলেট দিয়ে যুদ্ধ করি।'

চিঠিটি পেয়ে ক্লেয়ার গম্ভীর হয়ে যায়। আমরা খানিকটা বিচলিত বোধ করি। ব্যাপার কি? এভাবে ঘেরাও অবস্থায় ওরা কিভাবে এই সাহস করছে? ওদের গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র কি এতোই বেশি যে ওরা বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে? ওরা কিসের জোরে কথা বলছে? আমেরিকা কি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে নাকি?

আমাদের ভেতর নানা ভাবনা কাজ করে। এদিকে সারারাত গুলি বিনিময় হয়। মর্টার ও মেশিনগান ব্যবহৃত হয়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ছে। আমাদের মনোবল প্রবল। কারণ আমরা ওদের ঘেরাও করে রেখেছি। পরদিন সকালে আমরা ভারতীয় বিমানবাহিনীর সহযোগিতা চাই। দুপুরের দিকে দু'টো মিগ জঙ্গী বিমান উড়ে আসে আকাশে। পিটি স্কুলের ওপর রকেট ও বোমা বর্ষণ করে। আমরা আশান্বিত হয়ে উঠি যে এবার ওরা দমে যাবে। কিন্তু না ওরা দমে না। সন্ধ্যার পর পাকিস্তান আর্মির পক্ষ থেকে গোলাবর্ষণ বেড়ে যায়। রাত বারোটা। ওরা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আমাদের অবরোধ ভেঙে ঢাকার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমরাও অতন্দ্র প্রহরী। ওদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেই। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা দ্বিতীয় আক্রমণ চালায়। ভোর চারটা পর্যন্ত এই আক্রমণ চলে। আমরা ডিফেন্সে থাকায় ওরা আমাদের সামনে টিকতে পারে না। সব আক্রমণ ব্যাহত হয়।

ভোর হয়। ঘন কুয়াশায় মোড়া শীতের সকাল। রোদ উঠেছে। গোলাগুলির শব্দ নেই। ওরা নিস্তব্ধ। আহতদের চিৎকার ভেসে আসছে। সেইসঙ্গে গোঙানির শব্দ। আমরা ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি আমার দেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এমন একটি দৃশ্য দেখিনি। যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধ। আহত। নিহত। শত্রুপক্ষের অচেনা সৈনিকের মুখগুলো বিকৃত। তোবড়ানো। বীভৎস। ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, আমি এমনই স্বদেশ চেয়েছি। যেখানে শত্রু আমার পায়ের নিচে অনবরত পিষ্ট হবে। আমার খারাপ লাগছে না, বরং এই নতুন দৃশ্য দেখার উত্তেজনায় আমি ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসি। নীলাভ কুয়াশা ঝরতে থাকে আমার শরীরের ওপর। আমি ছুটতে থাকি। ইতস্তত ছোটা। ডিঙিয়ে যাই লাশ, মাড়িয়ে যাই রক্ত। কুড়িয়ে নেই শত্রুর বুক থেকে খসে পড়া রাইফেল। ছুটতে ছুটতে দেখি শত্রুপক্ষের যারা আহত হয়নি তারা ছত্রভঙ্গ বেসামাল, পায়ে হেঁটে ঢাকার দিকে যেতে চাইছে। মুক্তিযোদ্ধারা ওদের পথ রোধ করে। আমাদের মেডিকেল কোরের ডাক্তাররা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে

থাকে। জওয়ানরা নিহতদের লাশ জড়ো করে। আমরা লাশ এবং আহতদের নিয়ে পাকিস্তানিদের ঘাঁটিতে যাই। ওখানে অবস্থানরত অফিসার এবং সৈনিকরা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ওদের নির্দেশ দেয়া হয় লাশের ব্যবস্থা করতে। ওরা পিটি স্কুলের মাঠে গণকবর খুঁড়ে লাশ সমাহিত করে। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আহত এবং জীবিত বন্দীদের ভারতে পাঠিয়ে দেই। জামালপুর পতনের পর জেনারেল নাগরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হন।

শহরজুড়ে আনন্দ-উল্লাস। মনে হলো জামালপুর শহরে ঘরে কেউ নেই। নারী-পুরুষ শিশুরা বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। ওরা আমাদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করে। যারা স্বজন হারিয়েছে তাদের মনে আনন্দ ও বেদনা। তবুও সবার মুখে হাসি। জেনারেল নাগরা একজন শহীদের ছেলেকে কোলে তুলে নিলে আমাদের সবার চোখ ভিজে ওঠে।

এতো আনন্দের মধ্যেও ঢাকায় পৌঁছার জন্য আমরা উদগ্রীব। জামালপুর শহরের বাস, ট্রাক জড়ো করে আমরা ঢাকার দিকে রওনা হই। আমরা খবর পেয়ে গেছি যে ১১ নম্বর সেক্টরের হাতে জামালপুরের পতনের পর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল থেকে পাকিস্তান বাহিনী পিছু হটতে থাকে। তবু আমাদের আশঙ্কা ছিলো। তাই আমরা সাবধানের সঙ্গে এগোই। মধুপুরে পৌঁছে জানতে পারি একটি বিরাট পাকিস্তানি বাহিনী মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে টাঙ্গাইলের দিকে চলে গেছে। এরা ছিল ময়মনসিংহে অবস্থানরত পাকিস্তান ৯৩ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড। এই ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো ব্রিগেডিয়ার কাদের। আমরা পৌঁছানোর আগেই ভারতীয় প্যারা কমান্ডোরা টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানার কাছাকাছি অবতরণ করে। ওঁরা অবতরণের জন্য ঢাকামুখী রাস্তার পাশই বেছে নিয়েছিলো। এর প্রধান কারণ ছিলো পলায়নরত পাকবাহিনীকে আক্রমণ করা। ওরা করেওছিলো তাই। ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলো শত্রু সেনা বহর। দুপুরের পর আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই আবার সেই একই দৃশ্য। ছিন্নভিন্ন লাশ। রক্ত। জমাট এবং কালচে। আমার চিরচেনা স্বদেশের মধ্যে নতুন দৃশ্য। আনন্দ এবং উত্তেজনার যুগপৎ সম্মিলন। যেন এক অদৃশ্য বাঁশি এবং সেতারের মিলিত ঝঙ্কার আমার বুকের ভেতর। আরো মাইলখানেক এগিয়ে যাবার পর আমরা ছত্রী সেনাদের দেখা পাই। ওরা সাকসেসফুল অপারেশনের পরে একটি সেতুর নিচে বসে চা আর নিমকপারা খাচ্ছিলো। আমাদের দেখে হৈ-চৈ করে ওঠে। খোলা আকাশের নিচে আমাদের এ এক মহামিলন। আমাদের সামনে তখনো এক দীর্ঘপথ। তবু চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হয়েছিলো, আমিই স্বদেশ।

আবার রওনা হই। সামনে ঝাংড়া গ্রাম। সেখানকার একটি বড় মাঠে আমরা মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর জন্য অপেক্ষা করি। খিদে পেয়েছে। পিপাসাও। টিউবওয়েল ছিলো। সেটা চেপে আমরা প্রাণ ভরে পানি খাই। বেলা তিনটার দিকে কাদের সিদ্দিকী আসে। সঙ্গে কয়েকজন যোদ্ধা। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হয়। সবটাই যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে কথা। তারপর সে তার এলাকায় ফিরে যায়। আমরাও রওনা করি। সন্ধ্যার আগে টাঙ্গাইলে পৌঁছে যাই। ওয়াপদা রেস্ট হাউসে আমরা বিশ্রাম নেই। রাতে চমৎকার ঘুম হয়। গত কয়েকদিনে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। তাছাড়া রাতে কাদের সিদ্দিকীর আমন্ত্রণে ভুনা মাংস আর পরোটা খেয়েছি। খাবার এবং ঘুম দুটোই আমাকে ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়। যেন ঘরে পৌঁছে গেছি।

পরদিন টাঙ্গাইল শহরে বিজয়ের উল্লাস। ঘরে ফেরার উপলব্ধির সঙ্গে এটি একটি বাড়তি যোগ। এরমধ্যে ভারতীয় আর্মি ইঞ্জিনিয়ার ব্রহ্মপুত্রের ওপর ভাসমান সেতু তৈরি করে

ফেলেছে। সামরিক যানবাহন পারাপার করে নিয়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে আমরা মির্জাপুর হয়ে ঢাকার দিকে রওনা হই। রাতে কালিয়াকৈরে বিএডিসি কমপ্লেক্স-এ আমাদের বাহিনী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। অনেক রাত পর্যন্ত ঢাকা আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা হয়। আমার মনে হয় আজ রাতটা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। চলেই তো এসেছি ঘরের দোরগোড়ায়। অনেকরাতে বাইরে এসে বসি। লোকটি আমার কাঁধে হাত রাখে, ইউসুফ?

বলো।

চলো ওই মাঠে হেঁটে আসি। দেখো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। শহরের মানুষ ঘুমিয়ে গেছে। তোমার এই নিস্তব্ধতা ভালোলাগছে না?

লাগছে। ভীষণ ভালোলাগছে।

তুমি না বলো তুমিই স্বদেশ।

বলিতো। এটা ভাবতে আমার দারুণ ভালো লাগে। এই শহরের মানুষেরা আজ রাতে নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পারছে।

তোমার স্ত্রীর নাম কি ইউসুফ?

পারুল।

তোমার ছেলের নাম?

শ্রাবণ। কেন এসব জিজ্ঞেস করছো?

তুমিই স্বদেশ। তোমার জমিন, তোমার ফসল।

প্রত্যেকেই তো এমন ভাবে?

ভাবে। নানাভাবে, নানারকম করে।

লোকটির কথা শুনে আমার ভীষণ হাসি পায়। এই সরল কথাটি ও এমন করে জিজ্ঞেস করে কেন? ও নিজে কে? ও নিজেওতো এই সরল সত্যের অংশ। এই মুক্ত শহরে আজ রাত আমার, পারুলের এবং শ্রাবণের। লোকটি এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। ও চলে গেছে অন্য কোথাও। এভাবেই ও চলে যায়। আমি জানি আমাকে জাগিয়ে দেবার জন্য ও এসেছিলো। আসলে ও বলতে চেয়েছিলো, এই সুনসান রাতের অপূর্ব আকাশের গোল চাঁদ আমারই ছেলে শ্রাবণের মুখ। কতো বয়স হলো ওর? বছর দেড়েক। আমি জানি পারুল আর ও অবরুদ্ধ শহরে ভালো আছে। ওরা আমার ফেরার অপেক্ষায় আছে। একজন গভীর উৎকণ্ঠা, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর অবোধ শিশুটি কিছু না বুঝেই আমার অপেক্ষায় আছে। ও এখনো চেনেই না ওর বাবা কে? আমরা দুজন নারী-পুরুষ ওর স্বাধীন স্বদেশে গড়ে দেবো ওর ভবিষ্যৎ। তাই আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরছি।

পরদিন সকালে আমাদের অগ্রগামী বাহিনী কড্ডা সেতুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আমরা আগেই গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছি যে জয়দেবপুর থেকে কড্ডা সেতু পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী বেশ বড় ধরনের অবস্থান নিয়ে আছে। সেতুর গোড়ায় রাখা আছে কয়েকটি ট্যাংক। ওই ট্যাংক থেকে আমাদের অগ্রগামী দলের ওপর ওরা গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

এদিকে আমরা কালিয়াকৈর থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতেই দেখতে পাই রাস্তার পাশের শালবন থেকে পাকিস্তান আর্মির একজন জুনিয়র অফিসার সাদা রুমাল উড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। জিপে ছিলাম আমি আর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। আমরা জিপ থামাই। অফিসারটি এগিয়ে এসে বলে, ৯৩ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার

কাদের আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত। তিনি খুবই ক্লান্ত এবং অসুস্থ।

ঠিক আছে। ডাকুন তাকে। ক্লেয়ার বলে।

শালবনের ভেতরের একটি মাটির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ব্রিগেডিয়ার কাদের। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুবই অসুস্থ। ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না। লাঠিতে ভর করে এগিয়ে আসছে। সাথে আরো কয়েকজন অফিসার। এই প্রথম আমরা একজন উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারকে হাতে পেলাম। ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার কাদেরের সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করে, কমান্ডার হোয়ার ডিড ইউ ফেইল? কাদের ক্লান্ত বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আই ক্যান নট ফাইট এগেনিষ্ট মাই হোল পিপল এ্যান্ড আই ডিড নট এক্সপেক্ট সাচ এ ফাস্ট মুভ ফ্রম ইউ।

ক্লেয়ার হো হো করে হাসে। তারপর আমাকে দেখিয়ে বলে, এ হলো আবু ইউসুফ খান। পাকিস্তান এয়ারফোর্সের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষক। এ ছাড়াও তার আর একটি পরিচয় আছে। ও হলো এই ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর আবু তাহেরের বড় ভাই।

ব্রিগেডিয়ার কাদের আমার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলে,তাহের কোথায়? আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই । কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে ও আমার ছাত্র ছিলো । প্রিয় ছাত্র।

আমি এক মিনিট চুপ থেকে, নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, তাহের যুদ্ধে আহত হয়েছে। বাম পা নেই। ও এখন গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে।

ওহ,বলে কাদের অস্ফুট শব্দ করে। আমি অবাক হয়ে দেখি কাদেরের চোখে পানি। আশ্চর্য! ও পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছে বলে, ও ওর কজের জন্য লড়েছে,আমি আমার। আমরা দুজনেই যোদ্ধা।

ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার কয়েকজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে সঙ্গে দিয়ে ব্রিগেডিয়ার কাদেরকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে ভারতে পাঠিয়ে দেয়।

এদিকে কড্ডা সেতুর কাছে আমরা আটকা পড়েছি। আর এগুনো যাচ্ছে না। ভারতীয় বিমানবাহিনী উড়ে আসে আকাশে। কোনাবাড়ি, কড্ডা, জয়দেবপুর ও ঢাকা জেলার আশে পাশে বোমা বর্ষণ করে। পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পনের জন্য ভারতীয় বেতার থেকে বারবার আহবান জানানো হতে থাকে। এখন আমরা ভিন্নপথে ঢাকা পৌঁছানোর চিন্তা করি। আমরা কাসিমপুর গ্রামের পাশ দিয়ে কড্ডা নদী ও তার পাশের আর একটি ছোট নদী পার হয়ে জয়দেবপুর বাইপাস করে টঙ্গি শিল্প নগরীর উদ্দেশ্যে কয়েকটি কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা এবং কর্নেল ব্রারের নেতৃত্বে ১৩ গার্ড রেজিমেন্টকে রওনা করিয়ে দেই।

গ্রামবাসী কী অসাধারণ দক্ষতায় নৌকা জোগাড় করে মুক্তিযোদ্ধাদের পারাপারের ব্যবস্থা করে। মুহূর্তে গ্রামে খবর রটে গেলে যার কাছে যে ধরনের নৌকা ছিলো, ছোট কিংবা বড়, সব নিয়ে আসে। কতো শৃঙ্খলা, কতো তৎপরতা। সাধারণ মানুষের যেন এক অন্যরকম লড়াই। নদীর ধারের একটি বাড়িতে ঢুকি পানি খাওয়ার জন্য। বাড়ির ছেলেটি যুদ্ধে গেছে। বাড়িতে ওর যুবতী স্ত্রী আর বড়ো বাবা-মা আছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

হালিমা।

আমাদের পানি খাওয়াও।

মেয়েটি দৌড়ে চলে গেলো পানি আনার জন্য। বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, দেশ কি স্বাধীন হয়ে গেলো বাবা?

আর একটু বাকি। হয়ে যাবে। আপনারা ভালো ছিলেন তো?

বুড়ি কঁকিয়ে বলে, ভালো কি আর থাকবার পারছু। গরু ছাগল, হাঁস-মুরগি সব খ্যায়ে শেষ করছে হারামীরা।

যাক প্রাণে তো বেঁচে আছেন।

তা ঠিক। বুড়ো মাথা নাড়ে। জানে মরি নাই। ইজ্জতের ক্ষতি হয় নাই। মেয়েটারে কতো কষ্টে যে বাঁচায়ে রাখছি। দেখবেন আসেন।

বুড়ো আমাদের ঘরে নিয়ে যায়। চৌকি সরিয়ে দেখালো যে ওটার নিচে একটা গুহার মতো করা আছে। মুখটা হাবিজাবি নানা কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা। বুড়ি বললো, মেয়েটা সারাদিন ঐটার ভেতরে থাকতো। রাতে বার করতাম।

তখন হালিমা আমাদের জন্য জগ ভর্তি পানি নিয়ে আসে। পানি খেয়ে ওকে বলি, এখানে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে হালিমা, না?

কষ্ট? একটুও না। সারাদিন গর্তে থাকার সময় আমি একটা চোঙ্গা বুকে জড়ায়ে ধরে রাখতাম, আর আল্লারে ডাকতাম। হালিমা হাসি মুখে বলে, আল্লাহ আমার ডাক শুনছে।

তাই নাকি! কিসের চোঙ্গা?

বাঁশের।

কি ছিলো ওর মধ্যে?

দেখবেন? খাড়ান বার করি।

ও হাবিজাবি জিনিসপত্র সরিয়ে বাঁশের চোঙ্গাটা বের করে আনে। তারপর আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে সরল হাসিতে উদ্ভাসিত করে তোলে নিজেকে। আমরা অবাক হয়ে দেখি ও চোঙ্গার ভেতরে দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা বাংলাদেশের পতাকা বের করে। দু'হাতে উঁচু করে ধরে বলে, এই দেখেন?

কোথায় পেয়েছিলে?

আমার স্বামী যুদ্ধে যাওয়ার আগে বাড়িতে আ্নছিলো। আমি যত্ন করে রাখছি। মনে আশা ছিলো দেশ স্বাধীন হলে নিজ হাতে আমাদের উঠানে বাঁশের মাথায় বেঁধে উড়ায়ে দেবো।

চলো, আমরা সবাই মিলে তোমার পতাকা উড়ানো দেখবো।

সত্যি? ওর দৃষ্টি চকচক করে। ছুটে গিয়ে একটা লম্বা চিকন বাঁশ নিয়ে আসে উঠোনের কোণা থেকে। মনে হয় বাঁশটা বুঝি এজন্যই রাখা ছিলো।

ও বাঁশের মাথায় বেঁধে পতাকাটা উড়িয়ে দেয়। আমরা সবাই মিলে মনের আনন্দে 'সোনার বাংলা' গানটা গাইলাম। বেরিয়ে আসার সময় হালিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা সবাই যুদ্ধ করছেন সার?

হ্যাঁ, যুদ্ধইতো করেছি। এখন আমরা ঢাকা দখল করতে যাচ্ছি।

আপনার কষ্ট হয়েছে?

না, একটুও না। কষ্ট হবে কেন? দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা তো গর্বের কথা।

তাহলে আপনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যান যে আমার কষ্ট হয়েছে কিনা?

তাই তো! আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকি।

যার স্বামী যুদ্ধ করে তার আবার কষ্ট কিসের? মিলিটারি গ্রামে অত্যাচার করেছে এটাই আমার কষ্ট ছিলো। আমার কাছে যদি একটা রাইফেল থাকতো!

আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ও কি বুঝলো কে জানে। আমার পায়ে হাত

দিয়ে সালাম করে বললো, আপনি যুদ্ধ করছেন এইজন্য সালাম করলাম। এই গাঁয়ে যদি আবার আসেন তাহলে আমাদের বাড়িতে আসবেন। আমার স্বামী ফিরে আসলে আমি তাকে আপনার কথা বলবো।

হ্যাঁ, বাবা তুমি আবার আসবা। তোমাদের সঙ্গে আমার ছেলেটা নাই কেন বাবা?

বুড়ি আঁচলে চোখ মোছে।

আপনার ছেলে হয়তো অন্য জায়গায় যুদ্ধ করেছে। সেজন্য আমাদের সঙ্গে নেই। দেখবেন দু'চার দিনের মধ্যে ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে।

তোমাদের দেখে খুব শান্তি পেলাম বাবা।

বুড়োবুড়ি আমাদের পিছু পিছু নদীর ঘাট পর্যন্ত আসে। সেখানে গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা জমা হয়েছে। ওরা আমাদের দুজনের জন্য অপেক্ষা করছিলো। ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনারা সাহায্য না করলে আমরা এতো অল্প সময়ে এই দুটি নদী পার হতে পারতাম না। আমাদের জন্য এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকলো। কি বলে যে আপনাদের—

বলেন কি স্যার? হৈ-চৈ করে ওঠে কয়েকজন।

একজন তরুণ এগিয়ে এসে বলে, নৌকা যদি না থাকতো তাহলে আমরা গাঁয়ের লোকেরা চিৎ সাঁতারে ভেসে থাকতাম। আপনারা আমাদের বুকের ওপর দিয়ে মার্চ পাস্ট করে চলে যেতেন। দেখতেন আমাদের বুকের হাড় মড়মড় করে উঠতো না।

সেটা যদি না হতো তাহলে আমরা আপনাদের কাঁধে তুলে পার করে দিয়ে আসতাম। আল্লাহর কসম একটুও মিথ্যে না।

আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। আমার মনে হয় আমার চারপাশের বাতাসে রাশি রাশি ফুলের পাপড়ি। বিছিয়ে যাচ্ছে জমিনে, নদীতে। আমি স্বপ্নের ঘোরে নৌকায় উঠি।

নদীর ওপারে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি যে পাকবাহিনী আমাদের এই কৌশল টের পেয়ে কড্ডা সেতু ও পাশের আর একটি সেতু উড়িয়ে দিয়ে ঢাকার দিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের অগ্রগামী বাহিনী ওদের আক্রমণ করে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওরা দ্রুত সরে পড়ে। এদিকে সেতু না থাকার ফলে আমরা বিপদে পড়ি। সামরিক যান নিয়ে ঢাকা অভিমুখে আমাদের প্রধান বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। আমরা বিকল্প রাস্তা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হই। আমি বুঝে যাই যে পথ আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ দেশের রাস্তাঘাট আমাদেরই চেনা। বিকেলে আমি একটি জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। গাড়ি চালাচ্ছে শুকলা। ও চারদিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বললো, ইউসুফ তোমাদের দেশটা খুব সুন্দর। মনে হচ্ছে নদীগুলো কথা বলতে পারে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠি। ও বেশ নির্বিকার। আমি বলি, শুকলা তুমি দেখছি কবি হয়ে গেলে।

ও আগের মতোই নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, স্কুলে পড়ার সময়ে আমি কবিতা লিখতাম। বাবা মরে যাওয়ার পর পড়ালেখা হলো না। ড্রাইভিং শেখার পর আর্মিতে চাকরি হয়ে গেলো।

এবার আর আমি হাসতে পারলাম না। শুকলার কণ্ঠে যাদু। বিষাদ নয়, দুঃখ নয়, আমার মনে হলো ওর কণ্ঠে সুর আছে—যে সুর একজন মানুষ খুব যত্নে নিভৃতে লালন করে। তা খুব আন্তরিক মুহূর্তে প্রকাশ পেয়ে যায়। বাংলাদেশে ঢোকার পর পাঞ্জাবের অধিবাসী শুকলা

দীর্ঘকাল পর হয়তো নিজের ভেতর এমন একটা জায়গা দেখতে পেয়েছে।

একটু পর ও ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, তুমি কখনো কবিতা লেখোনি ইউসুফ?

আমি হাসতে থাকি। বুঝতে পারি গাড়ি-চালক শুকলা বেশ মুডে আছে। আবার বলে, তোমার হাসি শুনে আমি বুঝতে পারছি যে তুমি কবিতা লিখলেও এখনকার মতো যোদ্ধাই হতে। দেশের স্বাধীনতার জন্য কতো হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ছুটে এসেছো।

ওর আন্তরিক কথা আমার ভালো লাগে। হালকা কণ্ঠে বলি, এয়ারফোর্সের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষক হয়ে কবিতা হয় না শুকলা, যুদ্ধই হয়।

ও আমাকে সমর্থন করে ঘাড় নাড়ে। তারপর অসাধারণ সুন্দর কণ্ঠে দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে, কবিতাই যুদ্ধ। যুদ্ধও মানুষকে কবি করে। তোমাদের যুদ্ধে উপস্থিত থেকে আমি এ দু'টোই দেখেছি।

আমি ওর ঘাড়ে হাত রেখে মৃদু চাপ দেই। খুঁজতে খুঁজতে কোনাবাড়ি এলাকা থেকে সাভারের দিকে যাওয়ার একটি রাস্তা খুঁজে পাই। আমাদের সঙ্গে যে ম্যাপ ছিলো সেই ম্যাপে এই রাস্তাটির উল্লেখ ছিলো না। আমি হুররা করে চিৎকার করে উঠলে লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি ওকে বলি, দেখো আমি একটি দারুণ আবিষ্কার করেছি।

লোকটি মৃদু হেসে বলে, ঠিকই করেছো। এটি নবীনগরের রাস্তা। সাভারের সঙ্গে লিঙ্ক আছে। পাকিস্তানি আর্মি কর্নেল ফজলে হামিদ এই পথেই পশ্চাৎপসরণ করেছে। ওরা না থাকার কারণেই রাস্তা ফাঁকা।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, তাহলে আজ রাতেই মিত্রবাহিনী মিরপুর লোহার সেতুর কাছে পৌঁছে যাবে।

হ্যাঁ, যাবে। তুমি কি আর একটি খবর শুনেছো?

লোকটি উদগ্রীব দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকায়।

শুনেছি। আমরা জেনারেল নিয়াজীর একটি সিগনাল ইন্টারসেপ্ট করেছি।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো।

সিগন্যালে বলা হয়েছে সকল পাকিস্তানি বাহিনী যেন ঢাকায় এসে আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হয়।

লোকটির দিকে তাকিয়ে আমি চেঁচিয়ে বলি, এই সিগনালটি ওরা বারবার প্রচার করছে। ওদের সময় ফুরিয়েছে, বন্ধু ওদের সময় ফুরিয়েছে।

আমি ওর হাত জড়িয়ে ধরতে গেলে দেখল্যাম লোকটি নেই এবং কি আশ্চর্য আমার হাত দু'টি ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। চলে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। ওই হাতের নিয়ন্ত্রণ আর আমার নিজের নেই।

চ. লোকটি তখন জেনারেল নিয়াজির ট্যাকটিকাল হেড কোয়ার্টারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধীয় সদর দফতরটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আধা মাইলের মধ্যে এক জনশূন্য জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। যুদ্ধের আতঙ্ক শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার সদর দফতর সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘন ডালপালা বিস্তীর্ণ একটি গাছের নিচে মাটির

প্রায় তিন মিটার ভেতরে এই সদর দফতরটি বানানো হয়। লোকটি ছয়টি সিঁড়ি ধীর পায়ে নেমে আসে। সিঁড়ির বাঁ দিকে মোড় নিয়ে তিনটি ছোট ঘর। এগুলো পার হলে লম্বা করিডোর। করিডোরের শেষ মাথায় বড় আকারের ঘরটিই ট্যাক সদর দফতরের অপারেশন রুম। অন্য কথায় বলা যায় এটিই পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু।

লোকটি যখন ঘরটিতে ঢোকে তখন জেনারেল নিয়াজী অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলো। ঘরটির সবগুলো দেয়ালই ঢাকা বড় বড় অপারেশনাল মানচিত্র দিয়ে। ঘরের একপাশে সারি করে টেবিল রাখা আছে। ওগুলোর ওপরে সাজানো টেলিফোন আর বেতার যন্ত্র। দেয়াল পেছনে রেখে জেনারেল নিয়াজী দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে ত্রিশ জন অফিসার বসে আছে। নিয়াজী কথা বলছে আর পায়চারি করছে। তার কথার মূল বিষয় হলো খোলাখুলি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সভা শেষে সবাই চলে গেলে লোকটি সিদ্দিক সালিকের সামনে এসে দাঁড়ায়। সালিক থতমত খেয়ে বলে, তুমি এখানে?

লোকটি মৃদু হেসে বলে, এলাম। তুমি আমাকে মনে রেখেছো দেখছি।

সালিক বলে, মনে আছে তোমার সঙ্গে আমার কোথায় পরিচয় হয়েছিলো?

নিশ্চয়ই আছে। তেজগাঁ বিমানবন্দরে। যেদিন তুমি ঢাকায় প্রেস অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে বদলি হয়ে এলে।

তোমার কণ্ঠ কেমন জানি শোনাচ্ছে।

শোনাবেই তো। কারণ সেদিন তোমার ড্রাইভার আমাদের একটি বালককে বলেছিলো তোমার স্যুটকেসটি জিপে উঠিয়ে দেবার জন্য।

বালকটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আমার স্যুটকেসটি জিপে উঠিয়ে দিয়েছিলো।

সেটিই সঙ্গত ছিলো না কি?

হ্যাঁ ছিলো, আমি মানি। কারণ আমি বালকটিকে ওর মজুরি দিতে গেলে ড্রাইভার আর্ত চিৎকার করে বলেছিলো, করছেন কি? এই হারামজাদাদের আর নষ্ট করবেন না। আমার পাঞ্জাবি ড্রাইভারের আচরণে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম।

তুমি অনেক মানবিক। ওদের অনেকের মতো নও।

তোমরা এখন তোমাদের বিজয়ের দোরগোড়ায়।

হা-হা করে হেসে ওঠে লোকটি।

সালিক বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, হেসোনা।

হাসবোই তো। আনন্দের হাসি। আমি জানি সরাসরি যুদ্ধ শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাদের নৌ-বাহিনী আর বিমান বাহিনী শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ভর করছে জেনারেল নিয়াজী আর পঁয়তাল্লিশ হাজার সামরিক সৈনিকের ওপর। অবশ্য এর সঙ্গে তিয়াত্তর হাজার আধা-সামরিক সৈনিকও রয়েছে।

ঠিকই জানো। এখন জেনারেলের নৈতিক সাহস আর তার সৈনিকদের দৈহিক শক্তির ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

লোকটি আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, এখন তোমাদের দম্ভ চূর্ণ। ক্ষমতা গোটানোর পালা।

ওহ, তুমি এমন করে বলো না।

সালিক দেখে লোকটি নেই। করিডোরের মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে আছে। ওর চারদিকে

পতনের শব্দ। হুড়মুড় করে ভেঙে আসছে চারদিক। সত্তর সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় আসার পর থেকেই দেশের রাজনীতি ওকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। ও আসার আগে রাওয়ালপিণ্ডিতে ওকে বলা হয়েছিলো যে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা হচ্ছে ঘোমটার আড়ালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা মাত্র। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিলো তা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। ও ভেবেছিলো, এ দু'টি অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তো আমি কিছুই জানি না। ওখানে গিয়ে বাঙালিদের সঙ্গে মিশলে জানতে পারবো সত্যিকার ঘটনা। ঢাকায় আছে পঁচিশ হাজার সদস্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী। আমি তাদের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছি। ভারতের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় ভেবেছিলাম ভারত যদি কখনও পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এখানকার সেনাবাহিনী তা মোকাবেলা করতে পারবে তো? ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। কি করবো নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য স্মৃতি আঁকড়ে ধরি। কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি। যেমন এই ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। আর ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন একজন বাঙালি। তাহলে পাকিস্তানের বিপদ হবে কেন? না, আমরা ভালোই থাকবো। এই সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হই আমি পাকিস্তানের একজন অনুগত নাগরিক।

সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে একজন সহকর্মী বলেছিলো, তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি একটা খারাপ সময়ে এখানে বদলি হয়ে এসেছো।

তাই নাকি? আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

কিছুদিন থাকলেই টের পাবে যে এখানকার সবকিছুতে তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে।

বুঝলে না মার্শাল ল এখানে কার্যকর নেই। আর একজনের কণ্ঠ।

ঘরের জন্য আসবাব বা ক্রোকারিজ তেমন কিছু কিনো না। বলা যায় না কখন পাততাড়ি গোটাতে হবে।

শোনো তোমার ব্যাংক একাউন্ট ক্যান্টনমেন্টের ন্যাশনাল ব্যাংক শাখায় নিয়ে এসো। যেন শহরে বেশি যেতে না হয়।

সবচেয়ে জরুরি যেটা তা হলো তুমি যার জায়গায় বদলি হয়ে এসেছো সেই ফ্ল্যাটটাতেই থাকার চেষ্টা করবে। ওই ফ্ল্যাটটি ভীষণ নিরাপদ। ওখানে কেউ বোমা ছুঁড়তে পারবে না।

প্রথম দিন সহকর্মীদের এইসব কথায় আমি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ি। বুঝতেই পারি না যে আমার কোনো অপরাধ ছাড়া কেন একজন বাঙালি আমার বাড়িতে বোমা মারবে। নিশ্চয়ই আমার সহকর্মীরা নিজেরা এসব কল্পনা করছে। আমি পাত্তাই দিলাম না।

কদিন পর আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করলাম চলে আসার জন্য। ও এলো। দুজনে সংসার গুছিয়ে বসার জন্য তোড়জোড় শুরু করলাম। পরদিন ধাক্কা খেলাম যখন আমার স্ত্রী দু'জন আয়া রাখলো। আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? ও বললো, রাওয়ালপিণ্ডিতে আমি যে টাকায় একজন আয়া রাখতে পারতাম, এখানে সে টাকায় দুজন আয়া রাখতে পারছি। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। এই বৈষম্য আমি মানতে পারলাম না। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের পুরো চিত্রটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। দেখলাম রাস্তাঘাটে অর্ধ-উলঙ্গ ক্ষুধার্ত মানুষ। নোংরা, গরিব। শহরের মাঝখানে বস্তি। শিশুদের অবস্থা খুবই করুণ। যেখানেই আমি থেমেছি —রাস্তা কিংবা বাজার সবখানে ভিক্ষুকের দল আমাকে ছেঁকে ধরেছে।

আমি বুঝতে পারলাম পূর্ব পাকিস্তানের গরিবেরা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়েও গরিব। এরা কেন দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলে তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু নিজের চোখে দেখতে পাই। যেটা বাঙালিদের যথার্থ দাবি।

লোকটি আবার এসে ওর সামনে দাঁড়ায়, সালিক?

বলো। সালিক ওর দিকে তাকায় না।

তোমরা এখন কি করবে?

আমার জেনারেল জানে।

তোমার জেনারেল তোমাকে কি বলেছে তা আমি জানি।

তিনি তো সারাক্ষণই আমাকে কিছু না কিছু বলে। কোনটার কথা তুমি বলছো? প্রচলিত নিয়ম বিধির খসড়া তৈরি করা?

না। তিনি বলেছিলেন তাঁর যন্ত্রণার কথা। বলেছিলেন, সালিক তুমি ভাগ্যবান। তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে আজকে তুমি একজন জেনারেল নও।

চুপ করো। আমি এসব কথা শুনতে চাই না।

কিন্তু তুমি তোমার জেনারেলকে কাঁদতে দেখেছো।

আহ্ বলছি চুপ করো। গেট লস্ট।

লোকটির হা-হা হাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। সালিক দু'হাতে কান চেপে ধরে। বিড়বিড় করে বলে, ওদের প্রতি আমরা অনেক অন্যায় করেছি। নিজেদেরই ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে নিজেদের। তবু মানতে পারছি না। কি করে রোধ করা যাবে এ ভাঙন?

ও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। চারদিকে জনশূন্য প্রান্তর। ওর ভীষণ ভয় করে। কষ্ট হয়। তবু ও হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হয় ও জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে কথা বলছে। প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করে, পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ হতে যাচ্ছে আপনি এর জন্য কতোটা দায়ী?

আমি একটুও দায়ী নই। এরজন্য ইয়াহিয়া খান দায়ী।

আপনি কি কখনো তাঁকে জানিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার জন্য যে ধরনের যুদ্ধ উপকরণ আপনি চেয়েছেন তা এ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়?

তারা কি কচি খোকা? না কি তারা সামরিক ব্যক্তি নয়? যুদ্ধের কিছুই জানে না? তারা কি জানতো না মাত্র তিনটি পদাতিক ডিভিশন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি শক্তির মোকাবেলা সম্ভব না।

যতো যা কিছুই বলেন না কেন ঢাকা রক্ষায় আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। এ দায়িত্ব আপনার। ঢাকাকে আপনি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেন নি। সেখানে সৈন্যও ছিলো না।

এর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি দায়ী। ওরা আমাকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আটটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পাঠিয়েছে মাত্র পাঁচটি। বাকি তিনটি না আসার আগেই আমাকে না জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্ট খুলে দেয়া হয়। আমি তো ওই তিনটি ব্যাটেলিয়ন ঢাকায় রাখতে পারতাম।

কিন্তু ডিসেম্বরের তিন তারিখের পর আপনি বুঝে গিয়েছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কিছুই আসতে পারবে না। ঠিক না?

হ্যাঁ, ঠিক।

তাহলে নিজস্ব যা কিছু ছিলো তাই দিয়ে রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তুললেন না কেন?

কি করে করতাম? তুমি তো জানো একই সঙ্গে সকল সেক্টরে চাপ সৃষ্টি হলো। সব জায়গাতেই সৈনিকদের নিয়োজিত রাখতে হয়েছিলো। কাউকেই তো প্রত্যাহার করে আনা সম্ভব ছিলো না।

ঢাকার অল্প পরিমাণ যা ছিলো তা দিয়ে আরো কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন।

তুমি অযথা তর্ক করছো। কি লাভ হতো তাতে? আরো মৃত্যু আর ধ্বংসই ছিলো না কি এর পরিণতি? এখন ভেবে দেখো কোনটা ভালো, নব্বই হাজার বিধবা আর পাঁচ লক্ষ অনাথ শিশুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে আমি নব্বই হাজার যুদ্ধবন্দী নিয়ে দেশে ফিরবো। এটা কি অনেক বেশি মূল্যবান নয়?

হয়তো মূল্যবান। কিন্তু তবু আমার মনে হয় এটা করলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাস অন্যরকম হতো। সামরিক অপারেশনের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো।

সালিক দেখতে পায় নিয়াজী জবাব দিলো না। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ওর কানের পাশ দিয়ে বয়ে যায়। এ দীর্ঘশ্বাসের অভিজ্ঞতা সালিকের নেই। এখানে আসার পর থেকে বাঙালিদের কোনো দীর্ঘশ্বাস ও শোনেনি। পাকিস্তানিদেরও না। এতোদিন তো এদের মনে জয়ের আশা ছিলো। এখন দীর্ঘশ্বাস ঝড়ো বাতাসের মতো বইছে। এখন দেখতে হবে বাঙালির স্বাধীনতার উৎসব।

সালিকের মন খারাপ হয়ে যায়। ও হাঁটতে থাকে।

লোকটি এসে ওকে ডাকে, সালিক?

বলো। সালিক ওর দিকে তাকায় না।

তোমাকে ডাকছে সবাই।

জানি। তুমি যাও। তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরো।

কেন তুমি কি আমার চোখেও ঘৃণা দেখতে পাচ্ছো? সেই কুলি বালকটির মতো, যাকে তুমি এখানে আসার প্রথম দিন তেজগাঁ এয়ারপোর্টে দেখেছিলে?

না। আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অন্যরা পাবে।

কারণ তুমি আমার বন্ধু। তোমার ভেতরে অনেক মানবিক গুণ আছে, সেটা অন্যদের নেই। চলো যাই।

সালিক ওর জিপে ওঠে। আতঙ্কিত ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলে, স্যার আমাদের কি হবে? শুনতে পাচ্ছি মুক্তিবাহিনী মীরপুর সেতুর কাছে এসে গেছে?

ঘাবড়িও না। শান্ত থাকো।

আমরা বাঁচবো তো?

সালিক কথা বলে না। ও তো জানে ১০১ কমিউনিকেশন জোন-এর মেজর জেনারেল নাগরা মীরপুর সেতু থেকে বেশ দূরে অবস্থান নিয়েছে। জেনারেল নিয়াজীর কাছে চিরকুট পাঠিয়েছে। লিখেছে : প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখন মীরপুর সেতুর কাছে। আপনার প্রতিনিধি পাঠান।' জিপ থেকে নেমে সালিক যখন ঘরে ঢোকে তখন নিয়াজীসহ অন্যরা গম্ভীর মুখে বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই। সবার কপাল কোঁচকানো। চিন্তায় পিষ্ট হয়ে আছে ত্বক। সালিকের মনে হয় এটা একটা দারুণ নাটক। এখন ক্লাইমেক্স। নাটকের হিরো নিয়াজী।

ম্রিয়মান, বিমর্ষ। নাগরার পাঠানো চিরকুটটি যেন একটি জীবন্ত চরিত্র। কঠিন রাইভাল। ছোট একটি কাগজ যে এতো তীক্ষ্ণ হতে পারে সালিক এটা এই প্রথম উপলব্ধি করে। লোকটি সালিকের কানে কানে বলে, তুমি কি জানো এখন এই ঘরজুড়ে একটি মাত্র প্রশ্ন খড়্গের মতো ঝুলছে?

সালিক অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে, কি সেটা?

লোকটি গম্ভীর স্বরে বলে, নাগরা ঢাকার দোরগোড়ায়। তার সঙ্গে ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী। প্রশ্নটি হলো তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে, নাকি মোকাবেলা করা হবে।

তুমি থামো। সালিকের অসহিষ্ণু কণ্ঠ।

মেজর জেনারেল ফরমান নিয়াজীকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে কি?

নিয়াজী কিছু না বলে কঠিন চোখে তাকায়। যেন বলতে চায়, কি আছে না আছে তোমরা কি তার কিছুই জানো না? নিয়াজীকে চুপ করে থাকতে দেখে রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ বিরক্তির কণ্ঠে বলে, থলেতে কিছু কি আছে?

নিয়াজী ঢাকা রক্ষাকারী মেজর জেনারেল জামশেদের দিকে তাকায়। জামশেদ মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে। বিষণ্ন দৃষ্টির শূন্যতায় সবাই বোঝে, কিছুই নেই। গোলা শূন্য। ফরমান ও শরীফ প্রায় একই সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠে, এই যদি হয় অবস্থা তাহলে যান নাগরাকে গিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

ঘর আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ওদের ব্যঙ্গোক্তি নিয়াজীর বুক ফুঁড়ে যায়। কিন্তু কথা বলতে পারে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকেই তো ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তারও আগে বিবিসি খবরে বলেছিলো, নিয়াজী সৈনিকদের বিপদে ফেলে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। ঢাকা শহরে এ খবর পল্লবিত হয়েছিলো। এ খবর শোনার পর ও আকস্মিকভাবে হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টাল পরিদর্শনে গিয়ে লাউঞ্জে যাকে পেয়েছিলো তাকে ধরে বলেছিলো, বিবিসির লোকটি কোথায়?

লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হোটেলের অন্য কর্মচারিরা এসে জড়ো হয়। নিয়াজী শাউট করে ওঠে, সেই লোকটিকে আমি বলতে চাই যে আমি আমার সৈনিকদের রেখে পালিয়ে যাইনা। সর্বশক্তিমানের দোয়ায় আমি এখনো পূর্ব পাকিস্তানে আছি।

একথা মনে পড়তেই ও জামশেদের দিকে তাকালো। বললো, জামদেশ তুমি যাও ওদের অভ্যর্থনা জানাও। মীরপুর সেতুতে অবস্থানরত আমাদের সৈনিকদেরকে যুদ্ধ বিরতির প্রতি সম্মান দেখাতে বলো। ওদের নির্বিঘ্নে ঢাকায় ঢোকার সুযোগ করে দাও। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সালিকের সেই ব্যাটম্যানের কথা মনে হয় যে ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টারে বসে তার দুই ব্যান্ডের রেডিও ট্রানজিস্টারটি সিরিশ দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছিলো। টাঙ্গাইলে ভারতীয় ছত্রী বাহিনী নামার পর থেকেই ও রাতদিন রেডিও শুনতো। ওদের আশা ছিলো চীন আর আমেরিকা সাহায্য পাঠাবে। এমন একটি ধারণা সৈনিকদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছিলো। সেদিন ওই লোকটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ভাঁজ করা টুপিটি ঠিকঠাক করে স্যালুট দিয়েছিলো। সালিক খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করেছিলো, কোনো খবর আছে কি? ব্যাটম্যান শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলো, চীন বা আমেরিকার সাহায্যের কোনো খবর নাই। ও ব্যাটম্যানকে বলতে পারেনি যে এতোদিনে যখন কোনো খবর হয়নি, আর হবে না। এখন

নিয়াজীর মুখের দিকে তাকিয়ে সালিকের করুণা হয়। ও নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।
লোকটি ওর পিছু নেয়। ডাকে, সালিক।
এসো আমার সঙ্গে।
কোথায়?
এখন ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার নিশ্চিহ্ন করা হবে।
লোকটি শিহরিত হয়। ও দেখতে পায় ও একাই দাঁড়িয়ে আছে। অপারেশনাল মানচিত্রগুলো সরিয়ে ফেলে শেল নিক্ষেপ করে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কৌশলগত সদর দফতর। তখন ঢাকায় ঢুকছে মিত্রবাহিনী। চারদিকে জয়ের উল্লাস।
সালিক মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আছো?
দেখতে পাচ্ছো না? লোকটি বলে।
না। সালিকের ক্লান্ত, বিষণ্ন কণ্ঠ।
ভয় পেয়ো না। তোমাকে আমি পছন্দ করি। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তুমি যখন হেলিকপ্টারে উঠবে আমি তোমাকে সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবো।
আমার ভয় হচ্ছে আমরা বুঝি তোমাদেরকে ভারতীয়দের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।
হা-হা করে হেসে ওঠে লোকটি। শোননিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ? আর দাবায়ে রাখবার পারবা না? আমাদের কেউ শাসন করতে পারবে না। পারে না।
সালিক লোকটির দৃঢ়প্রত্যয়ে অভিভূত হয়। আর কথা বলতে পারে না।

ছ. ওদের আত্মসমর্পণের পর আমি ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও ক্যাপ্টেন বলবীর সিং একটি জিপে করে ঢাকার দিকে রওনা দেই। পার হচ্ছি মীরপুরের লোহার সেতু। কি প্রবল উত্তেজনা। কতো অসংখ্যবার পার হয়েছি এই সেতু কিন্তু এমন করে নয়। এ যাত্রা, অন্য যাত্রা। এ যাত্রায় মাত্রা আছে—বিশালত্বে এবং গভীরতায়। বেগ ধরে রাখতে পারি না। আমি যেন ওই মাত্রা ছুঁতে যাচ্ছি।
সাভারের কাছে জেনারেল নাগরা, কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্য স্টাফ অফিসাররা অপেক্ষা করছেন। জেনারেল নাগরা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ঢাকা পৌঁছে হেলিকপ্টার নামার নিরাপদ জায়গা দেখে তাদেরকে ওয়ারলেসে জানাতে। তখন প্রায় সকাল নটা। আমরা ফার্মগেট হয়ে এয়ারপোর্ট রোডে পৌঁছাই। আমাদের জিপের ড্রাইভার ভারতীয় সৈনিক শুকলা। ওকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। গম্ভীর, চুপচাপ মানুষটি। ভারতের কোন প্রদেশে ওর বাড়ি আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই। শুধু বুঝি ও একজন মানুষ। একটি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। আমি আলতো করে ওর ঘাড়ের কাছের চুল স্পর্শ করি।
আমাদের গাড়ি ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে। সামনে তেজগাঁ এয়ারপোর্ট। থার্ড গেটের আগেই বিমানবন্দরের হেলিপ্যাড। আমরা কাছে গিয়ে পুরো এলাকাটা ভালো করে দেখি। তারপর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ওয়ারলেসের মাধ্যমে জেনারেল নাগরাকে যোগাযোগ করে। তাঁকে এখানে অবতরণ করতে বলা হয়। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো একজন

পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশ। সে আমাদের জেনারেল নিয়াজীর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে। রাস্তার দুপাশে পাকিস্তান বাহিনী যার যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে নিজেদের অস্ত্র, অন্য হাতে সাদা পতাকা।

পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার। আমাদের জিপ এসে ঢোকে। জেনারেল নিয়াজীকে মধ্যখানে রেখে কোয়ার্টারের অফিসাররা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের বাম হাতের কব্জীর ওপর সাদা রুমাল বাঁধা। জেনারেল নিয়াজী এগিয়ে এসে ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে এবং তাকে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢোকে। পেছনে আমি আর ক্যাপ্টেন বলবীর সিং ঢুকি। আমরা ক্লেয়ারের কাছে আমাদের পরবর্তী কাজের কথা জানতে চাই। তিনি বলেন, আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করার জন্য একটি নিরাপদ জায়গা ঠিক করুন।

আমরা দুজনে বেরিয়ে আসি। বারান্দায় পাকিস্তানি অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বিষণ্ন, কেউ ক্রুদ্ধ। ইতস্তত পায়চারি করছে। আমি সরাসরি সবার মুখের দিকে তাকাই। যদি কেউ আমার চেনা হয়ে থাকে, তাকে বলবো— না থাক, কেউ আমার চেনা নয়। কেউ এতো বেশি বিষণ্ন যে সে মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। আমার ঘৃণা বাড়তে থাকে। বারান্দা থেকে নামতেই দেখি নিয়াজীর অফিসের বাইরে তার কালো রঙের শেভ্রোলেট গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টারের পতাকা লাগানো। সেটার দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো। শুকলার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় বললাম যে ওটা খুলে আনো।

শুকলা পতাকাটা খুলে এনে আমার হাতে দিলো। আমরা আবার জিপে উঠলাম। ক্যাপ্টেন বলবীর সিং-কে বললাম, দেখো এটা এখন আমার হাতের মুঠোয়। এটি পাবো এমন আশা করিনি। কিন্তু পতাকাটা হাতে পেয়ে মনে হচ্ছে এটার জন্যই দাহরান বিমানবন্দর থেকে ঢাকা ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ হাজার কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছি। বিজয়ের সাক্ষী হিসেবে এই পতাকা আমার কাছে আমৃত্যু থাকবে।

বলবীর মৃদু স্বরে বললো, তোমরা বাঙালিরা লড়াকু জাতি। তোমাদের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না।

আমরা এরপর ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে হেডকোয়ার্টারের জন্য জায়গা খুঁজি। কতোক্ষণ ঘুরেছি? একঘন্টা? এরকমই হবে, এর বেশি নয়। হলেও সামান্য সময় বেশি। বেইলি রোডে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট হাউসের গেটের সামনে এলে পাকিস্তানি গার্ডদের গুলিতে নিহত হয় ক্যাপ্টেন বলবীর সিং ও শুকলা।

আমি স্তম্ভিত। আমি মর্মাহত।

ইস্টার্ন হেডকোর্য়াটারের পতাকাটি হাতে নিয়ে ভাবছি বিকেলে রেসকোর্সে যেতে হবে। পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করবে মিত্রবাহিনীর কাছে।

কিন্তু শুকলা? শুকলাকে ছাড়া আমি সেই অনুষ্ঠানে কি করে যাবো? পাঞ্জাবের কোনো এক গ্রামে ওর বাড়ি। যেখানে ওর পরিবার ওর অপেক্ষায় আছে। যুদ্ধের অবসরে ব্যক্তিগত কথা জানা হয়নি। এখন নির্মম সত্যটা আমার সামনে। ও আমার স্বাধীনতার জন্য জীবন দিলো। ওর রক্তে ভিজে যাচ্ছে আমার দেশের মাটি। গড়াচ্ছে পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ওর শরীরটা। আমি জানি না চোখ দু'টো খোলা কিনা।

আমি দু'হাতে মুখ ঢাকি। চারপাশে উচ্চারিত হচ্ছে গগন-বিদারী শ্লোগান। গমগম করছে মানুষের কণ্ঠ। অল্পক্ষণে মনে হয় শুকলাই এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। বলছে, ইউসুফ যাই। ঘরে ফেরার সময় হলো। পাঞ্জাবে এলে আমার বাড়িতে এসো। আমার বউয়ের নাম অমৃতা। মেয়ে জয়িতা। ছেলে রণধীর। বুড়ো মা আছে। চোখে দেখতে পায় না। ছেলেমেয়ে দু'টো স্কুলে যায়। আমার বউ খুব কাজের মেয়ে। রাতদিন খাটে। গান গাইতে পারে। সংসারে শান্তি আছে। তুমি বেড়াতে এলে আমি খুব খুশি হবো ইউসুফ। আমি জানি আমার বউ তোমাকে গান শুনিয়ে খুশি হবে।

শুকলার কণ্ঠ আমাকে কাঁদাতে থাকে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। ওর লাশের পাশে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরে ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, ও কি আপনার কেউ হয়?

আমি উত্তর দেইনা।

জ. মেনাজ পরিবারের কাছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার খবর আসে। ওরা দেখতে পায় বড় সড়ক ধরে মিলিটারির গাড়িগুলো ফিরে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে, দ্যাশ স্বাধীন, দ্যাশ স্বাধীন-জয় বাংলা।

দুপুরের দিকে মেনাজ ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে। বেণুর শরীর খারাপ লাগে। ও ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলো। মেনাজ মেয়ের পাশে বসে পড়ে বলে, বেণু রে যুদ্ধ শ্যাষ। অখন মাখন ফিরা্যা আসবে। মাখনের সাতে তুমহারে হামি বিয়া দেবো।

সকিনা অকপটে বলে, ক্যামনে বিয়া দেবা? বেণু যে গর্ভবতী। মাখন কি রাজী হবে?

শরীর খারাপ নিয়েও বেণু হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে, গর্ভ? কিসের গর্ভ? এইডা গর্ভ না, জরায়ুর জখম।

বলেই আবার শুয়ে পড়ে। কাঁথামুড়ি দেয়। ওর মনও খারাপ। গত মাসে রাজাকাররা মাখনের বাবা, মা, ভাইবোন সবাইকে মেরে ফেলেছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিবার বাঁচতে পারবে না বলে হুমকি দিয়েছিলো ওরা। ফিরে এসে এতো দুঃখ কি করে সইবে মাখন? ওর কথা শুনে মেনাজ আর সকিনা উঠে পড়ে। মনে হয়, ওদের যেন চোখ খুলে যাচ্ছ, দু'জনেই বলে, ওতো ঠিক কতাই কহাছে। যুদ্ধের সময় মেয়ামানষের এমন জখমই তো হয়।

দু'জনে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে, মাখন কবে ফিরবে? মাখনের রাস্তা এটা। ওকে এ বাড়ি হয়ে নিজের বাড়িতে যেতে হবে। তাছাড়া ও যখন বেণুকে অপেক্ষা করতে বলেছে তখন এ বাড়িতে আসবেই। দুজনেই মাখনের অপেক্ষায় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। যতোদূর চোখ যায় দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বড়ো আশা মেনাজ পরিবারের, ও বেণুকে অপেক্ষা করতে বলেছে। ওরা আরো ভাবে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যে ক্ষতি হবার তাতো হবেই, তাই বলে সবকিছু কি মনে রাখতে হবে? বরং মনে রাখতে হবে রাজাকারদের শাস্তি দেয়ার কথা—মনে রাখতে হবে দালালদের ক্ষমা না করার কথা—মনে রাখতে হবে নতুন দেশকে গড়ে তোলার কথা। বেণুর গর্ভ তো তুচ্ছ ব্যাপার, কতো বড়ো কাজ

সামনে। বেণুর ভবিষ্যৎ নিয়ে মেনাজ পরিবারের আশা ফুরোয় না। নতুন দেশ, নতুন স্বপ্ন নিয়ে ওদের দৃষ্টি চকচক করে।

এইসব আশার মাঝে একদিন ওরা দখতে পায় কুয়াশা ভেদ করে কেউ বুঝি এগিয়ে আসছে। কিন্তু তার পূর্ণ অবয়ব ওদের কাছে পরিষ্কার নয়। ওরা অপেক্ষা করতে থাকে।

তখন লোকটি মাখনের কাঁধে হাত রেখে বলে, চলো। তোমাকে আমি তোমার গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

আমি তো সেটাই আশাকরি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। আমি তোমাকে বেণুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

দু'জনে বুড়ো-বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নেয়।

প্রথমে গরুর গাড়িতে, তারপর নৌকায়। দু'জনে অনেকটা পথ একসঙ্গে আসে। মাখনের মুখে কেবল বেণুর গল্প। একসময়ে লোকটি বলে, বিয়ের পরে তোমাদেরকে আমি একটি নতুন ঘর উপহার দেবো।

সত্যি ?

ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড় থেকে কাশের গুচ্ছ কেটে এনে শুকাবো। সেই নতুন ছন দিয়ে ছেয়ে দেবো ঘরের চাল।

মাখন চমকে ওঠে, কি সুন্দর স্বপ্ন ! লোকটির হাত চেপে ধরে, সত্যি তাই করবে ?

তোমাদের জন্য একটি নতুন নকশি কাঁথা নিয়ে আসবো। এখন তো ভীষণ শীত।

কোথায় পাবে ?

তুমি তো জানো না অনেক মেয়ে নতুন কাঁথা সেলাই করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। ওদের একজন দেবে।

উহ্, কি ভাগ্য আমার।

তোমাদের জন্য আমি একটি বড় পেতলের কুপি নিয়ে আসবো। তুমি রাতে ঘুমুবার আগে ওই কুপির আলোয় বেণুর মুখ দেখবে। ওটা কিন্তু অন্য কোনো সময় আর জ্বালিয়ো না। শুধু ওই আলোয় বেণুকে দেখা।

আমি তাই করবো। তোমার কথা শুনে আমার শরীরটা কাঁপছে।

তোমাদের গোয়ালে আমি একটি বকনা বাছুর দেবো। তোমাদের সন্তান হবার আগেই যেন ওটি দুগ্ধবতী হয়।

আর কতো স্বপ্ন তুমি আমাকে দেবে ?

তোমাদের ছেলে বা মেয়ে হলে তার নাম রাখবো আমি।

রেখো। আর কি করবে ?

সেই শিশুকে আমি ওই বুড়ো-বুড়ির কাছে নিয়ে যাবো যুদ্ধের গল্প শোনানোর জন্য।

যুদ্ধ ? মাখন বিষণ্ন দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে তাকায়।

কি ভাবছো ? পায়ের কথা ?

যুদ্ধে আমি পা হারালাম।

তাতে কি হয়েছে ? যুদ্ধ এমনই। মেয়েরাতো যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও অঙ্গ হারায়।

কিভাবে ?

ধর্ষিত হলে ওদের গর্ভ হয়। সেটা মাতৃত্বের গর্ভ না। সেটা জরায়ুর জখম।

জরায়ুর জখম? হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

মাখন সায় দেয়। ওদের গরুর গাড়ির যাত্রা শেষ হয়েছে। ওরা এখন নৌকায়। মাখন ছইহীন নৌকার পাটাতনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। শীতের রোদ ওর ভারী ভালো লাগছে। আহত হওয়ার এই কয়টা মাসতো ঘরে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। প্রাণ ভরে রোদ-বৃষ্টি দেখা হয়নি। লোকটির হাত চেপে ধরে বলে, খুব ভালো লাগছে বাড়ি ফিরতে।

লাগবেই তো মানুষ তো ঘরেই ফিরতে চায়।

আচ্ছা নদীর ঘাট থেকে অনেকটা পথ তো হেঁটে যেতে হবে। আমি কি করে হাঁটবো?

ক্রাচ দিয়ে। তোমাকে নতুন ক্রাচ এনে দিয়েছি।

ক্রাচ দিয়ে তো অতোটা পথ হাঁটতে পারবো না।

না পারলে আমি তোমাকে ঘাড়ে তুলে নেবো।

আচ্ছা, বেণু কি আমাকে ল্যাংড়া বলবে?

তুমি আবার সেই একই কথা বলছো। কেন ও তোমাকে ল্যাংড়া বলবে? তুমি তো আহত মুক্তিযোদ্ধা। তাছাড়া বেণু তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

আমিও বেণুকে খুব ভালোবাসি। বেণুকে ছাড়া বাঁচবোই না।

লোকটি দেখতে পায় মাখন লাজুক হেসে মুখটা অন্যদিকে ফেরায়। একটুপর গুণগুণ করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ঘাটে পৌঁছে গেলে মাখন নৌকা থেকে নামতে নামতে বলে, আমি জানি খবর পেলে বেণু আমার জন্য ঠিকই ঘাটে চলে আসতো। ও খুব ভালো মেয়ে।

তুমি কোনোদিন বেণুকে ভুল বুঝবে না তো মাখন?

কখখোনো না। কোনোদিনই না।

ও এতো জোরে কথা বলে যে আশেপাশের লোকেরা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। লোকটি মৃদু হেসে ওর ডান হাতটা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে বলে, চলো।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর, প্রায় বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় এসে লোকটি মাখনকে একা দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, এবার নিজে নিজে হাঁটো। এটা তো মাঠের কোণাকুণি একটা রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো নয়। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে ভয় নেই।

এতো কথা বলছো কেন? তুমি আসবে না আমার সঙ্গে? বেণুকে দেখবে না?

লোকটি হা-হা করে হেসে বলে, আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি।

মাখন এগিয়ে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায়। ওর সঙ্গে কেউ নেই। মনে হয় হাসিটা বাতাস হয়ে মাতামাতি করছে। বাতাস নয়, ও বুকভরে হাসির শ্বাস টানে। ও যতোটা সম্ভব দ্রুত গতিতে এগোয়। দেখতে পায় চারদিক থেকে গ্রামের লোক ওর দিকে ছুটে আসছে। আহ্, কি আনন্দ! বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরা।

গাঁয়ের লোকেরা মাখনকে আর হাঁটতে দেয় না। একজনে ক্রাচ দু'টো সরিয়ে নিলে অন্যরা ওকে কাঁধে তুলে নেয়। কেউ ওকে ওর বাড়ির খবর বলে না। বেণুদের বাড়ির সামনে আসার আগেই ও বলে, আপনেরা আমারে এইখানে নামায়ে দ্যান?

ও মানুষের ঘাড়ে চড়ে বেণুর সামনে যেতে চায় না। ক্রাচে ভর করে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। ছুটে আসে মেনাজ, বাবা মাখন, তুমি ব্যাঁচা আছ তাইলে?

মেনাজ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাখন হাসতে হাসতে বলে, একটা পা গ্যাছে।

যাক, পরাণ তো আছে।

বাজান কই? বাজান আসে না ক্যান হে?

তুমি আমার ঘরত চলো। এ্যানা দম নাও। দুইমুঠা ভাত খাও।

চলেন।

ও বেণুর কাছে আসে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও বেণু নেই। বেণু তখন ঘরের ভেতর। কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লোকটি ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, বেণু ওঠো। তোমার মখন ফিরেছে।

বেণু সোনা ওঠো—।

বেণু মুখের ওপর থেকে কাঁথা সরালে শুনতে পায় বাইরে কোলাহল। সকিনা মাখনকে জড়িয়ে ধরে বলছে, বাবা, বাবারে, কতোদিন পরে তোক দেখলাম।

মেনাজ বলে, বেণুর মা ওক আগে পানি দাও। ওর বুকে তিয়াস।

রেণু বারান্দায় খেজুরের পাটি বিছিয়ে দিয়ে বলে, বসেন মাখন ভাই।

জাকু ক্রাচ দু'টো ধরে বলে, এই দুইডা কি?

মাখন হাসতে হাসতে বলে, যুদ্ধের পা।

মেনাজ পরিবারের ক্ষুদে সদস্যরা অপার বিস্ময়ে বলে, আপনে যুদ্ধ করছেন মাখন ভাই!

রেণু বলে, আপনে তাইলে হেই মানুষডা যাক পাকিস্তান আর্মি মুকুত কয়ে ডরাইতো?

ওর কথা শুনে হো-হো করে হাসে মাখন। বলে, এই নয় মাসে তোরা তো অনেক কিছু শিখছস রে রেণু।

সকিনা এক ডালা মুড়ি-গুড় ওদের সামনে দেয়। বলে, খাও বাবা, অল্পক্ষণে ভাত হয়ে যাবে।

না, চাচী আমি বাড়ি গিয়া ভাত খামু। আমার মায়ের হাতের ভাত।

তাতো খ্যাবাই বাবা। তুমহার সাতে হামরাও তুমহার বাড়িত যাবো। তুমহি হামাকরে গাঁয়ের ধন। একডা সোনার পোলা।

মাখন দেখতে পায় মানুষগুলো উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু অন্তরালে গভীর বিষাদ। সেটা ওকে ভীষণ নাড়া দিয়ে যায়। ও মুড়ি চিবোয়। তখন জাকু চুপিচুপি বলে, মাখন ভাই আপনের কেউ নাই। সব শ্যাষ।

কেউ নাই? কি কহাচ্ছিস? মাখন চিৎকার করে ওঠে।

রাজাকাররা মারি ফালাইছে।

এই জাকু বলে, মেনাজ একটা হুঙ্কার দিয়ে ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে আসে। শিশুদের সত্য কথা কখনো কখনো কী ভীষণ নির্মম বুঝতে না বুঝতেই আর একটি শিশু বলে, আপনের বাড়িঘরও পুইড়ে ফালাইছে রাজাকাররা।

ও মাগো বলে চিৎকার করে ও বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে। জ্ঞান হারায়।

দুপুর গড়িয়ে যায়। ওর জ্ঞান ফেরে না। মেনাজ ওর চোখেমুখে পানির ঝাপটা দেয়। বাতাস করে। মনসুর ওর হাতে-পায়ে গরম তেল ঘঁষতে থাকে। ওর জ্ঞান ফেরে না। তখন কেউ কেউ একজন ডাক্তারের খোঁজে বাজারের দিকে দৌড়াতে থাকে। সকিনা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। ওর ভাত রান্না হয়েছে। খুব ইচ্ছে ছেলেটাকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দেবে।

বিকেলের পর ওর জ্ঞান ফেরে। ও শুনতে পায় লোকটি ওকে ডাকছে, মাখন ওঠো। বেণু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। নতুন দেশে তোমার নতুন জীবন শরু হবে।

মাখন চোখ খোলে। উঠে বসে। ওর শূন্য দৃষ্টি বেণুকে খোঁজে। একজন প্রিয় কেউ থাকলে বাকি জীবনটা হয়তো কেটে যেতে পারে। নইলে ও কি পাগল হয়ে যাবে?

বাবা চারটা ভাত খাও? সকিনার কণ্ঠ।

মা। ও ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। অনেকেই ওকে সান্ত্বনা দেয়। চোখের জল মুছিয়ে দেয়। ওর কান্না ফুরোয় না।

বাবা, মা গেলে মা থাকে। আদর-সোহাগ থাকে। বাবা ভাত খাও। তোমার খিদা প্যায়েছে।

ও হাঁ করে। সকিনা ওর মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দেয়। গ্রামবাসী একজন মায়ের হাতে ওর ভাত খাওয়া দেখে। সবাই বলে, ভাত খেয়ে ও এখানে থাকুক। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিক। তারপর নিজের বাড়ি যাবে। ভাত খাওয়া হলে মেনাজ ওকে পরিপাটি বিছানা দেয়। ও ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর ঘুম ভাঙে ঠিক সন্ধ্যায়। দিনের আলো নিভে গেছে। কুপি জ্বলছে। কুপিটি সামনে রেখে ওর মাথার কাছে বসে আছে বেণু। বুকের ওপর ওর হাত। ঘুম ভেঙে গেলে সে হাত চেপে ধরে মাখন, বেণু? কাঁচের চুড়িতে মৃদু শব্দ হয়। ও উঠে বসে। বুকে টেনে নেয় বেণুকে। বলে, চারদিকে ক্যাবল তুমহারেই খুঁজি। পলাইয়ে আছো ক্যান হে?

পলাই নাইতো। তুমহার জন্যিইতো বইসে আছি।

বেণু সোনা। আমার মানিক।

অদ্ভুত শিহরণ বেণুর শরীরে। ও পাগলের মতো মাখনের বুকে মুখ ঘঁষে। তারপর আস্তে করে বলে, চলো।

কোথায়? মাখনের কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ।

তুমহার ভিটায়।

ভিটা, আমার পোড়া ভিটা।

ও চৌকি থেকে নামার সময় দেখতে পায় বেণুর পূর্ণ অবয়ব। বেণু দাঁড়িয়ে আছে মাখনকে দাঁড়াতে সাহায্য করবে বলে। মাখন পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, বেণু, বেণু কি হয়েছে?

ও কুপিটা মাখনের হাতে দিয়ে বলে, ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। আমি ভালো হয়ে যাবো।

মাখন ওর মুখের সামনে কুপি উঠিয়ে ধরে। সেই আলোয় অপরূপ দেখায় বেণুকে। বেণুর কোনো গ্লানি নেই। কুপিটা রেখে ও বেণুর দু'হাত চেপে ধরে। দেখে বেণু কতো দৃঢ় প্রত্যয়ী। বেণু ফিসফিসিয়ে বলে, স্বাধীনতা কি সোজা কতা? স্বাধীনতা কতো কিছু নেয়। হের লাইগে মন খারাপ করবো ক্যানহে?

মাখনের মনে হয় বেণু কথা বলছে না, ওর কণ্ঠে এক আশ্চর্য ধ্বনি। ও ক্রাচটা বেণুর হাতে দিয়ে বলে, এইডে অখন থাইকে তুমহার।

আকাশে চাঁদ। আজ পূর্ণিমা। বেণু সহ মেনাজ পরিবারের ক্ষুদে সদস্যদের নিয়ে মাখন ওর ভিটের দিকে যেতে থাকে। ছোটরা হল্লা করতে করতে আগে আগে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। মাখন আর বেণু অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ক্রাচ নিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায়

অসুবিধে হচ্ছে মাখনের। বেণু ওকে ধরে নিয়ে এগুচ্ছে। একটুপর ছোটদের আর দেখা যাচ্ছে না। ভরা পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ওরা ছুটে চলে গেছে মাঠে। ওদের মাতামাতির খলখল কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে। মাখন বেণুকে বলে, কি সুন্দর শব্দ।

বেণু হাসতে হাসতে বলে, পূর্ণিমার শব্দ।

তখন দুজনে ওদের পোড়া ভিটের সামনে এসে দাঁড়ালে দেখে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলে, এসো।

মাখন বিষাদমাখা কণ্ঠে বলে, ঘরতো নেই।

লোকটি হাসতে থাকে, তাতে কি হয়েছে, ভিটে তো আছে। নতুন ঘর হবে।

বেণুর কানে সে হাসি পূর্ণিমার শব্দ হয়ে বাজে।